সংস্কৃতি বিষয়ক

যোগসূত্র

সংস্কৃতি বিষয়ক

যোগসূত্র

অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৯৩

সম্পাদক : বিনয় ঘোষ
সহযোগী সম্পাদক : সঞ্জয় চক্রবর্তী, কল্যাণ ভট্টাচার্য, সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য
প্রচার : মানস বসু
বিজ্ঞাপন : অসীম রক্ষিত
প্রচ্ছদ : সোমনাথ হোর
স্কেচ : সুব্রত চৌধুরী
অলঙ্করণ : অনন্য বিশ্বাস
কৃতজ্ঞতা : তপন দাশ, প্রদীপ সান্যাল, ধ্রুব গুপ্ত
যোগাযোগ : টি জি ২/২৯, তেঘরিয়া, হাতিয়ারা, কলকাতা-৭০০০৫৯
ফোন : ৫৯ ৪০৪৮
৪৩/১এ, মলঙ্গা লেন, কলকাতা-৭০০০১২

ভরৎবিলাপ ১ □ মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের খাতা ১৭ □ রিঙ্গনলীলা ৩২ □ কথকতার গান ৩৮ □ কথকদের কথা ৫২ □ কথকতার টুকিটাকি ৭৯ □ উইলিয়ম ওয়ার্ড / পুরাণ পড়া ও পুরাণ শোনা ৯৭ □ ড. দীনেশ চন্দ্র সেন / বাঙালার বিলুপ্ত সম্পদ—কথকতা ৯৯ □ রাজ্যেশ্বর মিত্র / কথকতা ১১১ □ রমাকান্ত চক্রবর্তী / কথকতা পাঠকতা ১১৬ □ অনিন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায় / রামচরিতের ঢোঁড়াইচরিত হয়ে ওঠা ১৩২ □ অদিতিনাথ সরকার / বানপট : গান এবং পালা ১৫২ □ গৌতম ভদ্র / কথকতার নানা কথা ১৬৭

হঠাৎ এরকম একটা বিষয় নিয়ে এত মাতামাতি কেন, এ প্রশ্ন উঠতেই পারে। আমাদের দিক থেকে বলার, সঙ্কটে লোকে উৎসের দিকে ফিরে তাকাবেই। সাহিত্য কিংবা নাটকের দিক থেকেও জরুরি মনে হয়েছে এই ফিরে দেখা।
এখানে বলে রাখা দরকার : উনিশ শতক ও বিশ শতকের বাংলা কথকতাই আমাদের প্রসঙ্গ।
প্রতিটি সংখ্যাতেই স্মরণ, শোক প্রকাশে আমরা যেন বাধ্য। এবার আঘাত ভূমিকম্পের।
স্মরণ : নির্মল গুহ রায়, উৎপল দত্ত এবং সুবীর রায় চৌধুরী।
২০. ১০. ৯৩

With best compliments from :

MICROSERVICES

(A Microventure in Computer Services)

1 PARK SIDE ROAD

CALCUTTA-700 026

□ Space Donated By A Well Wisher □

কথকতা বিষয়ক এই সংখ্যাটির আমন্ত্রিত সম্পাদক :

□ গৌতম ভদ্র □

সংখ্যাটির বিন্যাস এরকম :

কথকতার পুঁথি : বরাহনগরের পাঠবাড়ির পুঁথি ভরৎবিলাপ / মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের খাতা / রিঙ্গনলীলা—কুমুদবন্ধু ভট্টাচার্য।

□

কথকতার গান : রামধনের গান / হরি কীর্তন / মহানন্দের গান / ফেলারামের গান / স্বরলিপি।

□

কথকদের কথা : দ্বিজরাজ / কুমুদবন্ধু / ক্ষান্তিলতা / মৃত্যুঞ্জয় / বাসন্তী দেবী।

□

কথকতার টুকিটাকি : দীনবন্ধু মিত্রের চোখে কথক / বিদ্যাসাগরের লেখায় কথক / হিসাবের খাতা / চূর্ণী / মানপত্র / কার্ড / কথকদের নামাবলী।

□

পুনর্মুদ্রণ : উইলিয়ম ওয়ার্ড / ড. দীনেশচন্দ্র সেন।

□

আলোচনা : রাজ্যেশ্বর মিত্র / রমাকান্ত চক্রবর্তী / অনিন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায় / অদিতিনাথ সরকার।

□

কথকতার নানা কথা : গৌতম ভদ্র

□ পাঠ নির্দেশ □

পুঁথির বানানে 'ল' বোঝাতে 'ন'-এর তলায় বিন্দু বসিয়ে লেখার রীতি ছিল। ছাপায় সেই রীতি বজায় রাখা যায়নি। এখানে অনেক ক্ষেত্রেই 'ন'-কে 'ল' হিসাবে পড়তে হবে। অন্যান্য বানান যথাসাধ্য অপরিবর্তিত রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।

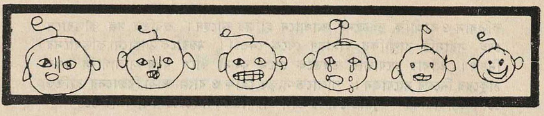

ভরৎবিলাপ

কথকতার পুথি প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে শ্রীহরিপদ চক্রবর্তী মহাশয় মন্তব্য করেছেন যে কথকতার কোনো পুথি এতাবৎকাল মুদ্রিত হয়নি। আমাদের প্রাথমিক অনুসন্ধানও এই মতকে সমর্থন করে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র সেন, শিবরতন মিত্র, অমলেন্দু মিত্র, হরিপদ চক্রবর্তী প্রভৃতি বিদ্বৎজনেরা নানা প্রসঙ্গে তাঁদের নানা রচনায় নানা টুকরো-অনুচ্ছেদ নিদর্শন হিসাবে হাজির করেছেন। দীনেশ চন্দ্র সেনের রচনাটির হদিশ আমরা পাই শ্রীমৃদুল কান্তি বসুর কাছ থেকে। কিন্তু আজ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ পুথির বিশদ অংশ ছাপানো হয়নি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বরানগর পাঠবাড়ীর শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গগ্রন্থমন্দিরে কথকতার পুথি সংরক্ষিত আছে। কিছু পুথি খণ্ডিত, কিছুর লিপিকাল, সময় ও লেখক অজ্ঞাত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথি-সংগ্রহ পরীক্ষা করার সুযোগ আমাদের হয়নি। কিন্তু অন্য তিনটি প্রতিষ্ঠানের পুথি-সংগ্রহ আমরা যথাসম্ভব ব্যবহার করেছি। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ থেকে উনিশ শতক জুড়ে এই পুথিগুলো লেখা হয়েছে। ভাষা, কাগজ ও লিপির ছাঁদ এবং পুষ্পিকায় প্রদত্ত সন দেখে এইরকম মনে হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথি তালিকায় একটি ২১১ পাতার বৃহৎ ও সম্পূর্ণ পুথির উল্লেখ পাওয়া যায় (৪২৪৩ নং)। ১৮৫৯ সালে লেখা, বিষয় পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ, ধ্রুবচরিত্র, জড়োনখগণ ও নরক। গত একবছরের অনুসন্ধানেও এই পুথিটির হদিস পাওয়া যায়নি। যে বিশ্ববিদ্যালয়ে সচেতনভাবে এশিয়ার এককালীন শ্রেষ্ঠ আইন পুস্তকের গ্রন্থাগারকে ভেঙে আলমারি সরিয়ে দিয়ে দেড়শ বছরের পুরনো পুস্তক ও প্রতিবেদনকে মাটিতে ফেলে চিরতরে নষ্ট করা হয়, মাননীয় উপাচার্য ও সহ-উপাচার্যকে বার বার চিঠি লিখেও প্রতিকার তো দূরের কথা জবাব পাওয়া যায় না, সেখানে অবশ্য একটি দামি পুথি খুঁজে না পাওয়া, এমন কিছু আক্ষেপের বিষয় নয়।

ইচ্ছা থাকলেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর্যুক্ত পুথিটি আমরা ছাপতে পারলাম না। ফলে বরাহনগর পাঠবাড়ীর শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দিরের সংগ্রহ থেকে 'ভরত বিলাপ' পালার অংশবিশেষ এখানে ছাপা হল। তালিকা নং ২৭৯০/১৮। নিয়মানুসারে সমস্ত পালাটি হুবহু ছাপা গেল না। অংশবিশেষ বাদ দিতে হল। আশা করা যায় তাতে আখ্যানাংশ ক্ষুণ্ণ হবে না বা পুথির পরিচয় পেতেও অসুবিধা হবে না।

এই পুথিটির পাটায় লেখা আছে পানিহাটি গৌরাঙ্গ মন্দির। ফলে বলা যায় যে বিংশ শতকের প্রথমে শ্রীঅমূল্যধন রায়ভট্ট মহাশয় এই পুথিটি সংগ্রহ করেছেন। ভোলানাথ স্মৃতিতীর্থের চতুষ্পাটিতে এই পালাটি লেখা হয়। পুথিতে তারিখ নেই। কিন্তু অন্যান্য সমতুল্য পালার পুথির সঙ্গে মিলিয়ে বোঝা যায় যে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পালাটি লেখা হয়েছে।

পালাটিতে টানা আখ্যান আছে। গান, চূর্ণী ইত্যাদি বা সব টুকিটাকি আলাদা টুকরো কাগজ বা পাতড়ায় থাকে, সেইরকম কিছু কিন্তু আলোচ্য পুথিটিতে নেই।

কৃত্তিবাস ও বাল্মীকি দুইজনেই আখ্যানে হাজির আছেন। সুরভির গল্প কৃত্তিবাসে নেই, সরাসরি বাল্মীকির রামায়ণ থেকে নেওয়া। মন্থরাকে ঠ্যাঙানো কৃত্তিবাসের নিজস্ব। আবার অযোধ্যার ভরতকে দেখে কলসী কাঁখে বধূর গালাগালি কথক ঠাকুরের নিজের সংযোজন। পালাতে সংস্কৃত শ্লোক ও বাংলা ভাষা বিন্যাসের রীতিও চোখ এড়াবার নয়। পুথিটি বেশির ভাগ জায়গায় লেখা হয়েছে কথা বলার ঢঙে। কথকতার শিল্প শ্রব্য। শুধু লেখায় তার আস্বাদ ধরা অসম্ভব। ছাপার অক্ষরে নিঃশব্দে পুথি পড়তে পড়তে আমরা কথককে, তার কৃত্তিকে যেন না ভুলে যাই।

[১ক] সষ্ঠ দিবসে রাজা রাম শোকে দেহত্যাগ কন্নে পর ।। কৌশল্যা মনে কন্নেণ রাজার ছয়দিন নিদ্রা হয় নাই। নিদ্রা হনো ভানো হলো ।। এই মনে করে সে গৃহ পরিত্যাগ করে অন্য গৃহে গমন। পরদিন প্রাভাত সময়ে ।। বশিষ্ঠ সভায় আগমন ।। বশিষ্ঠকে দর্শন করে সুমন্ত্র চরণে প্রণাম ।। আশন প্রদান ।। পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে পূজা ।। বশিষ্ঠ উ ।। সুমন্ত্র মহারাজ কোথায় ।। সুমন্ত্র উ ।। ঠাকুর জে অবধি শ্রীরাম বনগমন করেছেন সেই অবধি রাজা সভাতে আগমন করেন নাই ।। বোধহয় কৌশন্যা ভবনে আছেন ।। বশিষ্ঠ উ ।। সুমন্ত্র তুমি জায়ে রাজারে সভায় আনয়ন করো ।। পুত্রশোকে [১খ] কাতর হয়ে রাজকার্য পরিত্যাগ করা উচিৎ নয় ।। সুমন্ত্র এই কথা শ্রবণ করে কৌশল্যা ভবনে গমন করত মা কৌশল্যা সভাতে বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ আগমন করেছেন। মহারাজকে সভায় প্রেরণ করুন তারা আওহান কচ্চের্ন। কৌশল্যা উ ।। সুমন্ত্র ।। জে অবধি রাম আমার বনে গমন করেছেন ।। সেই অবধি রাজার নিদ্রা হয় নাই ।। কন্য অর্দ্ধ রজনী হতে রাজাঃ নিদ্রিত হয়েছেন। গুরুদ বশিষ্ঠের নিকটে বনো। রাজার নিদ্রা ভঙ্গ হনে সভায় প্রেরণ করব। সুমন্ত্র ।। এই কথা শ্রবণ করে সভায় গমন কন্নেন। বশিষ্ঠ সুমন্ত্রকে দেখে বনেন কৈ মহারাজ কৈ ।। সুমন্ত্র উ ।। গুরো জে অবধি শ্রীরাম বনগমন করেছেন

[২ক] সেই অবধি রাজার নিদ্রা হয় নাই ।। কন্য অর্দ্ধ-রাত্রিতে রাজা নিদ্রীত হয়েছেন ।। রাজ্ঞা কৌশল্যা বনেন যে রাজার নিদ্রা ভঙ্গ হলে পর সভায় গমন করবেন ।। বশিষ্ঠ উ ।। এ ।। বনো কি রাজা নিদ্রিতো পুত্র শোকাতুর জে তার কি আর নিদ্রা হছে ।। দেখো২ কি সর্বনাশ হনো বুঝি ।। সুমন্ত্র অই কথা শ্রবণ করে পুনর্ব্বার কৌশল্যার ভবনে গমন কন্নেন ।। তৎ কৌশল্যার নিকটে বনেন। রাজ্ঞি কৌশল্যে ।। গুরো বশিষ্ঠ বনেন ।। পুত্রশোকাতুর ।। জে ব্যাক্ত তার কি নিদ্রা আছে ।। কি ।। বিপৎ উপস্থিত হনো বুঝি ।। সুমন্ত্রের মুখে অইকথা শ্রবণ করে কৌশন্যা যে গৃহে রাজা সয়ন করে আছেন সেই গৃহে প্রবেশ করত ।। গাত্রের

[২খ] বস্ত্র উদঘাটন করে দেখেন জে উত্তায়ো লোচনং কাষ্ঠিভূত দেহ ।। রাজা দেহ ত্যাগ করেছেন। দর্শণ করে ।। উচ্চৈস্বরে বনেন মহারাজ পুত্রশোকে দেহত্যাগ কন্যান বনে ধরাতলে পতিতা মূচ্ছির্তা হনেন ।। কৌশন্যার রোদনধ্বনি শ্রবণ করে ।। অন্তঃপুরস্থা অন্য২ রাজ্ঞি সকলে আগমন করে রাজার মৃতদেহ দেখে ।। সকলে রোদন কর্ত্তে নাগিনেন ।। ক্ষণকান পরে কৌশল্যা চৈতন্য লাভ করত ।। রাম শোকে এবং

রাজার শোকে কাতরা ।। মৃত পতির চরণ গ্রহণ করে বিনাপ কর্ত্তে নাগিন ।। বনেন মহারাজ আপনি শকৃতি ।। অজী [?] বনর্হা জীবামি ত্বম্বিহানা ।। নরাধিপ ।। সকামা ভব কৈকেয়ি ভুঙ্ক্ষ রাজ্যমকণ্ঠকং ।।

[৩ক] পতি প্রাণৈ বিযুর্জে ধিককৃতে নিবৃর্তাভব ।। মহারাজ আপনি তো পুত্রশোকে জিবন পরিত্যাগ কল্লেন ।। আমার এ জীবনে কোন প্রয়োজন নাই ।। কিন্তু আপনায় ত্যাগ করে আমি এখোনো জিবন ধারণ করে আছি ।। ওরে পাপিনী কৈকেয়ী ।। তুই আজ সকামা হনি ।। নিষ্কণ্ঠকে রাজ্য ভোগ করো ।। তোকে ধিক ।। তিনটে বিনাশের কারণ । রাজা তোরে বিবাহ করেছিলেন ।। রামের বিনাশ মহারাজের মৃত্যু আর আমাদের বৈধব্ব ।। অপাপঃ পাপ সংকল্পে ভরতো দুষিতোস্তয়া ।। ভরৎ অপাপ কিন্তু তোর নিমিত্ত ভরৎ আজ দুশি হয়ে পাপী হয়েছে ।। ভরৎ তোরে পরি [৩খ] ত্যাগ কর্বে তোর অভিনাশ পরিপূর্ণ করবে না । ।। কি ।। কুকার্য কন্নি পতির নিমিত্ত ।। রাম জানকী লক্ষণের নিমিত্ত শোক করি ।। হা নাথ হা মহারাজ পতিতাং শোকসাগরে । হা মহারাজ, হা হয় আজ আমি পতিতা হনেম ।। আমার জীবনে ধিক জে হেতুক আপনি দেহত্যাগ করে সর্গগামি হনেন । আমি আপনার সঙ্গে গমন কত্তে পারনেম না ।। কেননা বনবাশী রাম পুনব্বার অযধ্যায় আগমন করবেন ।। তার বদন দর্শন আশায়এখোনো জিবন ধারণ করে আছি ।। মহারাজ আপনার এই দেহকে কিরূপে চিতায় দগ্ধ কর্বো ।। কৃতে সীতা সরসিজমুখী কুত্র বা নীন দেহঃ ।। ক্ক জাম্বুনদ হেমশুন্দরঃ বপু কুত্র বা

[৪ক] প্রাণ নাথ ঃ।। মহারাজ পদ্মমুখী শিতা আপনার কোথায় ।। নবদুর্বাদল স্যাম বামি বা কোথায় জাম্বুদ তপ্ত কাঞ্চনবর্ন ।। নক্ষণ বা কোথায় ।। কোথায় প্রাণনাথ হা রাম হা নক্ষণ হা জানকী দুঃখসাগরে নিমগ্না আমি তোমরা আমারে কেউ দর্শণ কন্নে না ।। এই বনে কৌশন্যা কুররি পক্ষিণীর ন্যায় রোদন কর্ত্তে নাগিনেন ।। তখন বশিষ্ঠ চিন্তা কর্ত্তে নাগিলেন ।। রাজাতো দেহত্যাগ কলেন ।। রাজার রামাদি পুত্র সকল নিকটে নাই ।। কে ।। দেহ সংস্কার করে ।। রাজার দেহ মন্ত্রপুত করে রক্ষা করা জাগ পরে জা হবার তাই হবে ।। বশিষ্ঠ শুমন্ত্রকে বনেন ।। সুমন্ত্র রাজ্ঞি সকলকে অন্য গৃহে গমন কর্ত্তে বনো ।। ঋশির আজ্ঞায় স্ত্রিসকল অন্যত্রে গমন কল্লেন ।। তখন বশিষ্ঠ রাজার মৃতদেহ মন্ত্রপূত করে তৈন্ দ্রোণি মধ্যে রক্ষাকরত [৪খ] রক্ষক সকল নিযুক্ত কল্লেন ।। সভায় গমন করে চিন্তা কর্ত্তে নাগিলেন । হয় কি । রাম নক্ষণ বনবাশী ভরত শত্রুঘ্ন মাতামহ গৃহে ।। শ্রীরাম সত্যবাদী ।। পিতৃসত্য প্রতিপানন ।। না ।। করে শে কখনো অযধ্যায় আগমন করবে না । তবে ভরতকে আনয়ন কর্ত্তে নন্দিগ্রামে ।। দুত প্রেরণ করা জাগ । এই স্থির করে দুত সকনকে বনেন ।। আরে দুত সকল কোথায় এদিকে আয় ।। অই কথা শ্রবণ করে দুৎ সকলের মনে ২ রাজা দেহত্যাগ করেচেন ।। রাজার চারি পুত্র ।। শ্রীরাম নক্ষণ ভরত শত্রুঘ্ন ।। রাম নক্ষণ বনবাশী ভরত শত্রুঘ্ন মাতুন্ ভবনে রাজার জ্যেষ্ঠ শন্তান শ্রীরাম ।। তিনি ।। না হলে রাজার ঔধর্দেহিক কার্জ্য হবে না তাই বুঝি ঋষি রামকে আনয়ন করবার নিমিত্ত ।।

আমাদের প্রেরণ করবেন আওহান [৫ক] কচ্চের্ন এই মনে করে শত ২ দূত গাত্রোত্থান-করে বল্লেন ঋশিরাজ কোথায় কোথায় জেতে হবে রাম আনয়নে আমি জাবোঃ ॥ ঋষি উ ॥ নারে রাম আনয়নে নয় ॥ নন্দিগ্রামে ভরত শত্রুঘ্ননে আনয়ন কর্ত্তে জেতে হবে ॥ ঋষির এই কথা শ্রবণ করে দূত সকল অধবদন ॥ আর কারো মুখে কথা নাই ॥ ঋষি উ ॥ রাম আনয়ন কর্ত্তে হবে বলে সকলে বল্‌চিশ আমি জাবো ২ ॥ ভরতকে আনয়ন কর্ত্তে হবে শুনে ॥ আর জে কেউ কথা কশনে ॥ এর কারণ কি ॥ কোন দুৎ বনেন ঠাকুর জাবো কি আমার বড় শির পিড়া উপস্থিত হয়েচে ॥ কোন দুৎ বলেন আমার চরণে কণ্টক বিদ্ধ হয়েছে ॥ অই কথা শ্রবণ করে ঋশি ক্রোধে পরিপূর্ণ ॥ কি ॥ পাপিশ্ঠ সকল মনে করেচো ॥ কি ॥ রাজা সর্গগামী রাম বিদেশস্থ বনে রাজ্যে শাশন কত্তা নাই।

[৫খ] আমি এক্ষণে এই রাজ্যের সাশনকর্ত্তা জানো ॥ ঋষির ক্রোধ দর্শন করে কোন বৃদ্ধ দূত বনেন ঋষিরাজ ॥ আমি গমন কর্বো পত্র প্রদান করুন ॥ তখন ঋষি ভরতে পত্র নিখন করে দূত হস্তে প্রদান করে বনেন দুৎ এই পত্র ভরতে প্রদান করে বনো ॥ রাজার অন্ত্যন্ত পিড়া হয়েছে জদি দর্শনে ইচ্ছা থাকে শিঘ্র আগমন করুন ॥ রাজার মৃত্যু সম্বাদ রামের বনগমন একথা ভরৎ নিকটে বনো না ॥ দুৎ পত্র নয়ে ॥ অযধ্যা হতে নন্দিগ্রামাভিমুখে গমন কর্ত্তে নাগিনেন ॥ পরদিন প্রভাতে সময়ে ॥ বামদেব জাবানি কশ্যপাদী ঋষিগণ বশিষ্ঠের নিকটে বনেন ॥ ভো ঋষিরাজ ॥ রাজাতো সর্গগামি হনেন ॥ রাম নক্ষণ বনবাসী ভরৎ শত্রুঘ্নন মাতামহ গৃহে এক্ষণে কে রাজা হবে। অরাজকে বহুদেশে মেঘ সকল্ কালে বারি বর্শন করে না। পৃথিবী শশ্যাহিনা। কৃশকেরা সময়ে বিজ [৬ক] রোপন করে না। পুত্রসকল পিতার বশিভূত হয় না ॥ স্ত্রিসকল পতির বশিভূতা হয় না। শিশ্য গুরুর বাক্য শোনে না। ব্রাহ্মণ সকল তারা তপশ্যাদি পরিত্যাগ করে ॥ প্রজা দশ্য পিড়িতা হয় ॥ বিবাহাদি ধর্ম্ম নোপ ॥ সর্বদা শত্রুভয় উপস্থিৎ ভয় ॥ নদীর জল শুষ্ক হয় ॥ বনে তৃণ জন্মায় না। রাজ্যে রাজা না থাকলে এই সকল উৎপাৎ হয় ॥ অতএব আপনি প্রজাপালন করো ॥ এ স্থানে দূত ॥ অযধ্যায় হতে নির্গত হয়ে ॥ গঙ্গা কুরুক্ষেত্র সরশ্বতী নদী পার হয়ে ॥ চইত্য বৃক্ষ প্রণাম করে ॥ শিধ্ব গণে প্রণাম করত রামকথা শ্রবণ করত পথি মধ্যে ছয় দিবা রাত্রি বাশ করে সপ্ত রাত্রিতে কেকয় রাজ্যে উপস্থিত হনো ॥ জেদিন দুৎ কেকয় রাজ্যে উপস্থিত হনো সেইদিন রাত্রি জোগে ভরৎ শত্রুঘ্ন সয়ন করে নিদ্রিতা ॥

[৬খ] ছিনেন। অর্দ্ধরজনী যোগে ভরত নিদারুণ সপ্ন দর্শণ করেছি ॥ শত্রুঘ্নন নিদ্রা-ভঙ্গ বনেন আর্জ্য কি সপ্নদর্শণ করেচেন ॥ বনুন ॥ ভরৎ উ ॥ দৃষ্টো ময়াদ্য সপ্নেন চন্দ্রমাঃ পতিতঃ ক্ষিতৌ ॥ ব্যক্তং রামোথ রাজা বা প্রাণা স্ত্যক্তা দিবাগতঃ। ভাই শত্রুঘ্ননরে আমি নিদ্রাকালে বড় দারুণ সপ্ন দেখেচি। জেনো চন্দ্রভূতলে খশে পড়েছে ॥ জ্ঞান হয় পিতা মহারাজ দেহত্যাগ করে সর্গগামী হয়েচে। অথবা শ্রীরামের কোন বিপদ হয়েছে।···সাগরের জল শুষ্ক হয়েছে রাহু জেনো সূর্য্যোকে গ্রাশ করেছে ॥

পিতামহারাজ দশরথ রক্ত বশন পরিধায়ি জবা পুষ্পের মনা কণ্ঠে তৈলাভ কলেবর দিগম্বর যমদুৎ সকল কণ্ঠে রজ্জু দিয়ে দক্ষিণাভিমুখে নয়ে গমন কচ্চেন ।। নিশ্চয় অযোধ্যায় কোন বিপদ উপস্থিৎ হয়েছে । নতুবা এমন দারুণ সপ্ন কেনো দেখবো ।। এই বনে উভয় ভ্রাতা রোদন কর্ত্তে নাগিলেন ।। কারো নিদ্রা হনো না অতি কষ্টে রাত্রি জাপন করে পরদিন অতি প্রত্তুশ সময়ে গাত্রোত্থান করে প্রাতঃ কৃত্যাদি সমাপন করে প্রাতঃস্নান আহ্নিক সমাপন করে সজন নয়নে উভয় ভ্রাতা সভাতে গমন করে ।। মাতামহ ও মাতুল চরণে প্রণাম কন্নেন ।

[৭খ] তৎ পরে কেকয় মহারাজার [?] আদেশানুশারে ।। আশনে উপবেশন কন্নেন । কেকয় মহারাজ ভরৎ শত্রুঘ্ননের বদন মলিন দর্শণ করে বনেন ।। ও ভাই ভরৎ তোমার বদন মনিন কেনো ।। ভরৎ উ ।। মাতামহ কি বনবো ।। কাল রজনীযোগে দারুণ সপ্ন দেখেছি ।। জেনো চন্দ্রদেব ভুতলে খশে পড়েছে ।। সাগরের জল শুষ্ক হয়েছে সুর্যদেবকে জেনো রাহুতে গ্রাশ করেছে ।। পিতামহারাজ দিগম্বর সর্বাঙ্গে তৈলাক্ত যমদুৎগণ কর্ত্তৃক জেনো দক্ষিণাভিমুখী গমন কর্চ্চেন ।। আমার জ্ঞান হয় পিতা-মহারাজ সর্গগামী রামের কোন বিপদ হয়েছে ।। অই কথা শ্রবণ করে ভরতের মাতুন জোধাজিৎ বনেন ভরৎ তার নিমিত্তে রোদন কেনো দেখো ভরৎ এইরূপ সপ্ন জে দেখে তার বাপ মরে জায় ।। ভরত উ ।। এরূপ পরিহাশ

[৮ক] করবেন না আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হয়েছে । মাতামহ উ ।। ভরত সপ্ন মিথ্যা হয় সত্য হয় তার নিমিত্ত এতো রোদন কেনো ।। শেদিন অযোধ্যাহতে দুৎ আগমন করেছিনো ।। অযোধ্যায় সকল মঙ্গল ।। জদি তেমনি হয় তাহলে অযোধ্যায় দুৎ প্রেরণ করি এইরূপ কথোপকথন হচ্চে এমনসময় অযোধ্যার দুৎ শভা দ্বারে উপস্থিৎ ।। ওহে দ্বার পান সকল সভায় গমনকরে ।। সংবাদ দেয় ।। জে অযোধ্যা হতে দুত এশেছে ।। অই কথা শ্রবণ করে দ্বারপান সভায় গমন । চরণে প্রণাম ।। কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান ।। রাজা দ্বার পানকে দরশন করে বনেন ।। কেমন হে দ্বারের সকল মঙ্গল । দ্বারপান উ ।। আজ্ঞা দ্বারের সকল মঙ্গল ।। অযোধ্যা হতে একটি দুৎ এশেছে ।। কেকয় রাজা অই কথা শ্রবণ করে বনেন ভরৎ আর চিন্তাকি দুৎ এশে এই বার সকল

[৮খ] সকল সম্বাদ শ্রবণ করো ।। দ্বারপানকে বনেন শিঘ্র দুৎকে সভায় প্রেরণ করো ।। দ্বারপান ।। প্রণমাদি করে সভা হতে গমন করত দুৎকে সভায় প্রেরণ কন্নেন ।। দুৎ সভায় উপস্থিত হয়ে কর শির সংজোগে সকলকে প্রণাম কল্লেন ।। ভরত বলেন দুৎ বলো ২ অযোধ্যার সম্বাদ বলো ।। দুৎ সজল নয়নে বনেন মহারাজ এই পত্রিকা গ্রহণ করুন ।। দুৎ মুখে ভরৎ এই কথা শ্রবণ করে ।। ভরৎ মূর্চ্ছিত হয়ে ভূতলে পতিত ।। অম্নি সকলে ।। হাহ ।। মুর্চ্ছিত হয়ে পন্‌লো কেনো ।। মুখে শিতল বারি প্রদান চারমর বৎজন ।। ভরৎ চৈতন্য নাভ কন্নেন ।। জুধাজিৎ বনেন ।। একি পত্রপাঠ করো পত্রমধ্যে

কি আছে দেখো ॥ তা ॥ না ॥ হয়ে হঠাৎ মূর্চ্ছিতো হয়ে পল্লে ॥ ভরৎ উ ॥ মাতুল আর পত্রপাঠ কর্ত্তে হবে না ॥ পত্রেতে জা আছে দূৎ
[৯ক] মুখে ব্যক্ত হয়েছে। রাজা দেহত্যাগ করেছে শ্রীরাম অযোধ্যায় নাই ॥ রাম জদি অযোধ্যায় থাকবেন তাহলে দূৎ আমাকে মহারাজ বনে সম্বোধন করবে কেনো। যুধাজিৎ উ ॥ ওরা ইতর জাতি ওদের কি শে জ্ঞান আছে ওরা জানে রাজার বেটা রাজাই হয়ে থাকে ॥ ভরৎ উ ॥ আজ্ঞা না অযোধ্যাতে এমন অবিধি নাই ॥ যুধাজিৎ ॥ জা হগ ॥ পত্র পাঠ করো ॥ ভরৎ পত্রিকার মুদ্রা ভঙ্গন করে পত্র পাঠ করে দেখনেন। গুরো ॥ বশিষ্ঠ পত্র লিখন করেছেন ॥ মহারাজের অত্যন্ত পিড়া উপস্থিত হয়েছে জদি দর্শনে ইচ্ছা থাকে তুমি শিঘ্র আগমন করবে ॥ তাই দর্শন করে বননেন ॥ মাতামহ ॥ অনুমতি করুন অদ্যে আমি অযোধ্যায় গমন কর্বো ॥ তখন কেকয় মহারাজ সাত অশ্ব শহশ্র রথ বহু সৈন্য ভরতের সঙ্গে প্রেরণ কল্লেন ॥ ভরৎ মহাশয়
[৯খ] মাতামহ এবং মাতুল চরণে প্রণাম করে ॥ সসৈন্যে শত্রুঘ্নের সহিত রথেতে আরোহণ কল্লেন ॥ সারথি অশ্বপৃষ্ঠে কশাঘাৎ ॥ ঘর ২ শব্দে রথের গতি ॥ ক্রমেতে ভরৎ শতদ্রু নদী পার হয়ে ক্ষেত্ররথ বন প্রাপ্ত হলো ॥ তৎপরেতে যমুনা পার হয়ে ॥ সৈন্য সকলকে ॥ আশ্বাসিত করত ॥ স্নানাহ্নিক ক্রিয়া সমাপণ করে হিরণ্যতি পার হয়ে বরুথ গ্রামে এক রাত্রি বাশ কল্লেন ॥ পরদিন প্রভাত সময়ে ॥ গাত্রোত্থান করে পুনর্ব্বার গমন কর্ত্তে নাগিলেন ॥ ভদ্রশান বন প্রাপ্ত হয়ে চতুরঙ্গ বাহিনী সৈন্য নয়ে ॥ কপিবতি স্থানুবতী নদী পার হয়ে ॥ গোমতী নদী তিরে একরাত্র বাশ কল্লেন ॥ এইরূপে—
[১০ক] সপ্তরাত্রি পথিমধ্যে বাশ করে ॥ অজধ্যার প্রান্তভাগে উপস্থিত ॥ দূর হতে অযোধ্যা দর্শণ করে বনেন ॥ ভাই শত্রুঘ্ন !! অযোধ্যায় এমন শোভাহিনা হয়েছে কেনো ॥ পূর্ব্বের ন্যায় অযোধ্যার আর সোভা নাই ॥ কিছু দূর গমন করে বনেন ॥ ভাই শত্রুঘ্ন ॥ পূর্ব্বেতে অযোধ্যায় ঋশিগণের বেদ পাঠের ধ্বনি ॥ এই স্থান হতে ॥ শ্রবণ করা জেতো ॥ আজ কিছু শোনা যায় না কেনো ॥ কিছুদূর আগমন করে ॥ সারথিকে বনেন ॥ অযোধ্যায়াঃ পুরা ঘোষা দূরাদেব জনোদ্ভবঃ ॥ শ্রুয়তে সাগরস্যেব
[১০ খ] মথৎমানস্য বাউ না ॥··· হে সারথে বাউ কর্ত্তৃক মথৎমান জেমন সাগরের শব্দ সেইরূপ অযোধ্যার হট্টের ক্রয়বিক্রয়ের ॥ লোকসকলের জনরব পূর্ব্বেতে প্রস্থান হতে শ্রবণ করা জেতো ॥ আজ কোন কিছু শোনা যায় না ॥ ক্রমেতে সরযূ আগমন ॥ ভাই শত্রুঘ্ন দেখ ২ ॥ কি ॥ আশ্চর্য ॥ অযোধ্যার পশুপাক্ষি প্রভৃতি সকলি নিরব ॥ অশ্বের হেশা ধ্বনি নাই হস্তি বৃংহিত ধ্বনি নাই
[১১ক] এর কারণ কি ॥ এই বনেতে ২ শরযূ পার হয়ে রাজপথে উপস্থিত হয়ে গমন কত্তে নাগিনেন ॥ এস্থানে অযধ্যা বাশীবাশীনি ॥ শ্রবণ কল্লেন ॥ মাতামহ গৃহ হতে ভরৎ আগমন কচ্চেন ॥ সেইকথা শ্রবণ করে ॥ সকলি বন্নেন সেই পাপত্মা ভরৎ আগমন কচ্চে ॥ ওর ॥ মুখাবনোকন করবো না ॥ জে পাপিনী কৈকেয়ী অযধ্যার বাশি বাশিনীর জিবন ধন ॥ উপবাশী রামকে বনবাশী করেছে ॥ তার পুত্রের মুখ

দরশন কত্তে আছে ॥ এই বনে সকনে গৃহমধ্যে প্রবেশ ॥ দ্বার রূধ্য করে রোদন কর্ত্তে নাগিন ॥

[১১খ] ভরৎ সকল প্রজার গৃহে দ্বার রূধ্য দেখে ॥ বিস্ময়ান্বিত হয়ে বনেন ভাই শত্রূঘ্নন ! দেখ ২ । সকল প্রজা দ্বার রূধ্য করে কোন হাহাকার শব্দে রোদন কর্চ্চে ॥ অযধ্যায় কি বিবাদ উপস্থিৎ হয়েছে তার সন্দেহ নাই ॥ অযধ্যাপূরির আর পূর্ব্বের মত শোভা নাই ॥ জেমন গজদন্ত হতা সর্ন্নতার সোভা থাকে না ॥ কিম্বা চন্দ্রহিনা সর্ব্বরি রাত্রি জেমন শোভা থাকে না ॥ অথবা পতিহিনা বিধবা নারী জেমন ॥ শ্রিহীনা হয় ॥ সেইরূপ আজ অযধ্যার শ্রিহিনা দর্শণ কচ্চি ॥ এমন সময় কুন বধূ কুম্ভকক্ষে জল লয়ে রাজপথে দিয়ে গমন কর্চ্চেনা খুদ্র শিশুশন্তান পশ্চাৎ ২ [১২ক] রোদন কর্ত্তে ২ গমন কর্চ্চে ॥ তখন ওরে জননী বনেন ॥ আয় ॥ না ॥ রে ॥ গৃহে গিয়ে ক্রোড়ে করবো এখন ॥ জলের কুম্ভ কক্ষে রয়েছে ॥ কি করে ক্রোড়ে করি বন ॥ এসো ২ ॥ নক্ষী ছেলে এশো ॥ এমন সময় দেখে যে রমারূঢ় ভরত আগমন কর্চ্চে ॥ সম্মুখে ভরৎকে দর্শণ করে কুন বধূ ক্রোধে পরি পূর্ন্না ॥ নিজ সন্তানের পৃষ্ঠে একটি চপেটাঘাৎ করে ॥ বনেন পাপিষ্ঠ । কু ॥ সন্তান তোর নিমিত্ত আজ সেই পাপিনীর গর্ভসম্ভূত পাপাত্মা ভরতের মুখ দর্শণ কর্ত্তে হনো ॥ এই বনে বালকের হস্ত ধারণ করত গৃহমধ্যে প্রবেশ করে ॥ দ্বার রোধ কল্লেন ॥ ভরত কুনবধূর মুখে শেই কথা শ্রবণ করে বনেন, ভাই শত্রূঘ্ননরে

[১২ খ] শ্রবণ কন্নে কুন বধূ ॥ কি বন্নে ॥ নিজ পুত্রের পৃষ্ঠে চপেটাঘাৎ করে বন্নো ॥ কুশন্তান পাপিনী গর্ভসম্ভূত পাপাত্মা ভরতের মুখ দর্শণ কর্ত্তে হনো ॥ সকার্যপরা মা কৈকেয়ী কি জানি কি বিপদ উপস্থিৎ করেছে ।...ক্রমে সভায় উপস্থিত হয়ে দেখেন সভা শূন্যা ॥ সিংহাশন

[১৩ ক] শূন্য সিংহাশন পিতা নাই ॥ দরশন করে অত্যন্ত্য ব্যাকুল ॥ ভাই শত্রূঘ্নরে ॥ সভা এমন শূন্যা রাজভবন নিস্তব্ধ ॥ দর্শণ করে আমার হৃদয় অত্যন্ত্য ব্যাকুল হয়েছে ॥ পিতা কোথায় আজ রাম কোথায় ॥ ক্রোমশ অন্তঃপুরে গমন করেন ॥ এখানে কৈকেয়ীর দাশী মন্থরা ভরৎ শত্রূঘ্নং অযধ্যায় আগমন করেছেন শুনে ॥ কৈকেয়ী ভবনে শোভা কর্ত্তে নাগিলেন । কৈকেয়ী দ্বা ॥ সভাবর্নণ ॥ এস্থানে ভরৎ কৌশন্যা প্রভৃতি ॥ রাম জননীগণের ভবনদ্বারে গমন করে দেখলেন জে নিরানন্দপুরি । সেই দর্শণ করে ভরত মনে ২ ॥ পিতা মা কৈকেয়ী ভবনে সর্বদা বাশ করেন ॥ জননীর ভবনে গমন কন্নেই

[১৩ খ] পিতার সহিৎ শাক্ষাৎ হবে ॥ এই মনে করে ॥ কৈকেয়ী ভবনদ্বারে গমন দেখলেন ॥ ভবনের বড় শোভা ॥ তখন শত্রূঘ্নন নিকটে বলেন ॥ ভাই শত্রূঘ্নন দেখো ২ ॥ কৌশন্যা প্রভৃতি জনগণের ভবন নিরান্দ ॥ কিন্তু মা কৈকেয়ী ভবনে কত শোভা ॥ দেখো ॥ সকার্য তৎপরা । মা । কেকয়ী ॥ কি কার্যই করেছে ॥ এই বনেই ॥ উভয় ভ্রাতা ভবনে প্রবেশ করে ॥ নিজ জননীর চরণে প্রণাম

কল্লেন ।। ভরতে ক্রোড়ে ধারণ মুখচুম্বন মস্তাকাঘ্রাণ ।। ভরৎ উ।। মা সভাশূণ্যো দেখনেম ।। কেনো ।। পিতা কোথায় ।। কেকয়ী উ।। ভরৎ ।। এই এনি ।। বশ সকল কথা বনবো ।। মাতামহ ভালো আছেন ।। ভরৎ উ ।। মা ।। মাতামহ ভবনে সকন

[১৪ ক] মঙ্গল ।। মা রাজদ্বারে পিতার প্রিয় হস্তি শত্রুঞ্জয় ।। পতিত রোদন কর্চ্চে নয়ন জলে দুটো হচ্ছে (২) হয়ে গিয়েছে ।। এর কারণ কি মা ।। শিঘ্র বলুন ।। পিতা কোথায় ।। কৈকেয়ী উ ।। আঃ স্থির হনা রে। বনচি ।। হেরে ভরৎ তোর মামা ।। ও দেশ ।। গিচনো বাড়িতে এশেছে ।। ভরৎ উ ।। মা ।। তিনি গৃহে আগমন করেছে ।। মা ।। রাজভবনে নিরানন্দ কেনো ।। রাজপথে আগমনের সহিৎ কাহারো সহিত শাক্ষাৎ হনো না ।। অযোধ্যাতে পূর্ব্বের ন্যায় ক্রয় বিক্রয়ের শব্দ নাই ।। বেদধ্বনি শ্রবণ কন্নেম না ।। এর কারণ কি ।। কৈকেয়ী উ ।। স্থির হয় সব বনবো ।। এনি বশ শ্রান্তি দূর কর ।। হেরে ভরৎ ।। তোর ছোট মামির পাঁচ মাশ গর্ভ শুনেচ্ছি ।। [?]

[১৪ খ] প্রশব করেচেন ।। ভরৎ উ ।। মা তিনি পুত্র প্রশব করেছেন ।। মা ।। আগমন সময়ে দেখনেম সকন প্রজার গৃহে দ্বার রুদ্ধ ।। এক কুল বধূ নিজ সন্তানের পৃষ্ঠে চপেটাঘাৎ করে বন্নে হেরে কুশন্তান তোর নিমিত্ত আজ পাপিনী গর্ভে সম্ভূত ভরতের বদন দর্শণ কর্ত্তে হলো ।। মা সেই কুলবধূ এরূপ কথা কেনো বন্নে ।। আপনি কি এমন কুকার্য করেছেন ।। শিঘ্র বলুন ।। এবং রঘুকুন ধুরন্ধর সেই রাম বা কোথায় আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হচ্চে ।। জননী ।। হয়ে। পুত্রেরে এরূপ জাতনা দেয়া উচিৎ [নয় ?] ।। শিঘ্র বনুন পিতা কোথায় ।। এই তৎখনাৎ ।। কৈকেয়ী আর ভরতে উক্তি প্রত্যুক্তি হতে নাগিল

'মাতঃ স্তাতঃ কৃযাতঃ সুরপতি ভবনং হা কুতঃ, পুত্র শোকাৎ কোঽসৌ পুত্র ইত্যাদি [১৫ ক] [···] ভরত উ ।।··· মা পিতা কোথায় কৈকেয়ী উ ।। সুরপতি ভবন ।। সুরপতি জে ইন্দ্র তার ভবন সর্গ তোমার পিতা সর্গে গমন করেছেন ।। দশ সহস্র বৎসর তার পরমাউ ।। এ নব সহস্র বৎসরে অকালে তিনি কি নিমিত্ত সর্গে গমন কল্লেন ।। কৈকেয়ী উ ।। পুত্র সোকাৎ ।। পুত্র শোকহেতু তিনি

[১৫ খ] অকালে সর্গে গমন করেছে। ভরৎ উ ।।

অথৌ কঃ পুত্র রাজার তো চারি পুত্র। শ্রীরাম লক্ষণ ভরত শত্রুঘ্ন কার শোকে পিতা দেহত্যাগ করেছেন। সে কোন পুত্র ।। মা। কৈকেয়ী ।। উ।। ত্তু মবরজ ভরায়স্য জাতঃ ।। সে কোন পুত্র জানো তুমি জার কণিষ্ঠ হয়ে জন্মেছো ।। ভরত উ ।। আমি জার কণিষ্ঠ হয়ে জন্মেছি ।। আমি তো শ্রীরামের কণিষ্ঠ ।। অস্য কিং ।। অস্য রামস্য কিং। শে রামের কি হয়েছে ।। শে রাম কোথায়। কৈকেয়ী উ প্রাপ্তোসৌ কাননান্ত। অশৌ রামঃ কাননন্তং ।। বনং প্রাপ্তঃ ।। সেই রাম বনে গমন করেছেন ভরত উ ।। কি মিহা ।। কেন রাম বনে গমন করেছেন ।। বনে কি মৃগয়া কত্তে [১৬ ক] গিয়েছেন। না ।। বনশোভা দর্শণ কত্তে গিয়েছেন ।। কৈকেয়ী উ ।।

তা ॥ নয় ॥ নৃপাগিরা ॥ রাজা গমন কর্ত্তে অনুমতি করেছেন ॥ ভরত উ ॥ কেন তিনি বনেতে গমন কত্তে অনুমতি কনেন ॥ কিন্তু মা সৌ বভাশে ॥ সে ॥ এমন কি নিদারুণ কথা জে রামের অদর্শণে ॥ দেহত্যাগ কত্তে হবে ॥ এমন রামকে বনে গমন কত্তে কেনো অনুমতি কল্লেন ॥ কৈকেয়ী উ ॥ মব্বাগবদ্ধঃ ॥ আমার জানে আবদ্ধ হয়ে রামকে বনে গমন করতে অনুমতি কন্যান ॥ হা ॥ ভরৎ ॥ সে ॥ কি অগ্নি হয়েছে ॥ কত কৌশলে হয়েছে ॥ শোন বনি ॥ তুমি শত্রুঘ্ননের সহিত মাতামহ ভবনে গমন করার কিছুদিন পুণ্য পুশ্য জোগে শ্রীরামকে রাজা করবার নিমিত্ত সকল উদ্যোগ কল্লেন অজধ্যা মহতী ঘটা নিত্য গান বাদ্য হতো ॥

[১৬ খ] গুরু বশিষ্ঠ আগমন করে রামের অধিবাস কল্লেন ॥ শ্রীরাম জানকীর সহিৎ উপবাস করে থাকনেন ॥ আমি মন্থরার মুখে রাম রাজা হবে শুনে ॥ উত্তম বসন অশন পরিত্যাগ করে ক্রোধাগারে সয়ন কল্লেম ॥ সায়ংকানে রাজা আমার ভবনেতে আগমন করে ॥ আমি ক্রোধাগারে সয়ন করে আছি দেখে ॥ আমার নিকটে গমন করে বনেন যে অভিমানের কারণ কি ॥ আমি বন্নেম আপনার নিকট জে চাইব ॥ তাই দেবে শিকার করো ॥ তবে তোমার সহিত আমি কথা কবো ॥ রাজা তাই ॥ শিকার কন্নেন। এইরূপ তৃ সত্য করিয়ে বন্নেম ॥ মহারাজ ॥ পূর্বে দেবাশুর যুদ্ধে দেবগণের

[১৭ ক] সেনাপতি হয়ে অশুরগণের সহিৎ যুদ্ধ করেছিলেন ॥ সেই যুদ্ধে আপনার অংগুষ্ঠে বাণব্রণ হয়েছিনো ॥ অত্যন্ত্য জাতনা ॥ আমি মুখ মদ্ধে করে রক্ষে করে সেই অংগুলির জাতনা নিবারণ করেছিলাম ॥ আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ঠ হয়ে দুটি বর দিতে সিকার করেছিনেন। সেই দুটি বর আজ প্রদান কর্ত্তে হবে ॥ রাজা আমার বাক্য জালে বদ্ধ হয়ে শিকার কন্নেন ॥ এক বরে তোমার রাজ্য লাভ দিতিয়ো বরে ॥ চতুর্দশ বৎসরের নিমিত্ত অনুজ লক্ষণ জানকীর সহিৎ বনবাশ ॥ এই নিমিত্ত রাজা রামকে বনগমনে অনুমতি করে রামশোকে দেহত্যাগ করে সর্গগামি হয়েছেন ॥ ভরত উ ॥ ফনন্তে রামকে বনবাশী করে তোমার ফন কি ॥ কৈকেয়ী উ ॥ তব ধারা বাশতা ॥ তোমার রাজ্যলাভের নিমিত্ত ॥

[১৭ খ] কৈকেয়ীর এই বাক্য শ্রবণ করে ভরৎ শত্রুঘ্নন হা হতোস্মি বনে ধরা পতিত মূর্চ্ছিত।: খনকাল পরে চৈতন্য লাভ করে রোদন কর্তে ২ বনেন ॥ কচ্চিন্ন ব্রাহ্মণ ধনং হৃতং রামেণ ধীমতা ॥ কচ্চিদাঢ্যো দরিদ্রোবা ভ্রাতা তেন বিহীসিতঃ ॥ বুদ্ধিমান রাম কখনো ব্রাহ্মণের ধন হরণ করেন নাই ॥ ধনবানের ধন হরণ করে তাকে দরিদ্র করেন নাই ॥ তবে কি পাপে রাম দুঃখসাগরেতে পতিত হনো ॥ রে ॥ নিন্দিতে শ্রীরামকে রাজ্য ভ্রস্ট করে ॥ পতির প্রাণ হরণ করে মাতৃগন্ধিনী নরকে গমন কন্নি ॥ তোরে ধিক তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে আমিথো পতিত হনেম। হা কষ্ট আমি এ প্রাণ পরিত্যাগ

[১৮ ক] কর্বো ॥ রে পাপে ॥ শ্রীরাম বা তোর নিকটে কি পাপাচারণ করেছে ॥ তুই ভ্রূনহত্যা করিস ॥

পিতা এবং রাম ভিন্ন রাজেতে কি প্রয়োজন ॥ পিতা নিজ কুননাশের নিমিত্ত তোমারে

বিবাহ করে ছিনেন। শ্রীরাম লক্ষণের সহিত বনবাশী হনে পর। রাম জননী কৌশন্যা এবং সুমিত্রা কিরূপে জিবন ধারণ করে আছেন॥ হা হা॥ ধিক তোরে॥ কখন কেকয় মহারাজের কন্যা নশ॥ জে কৌশল্যা নিজ ভগ্নির ন্যায় তোমায় প্রীত কর্ত্তো সেই কৌশল্যার পুত্র রামকে বনবাশী করে॥ কৌশন্যার হৃদয়ে পুত্র শোক শেন প্রদান কন্নি॥ পিতা এবং রাম ভিন্ন এই রাজ্য রক্ষা কর্ত্তে কি আমার শক্তি আছে

[১৮খ] এইরূপ বহু বিনাপ করে জননীর নিন্দা করত॥ শোকার্ত্ত উচ্চৈস্বরে রোদন কর্ত্তে নাগিনেন॥ পুনর্ব্বার জননীকে বনেন॥ আমি রাম নিকটে বনে গমন করে॥ রামের পরিবর্ত্তে চতুর্দশ বৎসর বনে বাশ কর্বো॥ শ্রীরাম অযধ্যায় আগমন করে রাজা হবেন॥ তথাপি তোর অভিনাশ পরিপূর্ণ করবো না॥ হে॥ পাপে॥ শ্রীরাম তোমার নিকটে কি অপরাধ করেছে॥ জে রাম নিজ জননী কৌশন্যাকে অতিক্রম করে অগ্রে তোর চরণে প্রণাম কর্ত্তেন তার কি এই প্রতিশোদ গ্রহণ কন্নি॥ প্রিথিবী তোরে এখন কেনো ধারণ করে আছেন॥ তুমি রামকে বনবাশী করে অত্যন্ত পাপিনী হয়েছো॥ ………

[১৯ক] ত্বং কুম্ভিপাকং গমিষ্যসি॥ নৃশংসে নিষ্ঠুরে ক্রুরে রাজ্য কামুকে॥ মে মম মাতৃরূপেন আমত্রে রে পতিঘাতিনী দুষ্টে রাজ্য কামুকে রাজ্য নো লুভে॥ পিতি বিনাশ করে কুম্ভিপাক নরকে গমন করবি॥ রে নৃশংশে নিষ্ঠুরে তুমি॥ তো আমার… পুত্র হতে প্রিয়তর বস্তু জগতে আর কিছুই নাই॥ শোন ২॥ পূর্ব্বে ভূতলে এক কৃশক দুটি বৃশের স্কন্ধে॥ নাঙ্গন প্রদান করে ভুমি কর্ষণ কচ্চে॥ দুর্ব্বল বৃশ

[১৯খ] নাঙ্গন বহন কর্ত্তে পারে না॥ কৃশক বারম্বার দণ্ডাঘাৎ কচ্চে॥ বৃশদ্বয়ের নয়ন হতে জলধারা পতিতা হতে নাগিল॥ পুত্রের রোদন দরশন করে। গো॥ জননী সুরভি॥ রোদন কর্ত্তে ২ ইন্দ্রের সভায় গমন॥ দেবরাজ দর্শন করে বনেন গো জননী এশো ২ নয়নে জন কেনো রোদনের কারণ কি॥ শুরভি॥ উ॥ দেবরাজ॥ অই দেখুন ভুতনে॥ কৃষক দুর্ব্বন বৃশের স্কন্ধে॥ হল প্রদান করে ভুমি কর্শণ কচ্চে॥ নাঙ্গন বহন কর্ত্তে পারে না॥ কৃশক বারম্বার দণ্ডাঘাৎ কচ্চে॥ বৃশের নয়ন হতে জন পতিত॥ হতেছে॥ জননী হয়ে পুত্রের রোদন কি শর্ঝ্য করা যায়॥ ইন্দ্র উ॥ দেবী॥ তোমার তো

[২০ক] বহু পুত্র তুমি। এক পুত্রের ক্লেশেশ সর্ঝ্য কর্ত্তে পারলে না॥ সুরভি উ॥ দেবরাজ॥ জননী সকল পুত্রের প্রতি সমান স্নেহ বিশেষত দুর্ব্বন ও বৃদ্ধ পুত্রের প্রতি অধিক স্নেহ হয়॥ দেবরাজ উ॥ গো জনী [জননী—G.B.] তুমি দুখ করো না। পূর্ব্বেতে॥ গো সকল॥ ব্রহ্মার নিকটে উত্তম নোকপ্রাপ্তির নিমিত্ত জাচিঞা করেছিনো॥ তখন ব্রহ্মা বনেছিনেন॥ তোমরা মনুশ্যো নোকে তপশ্যা করো॥ ক্লেশবধ বন্ধনাদি দ্বারা তোমাদের মঙ্গল হবে॥ সেই ব্রহ্মার বাক্যে গো-সকল ভূতলে হন সকটাদি দ্বারায় তপশ্যা কচ্চে॥ আমি মজ্যাদা স্থাপন করি॥ জারা দুর্ব্বল বৃশের দ্বারা হন সকটাদি বহন করাবে

[২০খ] তারা গোহত্যার পাপী হবে॥ আর জারা ঘাশগ্রাশাদি দ্বারায় হৃষ্টপুষ্ট বৃশের

কণ্ঠে হন সকটাদি বহন করাবে তাদের কোন পাপ হবে না ।। এই বনে সেই স্থানে প্রচুর বারি বর্শন কন্নেন। ভরৎ উ ।। দেখো দেখি মা ।। বহু পুত্রের জননী সুরভি ।। তিনি এক পুত্রের ক্লেশ শহ্য কর্ত্তে পারেন না ।। আর কৌশন্যা। এক পুত্রের জননী ।। রাম ভিন্ন ।। মা বনিতে জগতে আর কেউ নাই ।। সেই রামকে তুমি বনবাসি করেছো। রামের অদর্শনে কৌশল্যা কেমন করে জিবন ধারণ করবে। এই বনে ভরৎ শত্রুঘ্নন

[২১ক] উভয় ভ্রাতা রোদন কর্ত্তে নাগিন ।। এমন সময় ।। মন্থরা ।। উত্তম বশন ভুশনে বিভুশিতা হয়ে দেখে ।। জে ।। ভরৎ শত্রুঘ্নন পতিত ।। হয়ে রোদন কচ্চে ।। সেই দেখে বনে ও দশা ! ও দশা !! ছেনে বাড়ি ঢুকতে না ঢুকতে অম্নি কি বনতে হয় তোর বাপ মরেছে তোর ভাই বনে গিছে ।। এনো বশুগ স্থির হগ তবেতো বন্নে হয় ।। সে জা হক ও ভরৎ ।। তোমার রাজ্য নাভ রামের বনবাস্। শে !! তোমার মায়ের বুদ্ধিতে হয় নাই ।। সে ।। আমার বুদ্ধিতে হয়েছে ।। তোমার জননী ।। কৈকেয়ী ।। রাম রাজা হবে শুনে আহ্লাদে জেনো ফেটে ২ মতি [?] নাগিলা [?]

আমি কত বুঝিয়ে ছনে কনে কৌশলে ।। রাজার নিকটে দুটি বর জাচিঞা করিয়েছি একবরে

[২১খ] তুমি রাজা হবে একবরে রাম বনে জাবে ।। তোমার জননী কৈকেয়ী বনে ছিনো ।। দেখ মন্থরে রাম জদি বনে জায় ।। আর আমার ভরৎ জদি রাজা হয় ।। তা হনে ।। তোকে শোনা স্বোনায় দোনাবো ।। আর শোনা দিয়ে তোর কুর্জটি বাধিয়ে দিবো ।। দেখবো ২ ।। কেমন মায়ের বেটা দেখবো ।। ভরৎ শুনে বনেন ভাই শত্রুঘ্নন ।। মন্থরা ।। কি বনচো ।। শত্রুঘ্নন ।। উ ।। আর্জো। মন্থরা বনচ্চে। শ্রীরামের বনবাস আপনার রাজ্যনাভ ।। মা কৈকেয়ীর বুদ্ধিতে হয় নাই ।। পাপিনী মন্থরার পরমর্শে হয়েছে ।। ভরৎ। অই কথা শ্রবণ করে বনেন ভাই শত্রুঘ্নন রে ।। পাপিনী মন্থরা ।। জেমন কুকার্য করেছে ।। তার সমোচিৎ শাশন করো ।। শত্রুঘ্নন অই কথা শ্রবণ করে ।। শত্রুঘ্নন বনেন মন্থরে এই দিগে এশো ।। তোমায় একবার

[২২ক] শোনার দোনায় দোনাবো ।। মন্থরা উ ।। ও ।। দশা ।। ভরৎ রাজা না হতে ২ এখনি শোনার দোনায় দোনাবে ।। শত্রুঘ্ন উ ।। না না ।। জে উত্তম কার্জ্য করেছো ওর আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই ।। মন্থরা ।। ওরে একবার দাডায় ।। আমি কৌশন্যার দাশীদের ডেকে আনি তারা আমার সৌভাগ্য দেখবে ।। তখন ।। মন্থরা উচ্চেস্বরে বনেন ।। ওগো কৌশন্যার দাশী তোরা দেখে জাগে ।। আমি শোনার দোনায় দুন্নি ।। শোনা দিয়ে কুঁজ বাঁধাই ।। মন্হরার ।। অই কথা শ্রবণ করে ।। কৌশন্যার দাসীদের মনে ২ হবেয় বা ।। রাম বনে গেনেন ।। কি রাজা ভরৎ হনো ।। মন্থরার অহঙ্কার বাড়নো ।। দেখি ২ কি হয় ।। এই বনে দাশী সকল গবাক্ষে স্বারায় দিয়ে দর্শণ কর্ত্তে নাগিন ।। মন্হরা জেমন শত্রুঘ্ননের নিকট উপস্থিৎ হনো

[২২ খ] অম্নি শত্রুঘ্নন বাম হস্তে মন্থরার গ্রীবাদেশ ধারণ দক্ষিণ হস্তে চরণদ্বয় ধারণ করত ভুতলে নিষ্পেশন করে পাংশুতে মুখ ঘর্শণ করেন ।। মন্থরা বনেন মরি ২ ।। শত্রুঘ্নন

উ ।। একটু স্থির হয় ।। জদি শোনার দোনায় দুনবে একটু কণ্ঠ শিকার কর ।। মন্থরা উ ।। নৈশুখ দুখৈ বিনা নভ্যতে ।। তা একটু নাগে নাগুন ।। তখন শত্রুঘ্নন দুচরণে ধারণ করে ভূতলে মুখ ঘর্শণ কর্ত্তে নাগিল ।। কুজের উপরিভাগে বজ্রমুষ্টি প্রহারে মন্থরা অত্যন্তা কাতরা রুধির বমন কর্ত্তে নাগিল ।। শত্রুঘ্নন বলচেন এই শোনাদোনায় দোনো শোনা দিয়ে কুজ বাদায় ।। মন্থরা তখন কৈকেয়ীর স্মরণাগতা ।। কৈকেয়ী

[২৩ক] ভরতের স্মরণাগতা । ভরৎ শত্রুঘ্নন নিকটে বনেন । ওহে ।। দেখো ২ জেনো ।। স্ত্রি হত্যা হয় নাই ।। পাপিনীকে পরিত্যাগ করো ।। আমি জননী কৈকেয়ীর মস্তক ছেদন কর্ত্তে পারি ।। স্ত্রী হত্যা করিনে কি জানি সেই পাপে জদি রাম আগমন না করেন ।। তাই বনি ভাই তুমি মন্থরাকে পরিত্যাগ করো ।। শত্রুঘ্নন মন্থরাকে পরিত্যাগ কল্লেন ।। মন্থরা অতি কষ্টে শ্রেষ্ঠে সেই স্থান পরিত্যাগ কল্লেন ।। ভরৎ বল্লেন ভাই শত্রুঘ্ন চন ২ মা কৌশল্যার নিকটে গমন করি । এক পুত্রের জননী ।। মা কৌশন্যা । রামের অদর্শণে ।। কেমন করে জীবন ধারণ করে আছেন ।। চন ।। মাকে একবার দর্শণ করে আশি । এই বনে ভরৎ

[২৩খ] শত্রুঘ্নন উভয় ভ্রাতা কৌশন্যার নিকট গমন ।।

...ভরত উ ।। মা ।। আমি ভরৎ এনেম ।। কৌশল্যা মনে কন্নেন বুঝি বণ হতে রাম আগমন কনেন ।। বৎশ্য রাম তোমার পিতা মহারাজ চতুর্দশ বৎসর বনে গমনে অনুমতি করে ছিনেন ।। তুই আজ চতুর্দ্দশ জুগান্তে গৃহে এনি বাপ ।। বনে এই কাল শুখেতে বাশ করে ছিনো ।। কোন ক্লেশ হয় নাই তো ।। এই বনে অশ্রুমুখী রোদন কত্তে নাগনেন ।।

[২৪ ক] ভরৎ বলেন ভাই শত্রুঘ্নন রে ।। এখনো চতুর্দশ দিবশ হয় নাই রাম বনে গমন করেছেন ।। এরি মধ্যে মায়ের চতুর্দশ যুগজ্ঞান হয়েছে ।। এই চতুর্দশ বৎসর রামের অদর্শণে কেমনে জিবন ধারণ করবেন ।। তখন বলেন মা ।। মা আমি তোমার রাম নই ।। ভরৎ ।। অই কথা শ্রবণ করে ।। কৌশল্যা জেনো নজ্জা শাগরে নিমগ্না হনেন ।। তখন কৌশন্যা ।। ভরতে ক্রোড়ে ধারণ ।। মুখচুম্বন মস্তকাঘ্রাণ ।। * পত্র সভার্য্যো বনমেব মাতঃ স লক্ষ্মণো মে রঘুরাজ চন্দ্রঃ ।। চীবাম্বরো বদ্ধ জটাকলাপঃ সন্ত্যজ্যমাং দুঃখসমুদ্রমগ্নাঃ ।। হে বৎস ভরৎ । তোমার জননীর কার্য্যে শোনো ।। উপবাশী রাম আমার বনেতে গমন করেছেন ।। পুশ্য জোগে রামকে রাজা করবেন বলে উদ্যোগ করেছিলেন ।

[২৪ খ] তোমার জননী কৈকেয়ী ।। রাজার নিকট দুটি বর গ্রহণ করেছিনো ।। একেবরে তোমার রাজ্যলাভ দ্বিতীয় বরে জটা-বল্কল ধারণ করে রামের বনবাশ ।। কোথায় রাম রাজা হবেন ।। তা না হয়ে জটা-বল্কল ধারণ করে পিতৃসত্য পাননের নিমিত্ত আমাদের দুঃখসাগরে নিমগ্ন করে লক্ষণ জানকীর সহিৎ বনে গমন কনেন ।। তোমার জননী পাশান হৃদয়া সহস্তে রামের বশন ভুশন মোচন করে নিল্লে ।। কর্ণের

কুণ্ডল মোচনে বিলম্ব দেখে রামের কর্ণ হতে স্বয়ং সজোরে মোচন করে নিনে ॥ রাম অত্যন্ত কাতর ॥ বনেন মা ক্ষন্ত হয় আমি মোচন করে দি কর্ণে বেদনা হচ্চে ॥ এও আমাকে নয়নে দর্শণ কর্ত্তে হনো ॥ ভরৎ তোমার পিতা রামশোকে জিবন পরিত্যাগ করেছেন ॥ পিতার দেহ সংস্কার কর পিতৃদত্ত রাজ্য জননীর সহিৎ ভোগ কর রাজা হয় [২৫ ক] আর সুমিত্রার সহিৎ জেখানে রাম আমার বাস কর্চ্চেন সেই স্থানে আমাকে রক্ষা করে এশো ॥ এই বনে কৌশল্যা রোদন কর্তে নাগিলেন। ভরৎ অই কথা শ্রবণ করে হা হতোস্মি বলে ধরা তনে পতিত হনেন। কৌশন্যা ভরতকে উত্তোলন করে বনেন ভরৎ ॥ গাত্রোত্থান করো অধৈর্য হয়ো না ॥ তোমার পিতা সর্গগামী এক্ষণে আমাদের প্রতিপালন করো ॥ ভরত উ ॥ মা ॥ রামের বনগমন বিশয়ে আমি কিছুই ॥ জানিনে ॥ আমার প্রতি দোশারূপ করবেন না ॥ * তামেব ব্রুবতী দীনাং কৌশন্যাং রাম মাতরং কৃতাঞ্জলি রুবাচেদং ভরতোবাষ্প গদগদং রাম-জননী কৌশন্যা বারম্বার রোদন কর্ত্তে নাগলেন। দর্শন করে ভরৎ মহাসয় কৃতাঞ্জলি পুত্র সজন নয়নে গদগদ বাক্যে কৌশন্যার নিকট সফৎ কর্ত্তে [২৫ খ] নাগনেন ॥ প্রেমাং পাপীয়সীং মাতু সূর্যমত্ত প্রতি মেহতু ॥ পাদেন হন্যাৎগাং সুপ্তায়স্যা র্যেনিু মতো গতঃ ॥ পাপীয়শী দাশীতে গমন করে জে পাপ হয় সূর্যকে পুরিশপুত্র দর্শণ করলে জে পাপ হয় নিদ্রিত গো সকলকে পদাঘাৎ কল্লে জে পাপ হয়। সেই পাপ জেনো আমার হয় ॥ জদি আমার অনুমতিতে রামের বন গমন হয়ে থাকে * উচ্ছিষ্ঠঃ সংস্পৃশতু গামগ্নি ব্রাহ্মণমেবচ ॥ সনন্দিতু গুরুমৈব যস্যা র্যেনিুমতো গতঃ ॥ উচ্ছিষ্ট হস্তে উচ্ছিষ্ট বদনে গাবি ব্রহ্মণ অগ্নি স্পর্শ কল্লে যে পাপ হয় গুরুনিন্দা কল্লে জে পাপ হয় সেই পাপ জেনো আমার হয় ॥ জদি আমার অনুমতিতে রামের বনবাশ হয়ে থাকে। * বিশ্বাসঘাতিনা পাপং যষ্ঠৈব গুরু-ঘাতিনাং ॥ গুরোশ্চানিক নির্বন্ধে তৎ পাপং প্রতি পদ্যতা। বিশ্বাসঘাতির জে পাপ হয় ॥ [২৬ ক] গুরুহত্যা কলে জে পাপ হয় গুরুর সহিৎ মিথ্যানাপ কল্লে জে পাপ হয় সেই পাপ জেনো আমার হয় ॥ জদি আমার অনুমতিতে রামের বনবাস হয়ে থাকে ॥ * যৎ পদা পাবকং স্পষে বা কৃতঘ্নে তস্করে চয়ৎ। তৎ পাপং সমবাপোতু যস্যার্যেনিু মতো গতাঃ ॥ চরণের দ্বারা অগ্নি স্পর্শ করলে জে পাপ হয় কৃতঘ্নতা করলে জে পাপ হয় চুরি কন্নে জে পাপ হয় সেই পাপ জেনো আমার হয় ॥ জদি আমার অনুমতিতে রামের বনবাশ হয় ॥ *

এইরূপ বারম্বার জখন সফৎ কর্ত্তে লাগলেন ॥ ভরৎ ॥ তখন কৌশল্যা বনেন [২৭ খ] ভরৎ তোমাকে অপাপ জানি আর সফৎ কর্ত্তে হবে না ॥ গাত্রোত্থান করে ॥ তৈল দ্রোণি মধ্যে তোমার পিতার মৃতদেহ আছে, সৎকার করো। বনবাশী রাম বনবাশ উত্তির্ণ করে কতোদিনে রাম অযোধ্যায় আগমন করবেন রামের বদন দর্শণ কর্বো ॥ তৎপরে ভরত শত্রুঘ্ন বিলাপ কর্ত্তে নাগনেন ॥ ক্রমে রাত্রি উপস্থিত ॥ সেই রাত্রি জেনো শতবর্শ জ্ঞান হতে নাগিল ॥ পরদিন প্রভাতে মন্ত্রি গুরু বশিষ্ঠাদি ঋশিগণ আগমন করে ভরৎ নিকটে বনেন ॥ ভরৎ !! তোমার পিতার মৃতদেহ দাহ

করো ।। ভরৎ রোদন করত বনেন ।। জননী কৈকেয়ী আজ আমারে শোক সাগরে নিমগ্ন করেছেন ।।
* [২৮ ক] রহিতশ্চন্দ্র সূর্য্যাভাং যথা মেরূর্ণশোভতে ।। তথাপি ত্রাচ ভ্রাত্রাচ শূণ্যং পুরীমিদং মম ।। চন্দ্র সূর্যহিন পর্বতের জেমন শোভা থাকে না সেইরূপ পিতা-মহারাজ দশরথ এবং আর্যশ্রী রাম ভিন্ন ।। এ পুরির শোভা নাই ।। * সোহং পিত্রাসহৈ বাগ্নিং বনং রামেন বাস ২ ।। প্রবিশামি বিনা তাভ্যাং নহি জীবতু মৎ সহে ।। পিতার সহিত অগ্নিতে প্রবেশ করে জিবন পরিত্যাগ কর্বো অথবা রামের সহিত বনে গমন করে বাশ কর্বো ।। শ্রীরাম এবং রাজা ভিন্ন জিবন ধারণ করতে ইচ্ছা করি নাই ।।
[…অনুরূপ বিলাপ… G. B.]
[২৮ খ]…এই আমার নিশ্চয় বুদ্ধি ।। তাই বলি এই সমস্ত রাজ্য দূরে ত্যাগ করে জানকীর সহিৎ রামের হাশ্য যুক্ত বদন দেখে চরণশেবা কর্বো । শ্রান্তস্য যদি রামস্য পাদৌতৌ শুভ লক্ষণৌ ।। সংবাহয়ে বনস্থস্য গন্ধে রাজ্যাম্বরং ভব্যে । বন ভ্রমণ করে পরিশ্রান্ত । রাম জখন আশ্রমে সয়ন করবেন ।। শেই
[২৯ ক] সময় রামের শুভ নক্ষণ যুক্ত রামের চরণদ্বয় আমি সেবা কর্বো । সে আমার রাজ শুখ হতেও অধিকতর শুখ হবে ।। বশিষ্ঠ উ ।। ভবিত্যং ভবত্যেব ।। ভরৎ জা হবার তা হয়ে থাকে ।। এ ।। কেউ খণ্ডন কত্তে পারে না ।। এক্ষণে ধর্যব নম্বন করে ।। পিতার দেহসংস্কার কর ।। রাজা হয় ।। জননী সকলকে প্রতিপালন করো ।। তখন ভরৎ বশিষ্ঠ নিকটে বনেন ।। আপনি এ অনচিৎ বাক্য কেনো প্রয়োগ কচ্চেন ।। রাজার জেষ্ঠ সন্তান শ্রীরাম বর্ত্তমানে আমি কনিষ্ঠ হয়ে ।। কিরূপে দেহ সংস্কারাদি কর্বো ।। আমি বনে গমন করে শ্রীরামকে আনয়ন করি ।। শ্রীরাম এসে পিতার দেহসংস্কারাদি করবেন ।। তখন বশিষ্ঠ বনেন ।। শ্রীরাম পিতৃসত্য প্রতিপালনার্থ বনে গমন করেছেন ।।
[২৯ খ] বনবাশ উতির্ণ না করে আগমন করবে ন্না ।। অতেব আমরা আজ্ঞা কর্চ্চি তোমার পিতার দেহ সংস্কার করো ।। উভয় ভ্রাতা ঋশিগণ সঙ্গে কৌশন্যা ভবনে জে গৃহে রাজার মৃতদেহ আছে সেই গৃহে প্রবেশ করে ।। পিতার মৃতদেহ দর্শণ করত । হা মহারাজ বনে ধরাতলে পতিত মূর্চ্ছিত ।। বশিষ্ঠাদি ।। ঋষিগণ ভরতে উত্তোনন কল্লেন । ভরৎ চৈতন্য লাভ করে ।। রোদন করত বনেন ।। উতিষ্ঠোতিষ্ঠ শেশে ভরতোই মুপস্থিতঃ ।। মহারাজ ।। গাত্রোত্থান করুন ।।কেনো সয়ন করে আছেন ।। আমি ভরৎ আগমন করেছি ।। আমার সহিৎ আলাপ করুন ।। কোন কথা কন্না ।। পূর্ব্বে জখন আগমন কর্ত্তেম আমার সহিৎ কতো আলাপ কত্তেন ।। এক্ষণে আমায় ক্রোড়ে নয়ে মাতুন সকলের কুশন জিজ্ঞাসা
[৩০ ক] করুন । রাম লক্ষণ তারা ধন্য জে হেতুক তারা এরূপ পিতার মৃতদেহ দরশন কর্ত্তে হল না ।। আমি অধন্য মহাপাপী পিতার এরূপ দুর্গতি নয়নে দেকতে হনো ।। মহারাজ ।। আজ স্থির নিমিত্ত দেহত্যাগ করে আজ সর্গগামি হনে ।। এইরূপ বিবিধ বিনাপ কর্ত্তে নাগনেন ।। তখন বশিষ্ঠ জাবালি ।। ভরৎকে বলেন ।।

ভরৎ শোক পরিত্যাগ করো ॥ পিতার দেহ সথকার করো ॥ সর্গিয় ব্যক্তির নিমিত্ত বান্ধবগণ শোক কনে পর তাহাকে শর্গ হতে পতিত হতে হয় ॥ শ্রবণ করো ভরৎ ॥ পুর্ব্বেতে ভুমিদন্ন রাজা নিজ পুণ্য কর্ম্মের দ্বারায় সর্গগামি হয়েছিলেন। তৎপরে সেই রাজার বন্ধুবান্ধব সকলে বিবিধ শোক করাতে সেই ভুমিদন্ন রাজা সর্গ হতে পতিত হয়েছিলেন। শেই হেতু বন্নি গাত্রোত্থান করো শোক পরিত্যাগ করো ॥ তোমার পিতা সর্গগামি হয়েছেন তার নিমিত্ত শোক কর্ত্তে নাই ॥ এই কথা শ্রবণ করে ভরৎ মহাশয়

[৩০ খ] শোক পরিত্যাগ কল্লেন ॥ মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ শুমন্ত্রেরে বল্লেন ॥ সুমন্ত্র পিতার দেহ সংস্কারের সকন দ্রব্যাদির আয়োজন কর ॥ সুমন্ত্র দ্রব্যাদির আয়োজনের নিমিত্ত দুৎ নিযুক্ত কল্লেন ॥ প্রভাতে বন্দি শুতাদি সংখ পনবাদি শব্দ করে ভরত স্তব কর্ত্তে নাগনেন ॥ ভরৎ সেই সকল শুতাদিকে বলেন আমি রাজা নয় ॥ আমাকে বৃথা স্তব কচ্চো কেনো ॥ তৎপরে বশিষ্ঠের সহিৎ ভরত শত্রুঘ্নন। বহু শোভাযুক্ত জে সভা সেই সভায় গমন কল্লেন ॥ জেমন বৃহস্পতির সহিত ইন্দ্র জেমন সুধর্মা সভায় গমন করেন সেইরূপ বশিষ্ঠের সহিৎ ভরৎ গমন করেন ॥ প্রজা সকল ভরতে দর্শণ করে আনন্দে পরিপুর্ণ ॥ সে সভার কেমন শোভা হনে। দশরথকে পেয়ে জেমন শোভা

[৩১ ক] হয় তেমন্নি ভরৎকে পেয়ে তেম্নি শোভা হনো ॥ সভায় সকনে উপবেশন কনেন ॥ খনকাল পরে বশিষ্ঠ বলেন ভরৎ রাজ সংস্কারের দ্রব্য নয়ে জন সকন আগমন করেছেন। গন্ধ কাষ্ঠ ঘৃত তৈল ধুপ দিপ প্রভৃতি সকল দ্রবনয়ে ॥ জাবানি প্রমুখ ঋশি সকল আগমন করেছেন ॥ ভরৎ শেই সকল ঋষি গণের সহিত মান্য গন্ধ্যাদি উত্তম বশন ভুশনে বিভুতা শিবিকা নয়ে ॥ জে স্থানে গমন করে ॥ তদুপরি রাজার দেহ রক্ষা করত ॥ নয়ে চন্নেন। প্রজা সকন পশ্চাৎ ২ গমন করেন। কৌশন্যা প্রভৃতি শার্দ্ধশপ্তশতনারী হাহা শব্দে রোদন করত গমন কর্ত্তে নাগনেন। মৃতদেহ গন্ধদ্রব্যাদি দ্বারায় নেপন করে ॥

[৩১ খ] পট্ট বশন পরিধান করানেন ॥ গন্ধ মান্যাদি দ্বারায় সুশোভিত করে চিতার উপরিভাগে শয়ন করানেন ॥ তৎপরে ॥ দক্ষিনাগ্নি গার্হপত্যানি হবনি অগ্নি মন্ত্রপুত ॥ তিন অগ্নি দ্বারায় চিতা প্রজ্জ্বলিত কন্নেন ॥ অগ্নি প্রজ্বনিত দর্শণ করে সকনে হাহাকার কর্ত্তে নাগিল। কৌশন্যা প্রভৃতি রাজ্ঞিসকল হা নাথ হা মহারাজ বনে রোদন কর্ত্তে নাগিনো ॥ পুষ্প মান্যা দ্বারায় সুশোভিত চিতা ॥ পিতার সর্ব্বগাত্রেতে অগ্নি দর্শণ করে ভরৎ ॥ রাজার চরণ ধারণ করে বিনাপ করত বনেন ॥ জননী আমার এই কল্লেন ॥ শোকসাগরে নিমগ্ন হনেম রামজননী কৌশন্যাকে কি বনে শান্তনা করবো। জেষ্ঠ ভ্রাতা রামকর্তৃক আমি বঞ্চিত হনেম ॥ * অযোধ্যাং ন প্রব্যেক্ষামমি প্রব্যেক্ষামী হুতাশনং ॥ আমি অযোধ্যাতে আর গমন [৩২ ক] করবো না। পিতার সহিত অগ্নিতে প্রবেশ করে দেহত্যাগ কর্ব্বো ॥ এই বনে ॥ ভরৎ পতিত রোদন কর্ত্তে নাগনেন ॥ এই দরশন করে ॥ বশিষ্ঠ বনেন ॥ * ভরৎ জাতস্য মৃত্যু নির্যাত ॥ ধাচং জন্ম মৃতস্যচ ॥ তস্মাদ পরিহার্যার্থেণ

ত্বং শোচিতু মর্হসি ॥ জাতস্য লোকস্য মৃত্যুর নির্যতি ॥ আর ঘৃতস্য নোকশ্চ জন্মধাচং নিশ্চিত ॥ তস্মাৎ অপরিহার্যর্থে ত্বং শোচিতং ॥ না অইশি ॥ জে জন্মগ্রহণ করেছে তার নিশ্চয় মৃত্যু আছে এবং মৃত্যু হনেই আবার জন্ম ॥ এও ॥ নিশ্চয় ॥ তার অপরিহার্য্যত্ব অর্থাৎ নিশ্চয় হবে ॥ সেই কারণে বনি তুমি শোক পরিত্যাগ কর ॥ শোক করবার নিমিত্ত জজ্ঞ নয় ॥ ভরৎ শোক পরিত্যাগ কল্লেন ॥ রাজার দেহ তখন ভস্মিত ভুত হনো ॥ চিতা নির্ব্বাণ করে শরজুতে তর্পনাদি সমাপন কন্নেন ॥ রাজা সর্গগামি ॥

[৩২ খ] হনেন। তৎপরে ভরৎ শত্রুঘ্ন সকলের সহিৎ হতে ॥ হতনাথা অযধ্যা শোভাহিনা দর্শণ করে ॥ ভরৎ ॥ পথিমধ্যে পতিত ॥ রোদন কর্ত্তে ২ বনেন ॥ আমি এই স্থানে ॥ সয়ন কর্বো ॥ আর অযোধ্যায় গমন করবো না ॥ আমার এ জিবনে কি প্রয়োজন ॥ আমি দেহত্যাগ করে পিতার নিকট গমন কর্বো। তখন সকল আমাত্যগণের সহিৎ ॥ বশিষ্ঠ বনেন শোক পরিত্যাগ করো মূর্খের ন্যায় শোক কচ্চো কেনো ॥ সব্বনাশ উপস্থিৎ হনেও পন্ডিৎ কখনো শোক করে না ॥ কৌশন্যা বলেন ॥ ভরৎ তোমার পিতা সর্গগামি হয়েচেন। শ্রীরাম বনবাশী ॥ তুমি জদি এই রূপ শোককাতর হয়ে রোদন কর ॥ তবে আমাদের কে শান্তনা করবে ॥ ভরৎ গাত্রোস্থান করে সকলের সহিৎ রাজভবনে প্রবেশ কল্লেন ॥

[৩৩ ক] তৎপরে ব্রহ্মচর্যা তৃণের উপরিভাগে দশাহ সয়ং কন্নেন ॥ দশদিন গতো হনে ॥ দ্বাদশদিন খৌর কার্জ্য ত্রয়োদশদিন শ্রাধবাদি কার্জ্য কল্লেন ॥ ব্রাহ্মণে বহু ধন-দান গো-দান বস্ত্র দান বহু যানাদি দান করে শ্রাদ্ধ সমাপন কল্লেন ॥ তৎপরে ॥ অন্ধ খঞ্জকে বহু ধন দান তৎপরে ব্রহ্মণ ভোজন খত্রিয় ভোজন শুদ্র ভোজন ॥ সমস্ত ইতর জাতি ভোজন ॥ সেই সকন ইতর জাতিকে অশংখ ধনদান কর্তে লাগনেন ॥ এইরূপে শ্রাদ্ধাদি কার্জ্য সমাপন কন্নেন ॥ ভরৎ বিলাপ সমাপন ॥ পাড়া [?] তনে সমাপন হইল।
শ্রীভোগাথং [ভোলানাথং] স্মৃতিতের্থ চতুস্পাটিতে ॥ □

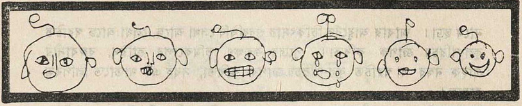

মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের খাতা

স্বনামধন্য পুত্রের পিতা কথক মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় শাস্ত্রী। যশোহর জেলার বনগ্রাম মহকুমার বারাকপুর গ্রামে তাঁর জন্ম। জন্ম সন আনুমানিক, ১৮৫৪, মৃত্যু, ১৯১২। পিতা তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় পেশায় কবিরাজ। কিন্তু পুত্রের ছিল দেশ ভ্রমণের নেশা, উৎসাহ ছিল গান-বাজনায়। মদন-মাস্টারের সঙ্গে পরিচিতি ছিল বলে শোনা যায়। উদাত্ত কণ্ঠস্বরের অধিকারী মহানন্দ মুখে মুখে ছড়া, কবিতা বাঁধতে পারতেন। শেষ পর্যন্ত কথকতাকে পেশা হিসাবে নেন। উদ্ধব শিরোমণি তাঁর গুরু। ইংরাজি ভাষার সঙ্গে মহানন্দের পরিচিতি ছিল, গ্রাহক ছিলেন হিন্দি বঙ্গবাসী পত্রিকার। এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়েছিলেন কিনা, তা জানা যায় না। যৌবনে সংস্কৃত শিখতে কাশীধাম যান এবং সমগ্র উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ভ্রমণ করেন। পারিবারিক শ্রুতিতে, গল্প-গাথায় চা-পানের প্রতি তাঁর আসক্তির কথা প্রায়ই শোনা যায়। 'ভুবনমোহিনী' নামে একটা নাটকও লিখেছিলেন, সেটি ছাপা হলেও এখনো পর্যন্ত নাটকটির কোন মুদ্রিত নমুনা চোখে পড়েনি। পেশাদার কথক হিসাবে মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ঘুরে বেড়াতেন। জমিদার বাড়িতে, সম্পন্ন গৃহস্থের দোচালাতে বা সাধারণ গৃহস্থের বাড়িতেও তিনি পাঠ করতেন। শোনা যায় যে পুত্র বালক বিভূতিভূষণ "পিতার অনুকরণে বারাকপুর গ্রামের গাছপালা ও বাঁশঝাড়কে শ্রোতা-রূপে কল্পনা করিয়া কথকতা করিতেন"। পথের পাঁচালীর একাংশের নামই তো অক্রুর সংবাদ, কথকদের চির অভ্যস্ত পালা।

শ্রী তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী রমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে আমরা যা পেয়েছি, তা এখানে কিছুটা সন্নিবেশিত করা হল। মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভ্রমণকাহিনীর একটি ছেঁড়া পাতা ও তাঁর লেখা পুথির একটা পাতড়া। পাতা দুটি ছিন্ন জীর্ণ ও কীটদষ্ট, ফলে মাঝে মাঝে পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি। ভ্রমণকাহিনীতে কৃষ্ণের প্রতি কটাক্ষটি কৌতূহলোদ্দীপক। কথকতার পাতার অংশটি, ঐতিহ্যানুসারী, সংস্কৃত শ্লোক ও বাংলা ভাষার মিশ্রণে বয়ানটা তৈরি হয়েছে।

অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গানের খাতাটি। ১৮৯০ সনের খাতা, সঙ্গীতসার। কালিতে লেখা। কথকদের গান গাইতে হত, লাগসই ছড়া কাটতে হত। সেই কাজেই খাতাটি ব্যবহৃত হত। আয়তন ও আকৃতি ডিমাই ১×৮। পৃষ্ঠা নম্বর নেই। মোট ৯৪ পৃষ্ঠা।

কথকদের মধ্যে প্রচলিত রীতি, গান ও পদাবলী সংগ্রহ করা, যাতে সময়মত ব্যবহার করা যায়। এই খাতাতেও নানা লোকের নানারকম গান আছে। প্রসাদী গান, বাউল সুরের গান, মধুকাণের গান, কাঙাল ফিকিরচাঁদ, মদনমাস্টার, হিন্দীগান, দোঁহাবলী, গোবিন্দ অধিকারী ও মোহন দাসের গীত।

কিন্তু এই সঙ্গীতসংগ্রহের পুথিটি কিছুটা খেরোর খাতার লক্ষণবিশিষ্ট। এতে টুকরো টুকরো ছড়া বা প্রবাদসংগ্রহ আছে। যেমন—স্টেশন, উইলসেন আর কেশব সেনের

নামে ছড়া। আবার আয়ুর্বেদ চিকিৎসার ঔষধবিধি লেখা আছে, লেখা আছে স্বরচিত কুল-পরিচয় জ্ঞাপক কবিতা। পুত্রের জন্মক্ষণ, ভূমিকম্পের তারিখ, বঙ্গবাসীর গ্রাহক নম্বর বা স্বরচিত কুল-পরিচয় জ্ঞাপক কবিতা, সবই এই খাতাতে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

আমরা এই অংশে কাশী প্রসঙ্গ কথক মহানন্দের স্বরচিত কবিতাটির বিশদ অংশ উদ্ধৃত করলাম। অনেক জায়গা অস্পষ্ট আছে। সাধ্যমত পাঠোদ্ধার করা হল। কবিতায় কথকতার কথা বার বার ফিরে এসেছে। এই কবিতা পাঠ কোনো কোনো পাঠকের মনে কথক হরিহর ও কাশীতে তাঁর জীবনচর্চার স্মৃতিকে উসকে দিতে পারে।

এই পাতড়া ও খাতা ব্যবহার করার অনুমতি দেবার জন্য ও সর্বতোভাবে সহযোগিতা করার জন্য আমরা শ্রী তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমতী রমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই। পাতড়া ও খাতার স্বত্ব শ্রীমতী রমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এর পুনর্ব্যবহার তাঁর অনুমোদন সাপেক্ষ। ৩১শে আগস্ট ১৯৯৩ সনের সাক্ষাৎকার ও বিভূতি রচনাবলী, ১ম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৭৮-এ সন্নিবেশিত চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়ের রচনা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

ভ্রমণ পঞ্জীর একপাতা

গোবর্দ্ধন গিরির ৭ ক্রোশ পশ্চিমে বরসান নামক গ্রামে বৃকুভানু রাজার বাড়ি ছিল। এই বৃষভানু কথাই শ্রী রাধিকা। বরসানে বৃষভানু রাজার স্মরণার্থ একটা মন্দির আছে, এই মন্দিরের মধ্যে বৃষভানু ও তাঁহার স্ত্রী কীর্ত্তিকী এবং পুত্র শ্রীদামাদির প্রতিমূর্ত্তি আছে। বরসানে ব্রহ্মা পর্ব্বত নামে একটী পর্ব্বত আছে, এই পর্ব্বতের উপরে মন্দিরের মধ্যে শ্রীরাধিকার মূর্ত্তিও দেখা যায়। পূর্ব্বে চির মাঠের অর্থ বস্ত্রহরণের ঘাট অর্থাৎ এই স্থলে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদি জলকেলীর সময় বস্ত্রহরণক শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ মহাত্মাই বটে !! বৃন্দাবনের…

কথকতার পুথির এক পৃষ্ঠা

চিন্ময়া অধুনা কি করিষ্যামি। অত্রাবসবে। মহোন্ধকারাত্রৌ। সর্ব্ব অদৃষ্ট জ্ঞাবো। তত্রনানা বৃক্ষেতে শোভা। ঘোরবনানিসন্তি। তৎ দৃ। অশ্বত্থামা। ক্রমেণ সমূন বৃক্ষ ভর্ত্তোননং কৃবো শিবমস্তকে প্রহার কারয়া শিবঃ তানিবৃক্ষাণিগ্রাসযা অনুবনিকপার্শ্বে একো বিল্ববৃক্ষোস্তি। অশ্বত্থামা ত ও' পাট থিবো শিরশি প্রহার কারয়া। অনু আশুতোষঃ বিল্ববৃক্ষস্র প্রহার শিরসি প্রাপ্তঅযেস্ত আত্রক্ষো পূজো। ও' স্তোকেকঃ মম পরম ভাক্তাসি সমূন-শাখাখা বিল্ববৃক্ষেণ নিষাযা মমপূজামকরো কঃ পুরুষঃ চন্দনেন মিশ্রিত কারাযিত্তা। শতসহস্র নক্ষ। সংক্ষা কৃরো। মমপূজা কারযা এবং প্রকারেণ। কোপি মমপূজা নকরোতি। তস্মা—কি বরবৃণু। এতৎশ্রু। অশ্বত্থামা শিক পপাতচরনৌপান্তে ছিল্বমূন ইবাদ্রুসঃ। এক প্রকারেণ শিবচরণোপান্তে পতিবো। ওঁ। হে প্রভোমমাপরা ধ [?] ম্বারদেহি এতৎশ্রু। শিবওঁ। ভো অশ্বত্থামন্ তব পাপ নাস্তি। যস্মাৎ কি এক প্রকারেণ মমপূজা কারষা [?] "এতৎশ্রু। অশ্বত্থামা ওঁ যদি তুষ্টোসি। তদাম্বার দেহি তৎশ্রু। তৎক্ষণা—। স্তবাদিক ২।।

সঙ্গীত-সার।

শ্রীমহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক শাস্ত্রী কর্ত্তৃক।
সংগৃহীত।

মুজঃফরপুর।

[illegible]

১২৯৭। চৈত্র।

সঙ্গীত-সার।

শ্রীমহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

[শাস্ত্রী কথক]

কর্ত্তৃক সংগৃহীত।

মজঃফরপুর।

সাকিম বারাকপুর।

১২৯৭। চৈত্র।

কাশী।

কাশী ফাঁসী সর্ব্বনাশী, নীনা চমৎকার।
তীর্থবাস দূরে থাক্, পায় নমস্কার॥
ভগবতী ভাগীরথী উত্তর বাহিনী।
বহিতেছেন বারাণসী, দিবস যামিনী॥
সুবর্ন মন্দির মাঝে, নিঙ্গ বিশ্বেশ্বর।
আর কত নিঙ্গ কাশী, সংখ্যা নাই তার্॥
ঘাটে পথে মঠে মাঠে, গড়া গড়ি যায়।
মোট কথা পড়ে আছে জরাগ্রস্ত প্রায়॥
তীর্থেতে বিরক্ত বড়, করে পাণ্ডাগণ।
মোণ্ডা দিয়ে ঠাণ্ডা করা, হয় দুর্ঘটন॥
জুয়াচুরী, বাটপাড়ি, বঞ্চনা, ছননা।
মূর্ত্তিমতি কাশীধাম…না হয় বর্ণনা॥

গয়া।

তীর্থ নিন্দা অধোগতি শাস্ত্রের বচন…।
ভুক্ত ভোগী বনে ভাই, দিনু বিবরণ…॥
অন্নদান সমদান, সংসারেতে নাই—।
তাহার দৃষ্টান্ত শুদ্ধ, কাশী ধামে পাই॥
অকাতরে অন্নব্যয়, প্রতিদিন কাশী…।
ভুকী, দুঃখী, কেহ নাহি রহে উপবাসী…॥
স্বর্ণথানা হাতে নয়ে স্বয়ং কাশীশ্বরী…॥
দ্বারে দ্বারে অন্ন দেন, যেন দয়া করি…॥
অন্নসত্র দেখে এস ; বারাণসী পরে।
অন্নপূর্ণা বিনা ভার ; কেবা নতে পারে ?॥
জয় মাতঃ অন্নপূর্ণা করি নমস্কার।
অন্ন জ্বানা বড় জ্বানা, কহিনাম সার্…॥
আরতি সুন্দর বড়, বিশ্বেশ্বর ঘরে…।
সায়ংকানে দরশনে, দেহ মন্ হরে…॥
বোধহয় কাশীনাথ, স্বয়ং আবির্ভাব…।
দর্শকের মনোমধ্যে, হয় এই ভাব…।
আশ্বিনে অম্বিকা পূজা, কাশী বড় ঘটা।
বিসর্জ্জনে গঙ্গাতীরে, দেখতে ভারিছটা…॥

এতশোভা মনোনোভা, কোথা নাহি হয়।
সাহেব সুবা এসে কত, ছবি তুনে নয়··· ॥
'বুড়ুয়া-মঙ্গিন' মেনা, নীনা বড় তার··· ।
ফাল্গুনেতে প্রায় হয়, দেখতে চমৎকার ॥
নৌকার উপরে মেনা, গঙ্গা গর্ভে হয়।
অহোরাত্র তিন দিন, উৎসব রয়··· ॥
কত নৃত্য, কত গীত, কত বাদ্য ভাণ্ড··· ।
'বুড়ুয়া মঙ্গিন' জেনো, যবনের কাণ্ড··· ॥
বেদের গণনা আর, জ্যোতিষের ব্যাখ্যা।
কাশীধামে ভান হয়, কর গিয়া শিক্ষা··· ॥
ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র চর্চা, সম্ভবতঃ হয়।
স্থানে স্থানে সঙ্গীতের ; আছে পরিচয় ॥
(আমি) হিন্দী ও সংস্কৃত ভাষা ; পড়ি কাশী ধামে।
বিদ্যা বুদ্ধি মুখশুদ্ধি ; পড়াশুনা নামে ॥
ষণ্ডা ষণ্ডা গুণ্ডা বড় ; কাশী বাস করে।
সাবধানে না থাকিনে, গনাটিপে ধরে ॥
বিনা দোষে একদিন, পড়েছিনু দায়।
গুণ্ডাহ'তে মান্‌টা রাখতে, দুটি টাকা যায় ॥
ব্রাহ্মণের অনুপায়, কাশী নাহি হয়···।
পরিচয় ভান হনে, পেট চনে, যায় ॥
'ষোল আনা' অধিষ্ঠান' আর মধুপুরী··· ।
প্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণের ; তিনটি চাকুরী··· ॥
মজাকোরে পেট্‌টানো ; বসে থাক ঘরে।
মাসে মাসে কিছু দান ; পাবে তুমি করে ॥
কোন মাসে তিন চার, কোন মাসে ছয় ···।
ষোল আনা অধিষ্ঠান ; তাহাকেই কয়··· ॥
(পুনশ্চ) নিত্যযদি নিমন্ত্রন ; জুটাইতে পারো··· ।
তবেই তোমার প্রতি ; হাতে পোয়া বারো ॥
তার মন্দ কত রূপ, প্রতিদিন থাকে।
দক্ষিণার পয়সায় ; ভাঁড় ভোরে যাবে ॥
কত যুবা এইরূপ অন্নদাস হয়ে··· ।
পড়ে আছে কাশীধামে, পরকান খেয়ে ॥
ধন্যকাশী বারাণসী ; মহিমা তোমার।
কত নীনা কর মাগো ! বুঝে সাধ্য কার্ ? ॥

সভাতে বিচার বড় দেখতে পরিপাটী।
পণ্ডিতে পণ্ডিতে দ্বন্দ্ব, ক্রমে নাঠানাঠী ॥
মনে হয় শিক্ষা কিছু, করি এই বার।
সাক্ষী দিতে হয় পাছে, থাকা বড় ভার ॥
মূন ব্যাখ্যা, 'কথকতা', বারমাস হয়।
কাশীধাম মধ্যে এটী, মুখ্য পরিচয়… ॥
পঞ্চক্রোশী মধ্যে কত, নিঙ্গ আর তীর্থ…।
পণ্ডিতে জানেনা হেথা, মেয়ে জানে তথ্য ॥
সাধু শান্ত সহরেতে, কচিৎ দেখা যায়।
যেথা সেথা দরশন, ভাগ্যে ঘটা দায় ॥
ভিক্ষুক ভুকীর কথা, ছেড়ে দাও ভাই…।
পথে ঘাটে কত আছে সংখ্যা নাহি পাই ॥
মেয়ে ছেনের চরিত্র ; কিছু ভান নয়…।
একরূপ সব তীর্থে, প্রায় দেখা যায় ॥

(আঁবির)

দেওয়ানি হোনীনামে, দুইটী উৎসব…।
বড় ধূম নেচে উঠে—; ছেনে বুড়ো সব— ॥
দেওানিতে জুয়া খেনা হয় গনি গনি।
হোনিতে আবির কাণ্ড, আর গানাগানি ॥
বারাণসী পরপারে ; ব্যাসকাশী নাম।
ব্যাসেশ্বর শিব নিঙ্গ ; আর রাজ ধাম… ॥
মহারাজ কাশীরাজ ঈশ্বরী প্রসাদ…।
ধার্ম্মিক সুধীর বড় কাশীতে প্রবাদ… ॥
বিশেষ সন্মান ছিন, গবর্ণমেন্ট্ বারে…।
বর্ত্তমানে দেহ ছেড়ে রাজা স্বর্গ পরে… ॥
ব্যাসকাশী মোনে গাধা, কাশীবাসী কয়…।
কেদার মণ্ডেতে নেখে ; কথা মিথ্যা নয়… ॥
কাশীতে ছাড়িনে দেহ, পায় মুক্তিপদ…।
শিববাক্য সত্য সত্য, নাহি হয় রদ… ॥
প্রস্তর নির্ম্মিত বাড়ি ; প্রায় কাশী পরে…।
বড় বড় ইমারত, শোভে গঙ্গা তীরে… ॥
রাস্তা গুনি বড় গনি, চনাফেরা দায়…।

পাসাপাসি হলে দুটী মাথা ফেটে যায়… ॥
দিবানিশী লোকচলে, সংখ্যা নাই তার্… ।
কার শ্রাদ্ধ কেবা করে, বুঝে উঠা ভার্… ॥
কার্ত্তিক দেবতা মধ্যে, নর মধ্যে উড়ে… ।
এছাড়া সকল জাত্, আছে কাশী জুড়ে ॥
নিম্মর্ল কলের জল ; দেখ ঘরে ঘরে… ।
গঙ্গাজল চক্ষুজল ; কেলে শোক ভরে… ॥
বড় ভক্ত যিনি তাঁর, গঙ্গাজলে স্নান… ।
যার তার্ কাছে গঙ্গা, নাপান্ সম্মান… ॥
মরি মরি দয়াবতি ; মাতা ভাগীরথি ! … ।
কোথা তব ভগীরথ, দেখাও দুর্গতি… ॥
শ্মশান ভীষণ বড় ; মণি কর্ণিকা… ।
কত শব দাহ হয়, নাহি লেখা জোখা… ॥
দিবা রাতি চিতা জ্বলে, ধূ ধূ রবে… ।
হুহু-করে প্রাণ ; কবে যেতে হবে… ॥
কত দেহ পড়ে আছে, জাহ্নবীর তটে… ।
পূতিগন্ধ শবগন্ধ নাসারন্ধ্র ফাটে… ॥
শৃগাল শকুনি তায়, করে কলরব…. ।
অবিরল কোলাহল নয়ে কত শব… ॥
মরি মরি কিবা দৃশ্য শ্মশানের ঘাটে… ।
নয়নে হেরিলে বুক পাষাণের ফাটে… ॥
হর হর ব্যোম ব্যোম, সদা বাজে গান… ।
শ্মশানে শঙ্কর নিজে, অঙ্গে রাম ছান… ॥
কর্ণমূলে রাম নাম দিয়ে তিন বার… ।
জন্ম মৃত্যু হতে জীবে, করেন উদ্ধার… ॥
কোথাহে পার্ব্বতি পতি পড়েছি শঙ্কটে… ।
বারাণসী পুরী যেন, অন্তে ভাগ্যে ঘটে… ॥
উত্তরেতে অসি যার্ ; দক্ষিণে বরণা… ।
বারাণসী বলি তারে শুন সর্ব্বজনা… ॥

মহারাজ হরিশচন্দ্র ; চণ্ডালের বেশে… ।
কাটান শ্মশানে কাল ; কাশী নানা ক্লেশে… ॥
বিশ্বামিত্র কোপে তার্ ; সর্ব্বস্বান্ত হয় ।
মার্কণ্ডেয় পুরাণেতে পাবে পরিচয়… ॥

বাজারে বাসন বেশী ; আর নামাবনী।
কৌটা বাটা বড় ঘটা ; দেখ গনি গনি··· ॥
নানারঙ্গে নানা শাড়ি, জোনা বাড়ি হয়।
গৃহস্থ নয় উচ্চদরে, দোকানেতে যায় ॥
শিব নিঙ্গ গড়ে কাশী কত কারিকরে।
শাক্ মাছ তুন্য, বিক্রী হয় ন্যায্য দরে ॥
পাথরেতে খোঁদা কাজ ; বড়ই সুন্দর ! ।
দেখা যায় যদি কেহ ; করে ঘর ॥
রুদ্রাক্ষ মানা আর ; কাশীর ভান নাম।
দেখে শুনে নও ভান, মিনে বার মাস ॥
শাক সব্জী ফন মূন ; কত তুমি চাও।
চান দিয়ে কিনে আন ; পেট ভরে খাও ॥
সুনভ বাজারে সব দুঃখ নাহি তায়।
ফন্ মধ্যে নারিকেন্ ; মেনা বড় দায়··· ॥
শ্রাবণ ভাদ্রে জন্মে ; আম আরও জাম।
বড় মিষ্ট আম্র ফন, ন্যাংড়া যার নাম ॥
কাশীর পিয়ারা, 'কুন', বড়ই বিখ্যাত···।

(ম'দ) ৭।

দেশান্তরে চনে যায় ; সমাদরে কত ॥
পাঁটা মেনা বড় ন্যাঠা ; দূরে যেত হয়।
দুর্গাবাড়ি ফেন কড়ি , কত নোকে নয় ॥
মদ ভাঙ্গ্ গাঁজা গুনি ; দেখ মোড়ে মোড়ে।
নেশা খোর খেয়ে ভোর ; পথে, ঘাটে, পড়ে ॥
চ'ডু চরশ্ বড় সরস ; চক্ষু মুদে খাবে।
দেশী ম'দ কাণ্ডি, সোঁপী ; সস্তা দরে পাবে ॥
রাব্ড়ি মিষ্টান্ন মধ্যে ; বড় মন্দ নয়···।
চম্ চম্ নামে বর্ফি'···, আরো ভান হয়··· ॥
খেন্না মাটীর দ্রব্য ; সত্য ভান বটে···।
গব্য দ্রব্য মধ্যে দধি ; টকে প্রাণ চটে··· ॥
(পণ্ডিত) বাপুদেব' বান শাস্ত্রী ; কৃষ্ণানন্দ আর।
কত বক্তা কাশী মধ্যে ; সংখ্যা করা ভার ॥
গ্রহদোষে কারাবাসে ; স্বামী কৃষ্ণানন্দ···।
রাহুযথ্য গ্রাসে চন্দ্র ; ভাগ্য বড় মন্দ··· ॥

কৃতকর্ম্ম্য, ফনাফন ; কোথা নাহি যায়… ।
কান পূর্ণ হনে জীব ; অবশ্যই পায়… ॥
বক্তৃতা শুনিনে যার্ ; চক্ষে ধারা বয়… ।
এ জনমে নীনা তার ; হয়ে গেছে হায়… ॥
বিথা শূন্য বৃহস্পতি কত আছে কাশী ।
টীকি নেড়ে ধিকির্ধিক ঘোরে দিবানিশি ॥
পড়া নাই শুনা নাই ; নাম বিথা নিধি… ।
অবিথা সেবাতে রত ; হায় পোড়া বিধি ! ॥
কাশী যাও কষ্ট নাই ; রেনগাড়ি চেপে ।
দেখন স্বরী মনেস্বারী, মন যাবে খেপে ॥
গঙ্গার উপরে সেতু ; প্রথমে দেখিবে ।
পার হয়ে কত কীর্ত্তি, নয়নে হেরিবে ॥
গণ্ডা গণ্ডা পাণ্ডা কত, পথে তুমি পাবে ।
মণ্ডা মত মিষ্ট বাক্যে ; তোমাকে ভজাবে ॥
মনিকরণিক তীর্থে ; আগে স্নান কর… ।
জপ্ তপ্ সেরে হৃদে, ইষ্ট চিন্তা ধর ॥
মা-মা-শব্দে যাও ; অন্নপূর্ণা মারে ।
দেখিবে সুন্দর মূর্ত্তি, মন্দির মাঝারে ॥
কৃপাময়ী কাশীশ্বরী ; বসে সিংহাসনে ।
তুলসী চন্দন দাও ; মায়ের চরণে… ॥
(কাশী) ভিন্ন ভিন্ন দেব মূর্ত্তি, দেখ তুমি কত… ।
বাণী কুণ্ড শিব নিঙ্গ ; আছে শত শত ॥
'জ্ঞান বাড়ো' মহাতীর্থ ; বিশ্বেশ্বর পাশে ।
তার জন পান কর ; সর্ব্বপাপ নাশে ॥
যবনের অত্যাচারে ; স্বয়ং বিশ্বেশ্বর… ।
'জ্ঞান বাপী' মধ্যে তিনি ; জনের ভিতর… ॥
বাপ নিঙ্গে আবির্ভার, কাশী বিশ্বনাথ ।
হেঁট মুণ্ডে কর পুটে ; কর প্রনিপাত ॥
কত জনা বসে হেথা, করে চণ্ডী পাঠ্ ।
কানে কথা গুনাভার, নেগে যায় হাট ॥
কত ভক্ত গঙ্গা জন, আর বিল্লদনে ।
পূজো করে বিশ্বশ্বরে, সদা কুতুহনে… ॥
হর হর ব্যোম্ ব্যোম্, জয় শিব শম্ভো… ।
ভক্ত মুখে ব্যক্ত হনে, হয় হৃদ কম্প… ॥

মরি মরি কিবা দৃশ্য, বিশ্বেশ্বর ঘরে।
যাও ভক্ত হবে মুক্ত, না যাবে জঠরে ॥
বিশ্বেশ্বর সন্ মুখে, নাম দণ্ডপানী··· ।
অগ্রে পূজা পান তিনি, শুনিবেন জ্ঞানী ॥
পশ্চাতে সকল দেব, করিবে অর্চ্চন।
কাশী যাত্রা মাত্রাহীন, না হবে কখন ॥
দরশনে বড় জ্বালা, কতই ভিক্ষুক··· ।
দিয়ে থুয়ে শেষ নাই ; এই বড় দুখ্··· ॥
স্নান মন্ত্র সঙ্গে থেকে, পড়াবে যে জন।
'গঙ্গা পুত্র' নাম তার ; জাতিতে ব্রাহ্মণ ॥
দেবাচয়ে দরশন ; যে জন করায়··· ।
'যাত্রাওলা' নাম তার, কাশী বাসী কয়··· ॥
যাত্রী প্রতি এক টাকা, আর এক আনা।
'গঙ্গা-পুত্র' আদি পার্য, নাহি তায় মানা ॥
সধবা কুমারী পূজা, আছে দুটী বার··· ।
বাড়িওলা বাবুদের তাতে বড় লাভ··· ॥
মর বাঁচ থুনে দাও ; যাহা আছে কাছে··· ।
ধাক্কাধুক্কি খেতে হয়, ভয় বড় পাছে··· ॥
বড়ই রহস্য কথা, শুন সর্ব্বজন··· ।
সধবা কুমারী চেনা ; হয় দুর্ঘটন··· ॥
কার মেয়ে আনে ধোরে, বলা নাহি যায়।
পূজা করো কর যোড়ে, গড় হও পায় ॥
শাঁখা শাড়ি দাও চুড়ি, কড়ি যত পার।
ব্যাগ্ ধরে টানাটানি, করে কারো কারো ॥
দয়া নাই মায়া নাই, দাও দাও রব।
নণ্ড পণ্ড হতে হয়··· ; ভণ্ড যোগী সব··· ॥
সধবা কুমারী যাঁরা, হন ক্ষতি নাই।
বাড়িওলা নয় সব্, তাঁরা পান্ ছাই ॥
রুক্ষ হস্তে দুঃখ পেয়ে, ঘরে ফিরে যান্!
জন যোগ মাত্র কিছু, কড়ি হাতে পান্।
এমন মজার তীর্থ; আর নাহি পাবে।
দেখে শুনে এস ভাই, চোক ফুটে যাবে ॥
তারপর দণ্ডী আর, ব্রাহ্মণ ভোজন।
বার্ বার্ এইবার, সংশয় জীবন ॥

পাঁচটা ব্রাহ্মণ যদি, নিমন্ত্রন করো।
শত শত অনাহূত, করে জ্বর জ্বর ॥
খেতে দাও বড় ভান, আশীর্ব্বাদ পাবে।
না হয় পয়সা কিছু নিয়ে তবে যাবে ॥
কাঙ্গানী বাঙ্গানী বেশী, কাশী দেখতে পাই।
অর্দ্ধচন্দ্র দাও, তবু, পেট টানা চাই ॥
বাঙ্গানী টোনাতে বাস, করা বড় দায়।
নোকের গরমে যেন, জীবন সংশয় ॥
জ্বর জ্বাড়ি বাড়ি বাড়ি, বড় মন্দ নয়।
মহামারী দেখা দিনে, সর্ব্বনাশ হয়… ॥
কাশীর নিকটে স্থান, নাম শিক্-রোন…।
সুখে বাস কর সেথা, নাহি কোন গোন ॥
জন বায়ু খুব ভান, ভাঙ্গা দেহ সারে।
(কত) বাবু ভেয়ে বায়ু খেতে, এসে বাস করে ॥
জজকোর্ট শিকরোনে, সদর কাছারি…।
(দেখ) সাম্‌না বেঁধে সাম্‌না কত, ঘোরে সাক্ষি সারি ॥
এই স্থানে কৃষ্ণানন্দ ; জজের বিচারে।
বনাৎকার অপরাধে, যান কারাগারে ॥
(কাশী) ডাক্‌তার কবিরাজ, কত তুমি চাও।
মোড়ে মোড়ে দেখতে পাবে, ভিজিট কিছু দাও ॥
কথকের সংখ্যা বেশী, পুরে নাকো আশা।
যৎকিঞ্চিৎ দিনে কথা, কয় বার মাস ॥
শিবের পূজারি কত, পৈতে ফোটা-ধারী।
পুষ্প পাত্র হাতে নয়ে, ঘোরে বাড়ি বাড়ি ॥
সকন বাড়িতে শিব, প্রায় দেখতে পাই।
শিব ছাড়া অন্য মূর্ত্তি, বড় কাশী নাই… ॥
শিবধন্য কাশীপুরী, এই হেও কয়…।
পঞ্চ ক্রোশী বারাণসী, শুদ্ধ শিবময়… ॥
অধিক ভ্রমণে যদি, শ্রম জ্ঞান হয়।
সংক্ষেপেতে বনে দিই, দর্শন উপায় ॥
অন্নপূর্ণা বিশ্বেশ্বর, আর দণ্ডপাণী।
ভৈরব, কেদার নাথ, শ্রেষ্ঠ বনে জানি ॥
(কাশীর) দক্ষিণেতে দুর্গাদেবী, দুর্গতি হারিণী।
কান ভয় হোতে কাশী রাখেন জননী ॥

আর গণপতি হেথা, নাম চিন্তামণী ।
এই কটি দরশনে, পূর্ণফল মানি ॥
আর যত পার দেখ, তাহে ক্ষতি নাই ।
স্থূলকথা বলে দিনু, মনে রেখ ভাই ॥
জলতীর্থ মধ্যে শ্রেষ্ঠ মণি-করাণিকা ।
তারপর কত আছে, নাহি লেখা জোখা ॥
বিয়াল্লিশ লিঙ্গ কাশী, শুন সর্ব্বজন ।
অনাদিনা মেতে তাঁরা, খ্যাত ত্রিভুবন ॥
ওঙ্কার ত্রিলোচন, আর বীরেশ্বর ।
এইরূপ পরিচয়, পাবে পর পর ॥
দেবতা অসুর নর, গন্ধর্ব্ব গণ ।
কতজনে কত শিব, করেছে স্থাপন ॥
পরিচয় দিতে গেলে, পুথি বেড়ে যায় ।
জলে স্থলে কত আছে, সংখ্যা করা দায় ॥
শিব শর্ম্মা নামে কোন, ব্রাহ্মণ সন্তান ।
বারমাস কোরে বাস, শেষ নাহি পান্ ॥
তিনে তিনে তীর্থকাশী মিথ্যা কথা নয় ।
কাশী খণ্ড খুলে দেখ, বেদব্যাসে কয় ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে, আছে তীর্থ যত ।
শিবের আজ্ঞায় কাশী, আছেন নিয়ত ॥
এক কলা পরিমাণে, নিজস্থানে রয় ।
পঞ্চদশ কলা তীর্থ, কাশীতে উদয় ॥
কাশীবাসী অন্য তীর্থে, আর নাহি যাবে ।
সর্ব্ব তীর্থ ফল কাশী, বাসে তারা পাবে ॥
শিবের সংকল্প এই, শুন সর্ব্ব জন ।
যাও যাবে অন্য তীর্থে, যদি লয় মন ॥
বিঘ্ন হর বিশ্বনাথ, করিয়ে যতন ।
ত্রিশূলে উপরে কাশী, করেন ধারণ ॥
সদা সত্য যুগ আর, উত্তর অয়ন ।
জানিবে কাশীতে ভাই, ব্যাসের বচন ॥
ভৈরব যাতনা পাপী, দেহ অন্তে পায় ।
দুরন্ত শমন ভয়, কাশী নাহি রয় ॥
জেনে রেখ পাপ ফল, কোথা নাহি যায় ।
আগে দণ্ড পরে মুক্তি, কাশী ধামে হয় ॥

অতএব সাবধান্, কাণ শুনে রেখ।
বাঁকা পথে কাঁটা দিয়ে, সোজা পথ দেখ ॥
মৃত্যু কানে ডাণ কাণ, কাশী থাকে খাড়া।
নিজ চোকে দেখা ভাই, কথা নয় বাড়া ॥
তাহার কারণ শিব, নিজে রাম নাম।
কর্ণমূলে দেন, জীব, পায় মোক্ষধাম ॥
মৃত্যু কানে গৃহমধ্যে, প্রায় সব মরে।
কাশীবাসী তাহে কোন, দোষ নাহি ধরে ॥
মৃত্যু কানে যদি জীব, যায় গঙ্গার ঘাটে।
কাশী প্রাপ্তি হয় নাকো, গঙ্গানাভ ঘটে ॥
কত জনে কত বনে, বুঝে উঠা ভার।
যার যাহা মনে এসে, করিবে ব্যাভার ॥
'মরা' কথা ভান নয়, শুনে রেখ ভাই।
কাশী নাভ হনো "তার", এই বনা চাই ॥
ধন্য ধন্য বিশ্বেশ্বর! বিঘ্ন—বিনাশন।
মুক্তি হেও বারাণসী, করেছ সৃজন ॥
প্রণিপাত করি পায়, নাহি জানি স্তুতি।
মৃত্যু কানে তব পদে, থাকে যেন মতি ॥
আর প্রণিপাত করি, নাম দণ্ডপাণী—।
তাঁর কৃপা হনে তবে, কাশীবাস মানী ॥
বৃদ্ধ কানে ঋষিরাজ, অগস্ত্য ঠাকুর—।
দেবচক্রে কাশী হতে, হয়েছেন দূর ॥
কি জানি ভাগ্যের কথা, বনা নাহি যায়।
কাশীবাসী হনে বিঘ্ন, আছে পায় পায় ॥
দণ্ডপাণী কোপে কাশী, ত্যাজে ষড়ানন।
শ্রীশৈন পর্ব্বতে বাস, শুন সর্ব্বজন ॥
দণ্ডপাণী তুষ্ট যদি হয় কোন কানে।
কাশীবাস তবে তার, ঘটিবে কপানে ॥
কাশী ছেড়ে যান যবে, অগস্ত্য ব্রাহ্মণ।
শ্রীশৈন পর্ব্বতে তাঁর, হয় আগমন— ॥
কার্ত্তিক নিকটে কাশী, মাহাত্ম্য শ্রবণে।
শতধারা বয় তাঁর, দুইটী নয়নে।
অতএব কাশী তুন্য, নেই আর ধাম।
ত্রিনোক মাঝারে নাই, রাম তুন্য নাম ॥

(শেষ)

বাউন সঙ্গীত।

এবার, ভাঙ্গনো ভবের বাসা।
বাসা ভেঙ্গে যায় চিরদিনের মত।।
আছে যে সব মানা মান, এই বেনা সব সমান,
সমান, নৈনে হবে সকন পয়মান, যে দিনে,
তুই হবি ফরসা।। বসে আছ কোন সাহসে,
ধরেছে ঘূণ মটকার বাঁশে, (এখন) যারা সাহস
-দিচ্ছে এসে, তখন তারাই দেখবে রঙ্গ
তামাসা।। ন দিকের দেওয়ান ফেটেছে, গে-
রো সকন কেটে গেছে, দেহের ছ'জন নয়কো
সুজন, তারাই তোমার কর্ম্ম নাশা।।
গুটায়ে নে তোর ক্যাঁথা ঝুনি, ছাড়মুখে বিষয়
বুনি, মুখে হরি হরি বনি, 'কর' যাবার পথ খোনসা।।

ঐ সঙ্গীত!

আর কেন মন এ সংসারে। যাই চন সেই নগরে। □

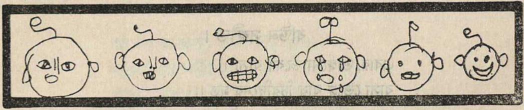

রিঙ্গনলীলা

পুথিটি হাল আমলের। লিখেছেন শ্রী কুমুদবন্ধু ভট্টাচার্য পুরাণরত্ন। এখন দৃষ্টিশক্তিহীন, ৯৪ বৎসর বয়স। কথিকা সম্রাজ্ঞী ভাগবতভারতী ক্ষান্তিলতা দেবী কুমুদবাবুর পত্নী, তাঁরই লেখা পালা তিনি হুবহু পাঠ করতেন। চন্দননগরের ফটকগোড়ায় এঁদের বাড়িতে হাতে লেখা নানা পালা আছে, যেমন শ্রীদামচরিত, তুলসীপূজা, সাবিত্রী আখ্যান ইত্যাদি।

ক্ষান্তিলতা দেবী পালা হুবহু পাঠ করতেন বলে পালাটিতে ব্যাখ্যা, শ্লোক ও গান বিস্তৃতভাবে রয়েছে। পুথিটির কাহিনী শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা, উৎস ভাগবতের দশম স্কন্ধ। কিন্তু কুমুদবন্ধু মনে করেন যে কথকতার মাত্রা সুরে বাঁধা। ফলে বার বার গদ্য থেকে সুরেলা পদ্যে যাওয়া ও ফিরে আসা বিন্যাসে দেখা যায়।

কথকতার পুথিতেও ছাপ পড়ে সময়ের, পরিস্থিতির। মেয়ে কথকী, অনেক সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল। কথকতার জবানীতেই সেই সমালোচনার জবাব দেওয়া হয়েছে। আবার নাড়ুগোপালের খেলার প্রসঙ্গে চলে এসেছে সমাজে মেয়েদের কর্তব্য, দেশের অর্থনীতির হাল ও টকি সুন্দরীর প্রভাবের কথা। তাতে তালও কাটে না, রসাভাবও হয় না; বরং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আসর জমে ওঠে। আবার সময়ের অভাব বুঝলে বা শ্রোতাদের রুচি মাফিক অংশটি যে বাদও যেতে পারে, তারও নির্দেশ দেওয়া থাকে।

পুথির আকারে কাগজ কাটা হয়েছে। সাধারণ লাইনটানা দিস্তে কাগজ। পুথিটির মোট পৃষ্ঠা ৩৩। প্রাসঙ্গিক অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হল।

অপার করুণাসিন্ধু মহামহিমাময় শ্রীভগবানের বাল্যলীলা বড়ই মধুময়। শ্রীধাম বৃন্দাবনে গোকুলে বাৎসল্য রসনির্যাস আস্বাদনলুব্ধ শ্রী বালগোপালের শৈশবলীলা কেলীমাধুর্য, পরমহংস চূড়ামণি শ্রীল শুকদেব গোস্বামী চরণ বর্ণন করছেন। শুনহে উত্তরনন্দন অবহিতচিত্তে। তোমার কুলের ঠাকুরের বালোচিত রিঙ্গনলীলা যশোদানন্দন শৈশবলীলায় কৃতনাবৎ শকটভঞ্জন তৃণাবর্ত প্রভৃতি অসুরগণকে নিহত করে শৈশবলীলামাধুর্যে মনোনিবেশ করেছেন। ইত্যবসরে দুটি ভায়ের নামকরণ অনুপ্রাশন কার্য্য সম্পন্ন হয়েছে। এইবার শ্রী শুকদেব গোস্বামী মহারাজের বলবার ভঙ্গিমা শ্রবণ করুন।

কালেন ব্রজতাল্পেন গোকুলে রামকেশবৌ।
জানুভ্যাং সহ পাণিভ্যাং রিঙ্গমানৌ বিজহ্রতুঃ ॥ ২১ ॥

শ্রীবলদেব ও শ্রীকেশব দুই ভাই ব্রজরাজনন্দন গৃহমধ্যে রিঙ্গনলীলা আরম্ভ করেছেন।

রিঙ্গনলীলা অর্থে—বুকে ভর দিয়ে কনুইয়ে ভর দিয়ে বা হামাগড়ী দিয়ে অগ্রসর হওয়া। বালকৃষ্ণের সে অদ্ভুত বালকেলির অপূর্ব দৃশ্য।

বিশ্বনিয়ন্তা শ্রীভগবান শ্রীধামবৃন্দাবন। বালকেলি করিতেছেন আনন্দিতমনে। তাঁর ভগবসা লুকিয়েছেন ব্রজের ধূলির মাঝে। মায়ের কোলে স্নেহস্নাত গোপবালক সেজে। বিশ্বনিয়ন্তা খেলেন নন্দের গৃহে আর অঙ্গনে। এমন গোপশিশু হলেন, কেহ নাহি জানে। বোঝে না কেউ তারে কিন্তু (কেউ) পায় না পরিচয়। যশোদা-নন্দনে এ কী, গুপ্ত অভিনয়॥

সাধারণ বালকানুকরণে তিনি আজ গোপশিশু, মাতৃস্নেহ রসনির্যাসলুব্ধ বালকবৃন্দ বিশ্বজীবকে আনন্দাতিশয্যে পরিপ্লুত করণোপযোগী শৈশব কেলিমাধুরীময় গোপাল। অসীম স্নেহবাৎসল্যবতী মা যশোমতী প্রাণভরা আনন্দের প্রতীক ও বাৎসল্য পুলকনির্মিত কুতুক।

বেদ বলেছেন—আনন্দং ব্রহ্মেতি ব্যজনাৎ। আনন্দই ব্রহ্মের বা ভগবানের উপাদান। ওগো তিনি যে আনন্দের মূর্তি, আনন্দ উপাদানে তিনি যে গঠিত॥ (কীর্তন)

১। (ওগো) সে আনন্দঘন, মুরতিমোহন ; কত ছন্দে গড়া অঙ্গ। (সে) আনন্দ সুন্দর, শিশু নটবর চিত্তহর সে যে ত্রিভঙ্গ॥

...

(কৃষ্ণ) স্নেহানন্দ সাগর উছলি দিয়েছেন, ভাসাইতে ব্রজভূমি।
কত আনন্দ তরঙ্গ, করিতেছে রঙ্গ গোকুলেতে দিবাযামী॥
(ব্রজের খেলা কেউ বোঝে না) এ রসনির্যাসের আরাধনা।
স্নেহসিন্ধু তুফান নানা ব্রহ্মাণ্ডে তার নাই তুলনা।
জীবে জানলে করার আনাগোনা। ভক্তের যে তাই উপাসনা॥...

যা হোক বিশ্বনিয়ন্তা ভগবান আজ শিশু সেজে বাল্যমাধুরী ছড়িয়ে রিঙ্গনলীলায় মত্ত। তিনি বুকে ভর দিয়ে চরণযুগল আকর্ষণ বা দুখানি চরণ টেনে নিয়ে হামাগুড়ী দিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন। উঠে দাঁড়িয়ে পদবিক্ষেপ করতে গিয়ে তিনি পড়ে যাচ্ছেন। এ লীলা তার আশ্চর্যই বটে। এ লীলা আশ্চর্য হতে আশ্চর্যময়ী হলেও—'লোকবত্তু লীলা কৈবল্যম্'। লোকচক্ষে ধূলো দিয়ে ব্যক্তলীলার ভিতরে গুপ্তভঙ্গিমা রেখে লুপ্ত হয়ে আছেন।

[এর পরের অংশে গীতা ইত্যাদি থেকে শ্লোক উদ্ধৃত করে লীলা অভিনয়ের ব্যাখ্যা করা হয়েছে।]

...

আমার মা-ভগ্নীগণ ও সুধীসাধক সমাজ। এই ভাগবত হচ্ছেন সাধনশাস্ত্র। এতে ভক্তিরসসিন্ধুর উত্তালতরঙ্গ নিয়তই উচ্ছ্বলিত হচ্ছে। সে তরঙ্গহিল্লোলে সাধকসমাজ ও ভক্তমণ্ডলী আনন্দে বিভোর হয়ে ভেসে ভেসে চলেছেন। এই ভক্তিরসের আধার না হলে ভাগবতশাস্ত্রের অধিকার হয় না। তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেছেন—

এক ভাগবত হয় ভাগবতশাস্ত্র। আর ভাগবত হয় ভক্তিরসপাত্র॥ ভাগবত না হলে বা ভক্তিরসে অধিকার না হলে ভাগবত আস্বাদন করা যায় না। 'ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং'। আপনারা সকলে স্থূল কথায় জেনে রাখুন ভাগবতখানাই জ্ঞানের শাস্ত্র। তার মধ্যে বিশেষতঃ ব্রজলীলা। এতে তত্ত্ব যতটা আস্বাদন করুন না করুন, লীলারস আস্বাদন করে পরিতৃপ্ত হন।...

কটুলাকণ্ঠ বজ্র কেহরিনখ, রাজত রুচির হিয়ো। মা যশোদা কৃষ্ণকে নজর লাগবার ভয়ে ব্যাঘ্রনখ তার কণ্ঠে ঝুলিয়ে দিয়েছেন। সেই সঙ্গে স্বর্ণপদকাদি সুন্দর বক্ষস্থলে শোভা পাচ্ছে। তাই বলেছেন ধন্য সুর এ কোপাল য়া সুখ, কা শত কল্প জিয়ো। সুরদাস বলেছেন, আমার শতকল্প বেঁচে থাকবার আবশ্যক নাই। বাৎসল্যময়ী মা যশোমতী স্নেহদত্ত মাখনদধি ভোজনতৃপ্ত সহস্যবদন বালগোপালের এই সৌন্দর্য একপল-মাত্র দর্শন করে হৃদয়ে যে অনন্ত সম্পদ লাভ হয় তাতেই আমি ধন্য।...

যাহোক্ এইবার লীলা আস্বাদন করা যাক্। পরমহংস-শিরোমণি শুকদেবজী বলছেন, মহারাজ শ্রবণ করুন...শ্রীকৃষ্ণের চরণনূপুর ও কটির কিঙ্কিণী অতীব মধুর ঝংকারে বাজছে, দুজনে প্রতিযোগিতা করতঃ নিজ নিজ ঝংকার মাধুর্যে কলহে রত অর্থাৎ কিঙ্কিণী আর নূপুর কলহ বা ঝগড়া আরম্ভ করেছে। কিঙ্কিণী নূপুরকে বলছে—

মঞ্জীর! সিঞ্জসি কিং গুঞ্জন রবৈর্জিতং জিতন্তুর্নিশং; স্থিতঃসন্ পাদয়োরিতি শ্যাম-সুন্দরস্য কিন্তে গৌরবম্। নীচত্বমাপ্তবতস্তে ভণিত মন্যায্যং বিদ্ধি তে পরং; স্তব্ধং কুরুষ্ব বাক্যং তে ঝণৎকার মুবাচেতি কিঙ্কিণী॥ বালকৃষ্ণের কটির কিঙ্কিণী বলছে এ মঞ্জির বা হে নূপুর তুমি গুঞ্জনরবে সিঞ্চন করতঃ যারা মাতৃজাতিকে ঘৃণা করেন, তারা নারীজাতি মাতৃমুখোচ্চারিত না শিখে এবং তারা মাতৃভাষা পরিত্যাগ করে তাদের পিতৃভাষায় কথা বলা উচিত। নয়তো তাদের পাণ্ডিত্য গৌরবে একটি নিজভাষা তৈরী করে সেই ভাষায় কথা বলুন। ঘৃণিতা নারী মায়ের ভাষায় কথা বললে তার পুরুষত্বে হানি হওয়াই সম্ভব।

তারপর আরো একটি কথা বলি—ছোট ছেলে অর্ধোস্ফুট অক্ষরে কথা বলে যখন বা-বা-বা-বা বলে যাকে তাকে বাবা বলে ডাকে।...তখন মা-ই 'তাকে কোলে ধরে' শিখিয়ে দেন; অমুক তোর বাবা, তোর বাবা অন্য কেউ নয়। সুতরাং বাবাকে চিনিয়ে দেওয়া প্রথম গুরুই মা...একথাও তারা যে দয়া করে ভুলে না যান। মাতৃরূপালক্ষী যাদের ঘরে তাদের আবার অভাব কিসের তাদের মাঠভরা শস্য থাকবে, ঘরভরা ঐশ্বর্য থাকবে, ভাণ্ডার ভরা ধনরত্ন থাকবে, এবং পেটভরা অন্ন থাকবে। কিন্তু আমাদের মা-ভগ্নীগণ! আপনাদের কাছে একটু বলি—এখন আমরা বুঝছি আমরা মাতৃত্বের ভান করে ঘরে থাকি; কিন্তু আমাদের ঘরে নাই ঐশ্বর্য, ভাণ্ডারে নাই ধনরত্ন, পেটে নাই অন্ন, মাঠে নাই শস্য, সবগুলোরই অভাব।

...

'যেদেশের ঘরে ঘরে লক্ষীপূজো হয়, যাদের প্রতিঘরে মাতৃরূপিণী লক্ষী নিত্যই বিরাজিতা তাদের অভাব মিটাবার জন্য, যারা লক্ষীকে চেনে না, লক্ষী কাকে বলে জানে না, সেইদেশ থেকে চাল ধার করে' এনে আমাদের ভারতসন্তানসন্ততি গণের পেটের অন্নসংস্থান করতে হয়, এ দুঃখের কথা বলবো কার কাছে ? ...

আর আমাদের ভারতের সেই আদর্শ নারীর অবনতি, কতদূর নিম্নস্তরে নেবেছে তা আমরা ধারণায়ও আনতে পারিনা। আজ আমাদের ভারতনারীর বিশেষতঃ বঙ্গনারীর বিলাসিতার উত্তালতরঙ্গে শুধু ভারত কেন, বিশ্বখানা প্রায় ডুবুডুবু। আমাদের সখীত্ব টকিসুন্দরীর সঙ্গে, চলনে বলনে বস্ত্রে গহনায়। সেদিকেই আমরা দৃষ্টি রেখে কোন অজানা অন্ধকারময় অধঃপতনের দিকে ছুটে চলেছি, তার ঠিক নাই। কোথায় এর অবসান হবে ; তা আমাদের জানা নাই। আমরা সন্তান পালন করতে শিখি নাই, সন্তানকে শিক্ষা দিতে শিখি নাই। কেবল সবাইকে বলে বেড়াই—আজকাল ছেলেরা বড় অবাধ্য, একদম কথা শোনে না। এর ষোল আনা দোষ যে মায়ের, গৃহলক্ষীদের। বিলাসিনী হয়ে তারা একথা স্বীকার করতে চান না। যতক্ষণ সন্তানের কল্যাণসাধন করবো, সন্তানের মঙ্গলের জন্য ব্রতাঅনুষ্ঠান করবো ; যতক্ষণ বসে পুত্রকে সুশিক্ষা দেবো, সে সময়টা আমরা বৃথা মনে করি, ততক্ষণ শ্রীযুক্তা সিনেমাদেবীর চরণসেবা করে আসি, জীবন সার্থক হবে। কিন্তু আপনারা মাতৃজাতি জেনে রাখবেন—সন্তানের সুশিক্ষার ভার সন্তানের কল্যাণের ভার সন্তান পালনের ভার একমাত্র নারীদের।...

[এই অংশটি বাদ বলে পুথিতে লেখা আছে]

দুই-তিন বৎসরের ছেলে উঠোনে অন্যান্য ছোট ছেলেদের সঙ্গে বেলা দশটার সময় অঙ্গনে ধুলোখেলা করছে। তার সর্ব্বগায়ে 'ধুলোমাটি মাখা'। তার স্নেহময়ী মা ছেলের কল্যাণে পঞ্চাশটাকা দামের একখানা গরদের শাড়ী পরিধানকরতঃ ঠাকুরঘরে ষষ্ঠীপূজার 'ব্রতিনী'। ছেলের পিতা একখানি চার-পাঁচ টাকা দামের কাপড় পরে কোথায় বাইরে বেরুচ্ছেন। যেইমাত্র প্রাঙ্গণে এসেছেন, অমনি 'ছেলেটি বাবা আমি যাবো, বাবা আমি যাবো' বলে দৌড়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরতে গেছে। বাবা তো কাপড়খানা ধুলো লেগে ময়লা হবার ভয়ে এক হাত দিয়ে ছেলেকে দূরে সরিয়ে রেখে, পাশ কাটিয়ে দ্রুতপদে চলে গেলেন। ছেলেটি তো বাবা বাবা বলে কেঁদে ধুলোয় গড়াগড়ি দিতে লাগলো। বাবার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই ; তিনি গন্তব্য স্থানে চলে গেলেন।

এদিকে ঠাকুরঘর থেকে মা সেই ছেলের কান্না শুনতে পেয়ে পূজা ফেলে ছুটে এসে দেখেন ছেলে ধুলোয় গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদছে। স্নেহময়ী মা তখন আর কোন 'বিচার না করে' টপ্ করে' ছেলেটিকে ধুলোর ভেতর থেকে বুকে তুলে নিয়ে, তার সেই মূল্যবান গরদের বস্ত্রের অঞ্চল দিয়ে, ছেলের অঙ্গের সমস্ত ধুলোমাটি মুছে পরিষ্কার করে' ; শিশুর অশ্রুজল মুছিয়ে দিয়ে স্তনটি তার মুখে দিয়ে তাকে পরিতৃপ্ত করতঃ তার সকল ব্যথাপনোদন করলেন। সুধীসমাজ ও আমার মা-ভগ্নীগণ

এইখানে পিতৃ-মাতৃস্নেহের তুলনা করুন। এবং বিচার করে বুঝুন। বাবা পাঁচটাকা দামের কাপড়ের মায়ায় পুত্রস্নেহ উপেক্ষা করলেন। আর মা পঞ্চাশটাকা দামের কাপড়কে উপেক্ষা করে স্নেহকাতরা হয়ে পুত্রকে বুকে ধরে স্তনপান করালেন।

[নারীর অধিকার বলে পুঁথির মার্জিনে লেখা হয়েছে]

……আরেক সম্প্রদায় আছেন, তাঁরা নারীজাতিকে ঘৃণাদৃষ্টিতে দেখেন ও নাসিকাকুঞ্চন করেন। তাঁরা ভুলে যান যে তাঁরা নারীর গর্ভেই জন্মেছেন, নারীর স্তন পেয়ে পুষ্ট হয়েছেন……নারীর বেদে অধিকার নেই বলে তারা সর্বদা লাঠি হাতে করে বেড়ান পেলে এক ঘা মারবেন। আচ্ছা সুধীসমাজ! আপনারা দৃক্‌পাত করুন।

যে বেদ বেদ বলে তাঁরা চিৎকার করেন, সেই বেদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হচ্ছেন গায়ত্রী। যে মন্ত্র ব্রাহ্মণগণ জপ করেন, সেটি হলো সাবিত্রীমন্ত্র, এরা সকলেই স্ত্রীলোক। তারপর দেবসমাজ সম্মিলিত হয়ে বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা নির্ণয়ের জন্য বহু চেষ্টা করে দেবসমাজে কোন যজ্ঞ পুরুষ না পেয়ে শেষকালে একটা মূর্খ নারী সরস্বতীকেই বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা নির্ণয় করে দিলেন। যার উপরে একমুহূর্ত না দাঁড়ালে আমরা বাঁচিনা, তিনিও স্ত্রীলোক, পৃথিবীদেবী। কী বলবো, এক সম্প্রদায় বলেন স্ত্রীলোকের মুখের কথা উপদেশশাস্ত্র শুনতে নাই। কিন্তু তাঁরা জানেন না যে—তাঁরা সর্বদাই স্ত্রীলোকের মুখ থেকে যা শুনেছেন, তাই বলছেন। যে যা ভাষা বলে সেটি তার মাতৃভাষা। হিন্দুস্তানের মাতৃভাষা হিন্দী, ইংরাজের মাতৃভাষা ইংরাজী, পার্সিয়ানের মাতৃভাষা পার্সী। বাঙালীর মাতৃভাষা বাংলা। জগতে প্রত্যেকেই তাঁরা মায়ের কাছ থেকেই ভাষা শেখেন।

দিবানিশি জিতং শব্দ করছ কেন আমি যে তোমার চেয়ে ঊর্ধ্বে শ্যামসুন্দরের কটিতটে অবস্থান করি।

……নূপুর বলে ওহে কিঙ্কিণী তুমি কী শ্যামসুন্দরের সব কিনে নিয়েছ? তখন কিঙ্কিণী বলে নহি নহি—

আমি নিয়েছে কৃষ্ণের কটি কিনি
তালে তালে বাজে ঝিঞ্জিনী
আর কী নূপুর তোমায় গনি,
কটি বেঁধে আমি আনন্দিনী……

আমার সঙ্গে তোমার তুলনাই হয় না তবু ছোট মুখে বড় কথা কেবল বজিতং ২ বলো কেন?…

আরে কিঙ্কিণী তুমি বলেছো। কৃষ্ণের ধূলোমাখা পায়ে থাকো বলে তুমি অতি হীন মূর্খ আরে মূর্খতমা কিঙ্কিণী—। শ্রীকৃষ্ণের চরণরজমাহাত্ম্য তুমি জান না। যে রজকণা প্রাপ্তির জন্য যোগীন্দ্র-মুনীন্দ্রগণ যুগযুগান্ত ধ্যানমগ্ন, যে রজঃকণা পাবার জন্য দেবেন্দ্র বাসব নন্দনজাত পারিজাত প্রসূনে শ্রীকৃষ্ণচরণযুগল অর্চনা করে করজোড়ে দণ্ডায়মান সেই চরণরজঃ গায়ে মেখে আমি ধন্য হয়ে কী করি জানো?……

১. যে চরণরজঃ, যোগীন্দ্র দুর্লভ জীবেরে মুক্তিদানে।
যে চরণখানি গয়াসুর আনি শিরে ধরি ধন্যমানে ॥
২. (বলি) যে চরণ পেয়ে, সর্বস্ব দানিয়ে মস্তকে ধরিল তায়।
যে পদ পরশি অহল্য পাষাণ, পাইল মানবীকায় ॥
৩. যে পদ পরশি, কাষ্ঠতরীখানা, সোনার তরণী হলো।
যে পদচিন্তন করি সাধুগণ, মুকতিরতন পেলো ॥...

বলি (সেই চরণে আমি থাকি) বিশ্ব যে পদে প্রণতি করে......তুমি কটিতে থাকিয়া দাও গো ফাঁকি। (আমি) বেজে প্রভুর নটন দেখি।
(আমি তো জয় করেছি) বিশ্বারাধ্য কৃষ্ণচরণ ছন্দিত নন্দিত আমি দেবারাধ্য রাঙ্গাচরণ মরণ বারণ অরুণ বরণ সে চরণ জয়। জিতং জিতং তাইতো বলি কেন বলিবো না বলো রিনিঝিনি বেজে তালে তালে বল হরি বোল হরি বলে।

ভক্তগণ বলছেন, ও ঠাকুর, কী করেছো আমরা এত অগুরু চুয়াচন্দন প্রস্তুত করে তোমায় কত ডাকাডাকি করি, কত অর্চনা করি, দেবেন্দ্র-মুণীন্দ্রগণ কত সুগন্ধি দ্রব্য সাজিয়ে শত উপাচারে অর্চনা করবে বলে কতভাবে তোমাকে আহ্বান করছেন, কই সেদিকে তুমি একবার ফিরেও তাকাও না। সে সমস্ত শত উপচারে আহ্বানে অর্চনার পূজামণ্ডপে রত্নসিংহাসনোপরি তোমাকে খুঁজে না পেয়ে, খুঁজতে ২ বৃন্দাবনে নন্দের অঙ্গনে এসে দেখি তুমি হর্ষাপ্লুত চিত্তে গায়ে কাদা মাখছো ? আরে ছ্যা ছ্যা ॥ লোকে দেখলে কী বলবে তুমি যে ভগবান এমনি করে গোয়ালার ঘরে এসে, তাদের উঠনের কাদা মেখে ২ হাসছ ? মুছে ফেলো মুছে ফেলো। লোকে দেখলে হাসবে যে আর করতালি দিয়ে বলবে এই যা কাদামাখা গোপশিশু, কাদামাখা গোপশিশু, কেউ তোমাকে ভগবান বলবে না।

ওসব ছেড়ে গায়ের কাদা মুছে ফেলে চলে এসো ঠাকুর আমরা তোমাকে রত্নসিংহাসনে বসিয়ে তোমার অঙ্গে সুগন্ধি চন্দনাগুরু প্রভৃতি দিয়ে কত শত উপচারে কত উপহারে তোমার অর্চনা করবো। তুমি যে ঠাকুর ভগবান তা ভুলে গেলে ?

(তখন কৃষ্ণ) আশাবরী

১. ব্রজে আমি নই ভগবান, তোমরা যেন ভুল করো না।
দিক্ না সবাই করতালি তাতে আমার মান যাবে না ॥
২. (তোমরা) দাঁড়ায়ে ব্রজের বাহিরে, (মোরে) ভগবান ভগবান করে ;
বাধা দিলে খেলায় মোরে (আমার) ব্রজের খেলার ভাব জান না ॥
৩. অন্যের দেওয়া চুয়াচন্দন তাতে তুষ্ট নয় আমার মন ;
গোপীর রাগাত্মিকা ভজন, বিধিমার্গে যায় না জানা ॥ ☐

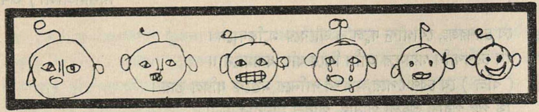

কথকতার গান

পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বর্ষীয়ান কথক কুমুদবন্ধু আমাদের বার বার বলছিলেন যে কথকতা করতে গেলে গলায় সবরকম গান খেলাতে হবে, বাউল, কীর্তন, ভাটিয়ালি, ভজন, থেকে শুরু করে টপ্পা পর্যন্ত। শুধু খেয়ালটা বাদ। গান ছাড়া কথকতা কল্পনা করা যায় না।

তাই অনেক কথকই নামজাদা গীতিকার। শ্রীধর কথক তো প্রসিদ্ধ নাম। তাঁর লেখা গানের খাতা খুঁজে বের করে বঙ্গবাসী প্রেস বই ছাপিয়েছিল। শ্রীধর কথক, ১৬৯টি সঙ্গীতে পূর্ণ, জীবনবৃত্তান্ত সম্বলিত; বঙ্গবাসী প্রেস, ১৩০৭। বঙ্গের সরি মিঞা বলে তাঁকে অভিহিত করা হয়েছিল। অন্যান্য কথকরাও গান লিখতেন। সেইসবের কয়েকটা নমুনা আমরা এই অংশে পেশ করছি।

গোবরডাঙ্গার রামধন তর্কবাগীশ উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের লোক। দীনবন্ধু মিত্রের সুরধুনী (১৮৭৯) কাব্যে তাঁর পদাবলীর সশ্রদ্ধ উল্লেখ আছে। তাঁর পদরচনার খ্যাতি ছিল, বৈষ্ণব মহাজনের পদানুসরণ করে তিনি ছন্দ-তালময় পদ রচনা করতেন। সেই পদগুলো এখানে সংকলিত হল।

কথকতা যাঁদের পেশা, তাঁদের কাছে গানের চাহিদা আছে। চালু জনপ্রিয় গানের সুরে কথা বাঁধা, কথকদের অভ্যাস ছিল। গান বেঁধে ও গানগুলিকে চটি পুস্তিকায় ছাপিয়ে বিক্রি করাই ছিল রীতি। এইরকম বই খুঁজলে পাওয়া যায়। ১২৯২ সনে ছাপা তারকব্রহ্ম কথক চূড়ামণির 'হরিকীর্ত্তন' এই গোত্রের বই। ১১ পৃষ্ঠার বই, মোট ১৪টা গান আছে। নির্দেশনামায় আছে, বাউলের সুর, দ্বিতীয় পালার গউরচন্দ্র, বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের সুর (গোবিন্দ অধিকারী রচিত বিখ্যাত গান), বাঁকা নদীর গতিক বুঝা ভার সুর, তাইতো বলি হরি বলরে মন সুর। চালু গীত, জনপ্রিয় সুর, সেইভাবে গান বাঁধলে দু পয়সা রোজগার হবে, অন্যান্য কথকরাও কিনবেন, কাজে লাগাবেন। উনিশ শতকে বাজার ও প্রেসের খেলার ছোঁয়াচ থেকে কথকতাও মুক্ত ছিল না। সুনীতি দেবীও 'কথকতার গান', মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেস, ১৯২১, বলে বই ছাপিয়েছিলেন। জনপ্রিয় গানের সঙ্গে তাঁর স্বরচিত গান ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। 'হরিকীর্ত্তনের' সংকলনের দুটি গান আমরা উদাহরণ হিসাবে হাজির করেছি।

কথক মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ভবঘুরে, গান সংগ্রহ করা তাঁর নেশা। বাউল, ছড়া, হিন্দী ভজন, সমসাময়িক হেন লোক নেই, যার লেখা গান তাঁর খাতায় টোকা নেই। গানের বৈচিত্র্যও অনেক। বৈচিত্র্য বোঝাবার জন্য তাঁর প্রাগুক্ত খাতা থেকে নানা ভাবের, নানা রকমের কয়েকটা গান এখানে সংকলিত হয়েছে। ভাব ও পরিস্থিতি অনুযায়ী কথকতায় গানগুলি ব্যবহৃত হত।

প্রয়াত ফেলারাম বন্দ্যোপাধ্যায় কথক দ্বিজরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা, বাঁকুড়ার

সোনামুখীর বাসিন্দা ছিলেন। ১৩০৮ সালে তাঁর জন্ম, দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর ধরে তিনি রামায়ণী কথকতা করেছেন। তাঁর মৃত্যু সময় ১৩ই মে ১৯৯০, রবিবার। ফেলারামের ভক্তিগীতি রচনায় আধুনিক ভাষা ও সুর বিন্যাসের ছাপ স্পষ্ট, রুচির পরিবর্তন সেখানে স্বীকৃত। গানে সময়ের ছাপ কী করে পড়ে, রামায়ণাচার্য ফেলারাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত গীতাবলী তার বড় উদাহরণ। ভাষা বা সুরের বিন্যাসে তার সাক্ষ্য পাওয়া যাবে।
তাঁর দুটি গানের স্বরলিপিও সংযোজিত হল। দ্বিজরাজবাবুর গাওয়া গানের ভিত্তিতে স্বরলিপি তৈরি করে দিয়েছেন শ্রী ধ্রুব গুপ্ত।

ক. কথক রামধন রচিত পদ

(১) রাগিণী-তোড়ী ভৈরবী।

জনরঞ্জন হে। পামর-জন-পাবন ত্রিভুবনবন্দন
চরণরেণুকণ হে। ব্রজ-নরপতি-নন্দন যদু-
নন্দন রঘুনন্দন জয় জগদানন্দন হে ॥

(২) রাগিণী-কানেড়া।

ভবপ্লব মাধব রাম হরে। কেশব কৃষ্ণ
মুকুন্দ মুরারে। উদ্ধর মামতিদীনং হীনং
পতিতং হতসংসারে ॥

(৩) রাগিণী-মালকোষ।

হে হরে মুরারে। শ্রীযদুনন্দন মাধব মধু-
সূদন। হে দীন-জন-প্রতিপালক পশুপালক
বালক গোপীজনধন ॥

(৪) রাগিণী-বিভাস।

হে মানসমভিপুরয় পুরুষোত্তম জয় জগদীশ
হরে। জয় জয় মীনরূপধর জয় বরাহবর
কচ্ছপ জয় নৃহরে।

(৫) রাগিণী-মুলতান।

হে বিভো! বিতরকরুণামনুদিনম্ ভবদব-
দহনদাহমনুবারয়, তারয় মামতিদীনম্। ভব-
পয়োনিধৌ পতিতং গতিহীনম্ ॥

(৬) রাগিণী-মুলতান।

কুরু দীনে ময়ি করুণালেশম্। বিধি ভব-
ভাবিত চরণ-সরোরুহ হর মম ক্লেশমশেষম্ ॥

হে নন্দতনুজ মে যাচিতমেবং বারয় শমনপুর-
প্রতিযানং সভয়-রামধন-বহুজন-সঞ্চিত-
কলিকৃত-দুরিতবিশেষম্ ॥

(৭) রাগিণী-সিন্ধু।

পামর মানস চিন্তয়সে কিম্। কুরু কেশবপদ-
ভজন সমাধিম্। তেন বিমোচয় মূঢ় মমাধিম্ ॥

(৮) রাগিণী-ভৈরবী।

হরে দামোদর হর মম ভবজলধৌ জননং মরণম্।
জলরুহদলচঞ্চলমিব সলিলং জীবনধনযৌবনমতিচপলম্ ॥

(৯) রাগিণী-ভৈরবী।

কেশব কৃপানিধান। করুণমবলোকয় কুরু
করুণাং ময়ি দীনহীনজনে। তব পদ-ভজন-
যজন-যাজন-পূজন-বন্দন-মনন-বিহীনে ॥

(১০) রাগিণী-ঝিঁঝিট।

ব্রজরাজ-কিশোর-সনাতন-রূপম্। ভাবয়
মানস মে সদা। তং প্রতি সম্প্রীতি কিং
কথয়ামি জীবনং সফলং মে ভাবি তদা ॥

(১১) রাগিণী-খাম্বাজ।

পীত-বসন বনচারী। সুললিতনটবর রাস-
বিহারী। রমণীমথকৃত মুরলী-কূজিত গোপিত-
গোপীসূত প্রেম-বিতারী ॥

(১২) রাগিণী-ঝিঁঝিট।

করুণানিধান কমলাপতে। কুরু করুণাং ময়ি
দীনগতে। কুবলয়-করিবর, কেশি-নিধনকর
কুপিত-কালিয়-কংসারাতে ॥

(১৩) বেহাগ

ময়ি দীনজনে কুরু করুণাবলেশম্। অপার-
ভব-ঘোরে মামুদ্ধর নিজদাসম্। যাচে নহীহ
মুরলীমোহন ধন-জন-যৌবন-মানম্। দর্শয় মামতি
দীনমনুক্ষণমনুপমনটবর-বেশম্ ॥

(১৪) পূরবী।

যদুনন্দন তারয় দীনগতে। রঘুনন্দন তারয়
দাশরথে। জয় জয় ভীষ্মকতনয়বর মামনু-
কম্পয় জয় জয় সীতা-প্রাণপতে ॥

(১৫) মন্দার।

মনো মে কিং কুরুষে। রাধাবল্লভ-চরণ-
সেবনমৃতে। ভ্রমষি ভৃশং বৃথা বিষয়সন্ধানে
ভবিতা গরলং তদপি শেষে।

(১৬) মুলতান।

চিন্তয় চিন্তামণি-গোকুলচন্দ্রম্। নতুবা বিফলং
যাতি জননম্। মোহনমুরলী-মুখরিত-বিজনম-
লকালঙ্কৃতভালম্। মৌক্তিক-পঙ্‌ক্তি-বিনি-
ন্দিত-দশনং কুণ্ডলমণ্ডিতগণ্ডম্। যদি ভবপারং
যামি বিপারং ধনগর্দিতং কুরু সারম্। গোপী-
নন্দন-চরণ রেণু ত্বং তত্র সমর্পয় সর্ব্বম্।

সূত্র : বিপিন বিহারী চক্রবর্তী প্রণীত, খাঁটুরার ইতিহাস ও কুশদ্বীপ কাহিনী, কলিকাতা, ১৩০৮। পৃ. ২৯-২১২।
পুনর্মুদ্রিত, অমলেন্দু দে বিরচিত, মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১৯৬৫, পরিশিষ্ট 'ক'।

খ. হরিকীর্ত্তন

৬ নং গান। দ্বিতীয় পালার গউর চন্দ্র সুর।

নমঃ নমঃ হে ও দীন দয়াল প্রবীণ,
শচীনন্দন গউর হরি। এস হৃদ পদ্মাসনে,
নিতাই সনে নিজগুণে দয়া করি। নাই তোমার
দয়ার অন্ত, হে অনন্ত, দাও হে দীনে চরণ ধরি।

৯ নং গান। বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের সুর।

হরি বলরে ভাই দিন বহে যায়। ভবে আর
বেলা নেই, আর বেলা নাই দিন বহে যায়।

...হরির নামটি ত্রিপুরারি পঞ্চবদন ভরি,
গায়ে ভস্ম মেখে নয়ন মুদে বলেন হরি
হরি, হায়রে নামের বালাই। জগাই মাধাই
উদ্ধার হল বলে হরি হরি, এস আচণ্ডালে
লয়ে কোলে বলি হরি হরি...

সূত্র : তারকব্রহ্ম কথক চূড়ামণি রচিত হরিকীর্ত্তন, (আখ্যাপত্র নেই), ১২৯২ সন।

গ. কথক মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় শাস্ত্রী সংগৃহীত ও রচিত গান

হিন্দীগীত

মনোয়া ভজ নে সীতারাম।
ভজনে সীতারাম, মনোয়া কাহে না জপতে নাম ;
দিন গয়া জী হরিগুণ গাওয়ে গুরু দিয়া যো নাম।
রাম-গড়কে বৈঠে রামজী, সরকী মুজরা লিজে
লিজো য়ো য়্যাচা নকার করেগা উনকো ত্যায়ছা
দিজো লারকা বানা নানন পানন, তিনকো দুধ
পিনাওয়ে। মরণকানে শরণ নেকে, বাবাকরু বোনা
ওয়ে। একনর ভুনে, দু'নর ভুনে ভুনে জগতসংসার।
জবন্ শুনকে যো নর ভুনে উন্‌কো নাহিপার'।

বাউনে—খেমটা।

আচ্ছা এক রঙ্গভূমি এসংসার।
ইহাতে দেখ্‌ছি যত চমৎকার।
আজ রাজা জমিদার, কান ভিক্ষাপাত্রসার,
এখন আনন্দ উৎসব রস, পরে হাহাকার।
সবার এই কান্না এই হাসি, নোকের তবু এত অহঙ্কার।
এইযে সব দৃশ্য মনোহর, থাকবে না দণ্ড দুইপর,
যত গীতবাদ্য রং তামাসা, সুখের আড়ম্বর।
যখন সময় হবে, সব ফুরাবে, তখন, দেখবে কেবন অন্ধকার।
পথিক কয় শোনরে আমার মন পেয়েছিস ভানো
আয়োজন, এখন সাবধানে খেন, খেনা করেয়ে যতন।
নৈনে পটক্ষেপণ হইনে পরে, পাবে অনুযোগ আর
তিরস্কার॥

ছড়া।

মা বেটী কাট্‌না কাটে, পেটের দায়েতে।
মুটেগিরি করে বাপ্, শিয়ান্ দহেতে

ছেনে কিন্তু বড় বাবু, বড় নাম ধরে…।
হাকিমের পদ্ পেয়ে, হুকুম্ জারি করে॥

ধন্য কলি বলিহারি, মহিমা তোমার।
এমন শাসন বল, হবে আর্ কার্ ॥

স্তোত্র।

জয় জয় যদুপতি, জগতোজীবন।
জয় জয় কংসঘাতী, কেশীনিপাতন ॥
জয় জয় বংশীধারী, বিপদোতারণ।
জয় জয় দুঃখহারী, দারিদ্র্য মোচন ॥

জয় জয় ব্রজরাজ, বিঘ্ন বিনাশন।
জয় জয় নবসাজ, নরক বারণ…॥

জয় জয় যজ্ঞেশ্বর, জলদ বরণ…।
জয় জয় কালবারী, কালীয় দমন ॥

জয় জয় হৃষীকেশ, হৃদয় রতন…।
দেহিপাদপদ্ম দীনে, পতিতোপাবন ॥

রাবণের যোগীবেশ।

গীত।

'সদা বববম্ বববম্ বববম্ বাজিতেছে গাল।
দেখ যোগীর বেশে রাবণ এসে সীতের কাছে,
—কচ্ছে হুল ॥ বাঘছাল কোটী শোভন, সর্ব্বাঙ্গে
বিভূতি লেপন ; মস্তকেতে জটাভার করেছে ধারণ'
বলে ভিক্ষাং দেহি সুন্দরি আমি উপবাসী
কত কাল ॥ ০ ॥

দক্ষযজ্ঞ।

সতী ভগ্নীগণ প্রতি।

গীত।

তাই ভাবিগো মনে, নিমন্ত্রণ বিনে 'কেমন করে যজ্ঞে
যাই বল না। তোমরা সবে যাবে' সমাদ্দর পাবে' আমি
গেলে পিতা কথা কবে না। একে আমি অতি ভিষণ
বীর ঘরণী' বিধাতা করেছেন জনম দুঃখিনী 'শিবের
অপমানে হলাম অপমানী' শিব নিন্দা আমার
প্রাণে সবেনা।

সূত্র : মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের খাতা।

ঘ. শ্রীফেলারাম বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত কথকতার গীত।

১. রামায়ণ দেহতত্ত্ব।

ঘরের ভিতর চুপটি করে, দেখ্ দেখি মন রামায়ণ।
চলছে খেলা সমান ভাবে, নাইরে বিরাম অনুক্ষণ ॥
আত্মারাম ঐ সহস্রারে, কাঁদছে বসে সীতার তরে।
কুলকুণ্ডলিনী সীতায় হরে, দশেন্দ্রিয় দশানন ॥
কাম ক্রোধাদি সৈন্য পেয়ে, রাখে মাকে লুকাইয়ে।
অধোমুখে মলিন হ'য়ে মায়ের ঝরিছে নয়ন ॥
মায়া সাগর শতেক যোজন, ছ'টা চক্র স্থাবর জঙ্গম।
দুরন্তরে মাতা পড়ে, কেমনে হ'বে মিলন ॥
মুমুক্ষুত্ব সুগ্রীব সনে, মিত্রতা কর যতনে।
মন রূপী হনুমানে, রাম মন্ত্র করাও শ্রবণ ॥
যমাদি সব কপি সাথে, সেতু বাঁধো সুদূর পথে।
জুটবে আসি আপনা হতে, ধর্ম্মরূপী বিভীষণ ॥
যুক্তি করি তারি সনে, জ্ঞান ধনুকে ভক্তিবানে।
বধ দুষ্ট দশাননে, চিন্তা কেন অকারণ ॥
কাঙাল দ্বিজ "ফেলু" ভাবে, মায়ের উদ্ধার তবেই হ'বে।
ঘরে বসে দেখতে পাবি, সেই অপরূপ যুগল মিলন ॥

২. বাউল।

তোর দিন গেল মন ব'য়ে।
বাজে কাজে বৃথা মজে, বাজে কথা ক'য়ে ॥
রং বেরং-এর পোশাক এ'টে মজে অভিনয়ে।
ভাঙলে নাটক কাঁদতে হবে, সবই খুলে দিয়ে ॥
শশক হয়ে আছো বসে চোখ দুটি বুজিয়ে।
তোর মাথার উপর রাখছে হিসাব, একজনা বসিয়ে ॥
বুক ফুলিয়ে যাচ্ছ চলে, বিষয় নেশা খেয়ে।
শেষে অনুতাপে প্রাণটা যাবে, নেশার ঘোর কাটিয়ে ॥
কেবা ভাল কেবা মন্দ, দেখলি নারে চেয়ে।
ভালোয় ভালো বাসতে নার, যত মন্দ জনায় পেয়ে ॥
দেখে শুনে রইলে "ফেলু" হতবুদ্ধি হয়ে।
ছুটরে ত্বরা ধরগে কেঁদে, গুরুর চরণ গিয়ে ॥

৩. ভজন

তুমি এসোহে তুমি এসোহে, মম তৃষিত তাপিত হৃদয়ে।

আমি দীনহীন কাঙালের মত একেলা আছি গো পড়িয়ে ॥
ভোগ সুখ আশা যা কিছু জগতে, রেখোনা গো কিছু আমার
বলিতে।
শুধু এ জীবন তোমারি আশাতে, অকাতরে দিনু বিলায়ে ॥
এসো শীতল সলিল মরুর মাঝারে, শারদ চাঁদিমা নিশীথ আঁধারে।
এসো শান্ত জীবনে মলয় মারুত, মন্দে মন্দে বহিয়ে ॥
এসো এসো তুমি এসো, মম নিভৃত হৃদয় কন্দর মাঝে এসো
এসোতুমি এসো ॥
এসো মুনিগণ চির বাঞ্ছিত ধন, যোগীজন চিত নন্দন।
এসো লাঞ্ছিত কর কাম কঠিন, সাধক হৃদি রঞ্জন ॥
ভব রোগ শোক নাশক এসো অজ্ঞান জ্ঞান দায়ক।
এসো নায়ক এসো তারক, এসো জগ মঙ্গল কারক ॥
আমি হৃদি মাঝে রূপ নেহারী ॥
একবার এসো এসোহে নীল গিরি, হৃদি মাঝারে রূপ নেহারী ॥

৪. সীতাউক্তি

পরাণ থাকিতে পরাণ বঁধুয়া, আর কি পাইব তোমা দেখিতে।
হৃদয় দেবতা অন্তর ব্যথা, আর কি যাইবে মম দূরেতে ॥
দিবস যামিনী নয়নের বারি, যতনে কোমল করে মুছাতে।
নিকটে আসিবে কহিবে গো কথা সোহাগে হৃদয়ে ধরিতে ॥
দরশ পরশ লালসে রেখেছি, এখনও পরান দেহেতে।
আদর যতন মধুর বচন, কেমনে পারিগো ভুলিতে ॥
তোমার আদরে আদরিনী সীতা, কাতরে লুটিছে ধূলিতে।
এসোহে প্রাণেশ মুছাইতে ক্লেশ, পারি না রহিতে সহিতে ॥

৫. বাউল

(রামপ্রসাদী সুর)

মন রে ভালো ব্যবসা পেলি।
চৌদ্দ সিকে মূলধন পেয়ে ফেঁপে ফুলে মস্ত হ'লি ॥
গ্রাহক দেখে নায়ক সেজে, ফের বাজিতে মজে গেলি।
কর্ম্মচারী ছ'জন রেখে, ন'টা দুয়ার খুলে দিলি ॥
কার কি নেব, কার কি পাব, খতেন খাতায় ঠিক নামালি।
তোর সাধের দোকান লুট হ'য়ে যায়, সেদিকে ঠিক না রাখিলি ॥
মহাজনের ভাঙলি টাকা, পরিশোধের কি করিলি।
এবার পরোয়ানা দাখিল হ'বে পড়বি বাঁধা আজ কি কালি ॥
এসব হিসাব নিকাশ না বুঝিয়ে, "ফেলু"রে তুই গোল্লায় গেলি।
কেবল হা অর্থ যো অর্থ করে ; দেশ বিদেশে ঘুরে মলি ॥

৬. মহাবীর স্তব

মহাবীর জয় মহাবীর, জয় মহাবীর জয় ।
প্রভাবে তোমার অভাব ভাবনা, সব নিবারণ হয় ।।
অনল অনিলে সাগরে সলিলে, পর্ব্বতে নাহি ভয় ।
সীতারাম বলে রাম কৃপাবলে, লভিলে সব বিজয় ।।
হুঙ্কারে তব রিপু নিশাচর, সমূলে বিনাশ পায় ।
নিশ্বাসে ঘোর মোহ লঙ্কাপুর, নিমেষে পুড়ে ছাই হয় ।।
মুখে রঘুবীর ভিতর বাহির, করিয়াছ রামময় ।
বক্ষ চিরিয়া সীতারাম রূপ, দিলে দেখায়ে সবায় ।।
"ফেলু"র মিনতি হে বীর মারুতি, নমি সদা তব পায় ।
করহ আশীষ রঘুপতি পদে, মতি যেন সদা রয় ।।

৭. ভজন

মম অস্থির চিত কর সুস্থির, ওগো তুমি চির শান্ত ।
বিপথ বিপাকে আর কতদিন, রাখিবে করিয়া ভ্রান্ত ।।
মম, নিভৃত হিয়ার নীরব বেদন, উদাস প্রাণের আকুল রোদন ।
তুমি যদি নাহি দেখ প্রিয়তম, কে করিবে বল অন্ত ।।
ব্যথিতের ব্যথা তুমি না বুঝিলে, চির পতিতেরে তুমি না তুলিলে ।
নিরাশার আশা তুমি আছ বলে, চারিদিকে ঘন ধ্বান্ত ।।
চির অপরাধী তাই কি জীবনে, বঞ্চিত হ'ব তব কৃপা গুণে ।
চাহিবে না কিগো নয়নের কোনে, "ফেলু" পথ হারা পান্থ ।।

৮. ভজন

বিমল আনন্দে সুললিত ছন্দে, জগদানন্দে ডাকোনা রে ।
ডাকিলে যতনে যোগারাদ্ধধনে, কোন যাতনা প্রাণে র'বে না রে ।।
দূরে পরিহর কুহকিনী আশা, ত্যজরে নিদাঘ বিষয় পিয়াসা ।
সুধাভ্রমে বিষপানে, হারায়ো না, জ্ঞান চেতনা রে ।
ঘুম ঘোর কেটে যাবে, স্বপন ফুরাইবে, আপাতমধুর সুখ র'বে না রে ।।
প্রেমানুরাগ ভাব মৃন্ময়ে, ভকতি সলিল যতনে সিঞ্চিয়ে ।
জীবন চক্রে ঘুরায়ে ফিরায়ে, পীরিতি ঘটিকা গড়না রে ।
তোমার এ ঘটে সকলি আছে, কেনরে ভাবনা মিছে,
জ্ঞানের দেউটি জেবলে দেখোনা রে ।।

৯. রূপ বর্ণনা

সে কার মত।
বলিবারে যাই ভাষা নাহি পাই, বলি বলি বলা হয় না তো ॥
নিরখী বিপুল জ্যোতির বিকাশ চন্দ্র সূরয হ'লো কি প্রকাশ।
ভাবিয়া দেখিলে মিথ্যা এই ভাষ, হয় না তো কভু সঙ্গত ॥
চন্দ্র সূরয বাহিরের স্তরে, বাহিরের তম নাশিবারে পারে।
সে যে বহিরন্তর আলোকিত করে, জ্যোতির আধার অদ্ভুত ॥
যদি বলি তবে মকরধ্বজ, সে কথা বলিতে পাই বড় লাজ।
মদন অরূপ সে যে রসকূপ, স্বরূপে ব্রহ্মাণ্ড আলো করে ॥

স্বরলিপি

"বিমল আনন্দে সুললিত ছন্দে"

	মা	মা	মা	মা |					
II	{সা	সা	সা	সা |	সা	মা	মা	-া	I
	বি	ম	ল	আ	ন	ন্	দে	০	
I	মা	পা	পা	পা |	পা	পা	পা	-া	I
	সু	ল	লি	ত	ছ	ন্	দে	০	
I	সা	(স)দা	দা	-া |	দা	দা	দা	পা	I
	জ	গ	দা	০	ন	ন্	দে	০	
I	পা	(প)দা	পা	-া |	(দ)পা	া	া	মা}	II
	ডা	কো	না	০	রে	০	০	০	
II	পা	র্সা	র্সা	ণা |	র্সা	-া	র্সা	ণা	I
	ডা	কি	লে	য	ত	০	নে	০	
I	পা	ণা	ণা	ণা |	ধা	(ধ)ণা	ণা	দা	I
	যো	গা	রা	ন্ধ	ধ	নে	০	০	
I	দা	দা	দা	দা |	দা	া	পা	দা	I
	কো	নো	যা	ত	না	০	প্রা	ণে	
I	মা	পা	(প)দা	া |	পা	-া	-া	-া	II
	র	বে	না	০	রে	০	০	০	
II	সা	মা	মা	মা |	মা	-া	মা	গা	I
	দূ	রে	প	রি	হ	০	র	০	
I	মা	পা	পা	পা |	পা	-া	পা	া	I
	কু	হ	কি	নী	আ	০	শা	০	
I	সা	দা	দা	দা |	দা	া	পা	মা	I
	ত্য	জ	রে	নি	দা	০	ঘ	০	
I	পা	ণা	ণ	ণ |	দা	া	পা	মা	I
	বি	ষ	য়	পি	য়া	০	সা	০	

I	প	ণর্সা	র্সা	র্সা |	ণা	ণা	দা	র্সণদা	I
	সদ্	ধা	ভ্র	মে	বি	ষ	পা	নে	
I	দা	দা	.দা	দা |	পা	দা	পা	মা	I
	হা	রা	য়ো	না	ম	o	o	ন্	
I	পা	ণদা	ণদা……	-া |	পা	-া	-া	-া	I
	চে	ত	না	o	রে	o	o	o	
I	সা	পা	পা	পা |	পা	পা	দা	পমা	
	ঘদ্	ম	ঘো	র	কে	টে	যা	বে	
I	মা	মা	মা	মা |	মা	া	মা	মা	I
	স্ব	প	ন	ফদ্	রা	o	ই	বে	
I	জ্ঞা	জ্ঞা	জ্ঞা	জ্ঞা |	ঋা	জ্ঞা	পা	মা	
	আ	পা	ত	ম	ধদ্	র	সদ্	খ	
I	জ্ঞা	জ্ঞা	ঋা	-া |	সা	-া	-া	-া	II
	র	বে	না	o	রে	o	o	o	
II	জ্ঞা	া	মা	া |	ণা	দা	দা	ণ	I
	প্রে	o	মা	o	নদ্	o	রা	গ	
I	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা |	র্সা	-া	র্সা	-া	I
	ভা	ব	ম্	ন্	ম	o	য়ে	o	
I	র্সা	র্ঋা	র্ঋা	র্ঋা |	র্ঋা	া	র্সা	-া	I
	ভ	ক	তি	স	লি	o	ল	o	
I	ণ	র্সা	র্দা	ণ |	র্সা	-া	র্সা	া-	I
	য	ত	নে	সি	ঞ্চি	o	য়ে	o	
I	পা	র্সা	র্সা	র্সা |	-া	র্সা	-া	ণা	I
	জী	ব	ন	চ	o	ক্রে	o	o	
I	ণা	র্ঋণা	ণা	ণা |	ধা	র্সণা	ণা	দা	I
	ঘদ্	রা	য়ে	ফি	রা	o	য়ে	o	

I	দা	দা	দা	পা । দা	দা	পা	দা	I
	পী	রি	তি	ঘ টি	কা	০	০	
I	মা	পা	॰দা	া । পা	-া	-া	-া	II
	গ	ড়	না	০ রে	০	০	০	

এর পর "এ ঘটে……দেখোনারে"-র সুর "প্রেমানুরাগ……ঘটিকা গড়না রে"-র অনুরূপ, কেবল 'এ ঘটে'র আগে পঞ্চমে 'তোমার' কথাটি যুক্ত হয়েছে গানের সময়।
"দীনহীন 'ফেলু……ডাকোনারে"-সুর "ঘুম ঘোর কেটে……রবে না রে"-র অনুরূপ দুই স্তবক তাল ছেড়ে গাওয়া হয়েছে, তাল কাহারবা। সুরে ভৈরবী রাগিণীর উপস্থিতি লক্ষ করবার মত। স্থানে স্থানে দ্বিজেন্দ্র গীতি, অতুলপ্রসাদী গানের এবং মুকুন্দ দাসের সুরের সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে। এ গানের সুর রাগাশ্রয়ী পুরাতন বাংলা গানের সুরের আত্মীয়, লোকসংগীতের সুর নয়।

"মহাবীর স্তব"

ধা	II	ধা	-া	ণা	-া । -া	-া	-া	ণা	I
ম		হা	০	বী	০ ০	০	০	র	
	I	ধা	ধা	-া	ণা । ধা	পা	ধপা	ধা	I
		জ	য়	০	ম হা	০	বী	র	
	I	মা	মা	-া	মা । ধা	-া	ণা	ণা	II
		জ	য়	০	ম হা	০	বী	র	
	II {	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা । র্সা	-া	ধা	ধা	I
		প্র	ভা	বে	তো ০	০	মা	র	
	I	—	র্সা	র্সা	র্সা । র্রা	র্সা	র্সা	ধা }	I
			অ	ভা	ব ভা	০	ব	না	
	I	—	ধা	ধা	ণা । ণা	পা	পা	ধা	I
			স	ব	নি বা	০	র	ণ	
	I	মা	মা	-া	মা । ধা	০	ণা	ণা	II
		হ	য়	০	ম হা	০	বী	র্	

<table>
<tr><td>II {</td><td>গা</td><td>গা</td><td>গা</td><td>গা</td><td>|</td><td>গা</td><td>গা</td><td>রা</td><td>-া</td><td>I</td></tr>
<tr><td></td><td>অ</td><td>ন</td><td>ল</td><td>অ</td><td></td><td>নি</td><td>০</td><td>লে</td><td>০</td><td></td></tr>
<tr><td>I</td><td>মা</td><td>মা</td><td>মা</td><td>গা</td><td>|</td><td>পা</td><td>মা</td><td>মা</td><td>া</td><td>I</td></tr>
<tr><td></td><td>সা</td><td>গ</td><td>র</td><td>স</td><td></td><td>লি</td><td>লে</td><td>০</td><td>০</td><td></td></tr>
<tr><td>I</td><td>ধা</td><td>ধা</td><td>ধা</td><td>ধা</td><td>|</td><td>পা</td><td>া</td><td>ধা</td><td>ণা</td><td>I</td></tr>
<tr><td></td><td>প</td><td>র</td><td>ব</td><td>তে</td><td></td><td>০</td><td>০</td><td>না</td><td>হি</td><td></td></tr>
<tr><td>I</td><td>র্সা</td><td>র্সা</td><td>-া</td><td>-া</td><td>|</td><td>-া</td><td>-া</td><td>-া</td><td>-া }</td><td>I</td></tr>
<tr><td></td><td>ভ</td><td>য়</td><td>০</td><td>০</td><td></td><td>০</td><td>০</td><td>০</td><td>০</td><td></td></tr>
</table>

"সীতারাম বলে……সব বিজয়" এর সুর "প্রভাবে তোমার……নিবারণ হয়" এর অনুরূপ।
"হুঙ্কারে তব……পুড়ে ছাই হয়" এর সুর"অনল অনিলে"……সব বিজয়ের অনুরূপ।

এর পর থেকে প্রতি দুই চরণ একই সুরের পুনরাবৃত্তি।

কেবল "মুখে রঘুবীর" এর আগে 'তোমার' কথাটি গান্ধারে উচ্চারিত হয়েছে, এবং 'ভিতর বাহির' কথাতে মধ্যম-ধৈবত মিলিয়ে একটা ছোট অলংকরণ করা হয়েছে। ভণিতায় 'ফেলু'-র আগে 'দীন' উচ্চারিত হয়েছে।

স্বরলিপি আট মাত্রায় কাহারবা করে লেখা হয়েছে কিন্তু মাঝখানে গাইবার ঝোঁক থেকে মনে হয়েছে একে রূপকড়া (৩।২।৩, অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের 'কেন সারাদিন ধীরে ধীরে'-র মত) তালে বাঁধা যায়। □

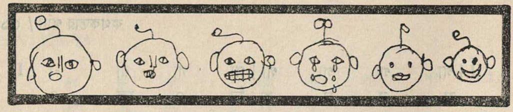

কথকদের কথা

কথকতার সমজদার অশেষজ্ঞ পণ্ডিত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি একবার লিখেছিলেন, 'গল্পের গুণ যদি চারি আনা, কথকের গুণ বার আনা।' কথকতার পুথি বা গান কথকের কণ্ঠেই জীবন্ত হয়ে ওঠে। শিল্পীরা কীভাবে তাদের সৃষ্টিকে বিচার করেন, কুন্তক যাকে বার বার বলেছেন, 'কবিব্যাপারঃ', সেটার ইঙ্গিত পাবার জন্য কথকদের জবানীর একটা সংকলন করা হয়েছে।

সোনামুখীর প্রয়াত কথক মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী মহাশয়কে সবাই রামঠাকুর বলে চিনতেন। শ্রীমতী বন্দনা সেনের বাল্য স্মৃতিতে রামঠাকুর উজ্জ্বল হয়ে আছেন। হাজরা রোডে গঙ্গাচরণ দাশগুপ্তের বাড়িতে সিঁড়ির ধাপিতে বাচ্ছারা ঝাঁক বেঁধে মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তীর পাঠ শুনত, হনুমানের অঙ্গভঙ্গিতে তারা মজা পেত, শুনে অবাক হয়ে যেত রামের ডাকে অকালবোধনে দেবীর পূজার পুরোহিত রাবণ নিজে হয়েছেন। ব্যাখ্যার অভিনবত্ব ও অভিনয়কুশলতা ছিল মৃত্যুঞ্জয়বাবুর আসরের আকর্ষণ, বাঁকুড়ার সোনামুখী নিবাসী লছমন প্রসাদ নিজেও কথক। পিতৃব্যের জীবন ও কথকী রীতি নিয়ে তাঁর লেখাটা কথকতার একটি ধারা প্রসঙ্গে আমাদের অবহিত করতে পারবে। বাঁকুড়ার সোনামুখীর মনোহর তলায় থাকেন কথক শ্রী দ্বিজরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়। পিতৃদেব ফেলারাম বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে ও তাঁর দাদা রসময় বন্দ্যোপাধ্যায়-কে কথকতায় দীক্ষা দিয়েছিলেন। দ্বিজবাবুর জন্ম ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩২ সালে তাঁদের, ঘরাণা আলাদা, রীতিও আলাদা। দ্বিজবাবু নিজে সেই কথা স্পষ্ট করে লিখেছেন। কলকাতার চালতাবাগান হরিসভায় দ্বিজবাবু বৎসরে পৌষ ও মাঘ মাসে একমাস ধরে কথকতা করেন, আমাদের জানত বর্তমানে কলকাতায় তাঁর এই আসরই নিয়মিত বসে, ঘড়ি ধরে শুরু হয়, একদিনও বাদ পড়ে না। দ্বিজবাবু ভালো করে জানেন যে তিনি একটি ধারার শেষ প্রতিনিধি। তাঁর পরই কথকতার এই পরম্পরায় 'পূর্ণচ্ছেদ' হবে।

চন্দননগরের ফটক গোড়ায় থাকেন শ্রীমতি ক্ষান্তিলতা দেবী ও তাঁর স্বামী ৯৪ বৎসরের বর্ষীয়ান কথক কুমুদবন্ধু ভট্টাচার্য পুরাণতীর্থ। ৭৫ বৎসরের বেশি বয়সে ক্ষান্তিলতা দেবী এখন আর আসরে যান না। জনসভায় প্রথম পেশাদার মহিলা কথকী হিসাবে আমরা বোধহয় ক্ষান্তিদেবীর কথা বলতে পারি। ২৮শে জুলাই, ১৯৯৩তে গৃহীত একটি সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে ক্ষান্তিদেবীর অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছি। পড়তেন ক্ষান্তিদেবী, কিন্তু পালা লিখতেন স্বামী কুমুদবন্ধু। অধুনা দৃষ্টিহীন ভগ্নস্বাস্থ্য কুমুদবাবুও আমাদের সঙ্গে কথা বলেছেন ; সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে পালা লেখার চাতুর্য সব কিছু তিনি নিজের অননুকরণীয় ভঙ্গিতে বলেছেন। সেই সবের আভাসও সাক্ষাৎকারে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

কোন্নগরের মাস্টারপাড়ার বাসিন্দা শ্রীমতী বাসন্তী চৌধুরীর জীবন ও অভিজ্ঞতা স্বতন্ত্র। ১৯২০ সালে সোদপুরে তাঁর জন্ম, পিতা পশু চিকিৎসক নন্দলাল দত্ত, মাতা বীণাপাণি দেবী। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রীর বিবাহ হয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপকের সঙ্গে, নিজেও হাওড়া গার্লস কলেজের অধ্যাপিকা ও সহ অধ্যক্ষা ছিলেন। রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়েও অধ্যাপনা করেন। গবেষণা করেছেন, বই লিখেছেন, সংকলকও বটে। 'অষ্টাদশ শতকে বাঙলার বৈষ্ণব সমাজ, সংগীত ও সাহিত্য', ১৯৬৮, 'ভাগবতের আলোকে বেদবাণী', 'দ্বাদশ ভাষণ' ইত্যাদি তাঁর গ্রন্থ। কথকের কোনরকম পরম্পরা থেকে তিনি আসেননি। অথচ কীভাবে ঘটনাচক্রে তিনি পাঠ ও কথকতার প্রথম সারির শিল্পী হয়ে উঠলেন এবং আন্তর্জাতিক স্তরেও তাঁর যাতায়াত শুরু হল, সেই অভিজ্ঞতার বিবৃতি তিনি নিজে লিখেছেন। ৭০ বৎসরের বেশি বয়স, এক চক্ষুতে দৃষ্টি নেই তবুও ডাক পড়লে আসরে যান বাসন্তী দেবী।

দেশজ ও আঞ্চলিক ধারায় জন্ম হলেও বর্তমান সময়ে কথকতার বিস্তার ও প্রচার কোনো ব্যক্তি বিশেষে, নির্দিষ্ট ঘরাণায় বা একান্ত ভৌগোলিক সীমায় আবদ্ধ থাকেনি। কথক বা কথকী নানা জাতের, নানা গোত্রের। তাই তাঁদের শিল্পবোধে ও অভিজ্ঞতায় ধরা পড়ে সপ্ত পদার্থের দুটি পদার্থই, সামান্য ও বিশেষ।

দ্বিজরাজের কথা

"ক থ ক তা"—কোনো বিষয়বস্তু সহজ সরল করে বোঝানোর পদ্ধতি। পূর্বে কথকতার যে স্টাইল ছিল, এখন সে রেওয়াজ নেই। দাশরথি রায়, শ্রীধর কথক, গদাধর শিরোমণি প্রমুখ সাধারণত গ্রাম্য পরিবেশে করতেন, কিন্তু বর্তমানকালে বিদ্বৎমণ্ডলীর কাছে, এ যুগের সঙ্গে সমতা বজায় রেখে কথকতা পরিবেশিত হয়। আমরা যেভাবে রামায়ণ কথকতা পরিবেশন করি, চিরাচরিত প্রথার থেকে তা একটু আলাদা। আমার স্বর্গীয় পিতা ফেলারাম বন্দ্যোপাধ্যায় আমার শিক্ষাগুরু। তাঁর কাছেই আমার কথকতা শিক্ষা। ছেলেবেলায় আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীরসময় বন্দ্যোপাধ্যায়ও আমাকে পদ্য ছন্দে কথা বলা অভ্যাস করাতেন। যেমন একটা পয়ারের প্রথম চরণ দাদা বললেন;—যাহা কর ভেবে কর করে ভাবিও না। আমি বললাম,—ভাবিয়া করিলে কাজ বিফল হবে না। এইভাবে আমরা পদ্য ছন্দে কথা বলা অভ্যাস করতাম। এখন আমরা রামায়ণ কথকতা পরিবেশন করার সময় কোনো কবির বাঁধা পয়ার সাধারণত বলি না। কিছু ত্রিপদী, পয়ার যা মহানাটকের শ্লোক মুখস্থ করতে হয়েছে অবশ্য। তা ছাড়া বাবার রচিত গান কথকতায় সংযোগ করি। আগেকার দিনে কথকতা পরিবেশিত হতো গ্রাম্য পরিবেশে ২০/৫০ জন শ্রোতার সামনে। কিন্তু ইদানিংকালে শহরে উচ্চশিক্ষিত মহলে ৪/৫ হাজার শ্রোতার সামনে পরিবেশিত হয়। আমাদের সোনামুখীর মনোহর তলায় ৺শ্যামসুন্দর জীউর মন্দিরে ছেলেবেলায় বাবা পুঁথি পাঠ করতেন। একদিনের ঘটনা মনে পড়ে। সেদিনের উপাখ্যান "সীতাহরণ" বাবা পুঁথি পাঠ করছেন, দাদা তন্ময় হয়ে শুনছেন। প্রতিটি শ্রোতার চোখে জল। যখন বাবা বর্ণনা করছেন, রাবণ বলছে, 'শোন সীতা, ভালো কথায় রাজি যখন হলে না, এবার আমি বল প্রয়োগ করতে বাধ্য হচ্ছি' এই বলে যোগীমূর্তিধারী রাবণ যেমন সীতাদেবীর কেশাকর্ষণ করেছে, দাদা তখন তাঁর কাছে একটি মন্দিরা ছিল, সেটি বাবার দিকে তাক করে ছুঁড়েছিলেন, সামলে না নিলে বাবার মাথা ফেটে যেত। এমন মোহ কথকতার দ্বারা সৃষ্টি করেছিলেন, দাদা মনে করেছিলেন, বাবাই রাবণ।

আর একবারের কথা মনে আছে, বাবার রামায়ণের দল ছিল। তাতে দাদা, আমি সহযোগিতা করতাম।

হৃদয়পুরে এক পণ্ডিত মশাইয়ের বাড়িতে গান হচ্ছে।
বিষয় "হরিশ্চন্দ্র", এমন পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, 'রোহিতাশ্বের মৃতদেহ বুকে নিয়ে শৈব্যা চলেছে শ্মশানে' ঘনঘটাচ্ছন্ন মেঘ আকাশে, মাঝে-মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। শৈব্যা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলছে :
'বাপরে আমার !! বাছারে আমার !!' এই দুটি কথা বলেই বাবা এমন ভাবে বিভোর হয়ে পড়লেন,—যে, আর কোনো কথাই বলতে পারলেন না। কথা বলতে গেলেই কান্না আসছে, গান বন্ধ হয়ে গেল। শ্রোতারাও এমন শোকবিহ্বল, যে তাঁরাও আর শুনতে পারলেন না। আমরা যে ভাবে কথকতা করি প্রাচীন ধারাবাহিকতা থেকে তা সম্পূর্ণ পৃথক। মূল বাল্মীকিকে বজায় রেখে কৃত্তিবাস, রঘুনন্দন গোস্বামী, তুলসীদাস প্রমুখ থেকে গ্রহণীয় ভাবগুলি নিয়ে, মহাজনী গান, তুলসীদাসী ভজন, বাবার স্বরচিত গান, শ্লোক সংযোগ করে বিশেষ ভঙ্গিতে পরিবেশন করি। অভিনয়াংশ কিছু থাকে। তবে স্বরসংবৃত্তি (যা কেহ-কেহ আজকাল করছেন, এতে মৌলিকত্ব ক্ষুণ্ণ হয়, যেন বাবাকে পিসেমশাই বলা) করি না। আমার কথকতা-জীবনের দীর্ঘ ৪০ বছরে এটুকু বুঝেছি, সমাজ শিক্ষা, গার্হস্থ্য শিক্ষা, লোকশিক্ষার অন্যতম প্রধান মাধ্যম এই "কথকতা"।
প্রাচীন ধারা থেকে পরিমার্জিত পরিবর্ধিত হতে-হতে কথকতা আজ যে পর্যায়ে এসেছে ; তা থেকে এটুকু বলা যায়, মানব জীবনে, সমাজ জীবনে "কথকতা" একটি অপরিহার্য অঙ্গ। □

কুমুদবন্ধু ভট্টাচার্য মহাশয়ের কথা

নড়াইল জমিদার রতন রায়ের নাম শুনেছেন? ওদের সভাপণ্ডিত ছিলেন অক্ষয়কুমার স্মৃতিতীর্থ। তাঁর বাড়ির কাছে আমার বাড়ি, তাঁর কাছে আমি সংস্কৃত শিখেছি। আমার বাবা রামায়ণ গাইতেন, নাম শ্রীসাধনচন্দ্র ভট্টাচার্য। বড় গাইয়ে ছিলেন। আমার বংশপরম্পরায় সংগীত। সংগীত বংশপরম্পরায় হলে ভালো হয়। আমাতে সে সংগীত পর্যবসিত হল, আমার থেকে আমার ছেলেতে, আমার ছেলে থেকে আমার নাতনীতে। এই শেষ, আর গান হবে না।

কথকতা কথকের মুখ থেকে শিখেছিলাম। আমার ৯৫ বৎসর বয়স। আর সুর ওঠে না। তা নাহলে কথকতা করে শোনাতাম, জিনিসটা কি সুন্দর। কথক হবার উপায় নেই অন্য কোনো লোকের। কথক হতে গেলে সংস্কৃত জ্ঞান থাকা চাই ভালো, বাংলায় জ্ঞান থাকা চাই ভালো, বাংলায় বক্তৃতা ও ভাষায় অধিকার থাকা চাই ভালো, নানারকম সংগীতে অধিকার থাকা চাই, কখনো বাউল, কখনো ভাটিয়ালি, কখনো ভৈরবী, কখনো মালকোষ—

এমনিতে কথক হবার উপায় নেই, কথকতায় কর্তাদিকে যে জ্ঞান থাকা চাই, আপনার সঙ্গে কথা কইছি, হঠাৎ সুর দিয়ে মাধুর্য ফুটিয়ে তুললাম। কথকতার ভিতর সব আছে। ভাষায় দখল না থাকলে কথক হবে না। অভিনয়, গলার স্বর সব আছে। পালা সাজাতাম যেমন রুক্মিণী হরণ। রুক্মিণীর জন্মবৃত্তান্ত, তাঁর পিতার নাম, কোথায় বাড়ি, তারপর ক্রমশ ক্রমশ রুক্মিণীর চরিত্রটা, রুক্মিণী হরণ কী করে হল, কৃষ্ণ কী করে তাঁকে হরণ করে নিয়ে এলেন, এই সব জিনিস ধীরে ধীরে পরিষ্কার করে—আপনারা দশ হাজার এখানে বসে আছেন, একমনে শুনবেন আপনারা আমার কথকতা। ওসব আমার মন থেকে, নিজে তৈরি করা। যেমন কথকতা চলছে :

গান—"এমন সাধের মানব জনম
পেয়েছে রে মন ভগবানের কৃপায়"

[টানা স্বরে]—তদনন্তর দেখা গেল দেবর্ষি নারদ আগমন করিতেছেন। এবম্ভূত সময়ে শোনা গেল দেবর্ষি নারদ বীণা বাজিয়ে তাঁর বীণার তন্ত্রীতে গুণগুণ সংগীত আলাপন করিতে করিতে ব্রহ্মলোক হইতে দ্বারকা নগরে উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ চরণে প্রণাম পূর্বক বলিলেন, 'প্রভো আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব।' [টানা স্বর শেষ] এই যে কথকতার ঢঙ, এ নাহলে হবে না…[টানা স্বর আবার শুরু] ভগবান বলেছেন নারদ

কথং তে সমাগমঃ ? কথৈব ? সব কুশল আছে ত ? এখন তুমি কোথা থেকে এসছ ? ব্রহ্মলোকাৎ আগতম্ । আমি ব্রহ্মলোক থেকে আসছি। আপনার শ্রীচরণ দর্শন করবার জন্য আমি এখানে এসেছি। সুরে গান

"একবার কৃপা কর মোর হৃদয়ে
ধন্য হব তোমার কৃপা দানে"

[টানা স্বর শেষ]

[মাঝে] ক্ষান্তিদেবী বলেন—'যা কিছু ওঁর মন থেকেই। শাস্ত্র থেকে নিয়েছেন, হয়ত ভাগবতের শ্লোক নিলেন, রুক্মিণী হরণে ভাগবতের যে শ্লোক আছে, শ্লোকগুলো নিলেন, তারপরে শ্লোকের ব্যাখ্যা মন থেকে তৈরী করে সুন্দর করে সাজিয়েছেন। তার সঙ্গে গান, গানও নিজের রচনা, সুর, ভাষা, সব নিজের।'

[কুমুদবন্ধু আবার বলছেন]

মহিলা কথক হিসাবে ওনার বিরুদ্ধে আপত্তি ছিল। একটা ঘটনা বলি। জেমো রাজবাড়িতে সভাপণ্ডিত, বেতের লাঠি হাতে চেয়ারে বসে আছেন। পাশে উঠানে অনেক লোক, অনেক পণ্ডিত আছেন, সাধারণ লোকেরাও আছে। রাণীমার একটা ব্রত প্রতিষ্ঠা ছিল, সেইজন্য অনেক ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করে আনা হয়েছিল। আমি যেতেই আমাকে জিজ্ঞেস করছেন, 'আপনার বাড়ি কোথায় ?'

—'আমার বাড়ি চন্দনগর।'

—'এখানে আপনি এসেছেন কথকতার জন্যে। আপনার স্ত্রী কথকতা করেন ?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'স্ত্রী জাতির অধিকার নেই আপনি জানেন। কথকতায়, ভাগবতে, বেদে, পুরাণে, স্ত্রী জাতির অধিকার নেই, আপনি জানেন।'

—'না জানি না, জানলে বোধহয় করাতাম না।'

—'স্ত্রীজাতির কাছ থেকে উপদেশ নিতে নেই।'

—'আপনার কথার জবাব আমি দেব। আপনি কি ভাষায় কথা বলেন ?'

—'বাংলা ভাষায়।'

—'বাংলা ভাষাটা কোন ভাষা ? আপনার মাতৃভাষা।'

—'হ্যাঁ হ্যাঁ আমার মাতৃভাষা।'

—'দেখুন মায়ের মুখ থেকে আপনি যে ভাষা শিখেছেন, সেটাই হল আপনার মাতৃভাষা। যদি স্ত্রীলোকের মুখ থেকে শুনতে নেই, শিখতে নেই, আপনার মা ত' স্ত্রীলোক ছিলেন না ?'

মশায় সমস্ত লোক আমার হয়ে গেল।

"দেখুন একটা কথা বলি। মায়ের মুখ থেকে আপনি বাবা চিনেছেন। যখন আপনি তিন-চার বছরের বালক তখন আপনি 'বা' 'বা' করে বেড়াতেন। রাস্তায় লোক যাচ্ছে, মা এসে বললেন, 'হ্যাপ বাবা কাকে বলছিস্, এই তোর বাবা', মা বাবাকে চিনিয়ে

দিয়েছেন, তবে আপনি বাবা চিনেছেন।”...ওর সব লোক আমার দিকে চলে এল।
কথকতাটা শেখাতাম কি করে জানেন? ও বসত, আমি কথকতা করে যেতাম। ও সুরটা টেক করে তুলে নিতে পারত। মিষ্টভাষিণী, ও যে কোনো সুরে গাইতে পারে। কথকতায় সব রকমের সুর চাই, ভাটিয়ালি চাই, টপ্পা চাই, কীর্তন চাই, খেয়ালটা খালি বাদ।
কখনো একসঙ্গে কথকতা করিনি। ও হচ্ছে আপনার স্ত্রী ও শিষ্যা। ও আমার মুখ থেকে কথা নিত, তাহলে আমি অপমান বোধ করতুম। ও যদি কথা বলতে বসে, আমি ওর মুখ থেকে কথা নিয়ে নিতুম, লোকেরা তখন বলবে, এর কথকতার ভুল হচ্ছে বা ত্রুটি আছে, ইনি সেই ত্রুটিটা সেরে দিচ্ছে।
আমার গুরু হচ্ছেন প্রভুপাদ রাধাবিনোদ গোস্বামী। গুরুর কৃপা না হলে কিছু হয় না। ওঁর কৃপালব্ধ যে সব জিনিস আমি পেয়েছি, আমি পরিবেশনা করেছি। □

ক্ষান্তিলতার কথা

আমার জন্ম চন্দননগরে। বাবার নাম শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মায়ের নাম শ্রীমতী প্রমীলাবালা দেবী। বিয়ে হয়েছে আমার এখানেই। শ্বশুরবাড়ি যাইনি কখনও। কারণ শ্বশুরবাড়ি খুলনায়। উনি (স্বামী) অনেক ছোটবেলাতেই এখানে চলে এসেছিলেন। বহু জায়গাতে উনি ঘুরে-ঘুরে বেড়াতেন। ঘুরতে-ঘুরতে আমাদের পাড়াতেই আছে বোসেদের বাড়ি—সেখানে কী একটা কাজে এসেছিলেন। আমার মার এসব বিষয়ে (ধর্মীয় আলোচনা, পাঠ ইত্যাদি) জানবার শুনবার খুবই আগ্রহ ছিল। আমার মা ছিলেন একটু সাধিকা। মা সাধন-ভজন এসব বিষয়ে অনেক কিছু লিখতেন। অনেক গভীর-গভীর বিষয়ে আলোচনা শুনতে যেতেন। এরজন্য উনি (মা) অনেক সাধু মহাপুরুষের সঙ্গলাভ করেছেন। এই আগ্রহ থাকার জন্য মা ওখানে (বোসেদের বাড়ি) আলোচনা শুনতে যান—সেখানে ওনাকে দেখে এবং কথা শুনে মায়ের ছেলের মতো ভাল লাগল। মা বললেন, 'বাবা, আমাদের বাড়িতে যেও' ইত্যাদি। মায়ের সঙ্গে ওনার যোগাযোগ হল, ভাল মতো আলাপ-আলোচনা হল। তারপর মা মাঝে-মাঝেই ওখানে ওনার পাঠ শুনতে যেতেন। উনি মাকে (আমার) 'মা' বলে ডাকতেন। এরপর উনি আমাদের বাড়িতে এলেন। অনেকদিনের কথা সেসব। তখন আমার বয়স বারো / তের।

ওনার সঙ্গে আমাদের বাড়ির যোগাযোগ হল। ওনার মনে অনেক দিনের ইচ্ছে কিছু একটা তৈরি করবেন। কিন্তু সেরকম কিছু না পেলে তৈরি কী করবেন?

আমি তখন সংস্কৃত পড়ছি। আমাদের চন্দননগরেই টোল — কালিদাস চতুষ্পাঠী। সেখানেই পড়ি। আমাদের পণ্ডিত মশায়ের নাম ছিল রামরতন বেদান্তরত্ন। তাঁর কাছেই সংস্কৃত পড়েছি। সপদ্যে ব্যাকরণের আদ্য-মধ্য পরীক্ষা দিয়েছি। মায়ের সঙ্গে ওনার যোগাযোগ ছিল। মা ওনাকে বললেন—'আমার মেয়ে শিক্ষিতা—সংস্কৃত পড়েছে। ওকে একটু দেখ। আমি তখন চন্দননগরে হরিশ্চন্দ্র মহাশয়ের স্কুলে থ্রিতে পড়ছি। ওনার সঙ্গে আমার যোগাযোগ হল। উনি তখন মাকে বললেন—'ওকে স্কুল ছাড়িয়ে দিন। আমি একটা অদ্ভুত জিনিস তৈরি করব। আমার মায়ের বরাবরই আগ্রহ ছিল — মেয়েরা স্বাবলম্বী হোক। তৈরি হোক, নিজেরা

উপার্জন করতে সক্ষম হোক। সেই সময় আমার বাবার চাকরিটাও চলে গেল। বাবা 'কলকাতা গুড্‌স্‌' (মালগুদাম)-এ চাকরি করতেন। হঠাৎ বাবার চাকরি চলে যাওয়াতে আর্থিক অনটনে সংসারের অবস্থা বেশ অচল হয়ে আসছিল। তখন ঠিক আয়ের জন্য না হলেও আমাকে শেখানোর বা তৈরি করানোর জন্য ওনার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। উনি বললেন, 'আমারও তো সেই ইচ্ছে।'

উনি এর আগে কথকতা করতে একলা-একলা অনেক দেশে-দেশে ঘুরেছেন। তখন ওনার বয়স অল্প ছিল। এরপর উনি আমাদের এখানেই পাকাপাকিভাবে এলেন। বিবাহ হল।

আমার থেকে দু-বছরের বড় আমার দিদি—হেমলতা দেবী তাঁর সঙ্গে ওনার প্রথমে বিবাহ হয়। দিদিও সংস্কৃত পাশ করেছে—খুব মেধাবী ছিলেন। উনি তাকেই প্রথমে শেখাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু দিদির শরীর হঠাৎ খুব খারাপ হয়ে গেল (বরাবরই ক্ষীণ ছিলেন)। তার ওপরে গলায়ও তেমন সুর আসছিল না।

আমি স্কুলে গানেতে বরাবর ফার্স্ট হতাম। স্বাস্থ্যও বেশ ভাল ছিল। গলাও সুরেলা ছিল। সেইসব কারণে উনি আমাকেই শেখাতে শুরু করেন। তখন আমার বয়স খুবই অল্প। আমার জন্মসনটা ঠিক মনে নেই। এখন আমার বয়স সাতাত্তর / আটাত্তর।

যাই হোক, উনি আমাকে শেখাতে লাগলেন আর আমাকে নিয়ে (পাঠ করানোর জন্য) এখানে-ওখানে যাওয়া শুরু করলেন। সঙ্গে আমার মা-ও যেতেন। আমাদের এক গুরুমা—যিনি আমাদের দীক্ষা দিয়েছেন তাঁকে গিয়ে উনি বললেন—'মা, আপনি দেখুন কেমন তৈরি হয়েছে। সর্বপ্রথম সেখানে নিয়ে গেলেন। সেদিন গ্রহণ ছিল। বোধহয় চন্দ্রগ্রহণ। গুরুমার বাড়িতে গিয়ে সেইদিন আমি প্রথম পাঠ করলাম। বয়স তখন আমার তের। তের / চোদ্দ বছর বয়স থেকেই আমি পাঠ আরম্ভ করি। তবে তা খুবই সামান্য। দু-এক জায়গায় অল্প-স্বল্প যেতাম। বয়স অল্প। খুব ভয় করত, আবার লজ্জাও হতো খুব। উনি অবশ্য সবসময় সঙ্গে থাকতেন। কিন্তু উনি পাঠ করতে পারতেন না তখন। ওনার বুকে একবার প্লুরিসিস হয়—সেইসময় থেকে আর পাঠ করতে পারতেন না আসরে। ওনার এজন্য তখন একটা কষ্ট ছিল—এত সুন্দর জিনিসটা হারিয়ে যাবে, নষ্ট হয়ে যাবে? আমি কাকে দিয়ে যাব। আমার মায়েরও খুব ইচ্ছে ছিল ওনার এত সুন্দর জিনিসটা যেন নষ্ট না হয়, কারও মধ্যে থেকে যাক। মা বললেন, 'আমার মেয়েকেই শেখাও।' উনি সানন্দে শেখালেন।

শিখছি আবার এখানে-ওখানে যাচ্ছি। উনি সবসময় আমার সঙ্গে থাকতেন। ওনার কাছে বসে আমাকে শিখতে হতো, পাঠ করতে হতো। সেইসময় অনেকে চিন্তা করলেন—এইভাবে দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো হয়তো ঠিক হচ্ছে না তার থেকে এদের বিবাহ হলে সবদিক থেকে ভাল হয়। সকলের এবং দিদিরও ইচ্ছেতে বা সকলের

মতামতেই আমাদের বিবাহ হয়। বিবাহের পরও বাইরে পাঠ করতে যাওয়ার সময় আমাদের দুজনের সঙ্গে মা-ও থাকতেন বেশির ভাগ সময়েই।

বহু দেশ ঘুরেছি। বলতে গেলে সারা ভারত। তবে দক্ষিণ ভারতে যাইনি। ভাগলপুর, জামালপুর, মুঙ্গের, এলাহাবাদ, প্রয়াগ, কাশী, মান্দার হিল কোথায় না গেছি! এদিকে আবার লালগোলা। লালগোলা মহারাজার বাড়ি। এক-একটা জেলায় গেছি, এক বছর করে থেকেছিও কোথাও কোথাও। যেমন মালদহ-বহরমপুরে একবছর করে ছিলাম। কুচবিহার-দিনাজপুর কোথায় না গেছি। জেলায়-জেলায় আর তার গ্রামে-শহরে বহু ঘুরেছি।

আমাকে কারা ডাকত—এর উত্তরে বলা যায়, ডাকত অনেকেই। অনেক সভা-সমিতির লোকজনেরা। ধর্মসভা, কোনো উৎসব-অনুষ্ঠান গ্রামে বা কারও বাড়িতে অনুষ্ঠিত হলেই আমার ডাক পড়ত। এসে বলতেন কেউ-কেউ 'আমাদের গ্রামে অমুক দিনে অমুক তারিখে একটা উৎসব আছে পারবেন তো যেতে ?' আবার এমন হয়েছে কোনো এক জায়গায় পাঠ করছি—অন্য আর এক জায়গার লোক সেই পাঠ শুনলেন—ভাল লাগল তাঁর। তখন উনি ওনার জায়গায় গিয়ে এইরকম একটা আসরের আয়োজন করলেন। তখন আমার বয়স পনেরো / ষোলো অথবা সতেরো।

আমার যখন সতেরো বছর বয়স তখন আমার প্রথম সন্তান (ছেলে) হয়। তার গর্ভাবস্থায়ও আমি নানা জায়গায় পাঠ করে বেড়িয়েছি। ছেলের পাঁচ-ছয় বছর পর্যন্ত ওকে সঙ্গে নিয়ে পাঠ করতে গেছি। ছেলের সাত বছর বয়সের সময় আমার বাপের বাড়ির পাশেই আমার বড় ভাজেরা থাকতেন তাঁর কাছে ওকে রাখলাম। বললাম—'ওকে তোমাদের কাছে রেখে স্কুলে ভর্তি করাও, লেখাপড়া শেখাও আমার সঙ্গে ঘুরে বেড়ালে তো পড়াশুনা কিছুই হবে না।'

কত জায়গায় গেছি। রাজা-রাজড়াদের বাড়ি যেমন গেছি আবার খুব সাধারণ লোকের বাড়িও গেছি। হরিসভা, দোল উৎসবে গেছি আবার ছেলের জন্মতিথি, অন্নপ্রাশন, গৃহপ্রবেশ, শ্রাদ্ধবাসর থেকে ডাক আসত সেখানেও গেছি। কোনো বাড়িতে সাতদিন ধরে রাসলীলার উৎসব হয়েছে, সেখানে পরপর সাত দিন ধরেই থেকেছি তাদেরই সঙ্গে—তাদেরই বাড়িতে। তারাই থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত করতেন।

তের বা চোদ্দ বছর বয়স থেকে প্রায় একটানা ষাট / পঁয়ষট্টি বছর বয়স পর্যন্ত ঘুরে-ঘুরে পাঠ করে গেছি। যখন আমি হাজারিবাগ, জামশেদপুর-টাটা গেলাম, তখন একনাগাড়ে বিরামহীনভাবে পাঠ করেছি। একদিনও বিশ্রাম করতে দেবে না লোকজনেরা। এতটাই তাদের আগ্রহ। আমার নোটবুকে কবে কোথায় পাঠ ইত্যাদি লিখে রাখতাম। আবার বিশ্রামের দিন কবে তাও লিখতাম। তাও লোকেরা পাগল করে দিত—সব জায়গাতেই যেতে হবে। আমি বলতাম—'একদিনও আমার খালি নেই', ওরা এসে অনুনয়-বিনয় করে বলতেন, 'যেতেই হবে আপনাকে' তারপর তাঁরা আমার নোটবুক নিয়ে বিশ্রামের দিনটাকে দেখিয়ে বলতেন, 'এই দিনে আমাদের

ওখানে যেতেই হবে।' এইসবগুলো সেইসময় ছিল। তবে সত্যি বলতে কি এত গান করে বেড়িয়েছি কিন্তু একদিনও গলা খারাপ হয়নি। একদিনে পাঁচ / ছয় ঘণ্টা পাঠ করেছি। গলা এত ভাল ছিল যে একদিনে দু-জায়গায় পাঠ করেছি দু-আড়াই ঘণ্টা ধরে। বিকেল পাঁচটা থেকে কথকতা করতে শুরু করলাম কোনো আসরে সাতটা-সাড়ে সাতটা পর্যন্ত করলাম। সেখানে একটু কথাবার্তা বলে বাড়ি গেলাম। জপ-তপ-সন্ধ্যা-আহ্নিক সেরে একটু চা খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম অন্য এক আসরের উদ্দেশ্যে। সেখানে সাড়ে সাতটা অথবা আটটা থেকে দশটা / সাড়ে দশটা পর্যন্ত পাঠ করলাম। এইভাবে পাঠ করেছি তখন।

এদিকে কলকাতার বোধহয় এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে না পাঠ করেছি। ওদিকে উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুর, শেওড়াফুলি, বৈদ্যবাটী, সোদপুর, আগরপাড়া, খড়দহ কোথায় না। এসব এক-একটা জায়গা এমন ছিল বছরের কোনো নির্দিষ্ট উৎসবের দিনে যেতেই হবে। সোদপুর থেকে সেদিনও এসেছিলেন ওদের এক আসরে পাঠ করার আর্জি নিয়ে। বাঁধা আসর ব্যাপারটা কথকদের থাকেই। বাঁধা আসর বলতে এ বছর এক জায়গায় গেয়ে এলাম আবার সেদিনই ঠিক হয়ে যেত আগামী বছরে ওই দিনেই গাইতে যেতে হবে ওখানে।

উনি কাউকে আলাদা শিখিয়েছেন কিনা বললে বলতে হয়—সেভাবে কেউ আসেনও নি আবার উনিও সেভাবে শেখাননি। এ ব্যাপারটায় ব্রাহ্মণদেরই একমাত্র অধিকার এমন কোনো কথা নেই। তবে কথকতা করতে গেলে অনেক বিষয়েই অভিজ্ঞ হতে হবে। অর্থাৎ সংস্কৃতের জ্ঞান থাকা চাই, সংস্কৃত উচ্চারণ ভাল হওয়া চাই, গানের জন্য সুরেলা কণ্ঠ দরকার, গানের বিষয়ে অর্থাৎ রাগের বিষয়ে জ্ঞান থাকা চাই। এতসব বিষয় থাকলেই কথকতা করতে পারা যায়। লেখা-পড়ার চর্চাটাও খুব প্রয়োজনীয়।

তবে ওনার কাছে যদি কেউ আসত তাকে তিনি আগ্রহভরেই শেখাতেন। অবশ্য একবার একটি মেয়ে এসেছিল। আমাদের এখানকার হাটখোলা গোন্দলপাড়ার মেয়ে। নাম সুধা মুখার্জি। সংস্কৃত ভাল না জানলেও বলতে পারত একটু-আধটু। গানের গলা বেশ ভাল ছিল, উচ্চারণও ভালই করত। উনি তাকে শিখিয়েছিলেন। দু-এক জায়গায় মেয়েটি পাঠও করেছিল। কিন্তু মেয়েটি হঠাৎই ক্যানসারে মারা যায়। তারপর আর কাউকেই উনি শেখাননি।

কথকতা-টা আসলে কী? কথকতায় গান জানা জরুরি, পাঠেরও বিশেষ ভঙ্গি আছে সেটা শিখতে হয় এবং সবচেয়ে যেটা প্রয়োজন যে বিষয়টা পাঠ করবে তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়া। এটা একটা রসের, একটা ভাবের ব্যাপার।

উনি প্রচুর গান লিখেছেন। আমি ওনার লেখাই পাঠ করতাম। উনি যা-যা লিখতেন, পাঠের সময় সামনে রেখে সেটাই পাঠ করতাম। উনি গানে সুর দিতেন, রাগ-রাগিণী নিয়ে আলোচনা করতেন—আর উনি যেভাবে যেভাবে বলতেন আমি ঠিক সেইভাবেই তুলে নিতাম এবং আসরে গিয়ে উপস্থাপিত করতাম। এমন অনেক দিন গেছে শ্রোতারা

একটা বিশেষ কিছু শুনতে চায় কিন্তু লেখা নেই—উনি সকাল থেকে লিখে যেতেন—আর আমি পাশে বসে থেকে পড়ছি—করছি, তারপর বিকেলে আসরে ওই নতুন জিনিসটাই উপস্থাপন করতাম। আমি ঈশ্বরকে মানি। তাঁর অসীম করুণা আমার ওপর না থাকলে এইরকম করা যায় না। ভাবলে খুব অবাক লাগে নিজেরই।

লোকে যেভাবে গানের রেওয়াজ করে আমি সেভাবে কোনোদিন করিনি। স্কুলে গানের ক্লাস ছিল। পুরো গানটা শিখতাম—গাইতাম প্রাইজও পেয়েছি। আর গানের গলাটা ভাল ছিল। উনি গানটা বলতেন, সুর দিতেন। আমি শুনে তখনই গলায় তুলে নিতাম। ওনাকে শোনাতাম। শুনে ওনার যে জায়গাটা ঠিক লাগত না সে জায়গাটা ঠিক করে দিতেন—তারপর নিজে করে বলতেন এইভাবে গাইতে হবে। আমি করতাম। পাঠের পদ্ধতিও কী হবে, কখন কীভাবে হাত নাড়তে হবে উনি সবকিছুই করে দিতেন—আমি আসরে গিয়ে সেইভাবে করতাম। উনি সবসময় আমাকে বলতেন—'যখন যে চরিত্রটা পাঠ করবে, মনে করবে তুমিই সেই। যেমন যখন ব্যাসাসনে বসবে তখন মনে করবে তুমিই স্বয়ং ব্যাস। সামনে যে শ্রোতারা থাকবে তাদের কখনওই ভয় পাবে না।' বাস্তবিকই আমিও পাঠ করতে গিয়ে কেমন একটা শক্তি পেতাম। প্রথম-প্রথম অবশ্য ভয়-লজ্জা দুটোই ছিল, তখন চোখ বুজে পাঠ করতাম। পরে অভ্যস্ত হয়ে গেলাম। ভয়-ভীতি সরে গেল, আমিও স্বচ্ছন্দ হলাম। শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধবৎ পাঠ শুনতেন, আসরে টুঁ শব্দটি হতো না। আসরে সবরকম মানুষজন আসতেন। সব বয়সের পুরুষ-মহিলা, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবাই। এক-একটা আসরে লোক উপচে পড়ত, পাঁচ হাজার, দশ হাজার লোক হামেশাই হতো।

আমার জনপ্রিয়তা তখন এমন ছিল যে, আমাকে বাদ দিয়ে কথকতার আসর বা কোনো উৎসব হতো না। তরুণকান্তি ঘোষ মহাশয় আমার গানের খুব ভক্ত ছিলেন। তাঁদের দোলযাত্রা উৎসব হতো, নানা আসরও হতো। উনি আমাকে আসরে ডাকতেন। স্বামী নিখিলময়ানন্দকে পাঠাতেন। তিনি এসে আমাকে বলতেন, 'মা, আপনাকে তরুণ যেতে বলেছে, আরও বলেছে ক্ষান্তিলতা না থাকলে আসরে লোকই হবে না'। গর্ব না করেই বলছি কোনো আসরে আমার গান আগে থাকলে শ্রোতারা আমারটা শুনেই চলে যেতেন—আসর ফাঁকা হয়ে যেত। সেইজন্য আমাকে সবসময়ই পরে দেওয়া হতো। আবার এমনও হয়েছে আমি পরে গাইব বলে অনেক শ্রোতা আগে না এসে আমার সময়ে উপস্থিত হতেন।

আমার পারিশ্রমিকের কথা বলতে গেলে বলতে হয়—প্রথম আমি শুরু করি পাঁচ টাকা দিয়ে, তারপর দশ টাকা, তারপর দীর্ঘদিন আমি একান্ন টাকার পারিশ্রমিকে পাঠ করেছি। কলকাতায় যখন পাঠ করেছি তখন একান্ন টাকাতেই বেশি করেছি। কলকাতাতে, দক্ষিণেশ্বরে, আদ্যাপীঠে সমস্ত জায়গাতেই ওই একান্ন টাকা। শেষের দিকে অবশ্য পারিশ্রমিকটা একশ এক টাকায় নিয়ে যাই। লালগোলার রাজবাড়ি, বহরমপুরে রাজা কমলচন্দ্র রায়ের বাড়ি এইরকম তৎকালীন অনেক রাজবাড়িতে পাঠ

করেছি অনেকবার। উড়িষ্যা রাজ্যের কয়েকটি রাজবাড়িতে গেছি। আজ আর সব ভালভাবে মনে নেই। পুরিতে বেশ কয়েকবার গেছি—পাঠও করেছি তবে ভুবনেশ্বরে পাঠ করিনি।

শ্রোতারা নানা ধরনের ছিলেন, তবে সাধারণ মানুষজনই বেশি—পুরুষের সংখ্যা অনেক থাকলেও মেয়েদের সংখ্যা ছিল তার থেকেও বেশি। এই বেশি হওয়ার কারণ হিসেবে আমার মনে হয়, মেয়েদের সংসারে অনেক দুঃখ, জ্বালা-যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। তার থেকে কিছুক্ষণ মুক্তি পাওয়ার জন্য, শান্তি পাওয়ার জন্য দু-আড়াই ঘণ্টা তন্ময় হয়ে বসে পাঠ শুনতেন। ওটাই তাঁদের অনেক পাওয়া। শুধু গরীব বা দুঃস্থ পরিবারের মেয়েরা শুনতে আসত তা নয়, ভাল পরিবারের অর্থাৎ শিক্ষিত, উচ্চবংশীয়, গৃহস্থ মেয়েরাই বেশি আসতেন।

আমি আমার পাঠের সময় নিজের তৈরি করা কোনো শব্দ বা নিজের ধারণা মতো কোনো কথা আনতাম না। আমার যেটা তৈরি করা থাকত আগের থেকে অর্থাৎ উনি যেটা তৈরি করে দিতেন দুঘণ্টা-আড়াই ঘণ্টার জন্য সেটাই শুধু পাঠ করতাম। উনি এমনভাবে তৈরি করে দিতেন নিজের কোনো শব্দ বা কথা আনার প্রয়োজনই হতো না।

শ্রোতাদের কাছ থেকে আমার পাঠ সংক্রান্ত কোনোদিনই কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া আসেনি। কোনো সমালোচনাও আসেনি। বা কেউ কোনোদিন বলেনি 'এটা ঠিক হল না, বা ওটা বললে ভাল হয়'। আমি যখন যেটা করেছি ওঁরা তখন সেটা শুনেছেন। মতামতটা জানিয়েছেন কোনটা পাঠ করব এই বিষয়ে অর্থাৎ 'আমাদের এখানে (একটা পাঠের নাম করে বলতেন) আজ এই পাঠটা করবেন' এই পর্যন্ত। অন্যরকম মতামত দেবার সাহসও তাঁরা দেখাতেন না। কারণ সব আসরেই উনি থাকতেন। তবু কারও যদি কোনো প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা বা মতামত থাকত সেটা ওনাকে করতেন এবং উনিও যথাযথ উত্তর দিতেন। আমাকে কেউ কোনোদিন কিছু জিজ্ঞাসা করেনি। সেটা ছোট বয়সে হোক বা বড় বয়সে হোক।

এই কথকতার দিকে এলাম কারণ ছোটবেলা থেকে আমার এ বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ ছিল। আর আমার মা যেহেতু এসব বিষয়ে বরাবরই আগ্রহী ছিলেন যেতে চাইলেই উনি সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন। আমাদের চন্দননগরে সতীশচন্দ্র কথকতা করতেন তাঁকে আমরা সতীশ কথক বলতাম। তাঁর পাঠ ভাল লাগত শুনতে। কিন্তু অত ছোট বয়সে ওই পাঠ নিয়ে কোনো চিন্তা বা ধারণার জন্ম দিত না। তাই আগে বা পরে কোন কথকের গান আমার ভাল লেগেছে তা বলতে পারব না। আর পরবর্তীতেও সেইরকমভাবে কারও পাঠ শুনিনি। একই আসরে আমার পাঠের আগে হয়তো কারও পাঠ আছে—তখন কিছুটা শুনেছি, এইরকমভাবে কিছু কিছু কথকের উপস্থাপনা দেখেছি। তবে তাঁরা আমার মনে খুব রেখাপাত করেননি। আমি অবশ্য

কীর্তন শুনতে খুব ভালবাসতাম—এখনও বাসি। আসরে আমার আগে বা পরে যদি কীর্তনের অনুষ্ঠান থাকত সেটা প্রথম থেকেই মন দিয়ে শুনতাম।

কথকতায়ও কীর্তন গান লাগে। আমি নিজেও কীর্তন করতাম। কীর্তনের মধ্যেও অনেক রকম গান থাকে। এমনি কীর্তন, পালাকীর্তন, ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, চণ্ডী, চৈতন্য-চরিতামৃত সবই কীর্তনের মধ্যে পড়ে। আমার ভাল লাগত এবং আগ্রহ নিয়েই শুনতাম।

আমার রেকর্ড হয়েছে হিন্দুস্তান কোম্পানি থেকে। [দেবী মাহাত্ম্য (শ্রীশ্রীচণ্ডী) H 1922, 78] কিন্তু কবে হয়েছে তারিখটা মনে নেই। মনে হয় বরানগর থাকাকালীন। আমি বরানগরে পাঁচ বছর ছিলাম। বরানগর ঝুলনতলা, পাঠবাড়ি তার পাশে থাকতাম। তখন কলকাতায় খুব অনুষ্ঠান করেছি। আমার একটা বাঁধা ট্যাক্সি ছিল। যিনি ড্রাইভার ছিলেন তাঁর নিজের ট্যাক্সি ওটা। ছেলেটি সারাদিন অন্য ভাড়া খাটত, বিকেল হলে আমার ওখানে চলে আসত। ওটাতে করে আমি কলকাতার নানা আসরে গাইতে যেতাম। পাঠ শেষে ওটা করে বাড়ি ফিরতাম।

অন্য পাঠক বা কথকের সঙ্গে আমার সেইরকম একটা সম্পর্ক ছিল না। আসলে কথক সমাজ বলে কিছু ছিল না। কথক যাঁরা ছিলেন সবারই এক-একটা নিজস্ব ভঙ্গি ছিল। তবে ওনার কাছে অনেকে পাঠ নিয়ে আলোচনা করতে আসতেন। কেউ-কেউ সেইসময় ব্যাখ্যাকার ছিলেন। ব্যাখ্যা শুনতে আমার খুব ভাল লাগত। মহানন্দ ব্রহ্মচারী এইরকম এক ব্যাখ্যাকার ছিলেন। তাঁর ব্যাখ্যা আমার তো খুব ভাল লাগত।

কথকতা আর ব্যাখ্যা কখনও এক নয়। কথকতার মধ্যে আছে গল্প-উপন্যাস, অন্যান্য শাস্ত্রের আলোচনা, উদাহরণ, গান আর পাঠ।

আর ব্যাখ্যার মধ্যে আছে শুধুই ব্যাখ্যা আর সংস্কৃত শ্লোক। সংস্কৃতজ্ঞ সংস্কৃত শ্লোক বলে তার ব্যাখ্যা করতেন। আবার কখনও-কখনও অন্য কোনো বিষয় যুক্ত করে তার থেকে উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করতেন। ব্যাখ্যা একেই বলে। কথকতা আর ব্যাখ্যার মধ্যে কোনো মিল নেই।

কথকতা ঠিক অভিনয় নয়। তবে পাঠ করতে গেলে অভিনয়ের কিছু এসে পড়ে। আসলে পাঠের সময় নানারকম ভাব আনতে হয়। কখনও কাঁদতেও হয়। সেই কান্না শ্রোতাদের মধ্যে ঠিকভাবে গেলে তাঁরাও চোখের জলে ভাসতেন। এটা একেবারেই ভাবের ব্যাপার। এরজন্য অভিনয় করার দরকার হয় না অভিনয়ের মতো শুনতে হলেও।

আমার আগে বা সেই সময় কোনো মহিলা কথক ছিলেন না। আমিই প্রথম এবং তখনকার একমাত্র মহিলা কথক ঠাকুরানি। আমার আগে কথক ঠাকুর ছিলেন অনেকেই। তবে তাঁরা বেশিরভাগই পূর্ববঙ্গের।

কথকতার সময় বলতে কিছু নেই। সারা বছর এই অনুষ্ঠান হতো। অন্তত আমি তো

সারা বছরই পাঠ করতাম এখানে-ওখানে। নিমন্ত্রণ পেতামও খুব। তাই বছরের কোন সময়টা এই পাঠ বেশি হতো বলা কঠিন। তবুও ধর্মীয় অনুষ্ঠান যে মাসগুলোতে বেশি হয় স্বাভাবিকভাবে এই পাঠও বেশি হয় যেমন বৈশাখ, আষাঢ়, কার্তিক, চৈত্র ইত্যাদি। কিন্তু শুধু ধর্মীয় আসরে পাঠ হতো এমনটা নয়, গৃহের কোনো মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান বা শ্রাদ্ধবাসরেও এই পাঠের ব্যবস্থা হতো।

একজন মহিলা কথক এবং একজন পুরুষ কথকের মধ্যে পার্থক্য তো থাকবে। একজন মহিলা কথক সীতা বা কুন্তীকে তার পাঠের মধ্যে দিয়ে যেভাবে হাজির করবেন একজন পুরুষ কথকের পক্ষে তা সম্ভব হবে কি ? কুন্তী বা সীতার দুঃখ আমি যেভাবে অনুভব করতে পারি সেই অনুভবের জায়গাটায় পুরুষদের পেঁছনো সম্ভব নয়। আমি মহিলা বলে সীতা বা কুন্তীর পাঠের সময় তাঁদের সঙ্গে আমি একাত্ম হয়েছি। তাঁদের ব্যথা আমার ব্যথা, আমার দুঃখ, আমার যন্ত্রণা। এই ভাবটা আমার মধ্যে এসে যেত। পুরুষরা দুঃখটা বুঝতেন কিন্তু তাঁদের নিজেদের দুঃখ হিসেবে নয়।

আমি কথক হতে পেরেছিলাম আমার মা আর স্বামীর সাহায্য ও প্রেরণায়। কিন্তু বাইরের সমাজ বিশেষ করে সেইসময় এটাকে এত সহজভাবে মেনে নেবে কি ? নেয়ওনি। বাধা এসেছে প্রচুর। আর এই বাধা পণ্ডিতমণ্ডলির ভেতর থেকেই বেশি এসেছে। তাঁরা শাস্ত্র তুলে হৈ-চৈ ফেলে দিতেন। তাঁরা বলতেন মহিলাদের শাস্ত্রপাঠে কোনো অধিকার নেই, ভাগবতে অধিকার নেই এ সমস্ত শাস্ত্রবিরোধী কাজ হচ্ছে। এইসব কথা তাঁরা ওনাকেই বলতেন। উনি ওঁদের এসব কথার উত্তর শাস্ত্র দিয়েই দিতেন। উনি মনুসংহিতা খুলে দেখাতেন পুরাকালে মহিলাদের পৈতা হতো, তাঁরা গুরুগৃহে বাস করতেন, তাঁরা বেদ পড়তেও পারতেন পড়াতেও পারতেন। পুরাকালে যদি পারে তাহলে এখন মেয়েদের ভাগবতে অধিকার থাকবে না কেন? আবার ব্যাসদেবের রচনা থেকেও দেখাতেন। 'স্ত্রী শূদ্র, দ্বিজ বন্ধুণাং ত্রয়ী ন সুখী গোচরা।' ত্রয়ী সুখী ন গোচরা বলতে স্ত্রী শূদ্র আর দ্বিজ বন্ধু যারা ব্রাহ্মণ হয়েও ব্রাহ্মণের কাজ করে না তাঁদের ত্রয়ী অর্থাৎ বেদ বা ওঙ্কার-এ অধিকার নেই। এঁরা ওম উচ্চারণ করতে পারবেন না। উনি পুরাকালের গার্গী, মৈত্রেয়ীর উদাহরণ দিয়েও দেখিয়েছেন। অনেক বড়-বড় জ্ঞানী পণ্ডিতের সঙ্গে ওঁর তর্ক-বিতর্ক হয়েছে।

সব শেষে আমি এটা বলব—ওনার কৃতিত্ব অনেক। অপরিসীম জ্ঞান ছিল ওঁর। এখন চুরানব্বই বছর বয়স ওনার কিন্তু এখনও কত স্মরণশক্তি। চোখের দৃষ্টির স্বচ্ছতা কমে যাওয়ার জন্য অথর্ব হয়ে পড়েছেন কিন্তু জ্ঞান এখনও অগাধ। এই বৃদ্ধ বয়সে আমি কবে কোন অনুষ্ঠানে কোন সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করেছিলাম উনি এখনও মুখস্থ বলে যান। লেখাপড়া (স্কুল কলেজের) কতদূর কী করেছেন জানি না, কিন্তু পুরাণ, শাস্ত্র, ভাগবতে জ্ঞান ছিল অপরিসীম। একটা মানুষের মধ্যে এমন অনেক কিছু ছিল ভাবলে অবাক হতে হয়।

ওনার রক্তে ছিল কথকতা। কথক ঠাকুরের বংশ বললেই ঠিক বলা হয়। আমার

শ্বশুর মহাশয় রামায়ণ গান করতেন। আমার মেজভাসুর গান গাইতেন। কথক অবশ্য উনিই প্রথম। উনি যাঁকে গুরু মেনেছিলেন তিনি ছিলেন এক কথক। তাঁর কাছ থেকেই উনি কথকতা শিখেছিলেন এবং তাঁর প্রভাবে কথক হয়েছিলেন। গুরুর নাম রাধাবিনোদ গোস্বামী। তাঁর কাছে ওনার এই শিক্ষা। □

রামায়ণ সম্রাট মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তীর কথা

লিখেছেন : লছমন প্রসাদ চক্রবর্তী

বাঁকুড়া জেলার সোনামুখির অন্তর্গত বৈকুণ্ঠপুর পল্লীতে রামায়ণ সম্রাট মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তীর জন্ম। ১৩১২ (১৯০৫) সালের ২৪শে শ্রাবণ।

জ্যাঠামশাই মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তীর মুখে শুনেছি আমরা কৃত্তিবাস বংশীয়। মহাকবি কৃত্তিবাস ওঝার এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা নরসিংহ ওঝার বংশধর আমরা। আদি নিবাস নদীয়ার ফুলিয়াতে। যাজক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পিতা রামকিঙ্কর চক্রবর্তীর নিকট নিতান্ত শৈশবে সংস্কৃতের পাঠ নেন মৃত্যুঞ্জয়। পাঠ নিয়েছেন ঠাকুর্দা মাধবচন্দ্র ন্যায়রত্নের কাছেও। পরে চন্দননগরস্থিত কালীদাস চতুষ্পাঠীতে কিছুদিন সংস্কৃত শেখেন।

আঠারো বছর বয়সেই সোনামুখিতে তিনি এক যাত্রাদল গড়লেন। লক্ষ্মণ, বাল্মীকি ও শকুনির চরিত্রে অভিনয় করতেন মৃত্যুঞ্জয়। সেই সময় তিনি বহুস্থানে যাত্রাগান করেন। তবে দলটি কয়েক বৎসরের মধ্যেই ভেঙে যায়। এই সময় তাঁর কাকা প্রভাকর চক্রবর্তী (পুরাণ রত্ন) মহাশয় একখানি রামায়ণ পুঁথি (প্রভাকরের হাতে লেখা) তাঁকে দিয়ে বললেন, 'এই রামায়ণ পুঁথিখানি পড় এবং রামায়ণ গান কর'।

কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় তো জানেন না কী করে রামায়ণ গান করতে হয়। তাহা শিখিবার জন্য গুরু দরকার। কাজেই তিনি গেলেন স্থানীয় রামায়ণ গায়ক শ্রীযুক্ত ফকিরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে।

বড় বড় ওস্তাদের কাছে গেলেন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিখতে এবং স্বল্পকালের মধ্যেই গান শিখে নিজেই গান রচনা করতে লাগলেন। ভালভাবে আয়ত্ত করলেন যাত্রাপালার গানও। এরপর মধ্যম ভ্রাতা বৈদ্যনাথকে শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়ে শুরু করলেন রামায়ণ গান। কণ্ঠস্বর দুভায়েরই লালিত্যমণ্ডিত। রামায়ণ গান সূত্রে ভারতের হেন স্থান নেই যেখানে তাঁরা যাননি। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তাঁকে বহুবার দিল্লীতে আমন্ত্রণ করেছেন। গান করেছেন পশ্চিমবঙ্গের রাজভবনেও। বিদেশে রামায়ণ গানের জন্যও ডাক পেয়েছেন। কিন্তু যাননি। তিনি বলতেন : ভারতের ঐতিহ্য রামায়ণ গান বিদেশকে দেব না।

সহস্র লোকের মন জয় করেছেন তাঁরা। দুভাই ছিলেন এক প্রাণ। ধন্য হয়েছেন মা আনন্দময়ীর কৃপা ও সান্নিধ্যে। মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তীর রামায়ণ গান সম্পর্কে

এই অংশে ব্যবহৃত ছবিটি মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী'র—সম্পাদক।

বিশদ আলোচনার আগে আর একটি তথ্য পেশ করি : রামায়ণ গানকে কুলবৃত্তি হিসাবে, এই শিল্পকে বংশ পরম্পরায় ধরে রাখতে চেয়েছিলেন তিনি। যেজন্য রেকর্ড কোম্পানির শত অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি কখনও রেকর্ড করাতে রাজি হননি। আমাকে দিনের পর দিন তালিম দিয়েছেন। এবং অবশেষে এক আসরে আমাকে হাজির করে ঘোষণা করেন : 'এই আমার রেকর্ড।'

আবার আকাশবাণীর আমন্ত্রণ উপেক্ষা করেছেন রামায়ণ গানকে খর্বিত করতে চাননি বলে। তিনি বিশ্বাস করতেন না পনেরো মিনিট বা আধঘণ্টায় রামায়ণ গান সম্ভব। আকাশবাণী কর্তৃপক্ষকে তিনি স্পষ্ট বলে দিয়েছিলেন, 'একঘণ্টার কমে পারব না'। কর্তৃপক্ষ আধঘণ্টার বেশি সময় দিতে পারবেন না বলায় তাঁদের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন।

মৃত্যুঞ্জয়বাবুর রামায়ণ গান অতি সুমধুর, তিনি গানে বসিতেন অতি শুদ্ধাচারে। প্রথমেই বিগ্রহটিকে বুকে লাগাইয়া শঙ্খধ্বনি সহযোগে আসরে আসিয়া বসিতেন। তৎপরে পূজাপাঠ ও মঙ্গলাচরণ, তৎপরে শ্রীশ্রী রামায়ণ গান আরম্ভ। তাঁর আসরে ভাল মাইক এবং জোরালো লাইট দরকার হত। তিনি ছিলেন একাধারে গায়ক, অভিনেতা, কবি ও পণ্ডিত। তিনি গানগুলি গাইতেন অতি সুমধুর সুরে। অভিনয় করিতেন অতিশয় ভাবাবেগে। কবিত্ব ফলাইতেন স্বকীয় মর্যাদায়। পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতেন অভিনব ব্যাখ্যায়।

এই গান, অভিনয়, কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য সহযোগেই গড়ে উঠেছিল তাঁর রামায়ণ গান। তিনি ছিলেন পয়ারসিদ্ধ। অর্থাৎ পয়ারকে নানারূপ রাগ-রাগিনী দ্বারা সজ্জিত করতেন। যখন যে ভাবের প্রয়োজন তখনই দেখা যেত সেই সুরে বেরিয়ে আসছে তাঁর কণ্ঠ থেকে। এছাড়া নানা ভাবের গান সবই রাগাশ্রিত। ভারতবর্ষে যত রকমের রামায়ণ কাব্য বের হয়েছে সবকটি থেকেই তিনি গ্রহণ করেছেন। সংস্কৃত, বাংলা ও হিন্দি এই তিন ভাষাই প্রয়োগ করিতেন তাঁর রামায়ণ গানে। এবং সংস্কৃত, বাংলা ও হিন্দিতে যত রকমের রামায়ণ লেখা হয়েছে সে সবই ছিল তাঁর দখলে। মহাকবি বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণ। তুলসীদাসজীর হিন্দি ও কৃত্তিবাসজীর বাংলা এগুলি ছিল আসল, তাঁর কাছে মূল খুঁটি। এ ছাড়া তিনি ভট্টিকাব্য, কালিদাসের রঘুবংশ এবং ভাসপ্রণীত প্রতিমা নাটক থেকেও বহু চোখা-চোখা জিনিস তাঁর রামায়ণ গানে দিয়েছেন।

অধ্যাত্ম রামায়ণ, অদ্ভুত রামায়ণ, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ ও কালিসিংহের রামায়ণ থেকেও বহু বিষয় নিয়েছিলেন। এছাড়া তিনি বহু নাটক, যাত্রাগান, তৎকালীন সময়ে যাহা প্রকাশ পাইয়াছিল সমস্তই গ্রহণ করেছেন।

মহাত্মা গিরিশ ঘোষের লেখা গানও তিনি দিয়েছেন তাঁর রামায়ণ গানে, যেমন :

চল সবে ভার নিয়ে যাই অজধ্যায় রাম রাজা হবে।
দিব তাঁর চরণে ভার সে বিনে ভার কে আর লবে।।...

ডি. এল. রায়ের লেখা গানও দিয়েছেন। এবং সব থেকে আকর্ষণ ছিল তৎকালীন যাত্রাপালার গানগুলি। গানগুলি তিনি অতি সুমধুর সুরে গাইতেন। তাঁর নিজের লেখা গান, অভিনয় তো অশেষ। সব কিছুর সমন্বয় সাধন করেছিলেন। তাঁর ছিল একটাই জিনিস, সেটা হল কখন কীভাবে পরিবেশন করলে দর্শক বা শ্রোতাদের মন জয় করা যাবে তা তিনি জানতেন। সেইভাবেই তিনি পরিবেশন করতেন।

রামায়ণ গানের মধ্যে বিবেকানন্দ ও অন্যান্য মনীষীদের বাণীও প্রয়োগ করতেন।

নীলকণ্ঠের সুর অর্থাৎ সাধক কবি নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সুর ও তাঁর গানও তিনি ব্যবহার করেছেন। সংস্কৃত শ্লোকগুলি বলে তারপর বাংলায় ব্যাখ্যা করতেন। হিন্দি দোহা চোপাই বলে সেগুলিরও তর্জমা করতেন বাংলাতে। মাইকেল মধুসূদন দত্তের কাব্য থেকেও বহু জিনিস নিয়েছেন। গান বাঁধতেন আসরে বসেই। পরে সেগুলি আবার লিখে রাখতেন আসর শেষে। তাঁর অভিনয় দক্ষতা ছিল অসাধারণ। এই দেখছি তিনি কেঁদে ভাসিয়ে দিলেন আবার মুহূর্তের মধ্যে দেখছি হো হো করে হাসছেন।

একদিকে সীতামা হয়ে কাঁদছেন, অন্যদিকে রাবণ হয়ে অট্টহাস্য করছেন। এমন মনে হত যেন তাঁর মুখ-সুখ খানাই পাল্টে গেল, মুখটা যেন দুটো ভাগ হয়ে গেল, একদিকে চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়ছে আর দিকে চোখে জল নেই, সেই দিকের চোখ ও মুখ হাসছে।

এ কী করে সম্ভব জিজ্ঞেস করলে বলতেন 'এ জিনিস হল ভাব রাজ্যের জিনিস। এ জিনিস বলে বোঝানো যায় না।'

রামায়ণ গানে বিভিন্ন মত আছে। ভিন্ন ভিন্ন মত অনুযায়ী আছে : দুই তিন রকম রামায়ণ।

শ্রোতাদের বলতেনও সেকথা, রামায়ণের একটা মত নয় নেই বিভিন্ন মত আছে। কোনটা ঠিক আর কোনটা ঠিক নয় সেটা কারও পক্ষে বলা সম্ভব নয়। এই বলে বলতেন গোস্বামী তুলসীদাসজী সেই জন্যই বলেছেন রামায়ণ বহুকোটি অপারা! অর্থাৎ রামায়ণ মহাকাব্যে বহু কোটি কোটি মত আছে। যেমন দেখুন কৃত্তিবাসজী বলেছেন রামচন্দ্র যে অকাল বোধন করেছিলেন তার পুরোহিত রামচন্দ্র নিজে। আবার কালিসিংহ বলেছেন অকাল বোধনে পুরোহিত মহারাজ রাবণ। এবার কোনটা ঠিক কী করে বিচার করা যায় বলুন। তবে এই প্রসঙ্গে তিনি বলতেন যে দুটি মত রয়েছে, কোনটা ঠিক কোনটা ঠিক নয় বলা শক্ত কিন্তু যেহেতু আমি কৃত্তিবাস বংশীয় সেই কারণে আমি কৃত্তিবাসজীর মতটিই গ্রহণ করে গাইছি। এবং সেই সময়েই বললেন এ কথাটি 'রামায়ণ বহুকোটি অপারা, রামায়ণে বহু কোটি মত আছে।' গানের মধ্যে তিনি হাস্যরস এবং রসিকতাও পরিবেশন করতেন।

মানুষের মন জয় করতে পেরেছিলেন মৃত্যুঞ্জয়। মানুষের অন্তরের অন্তস্থলে পৌঁছে দিতেন তাঁদের মনের খোরাককে। তাঁদের সামনে সম্পূর্ণ ছবিটি ভেসে উঠত। তাঁর

বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল শবরীর প্রতিক্ষা পালাটিতে। এটি তিনি নিজস্ব সত্ত্বা দিয়ে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে এবং পুরাণ কাঠামোর আশ্রয়ে সৃষ্টি করেছিলেন।
অষ্টাদশ পুরাণ কণ্ঠস্থ ছিল মৃত্যুঞ্জয়ের।
অভীচার যজ্ঞ পালায় রাবণকে বড় করে দেখিয়েছেন। সেখানে রাবণের মরণ যজ্ঞ করছেন শ্রীরামচন্দ্র ; রাবণ সেই যজ্ঞে পুরোহিত। কাজেই দেখুন রাবণ সেখানে নিজের মরণ যজ্ঞে নিজেই পুরোহিত হয়ে নিজেরই আত্মাহুতি নিজে দিচ্ছেন॥
জয় রাম বলে তিনি যখন হুঙ্কার ছাড়তেন, তখন মনে হত সত্যই যেন স্বয়ং মহাবীর হুঙ্কার ছাড়লেন। আর গোটা আসর কেঁপে উঠত সেই হুঙ্কারে।
শবরীর পালাতে তিনি একটি বিশেষ জিনিস প্রমাণ করেছেন তা হল ; ভক্তি বিনা পরমেশ্বরকে পাওয়া যায় না। তাই তুলসীদাসের রামচরিত মানস থেকে এই উক্তিটি তিনি দিতেন :

চৌপাই

জাতি পাঁতি কুল ধর্ম বড়াঈ।
ধন বল পরিজন গুণ চতুরাঈ॥
ভকতি হীন নর সোহই কৈসা।
বিনুজল বারিদ দেখিয় জৈসা॥

অর্থাৎ, জাতি শ্রেণীকুল ও ধর্মের খ্যাতি, ধনবল পরিজন, গুণ ও চতুরতা এ সকল থাকিলেও ভক্তি যাহার নাই, সে তেমনই শোভা পায়, যেমন জল বিনা মেঘ দেখিতে পাওয়া যায়। এক কথায় বিনা জলের মেঘের মত। গানের মধ্যে তিনি বলেছেন :

আখর

(বিনাজলের মেঘ যেন, যে নর ভকতিহীন)

ভক্ত সংবাদ পালাতে ভরতের ভ্রাতৃভক্তি যে কত বড় তা তিনি অতি নিপুণ ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। যখন ভরতকে চিত্রকূট পর্বতে রামচন্দ্র বলছেন 'ভরত, পিতা তোমাকেই চৌদ্দ বৎসরের জন্য রাজত্ব দিয়ে গেছেন, তুমি সেই রাজত্ব গ্রহণ কর।' তার উত্তরে ভরতের উক্তিটি কি সুমধুর প্রাণস্পর্শী তা মহাকবি বাল্মীকির শ্লোকের দ্বারা তিনি ব্যক্ত করেছেন :

শ্লোক

বৃদ্ধোরসাং রাজধুরাং প্রবোঢ়ুং
কথং কনীয়ান হমুৎ সহেয়।
মা মাং প্রযুঙ্‌কথাঃ কুল কীর্ত্তি—
লোপে প্রাহস্ম রামং ভরতোঽপি ধম্ম্যম্॥

অর্থ

তখন শ্রীভরত শ্রীরামকে এই বক্ষ্যমান ধর্ম্মানুগত বাক্যগুলি বললেন : হে রঘুবংশাবঅংশ। জ্যৈষ্ঠার্হ রাজ্য (অর্থাৎ এই রঘুবংশের আদি হতে জ্যৈষ্ঠানুক্রমে রাজা হয়ে আসছেন)

আমি কনিষ্ঠ হয়ে কী প্রকারে সেই রাজত্ব গ্রহণ করি ? রঘু বংশের কীর্ত্তিলোপকর কার্যে আমাকে নিযুক্ত করবেন না ॥

এই ভাবে প্রতি পালাতে তিনি গান শ্লোক হিন্দি দোঁহা চৌপাই, অভিনয়, দেহতত্ত্ব প্রভৃতি নানারূপ সম্ভার দিয়ে মানুষের হৃদয়কে ভাবিয়ে দিয়েছেন। তাঁর প্রতিটি পালা যেন শ্রীরামের প্রতিচ্ছবি। প্রতিটি পালা এক একটি বিশেষ ভাবাবেগ সৃষ্টি করেছে। তিনি মোট ৩৭টি পালা তৈরি করেছেন এতেই তিনি সম্পূর্ণ রামায়ণ গান প্রকাশ করেছেন। তিনি অভিনয়গুলিকে নিজস্ব স্বকীয়তায় প্রভাবিত করেছেন বলেই সমাজ জীবনে এত সমৃদ্ধি লাভ করেছেন তিনি। তিনি একা হারমোনিয়াম বাজিয়ে বসে গাইতেন কিন্তু মনে হত তিনি একের মধ্যে বহু। তখনি সীতা, তখনি রাম, তখনি রাবণ তখনি বিভীষণ তখনি লক্ষ্মণ তখন বাল্মীকি সকলে অবাক হতেন। এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ে গেল সেটি হল একবার কোকলা বাড়ী অথবা বেহালায় রায় বাড়িতে বাবার রামায়ণ গান হচ্ছে। আসরে ছিলেন চিত্র পরিচালক গুরু দত্ত মহাশয়, চিত্রতারকা বিকাশ রায়, উত্তমকুমার প্রমুখ বহু বিশিষ্ট শিল্পী। সেখানে গানের শেষে বাবার বিশ্রামকক্ষে গিয়ে গুরু দত্ত মহাশয় বিকাশ রায় মহাশয়কে বললেন "বিকাশ পার এরকম একাই রাম একাই সীতা একাই সব" তার উত্তরে বিকাশ বাবু বললেন "মাপ করবেন তা পারব না। একটা করে চরিত্র বলুন আমরা করে দেব, কিন্তু একাই এক সঙ্গে এত সব ও আমরা পারব না। ও একমাত্র মৃত্যুঞ্জয় বাবুই পারেন।" এভাবে বহু গায়ক বহু শিল্পীর প্রশংসা তিনি পেয়েছেন। তাঁর রচিত গানের সুরও তাঁর নিজেরই দেওয়া। কীর্ত্তন গানও বহু লিখেছেন। অকাল-বোধন পালা থেকে তাঁর লেখা গানের একটি নমুনা পেশ করি :

দুর্গা / তেওরা

দেবীর বোধন করে নবঘন সাগর তীরে সন্ধাকালে।
গড়িয়া মুরতি মাতা দশ ভূজা পুজিছে পুষ্প বিল্বদলে
কপিগণ আনে ফল ফুল, করে আয়োজন যতেক বীরে,
বিভীষণ দেয় ধূপের শিখা ; সুগ্রীবাদী কর জোড় করে,
কুসুম চন্দন লইয়ে লক্ষ্মণ, রামে তুলে দেন করিয়া যতন
সঁপিয়া ঘটেতে ভকতি ভরে রাম ভেসে যান নয়ন জলে ॥ □

বাসন্তী চৌধুরীর কথা

কবেকার কথা, তাতো মনে নেই। বালিকা বয়সে খুব কথা বলতাম। কথার বাঁধুনি ও ভঙ্গীও নাকি বেশ চিত্তাকর্ষক ছিল। আমার মা বলতেন, "এ মেয়ে বড় হয়ে কথা বেচে খাবে।" মাতৃবাক্য লঙ্ঘিত হয়নি। উত্তরজীবনে আমাকে কথা বেচেই খেতে হয়েছে—অধ্যাপনা ও কথকতা। কলেজ জীবনে অধ্যাপনা করার সঙ্গে সঙ্গে ১৯৫৪ সাল থেকে সভাসমিতিতে বক্তৃতা দিতে মাঝে মাঝে ডাক পড়তো,—বেশীর ভাগ সেগুলি ধর্মসভা। বেদান্তের ওপর ভিত্তি করে তখন বক্তৃতা দিতাম, কেননা আমার এম. এ-তে সংস্কৃতের বিশেষ নির্বাচিত বিষয়ই ছিল বেদান্ত। ১৯৪৯ সালে কোন্নগর এসে পরিচয় হয়েছিল এক পরম বৈষ্ণব কোন্নগর হাইস্কুলের অবসর-প্রাপ্ত শিক্ষক যতীন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে। তিনি ভাগবতের প্রখ্যাত বক্তা প্রভুপাদ রাধাবিনোদ গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন এবং নিজেও ভাগবত ব্যাখ্যাকার হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন। খেয়ানৌকায় গঙ্গা পার হয়ে কোন্নগরের ওপারে পানিহাটীতে "রাঘব পণ্ডিতের বাড়ী" নিত্য ভাগবতপাঠ করতে যেতেন। তিনি আমাকে শুধু মা বলে ডাকতেনই না—গর্ভধারিণী মায়ের মতো দেখতেন বলে ঐ আশী বছরের বৃদ্ধের ভূমিষ্ঠ প্রণামও আমাকে গ্রহণ করতে হোতো। তিনি সভাসমিতিতে আমার বক্তৃতা শুনে

শুনে একদিন আমাকে বললেন, "মা, আমি অক্ষম হয়ে পড়ছি। রোজ ওপারে ভাগবতপাঠ করতে যেতে আমার কষ্টই হয়। এক বৈষ্ণবপাঠক তাঁর ভাগবতপাঠের দায়িত্ব আমাকে দিয়ে বৃন্দাবনে চলে গিয়েছিলেন। আমার ভাবনা হয়, আমি কাকে এই দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে পরপারে যেতে পারবো। আমার মনে বিশ্বাস হয়েছে, যে আমি পথ খুঁজে পেয়েছি। তুমিই মা আমার এই কাজটার ধারাবহন করতে পারবে।" আমি বলি, "আমি তো বেদান্তচর্চা করেছি, ভাগবতগ্রন্থ তো পড়িইনি। কেমন করে এ গ্রন্থ পাঠ ব্যাখ্যা করবো ?" তিনি বলেন, "না মা তোমার প্রতি গুরুকৃপা আছে। তোমার সাতবছর বয়সে শ্রীশ্রীরামঠাকুর তোমাকে দীক্ষা দিয়েছেন। আর তুমি বেদান্ত পড়েছো বলেই তো ভাগবতপাঠও করতে বলছি। বেদান্তের ভিত্তিভূমি থাকলে ভক্তি-শাস্ত্রপাঠ আরো উজ্জ্বল হবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবও তো বলেছেন—বেদান্ত-জ্ঞান আঁচলে বেঁধে ভক্তির রাস্তায় নামতে হবে। তাছাড়া, তুমি তো গান গাইতে পারো। ঐ পাঠের সঙ্গে সঙ্গে তুমি গান মিশিয়ে করে দেখো, তাতে বহুলোকের মনোরঞ্জন করতে পারবে।" ভাগবত পাঠকরা গান করবেন না, শুধু শাস্ত্রপাঠ ও ব্যাখ্যা করবেন এইরকম সংস্কার অনেকের মধ্যে আছে। যতীন

রায়ের কথাটা মনে ধরলো। ভাবলাম, শ্রীমদ্‌ভাগবতকে যদি কথকতার মাধ্যমে পরিবেশন করি, তাহলে তাতে গান করলে কারো কিছু বলারও থাকবে না। প্রথম পাঠ ১৯৫৯ সালে করলাম কোন্নগর হরিসভায়। একশো বছরেরও পুরোনো হরিসভা। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব দক্ষিণেশ্বর থেকে নৌকো পার হয়ে এসে এই হরিসভায় বসতেন। বহু বৈষ্ণবের স্পর্শপূত এই ব্যাসাসন। সামনে সুসজ্জিত শ্রীরাধাগোবিন্দ বিগ্রহ। বৈষ্ণব ও ভক্তসমাবেশে সেদিন প্রথম ভাগবতপাঠ করলাম। একটি শ্লোক সংগীত-সহযোগে ব্যাখ্যা করতে লাগলো দু ঘণ্টা। উল্লসিত হয়ে উঠলেন বৃদ্ধ যতীন রায়। "মা তুমি পারবে, বলেছিলাম না? তুমি এ গ্রন্থপাঠ ছেড়ো না।" নিজে দিয়ে গেলেন আমাকে ভাগবতের একটি খণ্ড—দশম স্কন্ধ। আমিও উৎসাহী হয়ে আলমারী থেকে খুঁজে পেতে বের করলাম শ্রীধর স্বামীর টীকাসহ আর একটি সম্পূর্ণ ভাগবতগ্রন্থ। এই ব্যাপারের ৬।৭ বছর আগে একবার দিল্লী গিয়েছিলাম। দিল্লীতে আমার ন' মামা তখন এক বছর হোলো মারা গেছেন। তিনি গণিতজ্ঞ হলেও বৌদ্ধদর্শন বেদান্ত ও বৈষ্ণব-শাস্ত্রেও সুপণ্ডিত ছিলেন। সব বিষয়ে তাঁর প্রচুর গ্রন্থ ছিল। মামীমা তাঁর সংস্কৃত গ্রন্থ সংগ্রহ আমাকে যোগ্য উত্তরাধিকারী বিবেচনা করে দিয়ে দিলেন। তার মধ্যে দুখণ্ডে সম্পূর্ণ ভাগবতও ছিল। গ্রন্থ কৃপা করে কয়েকবছর আগেই আমার কাছে অযাচিতভাবে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। আর যথা সময়ের জন্য প্রতীক্ষা করেছিলেন। ঝেড়েঝুড়ে এই বার তাঁকে আমার বরণ করে নেবার পালা। হরিসভায় পাঠের প্রশস্তি শুনে প্রতিবেশী রাম মুখার্জী দ্বিতীয় পাঠের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। অবসরপ্রাপ্ত একদা শিক্ষক আমার বৃদ্ধ শ্বশুরমশাই আমাদের বাড়ীর ছাদে বসেই মাইকে শুনছিলেন। তিনি বললেন, "আমি দূর থেকে তো সব কথা বুঝতে পারছিলাম না, তবে বৌমার বাচনভঙ্গী শুনে বুঝলাম ও ভবিষ্যতে নিশ্চয় এতে প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারবে।" তার কিছুদিন পরেই আমি নবদ্বীপ গেলাম। মহাপ্রভুর বাড়ী আমার তৃতীয় পাঠ। তখন আমি নবদ্বীপ নিয়মিত প্রতি মাসে যাই বিখ্যাত কীর্ত্তনীয়া রাধাচরণ দাস বাবাজীর কাছে কীর্ত্তন শিখতে। তার আগে রবীন্দ্রসংগীতে গীতভারতী উপাধি পেয়েছি। রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে বিষ্ণুপুরী ঘরাণার ধ্রুপদ তালিম নিয়েছি। প্রসিদ্ধ খেয়াল গায়ক সত্যেন ঘোষালের সুযোগ্য ছাত্র উপেন ঘোষের কাছে ১৫ বছর খেয়াল শিখেছি। কিন্তু মন মজে গিয়েছিল কীর্ত্তনে। বাউলও ভাল লাগতো, তাই সুরেন চক্রবর্তীর কাছেও ১৫ বছর বাউল ও লোকসংগীত শিখতাম। পোড়ামা তলার পূর্ণ বাগচী ও কবি বিমানবিহারী মজুমদার এঁরা আমার কীর্ত্তন শুনতে ভালবাসতেন। সেইজন্য এঁরাই মহাপ্রভুর বাড়ী আমার পাঠের ব্যবস্থা করলেন। আমি ভাগবত কথকতা করে শোনালাম মুখ্যভাবে, কীর্ত্তনও গাইলাম সঙ্গে সঙ্গে। সেখানে বহু বৈষ্ণবশ্রোতা সেদিন উপস্থিত ছিলেন। পাঠের পরদিন আমার কীর্ত্তনের গুরু রাধাচরণ দাস বাবাজীকে জিজ্ঞাসা করলাম, "বাবাজী, শ্রোতারা শুনে কি মন্তব্য করলেন?" তখন বয়স অল্প, খ্যাতি শুনলে আনন্দ হয়, নিন্দা শুনলে দুঃখ পাই। বাবাজী

বললেন, "এঁদের সবার ভাগবত শুনে শুনে কান তৈরী হয়ে আছে। সবাই একবাক্যে বলেছেন এ মেয়েটি ভবিষ্যতে উত্তম ভাগবতবক্তা বা পাঠক হবে। তবে একজন বলেছেন—বৈরাগ্যের কথা বলছে হাতের সোনার চুড়ি বালা বাজিয়ে? তখন সধবা ছিলাম আর সোনার গহনা পরার রেওয়াজও ছিল। আর আমি কথা বলতে গিয়ে হাত তো নেড়েইছি। কিন্তু যেই এইকথা শুনলাম—মনে হোলো

"নিন্দক্ মেরি মিত্ হ্যায়, নিত্ নিত্ ময়লা ধোয়্।
ঐসা নিন্দক্ মর্ গয়ে যব্; তুলসীদাস বৈঠ্ রোয়।"

ইনিই আমার প্রকৃত মিত্র বটে। কেননা তিনি বুঝিয়ে দিলেন—একজন কথকের বেশভূষার একটা ইমেজ থাকা দরকার। এতো যে কোনো সভাসমিতি নয়। সেইদিনই সোনার চুড়ি হার বালা খুলে ফেললাম। আর কোনোদিন পাঠের আসরে গলায় তুলসীর মালা, হাতে তুলসীর বালা ও শাঁখা ছাড়া পরিনি। হার্টের গোলমাল হয়েছিল বলে ৺শিবানন্দ গিরি মহারাজ রুদ্রাক্ষের মালা ধারণ করতে বলেছিলেন তাই রুদ্রাক্ষের মালাও পরি। আস্তে আস্তে সাদা কাপড় ছেড়ে গেরুয়া পরেছি। যথাবিহিত সন্ন্যাস না নিয়ে গেরুয়া পরেছেন কেন—জিজ্ঞাসা করেছেন অনেকে। আমার ভাল লাগে তাই পরি। আমার স্বামীরও এই রং ভাল লাগতো বলে পরতে বলতেন। যাঁর আগ্রহ ও পৃষ্ঠপোষকতা না থাকলে আজ আমার কাছে এই জগৎটার দরজা অবরুদ্ধই থাকতো। আমাকে সঙ্গে করে বিভিন্ন আসরে নিয়ে যেতেন। চোখের জলে মুখ চোখ রাঙ্গা ও ভারী হয়ে যেতো। আমি বলতাম, "তুমি তো পরম ভক্ত দেখতে পাই। সায়েন্টিস্ট হয়েও ভগবানের লীলা শুনে তোমার চোখে জল আসে এত! উনি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির পিওর ম্যাথমেটিক্সের প্রফেসর ছিলেন। হেসে বলতেন—"না, না, আমি ভক্ত টক্ত নই। তুমি যে সেন্টিমেন্টে সুড়সুড়ি দিয়ে কথা বলো, তাতেই সবার মতো আমারও চোখে জল আসে।" কথকতায় এ কথাটা মূল্যবান বটে। যুক্তিতর্কের মাধ্যমে তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করা এক, আর রসে-বশে শ্রোতাদের হৃদয়ে প্রবেশ করা অর্থাৎ সেন্টিমেন্টে অ্যাপিল করা যাকে বলে, সেটা আর এক। মস্তিষ্ক ও হৃদয় এই দুটোরই প্রয়োজন আছে কথকতায়। তত্ত্ব ও তথ্য। শুধু তথ্য পরিবেশনে কাহিনীর চিত্রটি কথকের বলার মাধুর্যে ও চাতুর্যে ফুটে ওঠে। ধীরে ধীরে শ্রোতার চিত্ত সংবেদনশীল হয়ে ওঠে। শ্রোতাদের মধ্যে কিন্তু এমনও কেউ কেউ থাকেন, তাঁরা কাহিনীর অন্তরালে তত্ত্বটুকু আস্বাদন করতে চান। কথকতা প্রসঙ্গে এটা ভুললে চলবে না কোনমতেই। কথক দু-তরফেরই কথা মনে রেখে কথা পরিবেশন করবেন। তত্ত্ব বাহন, তথ্য বাহ্য। তত্ত্বের ভূমিতে রসসমৃদ্ধ তথ্য বসে থাকে। ঘোড়া ছেড়ে যেমন ঘোড়সওয়ারকে কল্পনা করা যায় না, সেইরকম আর কি। ঘোড়াটা গৌণ হলেও লোকের দৃষ্টি পড়ে ঘোড়-সওয়ারের দিকে, তেমনি কথকতায় রসবস্তুকাহিনী মুখ্য হয়ে থাকে কিন্তু তত্ত্বকে বাদ দিয়ে নয়। রসগোল্লা সন্দেশ কিনতে গেলো দোকানদার যেমন ভাঁড়ে করে বা ঠোঙ্গায় মুড়ে দেয়, কিন্তু যে ঐ মিষ্টদ্রব্য আস্বাদন করবে, সে ঠোঙ্গা বা ভাঁড়টা ফেলে দিয়ে

সন্দেশ রসগোল্লাটাই খায়। তবু দোকানদারের কর্তব্য ঠোঙ্গায় মুড়ে বা ভাঁড়ে দেওয়া। তেমনি কথক তো দোকানদারের আসনে বসেছেন, কাজেই তত্ত্বের ঠোঙ্গায় মুড়ে রসযুক্ত তথ্যবস্তু পরিবেশন করবেন। আস্বাদন যথাযোগ্য ভোক্তা হিসেবে হবে। তবে রসগোল্লা খাবার পরও রসগোল্লার ভাঁড়টাও তো চেটে খায় অনেকে—মনে রাখতে হবে।

সংগীত এমনই জিনিষ যা সর্বজনচিত্তাকর্ষী। কাজেই কথকতায় বাচিক ভঙ্গীর সঙ্গে সংগীত উপযুক্ত ভাব বহনে সাহায্য করে। অভিনয়ে যেমন আংগিক, বাচিক, আহার্য সাত্ত্বিক এই চারটি অংগ তেমনি কথকতার অভিনয়ের সঙ্গে কিয়দংশ সাদৃশ্য আছে। আহার্য সম্বন্ধে বলা যায় ডেকরেশন বা মেকআপ অভিনেতার মতো এতে থাকতে পারে না। অভিনয়ে একজন একজনের ভূমিকা গ্রহণ করে বলে তার বেশও গ্রহণ করতে হয় কিন্তু কথকতায় তো একজনই সকলের হয়ে কথা বলবেন। কাজেই আহার্য বা মেকআপের দরকার হয় না। তবে এর আগেই বলা হয়েছে কথকের সাজের মধ্যেই একটা সব্রাইটি বা সম্ভ্রম আকর্ষণকারী ভাব থাকবে। মাল্যতিলকবস্ত্র উত্তরীয় প্রভৃতিতে শ্রদ্ধা আকর্ষণকারী ভূষা। উত্তরীয় অবশ্য রাখতে হবে। হাত, মুখ, চোখের অভিনয়োচিত কিছু সুললিত ভঙ্গী থাকবে যাকে আংগিক বলা যেতে পারে। কথকতা বাক্যপ্রধান, কাজেই বাচিক অভিনয়ই এর সবচেয়ে কৃতিত্ব বহন করে। আর সব মিলিয়ে যে সাত্ত্বিক ভাব এতে উদিত হবে, তার ফলেই অষ্টসাত্ত্বিক ভাবলক্ষণ শ্রোতা ও পাঠকের মধ্যে ফুটে উঠবে ও সার্থকতার পথে উন্নীত হবে। তখন অশ্রু, কম্প, পুলক, স্বেদ, রোমাঞ্চ, বেপথুবৈবর্ণ, প্রলয় এগুলি কথক ও শ্রোতাদের মধ্যে দেখা যায়। শেষ অবস্থাটি সম্বন্ধে কথককে কিছু সংযত থাকতে হয়। শেষ অবস্থাটি তো প্রলয় বা মূর্চ্ছা। অনেক আসরে দেখা গেছে, এইরকম ভাবাবিষ্ট ভক্ত শ্রোতাকে সরিয়ে নিয়ে ডাক্তারী পরীক্ষা করে, হৃদস্পন্দন ব্লাডপ্রেসার এগুলির বিশেষ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা গেছে। সাধারণতঃ কিছুক্ষণ কানের কাছে নাম শুনিয়ে পূর্বাবস্থায় এঁদের ফিরিয়ে আনতে হয়। সীতারাম দাস ওঙ্কারনাথের এক প্রিয় শিষ্য মিলিটারী ক্যাপ্টেন ছিলেন। ক্যাপ্টেন এম্ এন্ রায় পরমভক্ত ছিলেন। ইনি কখনই আমার পাঠের আসরে আধ-ঘণ্টার বেশী শুনতে পারতেন না। তার আগেই অচৈতন্য হয়ে যেতেন। পাঠের শেষে জ্ঞান ফিরে এলে দেখা করতে আসতেন। অশ্রুপ্লাবিত নয়নে মাথায় দুহাত রেখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলতেন। আমার সব শরীরের মধ্যে একটা বৈদ্যুতিক তরংগের মত খেলে যেতো। এসব এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা—প্রত্যক্ষ না হলে কাগজে লিখে বা মুখে বলে বোঝানো যাবে না।

১৯৮৪ সালে টরেন্টো ইউনিভার্সিটি কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে, 'লাভ সেন্টিমেন্ট অ্যান্ড ইটস স্পিরিচুয়াল ইমপ্লিকেশন ইন গৌড়ীয় বৈষ্ণবইজম্' শীর্ষক বক্তৃতা দিয়েছিলাম কথকতার স্টাইলে। সাউথ এশিয়ান সিরিজ, অকেশন্যাল পেপার নং ৩৫, সামার, ১৯৮৫। মিচিগান্ স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে 'বেঙ্গল বৈষ্ণবইজম, ওরিয়েন্টালিজম, সোসাইটি অ্যান্ড দি আর্টস' নামে একটি বক্তৃতা সংকলনও ছাপা হয়েছিল। সংকলনটির

সম্পাদক ডঃ যোশেফ টি ওকোনিল সম্পাদকীয় নোটে ওই বক্তৃতাটি সম্পর্কে লিখেছিলেন: "This somewhat larger and more formally arranged written version cannot duplicate the quality of evocative expression that Dr. Chaudhury achieved in her distinctive and exquisite—oral expression to the conference. There she deftly interwove *prose expression*, Sanskrit *recitation* and vernacular *Indian Songs* all conveyed with *apt facial expression*, *gestures* and *other dramatic embellishments*. The written version does however indicate structure, sources, theological content and, one might hope something of the poetic quality and fervor of this mode of Gaudiya Vaisnava discourse cum recital.
এই যে "Discourse cum recital" অর্থাৎ কথকতার প্রয়োজনীয় অংগগুলি বলেই দেওয়া হয়েছে—(1) prose expression, Sanskrit recitation, Vernacular Indian Songs, apt facial expression, gestures, other dramatic embellishments. সংস্কৃত আবৃত্তি, তার ব্যাখ্যা, সংগীত (যদিও শুধু বাংলা গান নয়, প্রয়োজনবোধে এই সব গানের ইংরাজী অনুবাদ, হিন্দীতে অনুবাদ, সংস্কৃত গানও করে দেখেছি চিত্তাকর্ষক হয়), মুখচোখের ভঙ্গী, অভিনয়োচিত অংগগুলির ব্যবহার কথকতাকে রসোত্তীর্ণ করে।
এই গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি অন্যত্র বলেছেন : "Basanti Chaudhury demonstrated to the Conference a distinctive style of Gaudiya Vaisnava discourse cum recitation cum song. With her fine voice and meticulously modulated gestures and facial expressions she dramatised one esthetic subtlety and emotional power of devout love epitomised in Radha's passion of Krishna. She also sang a selection of devotional lyrics, Padavali Kirtan......... The volume begins with a written version of other elaboration in poetry and prose of eight phases of Radha's love for Krishna."

প্রফেসর ওকোনিলের এই যে প্রবন্ধের সমালোচনা তাতে মোটামুটি বোঝা যাচ্ছে কথকতার সার্থকতা বা রসপুষ্টি কিভাবে হতে পারে। সংস্কৃত আবৃত্তি—যে শাস্ত্রকে ভিত্তি করে কথার আরম্ভ প্রথমে মংগলাচরণের মাধ্যমে গুরুবন্দনা, কৃষ্ণ শিব গণেশ প্রভৃতি উপাস্য দেবতাদের বন্দনা, গৌর নিত্যানন্দ ও ছয় গোস্বামীর ও ভক্ত শ্রোতাদের বন্দনা করে নিতে হয়। সংস্কৃত, বাংলা, ইংরাজী যে ধরনের শ্রোতার সামনে উপস্থিত হবেন, সেটি অনুবাদ করেও নিতে পারা যায়। মূল গ্রন্থের সংস্কৃত শ্লোক অবশ্যই শুদ্ধ ও সুরে আবৃত্তি করতে হয় না হলে কথকতার গুরুত্ব হয় না। তারপর তার ব্যাখ্যার সময় পদ্যে প্রয়োজনীয় শাস্ত্রসিদ্ধান্ত, অন্যোক্তি, আবৃত্তি (যে কোন ভাষায়) করা হবে।

শেষে শ্রোতাদের জন্য কল্যাণ প্রার্থনায় সমাপ্তি হবে। সবসময় তৈরী থাকতে হবে কথকতার পরে শ্রোতাদের প্রশ্ন থাকলে যাতে তার সুষ্ঠু সমাধান করতে পারা যায়। শিক্ষকতার ক্ষেত্রে যেমন শিক্ষককে অনেক রকম প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে উত্তর দিতে হয়। এডিনবরো ইউনিভার্সিটিতে বক্তৃতার পর আমেরিকান ছাত্রছাত্রীরা ঘিরে এসেছে টেবিলের কাছে। জিজ্ঞাসা করছে—রাধাকৃষ্ণ তোমাদের উপাস্য। But it is illegal love. How do you reconcile ? তাদের এই সন্দেহভাজনের জন্য আবার শুরু করতে হয়—আলোচনা। এই ধরনের নানা প্রশ্ন। এইরকম শাস্ত্র সিদ্ধান্ত সম্পর্কে'ও যেমন, তেমনই কারো ব্যক্তিগত, পারিবারিক সমস্যা সমাধান সম্পর্কে'ও প্রশ্ন আসে। অধিকাংশ শ্রোতারা ধরেই নেন, যিনি কথকতার আসনে বসেছেন, তিনি তাঁদের চেয়ে জ্ঞানবৃদ্ধ। যদি এমন কেউ থাকেন, তা না মনে করলেও প্রশ্ন করেই শুধু ব্যস্ত করতে চান, বিরক্তি প্রকাশ না করে যথাসম্ভব তার সমাধান করতে চেষ্টা করা উচিত। সংগীত নির্বাচনে আমি কীর্তন, বাউল, লোকসংগীত, রবীন্দ্রসংগীত, প্রাচীন বাংলা গান, ভজন সবরকমেই উদার। বিদেশে গানগুলিকে সেই ভাষায় অনুবাদ করে এবং সেই একই সুর বজায় রেখে গাওয়াতে শ্রোতাদের চিত্তরঞ্জন করার আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছিল। আমার তো মনে হয়, কথকসম্প্রদায়ের বিভিন্ন ভাষাগত দক্ষতা জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সাহায্য করে। ওকোনিলের ভাষায় 'facial expression' ও 'dramatic embellishment' এই দুটিই কথকতায় প্রয়োজনীয়। পাণ্ডিত্যপূর্ণ পাঠ কিছু পণ্ডিত শ্রোতাকে অনেকক্ষণ মুগ্ধ করে রাখতে পারে। কিন্তু একটি আসরে শ্রোতা তো নানারকম থাকেন। এই কথাটি মনে রেখে সকলের পক্ষে যাতে চিত্তহারী হয় সেজন্য কথকতার পক্ষে এগুলির প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়। কীর্ত্তনে দোহাররা থাকেন, নানা যন্ত্রও থাকে কিন্তু কথকতা ওয়ান-ম্যান-শো। এখানে দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর সাহায্য ছাড়াই যাকে বলে নন-স্টপ-এক্টিভিটি-শো করে যেতে হয়। সেজন্য একজন কীর্ত্তন গায়কের চেয়ে কথকের কাজ পরিশ্রমসাধ্য বেশী। প্রাসঙ্গিক উপাখ্যান—বর্ত্তমান সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে তুলনামূলক আলোচনা থাকবে কিন্তু কখনই কাউকে আঘাত করার উদ্দেশ্য নিয়ে কিছু বলা হবে না। মনে রাখতে হবে, কথকতার মাধ্যমে জনশিক্ষার প্রসার ঘটানো যায়। শুধু ধর্মীয় উন্মাদনা নয়, নৈতিক চরিত্রের ওপর এর প্রচুর প্রতিফলন আছে। আমেরিকায় কোনো একজন শ্রোতার নিজমুখে উক্তি "একদিন এসে আমার বাড়ী পাঠের পর আপনি সমস্ত চরিত্র বদলে দিয়েছেন বলে আমি যে কি কৃতজ্ঞ বলতে পারি না।" উত্তরবংগে একজন মাড়োয়ারী ভদ্রলোক পাঠের পরদিন নিমন্ত্রণ করে বলেছিলেন, "আমি এক বছর ঘুমোতে পারিনি। মাতাজী—কাল পাঠ শুনে যাবার পর আমি একবছর বাদে ঘুমোতে পেরেছি।" এইরকম কতই না অভিজ্ঞতা হয় কতজনের জীবনে শ্রবণের মাধ্যমে। ১৯৯২ সালে আমেরিকার শিকাগো শহরে এক মুসলমান ডাক্তারের বাড়ীতে ভাগবত পাঠের আমন্ত্রণে গিয়েছিলাম। একজন মুসলমানের বাড়ী পাঠ করছি, এটা আমার

কথকতা জীবনের অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল। একজন বাঙ্গালী ডাক্তার অশোক রায় ও একজন মহারাষ্ট্রী ভদ্রলোক ছাড়া সে সভায় সবাই আমেরিকান ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা ছিলেন। পাঠের পর একজন সাহেব গায়ত্রী মন্ত্রের ব্যাখ্যা শুনতে চাইলেন। এও এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা। একজন অভারতীয় শুনতে চাইছেন গায়ত্রী মন্ত্রের ব্যাখ্যা। এই ব্যাখ্যা শোনার পর আমাকে চিঠি লেখেন—"I have grasped the meaning of Gayatri. It has a tremendous effect on me." তিনি বলেছেন "আমি তোমার টেপের কপি আমার অনেক বন্ধুদের দিয়েছি। আর আমি গাড়ী চালাবার সময় শুনতে শুনতে যাই। I am not tired of it". সেখানে উপস্থিত ডাক্তার রায় জিজ্ঞাসা করেছেন—"আপনাদের বুঝতে কি কোনো অসুবিধা হয়েছে?" আসল কথা আমার উচ্চারণ বা Intonation তো আমেরিকানদের মতো নয়। তাঁরা বলেছেন, "না আমাদের বুঝতে কোনো অসুবিধাই হয়নি। উনি শুধু তো মুখে কথা বলছেন না, ওঁর সমস্ত শরীরটাই কথা বলছে। এইখানেই কথকতার সার্থকতা। যখন কথকতার আসনে উপবিষ্ট কথকের শুধু মুখই কথা বলে না। সমস্ত শরীর কথা বলে। ১৯৮৮ সালে বার্লিনে কথকতা করার সময় সভায় এমন কয়েকজন শ্রোতা ছিলেন—যাঁরা ইংরাজী বুঝতেন না, কিন্তু বুঝতে না পারলেও কিছু বুঝতে পারছেন কিনা জিজ্ঞাসায়—তাঁদের মধ্যে একজন মন্তব্য করেন খুবই কম বুঝেছেন—"Very little, but I have appreciated the spirit. যার জন্য দুঘণ্টা স্থির হয়ে বসেও ছিলেন। এই Spirit-টা কি? এটা হৃদয়ের ভাষা, আঞ্চলিক, প্রাদেশিক বা আন্তঃপ্রাদেশিক ভাষা নয়। লন্ডনের কেন্ট নিবাসী লুই স্টুয়ার্ট এই কথাই মন্তব্য করেছিলেন—"এটা হৃদয়ের ভাষা, Soul দিয়ে বুঝতে হয়। তাই এঁর বক্তব্য তো আমার কাছে কিছুই দুর্বোধ্য ঠেকে না। তবে আমি বাংলা শিখবো, সংস্কৃত দর্শন, ভক্তিশাস্ত্র পড়বো। আমি বর্ণপরিচয় পড়তে আরম্ভ করেছি।" এতই ইনস্পায়ার্ড হয়েছেন। এই হোলো কথকতা। ফকরুদ্দীন আদমজীর ভাষায় I am not tired of it, কথকতা "ক্লান্তি বিহীন ফুল ফোটানোর খেলা।" যা কথক ও শ্রোতার চিত্তে অনির্বচনীয় মাধুর্য্য প্রভাব বিস্তার করে। □

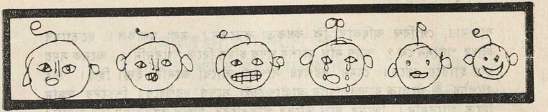

কথকতার টুকিটাকি

যে কোনো কাজের সূত্রে জমে ওঠে নানা তথ্য, টুকরো খবর। প্রবন্ধ বা নিবন্ধের গতের মধ্যে সে সব তথ্য ও খবরকে রাখা সঙ্গত হবে না। এলোমেলো থাকার মধ্যেই ধরা পড়ে খবরগুলির তাৎপর্য। কথকতাকে নিয়ে আমাদের অনুসন্ধানসূত্রে এইরকম কিছু খবর সংগৃহীত হয়েছে। খবরগুলি বিক্ষিপ্ত তাই সাজানো মুশকিল। কিন্তু তথ্যগুলি এমন কিছু আনাচ-কানাচের খবর দেয়, যা ধারাবাহিক আখ্যানের ছকে পড়ে না।

কথকতার স্বর্ণময় যুগে বাংলার দুই সাহিত্যিক কথকতা সম্পর্কে কীভাবে তাঁদের মত প্রকাশ করেছেন, তার নমুনা আমরা প্রথমে হাজির করেছি। প্রশংসা আছে, ঠাট্টাও আছে, প্রতিক্রিয়া অবিমিশ্র নয়।

পেশার তাগিদে কথক ঘুরে বেড়ান, নিজের আয়-ব্যয় ও বাড়ির চিন্তা তাঁকে করতে হয়। ভবঘুরে হরিহরের কথাতো আর আমরা ভুলতে পারি না। হিসাবের খাতার দুটি পাতায় ধরা পড়েছে উনিশ শতকের গোড়ার দিকের এক কথকের দৈনন্দিন খাই-খরচ। ভালো কথক যেমন গান বাঁধতে পারেন, তেমনই ভালো চূর্ণী বা সাট তৈরি করতেও পারেন। কোনো বিশেষ কিছুর জন্য গোছানো লেখাকে বলে চূর্ণী, তা বিবৃতিধর্মী, বর্ণনামূলক। অনুপ্রাসের আড়ম্বর এইসব বর্ণনায় দেখা যায়। শব্দের ঝঙ্কার সৃষ্টি করা চূর্ণকের অন্যতম উদ্দেশ্য। চূর্ণীগুলি নানা জায়গা থেকে সংগৃহীত করা হত বা কোনো দক্ষ কথক চূর্ণী রচনা করতেন। কথকের শিষ্যরা সেই সাট বা চূর্ণী অনুসারে আসর জমাতেন। গদাধরের সাট রাঢ় অঞ্চলে প্রচারিত, আবার রামধনের সাট কলকাতা ও চব্বিশ পরগণা অঞ্চলে জনপ্রিয় ছিল।

নানারকমের চূর্ণী আমরা সংকলিত করেছি। লম্বা লম্বা চূর্ণীতে নানা ধরনের চিত্র আছে। আবার নারীরূপের বিবৃতিতে প্রথাসিদ্ধ উপমাগুলির 'অনুপ্রাসিত সমাবেশ' লক্ষণীয়। সংস্কৃতের ঢঙে বাংলা পদ্যও চূর্ণীরূপে ব্যবহৃত হত। উনিশ শতকে চূর্ণী ছাড়া কথকতা করার কথা ভাবা যেত না। এইগুলি মূল আখ্যানের অংশ নয়। অনেক সময় টুকরো কাগজে আলাদাভাবে লেখা হত।

যে কোনো শিল্পীর চাই স্বীকৃতি ও প্রচার। মানপত্র বা কার্ড-এর নমুনা সেই কারণে পেশ করেছি।

কিছু-কিছু কথক নামকরা, তাঁদের প্রসঙ্গে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে নানা তথ্য। আবার কারুর নাম জানি, আর কিছুই জানি না। নামকরা ও অনামী সবাই মিলেই কিন্তু কথকতার ধারাকে পুষ্ট করেছেন। তাই আমরা সাধ্যমতো পাঠক ও কথকের নামের তালিকা তৈরি করলাম। অনেকে বাদ পড়লেন। কারণ আমাদের অজ্ঞতা। অনেকের সম্পর্কে বোধ হয় আরো কিছু খবর পাওয়া যেত, দিতে পারলাম না। সেজন্যও দায়ী আমাদের অক্ষমতা। আমরা প্রত্যেকটি সূত্র খুঁটিয়ে দেখেছি—বলা

যায় না। গোবিন্দ অধিকারী কি কথকতা করতেন? বলা মুশকিল। হুতোমের হলধর পঞ্চানন কে? অরুণ নাগ মহাশয় পর্যন্ত হদিস দিতে পারেননি। অনেক সময় সূত্র হারিয়ে গেছে। যেমন, ধরণীধর সম্পর্কে আরো জানার ইচ্ছা ছিল। তাঁর প্রপৌত্র শ্রী অলোক বন্দ্যোপাধ্যায় আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও ধরণীধরের শিষ্যদের সন্ধান দিতে পারেননি। ভিটের সঙ্গে তাঁদের পরিবারের সম্পর্ক অনেকদিন ছিন্ন হয়েছে। ক্ষেত্রনাথ কথক থাকতেন বাগবাজারে, শেষে মারা যান কাশীতে। আর কিছু জানতে পারিনি। বরাহনগরের কুঠিঘাটে 'ঠাকুরদা' বা নারায়ণ দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বংশধররা আছেন, সম্পত্তিও ভোগ করছেন। পূর্বপুরুষের কোনো খবর তাঁরা রাখেন না। আর বাংলাদেশে তো আমরা সেরকম কোনো অনুসন্ধানই করিনি।
আমাদের তালিকাটি নিতান্ত অসম্পূর্ণ। তবু কোথাও একটা আরম্ভ করতে হবে, এই ভরসায় তালিকাটি করা। অন্যরা নিশ্চয় সবকিছু শুধরে দেবেন।

ক. দীনবন্ধু মিত্রের চোখে কথক

পরিপাটী বংশবাটী স্থান মনোহর,
যে দিকে তাকাই, দেখি সকলি সুন্দর,

বিদ্যা বিশারদ কত পণ্ডিতের বাস,
সুগৌরবে শাস্ত্রালাপ করে বার মাস।
এই স্থলে জন্মেছিল শ্রীধর রতন,
কথককুলের কেতু কাঞ্চনবরণ ;
সুভাবে রচিল কত গীত মধুময়

শুনিলে আনন্দে নাচে লোকের হৃদয় ;
অকালে কালের কোলে পড়িল সুজন,
কাঁদিল কামিনী, কন্যা, কবি, বন্ধুগণ।...

ভদ্রজন বাসস্থান গরিফা, নৈহাটী

ভাটপাড়া, যথা চতুষ্পাঠী পরিপাটী,
পণ্ডিতমণ্ডলী করে শাস্ত্র আলাপন,

ব্যাকরণ ন্যায়স্মৃতি ষড় দরশন।
এইস্থানে রামধন কথকরতন
কলকণ্ঠ কলে কল করিত কলন,

সুললিত পদাবলী বিরচিত তাঁর,
সকল কথক সুরে করিছে বিহার।

[—সুরধুনী কাব্য (১৮৭১)। দীনবন্ধু রচনাসংগ্রহ, সাক্ষরতা প্রকাশন, কলিকাতা, ১৯৭৩, ৪৮৪ ও ৪৯০।]

খ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের লেখায় কথক

কিছু কাল পূর্বে, এই পরম পবিত্র গৌড়দেশে কৃষ্ণহরি শিরোমণি নামে, এক সুপণ্ডিত অতি প্রসিদ্ধ কথক আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যাঁহারা তাঁহার কথা শুনিতেন, সকলেই মোহিত হইতেন। এক মধ্যবয়স্কা বিধবা নারী, প্রত্যহ, তাঁহার কথা শুনিতে যাইতেন। কথা শুনিয়া, এত মোহিত হইয়াছিলেন, যে তিনি, অবাধে, সন্ধ্যার পর, তাঁহার বাসায় গিয়া, তদীয় পরিচর্যায় নিযুক্ত থাকিতেন। ক্রমে ক্রমে ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া, অবশেষে, ঐ বিধবা রমণী গুণমণি শিরোমণি মহাশয়ের প্রকৃত সেবাদাসী হইয়া পড়িলেন।

এক দিন, শিরোমণি মহাশয়, ব্যাসাসনে আসীন হইয়া, স্ত্রীজাতির ব্যভিচারবিষয়ে অশেষবিধ দোষ কীর্তন করিয়া, পরিশেষে কহিয়াছিলেন, 'যে নারী পরপুরুষে উপগতা হয়, নরকে গিয়া, তাহাকে, অনন্তকাল, যৎপরোনাস্তি শাস্তিভোগ করিতে হয়। নরকে এক লৌহময় শাল্মলি বৃক্ষ আছে। তাহার স্কন্ধদেশ, অতি তীক্ষ্ণাগ্র দীর্ঘ কণ্টকে পরিপূর্ণ। যমদূতেরা, ব্যভিচারিণীকে, সেই ভয়ঙ্কর শাল্মলি বৃক্ষের নিকটে লইয়া গিয়া, বলে, তুমি, জীবদ্দশায়, প্রাণাধিকপ্রিয় উপপতিকে, নিরতিশয় প্রেমভরে, যেরূপ গাঢ় আলিঙ্গদান করিতে; এক্ষণে, এই শাল্মলি বৃক্ষকে, উপপতি ভাবিয়া, সেইরূপ গাঢ় আলিঙ্গনদান কর। সে ভয়ে অগ্রসর হইতে না পারিলে, যমদূতেরা, যথাবিহিত প্রহার ও যথোচিত তিরস্কার করিয়া, বলপূর্বক, তাহাকে আলিঙ্গন করায়; তাহার সর্ব শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়া যায়; অবিশ্রান্ত শোণিতস্রাব হইতে থাকে; সে, যাতনায় অস্থির ও মৃতপ্রায় হইয়া, অতিকরুণ স্বরে, বিলাপ, পরিতাপ, ও অনুতাপ করিতে থাকে। এই সমস্ত অনুধাবন করিয়া, কোনও স্ত্রীলোকেরই, আকিঞ্চিৎকর, ক্ষণিক সুখের অভিলাষে, পরপুরুষে উপগতা হওয়া উচিত নহে' ইত্যাদি।

ব্যভিচারিণীর ভয়ানক শাস্তিভোগবৃত্তান্ত শ্রবণে, কথকচূড়ামণি শিরোমণি মহাশয়ের সেবাদাসী, ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া, প্রতিজ্ঞা করিলেন, 'যাহা করিয়াছি, তাহার আরা চারা নাই, অতঃপর, আর আমি, প্রাণান্তেও পরপুরুষে উপগতা হইব না।' সে দিন, সন্ধ্যার পর, তিনি, পূর্ববৎ, শিরোমণি মহাশয়ের আবাসে উপস্থিত হইয়া, যথাবৎ আর আর পরিচর্যা করিলেন; কিন্তু, অন্যান্য দিবসের মত, তাঁহার চরণসেবার জন্য, যথা-সময়ে, তদীয় শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন না।

শিরোমণি মহাশয়, কিয়ৎক্ষণ, অপেক্ষা করিলেন; অবশেষে, বিলম্ব দর্শনে, অধৈর্য হইয়া তাঁহার নামগ্রহণপূর্বক, বারংবার আহ্বান করিতে লাগিলেন। সেবাদাসী, গৃহমধ্যে

প্রবিষ্ট না হইয়া, দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিলেন ; এবং, গলবস্ত্র ও কৃতাঞ্জলি হইয়া, গলদশ্রু লোচনে, শোকাকুল বচনে কহিলেন, 'প্রভো ! কৃপা করিয়া, আমায় ক্ষমা করুন। সিমূল গাছের উপাখ্যান শুনিয়া, আমি ভয়ে মরিয়া রহিয়াছি ; আপনকার চরণসেবা করিতে, আর আমার, কোনও মতে, প্রবৃত্তি ও সাহস হইতেছে না। না জানিয়া যাহা করিয়াছি, তাহা হইতে কেমন করিয়া নিস্তার পাইব, সেই ভাবনায় অস্থির হইয়াছি।' সেবাদাসীর কথা শুনিয়া, পণ্ডিতচূড়ামণি শিরোমণি মহাশয় শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন ; এবং দ্বারদেশে আসিয়া, সেবাদাসীর হস্তে ধরিয়া, সহাস্য মুখে কহিলেন, 'আরে পাগলি ! তুমি এই ভয়ে আজ শয্যায় যাইতেছ না ? আমরা, পূর্বাপর, যেরূপ বলিয়া আসিতেছি, আজও সেইরূপ বলিয়াছি। সিমূল গাছ, পূর্বে, ঐরূপ ভয়ঙ্কর ছিল যথার্থ বটে; কিন্তু, শরীরের ঘর্ষণে ঘর্ষণে, লোহময় কণ্টকসকল ক্রমে ক্ষয় পাওয়াতে সিমূল গাছ তেল হইয়া গিয়াছে ; এখন, আলিঙ্গন করিলে, সর্ব শরীর শীতল ও পুলকিত হয়'। এই বলিয়া, অভয়প্রদান ও প্রলোভনপ্রদর্শনপূর্বক, শয্যায় লইয়া গিয়া, গুণমণি শিরোমণি মহাশয় তাঁহাকে, পূর্ববৎ, চরণসেবায় প্রবৃত্ত করিলেন। ...

সন ১২৯১ সাল। (১৮৮৪)
২৫ আশ্বিন।

[—ব্রজবিলাস, দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন/বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, স্বাক্ষরতা প্রকাশন, কলিকাতা, ১৯৭২, ৪৫৪-৪৫৫।]

গ. একজন কথকের হিসাবের খাতার এক পাতা। (১৮৩৪)

৭ শ্রীশ্রীহরিঃ—

সন ১২৪১ সাল—

বিতারিখ ১৪ কার্ত্তিক—

শুভারম্ভঃ—

একজায় সুরুল্যায় কথকতার জমা খরচ—

জমা—	খরচ—
নিজ দং জমা— ১৵০	১৮ রোজ ভ্রাতৃদ্বিতীয়া
খেওয়ায় খরচ—১৵০	গুঃ কৃষ্ণমুনী আশীর্ব্বাদী—।০
	পলা—।০
১৮ রোজ জীবনকৃষ্ণ ঘোষ—।৵০	শিবগুরুর ধুতি খরিদ—।৴০
১৫ কার্ত্তিক বাসার—	জীবনকৃষ্ণ ঘোষ দেন—
যজমান রামমোহন সিংহ—১৲	১ বাটী ১ ধুতি—।৵০
গুঃ গোস্বামী কাত—১৲	

জমা—

উপরি—।০ ।০

২০ রোজ—
নিজ—।০
উপরি—।০ ৷৷০

২১ রোজ—
নিজ—৷৷০ ৷৷০

৩৷৷৶০

২২ রোজ কামাই—
২৪ রোজ শিব বিবাহ—
বাটি ১ খানি ১ রিকাবী ১ খানি
কা নিজ—৷৷০ ৷৷০
২৪ রোজ ধ্রুব চং—১৲
নিজ—।০
উপরি—৵০

২৮ প্রহ্লাদ চং—৷৷০
নিজ—।০
উপরি—।০

৫।৶

বাদ খরচ— ৪৷৷৴০
বাকী তং— ১৴০
বাদ খরচ ৩০ রোজ— ১৴০

২৯ রোজ বলি বামন—
আপকরা ১টী—
বস্ত্র গামছা ২ খানি—
চাল—১৷৷০ কাঠা

নিজ দং ফেরি— ৷৷০
দুই ভ্রাতা— ৷৷০

১৲

উপরি— ৷৷০
দফে উ— ।০

১৷৵০

৩০ রোজ নিজ— ।০

২৲

খরচ—

২২ রোজ রাণীপুরের—
গুঃ হরিনারায়ণ দত্ত—১৲
বাটী পাঠাই—
কলা—১৲

১৷৷৴০

২৯ রোজ কান্ধি দং—
হুকা কাপড় খরিদ—
গুঃ নন্দমোহন সিংহ— ৴০
ধুতি ১৷৷০ চাদর ১৷৷০ এঃ ৩৲

৪৷৷৴০

৩০ রোজ শ্রীশিবগুরু ভং ১৴
বাটী লই যান ১৴

৫৷৷৶০

জমা পয়সা—১৷০
১১ রোজ অগ্রহায়ণ—
তুলসীমালা খরিদ—১৫
গন্ধী গুঃ গঙ্গানারায়ণ—
মিসি খরিদ—১০

কাহার বেগারের খরচ—
১৯। ২১ রোজ—
জসত কাহার দিগর— ।০
শ্রীসার্থক ও শ্রীকাসী ঘলুই—
ইলাম— ৴০

মূলা খরিদ—
শুরুলিয়া পাঠাই—
বঃ জীবণকৃষ্ণ ঘোষ—
৴১০ কাত ১২ টা ৴১০

২২ রোজ—
নাঃ ১২ কার্ত্তিকের—
দুগ্ধের দেনা শোধ—
গুঃ গোপবধূ—
পয়সা— ৵১০

জমা—	
১ অগ্রহায়ণ—	
নিজ—।০	।০
২ রোজান্নপ্রাশন	৸০
থাল ১ খান বস্ত্র ১ জোড়—	
নিজ নগদ—	॥০
ব্রজমোহন—	।০
	৸০
৩ রোজ নিজ—।০	।০
উদূখল ধং—	
৪ রোজ নিজ নিজ—॥০	॥০
৫ রোজ নিজ—।০	।০
৩ রোজ নিজ ।০—	।০
	৪।০

ইত্যাদি

খরচ—	
ডালা খরিদ—	
গুঃ বেহানী—	/০
	॥৶১০
২৪ রোজ—	
জুতা খরিদ—	
২ জোড় কাত—	।১০
হাট খরচ—	/৫

ইত্যাদি

[—চিঠিপত্রে সমাজচিত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, (পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত), বিশ্বভারতী, ১৯৫৩, ৮৯-৯০ ।]

ঘ. চূর্ণী বা সাট

(নানা বিষয়ে সাজানো ছকে ফেলা বর্ণনা)

শিবের বর্ণনা :

রজত কলেবর সুজুট কলাপকুসুম পরিপূরিত নির্জ্জরগণ পুরন্দর নগরনাগরীগণ গন্ধর্ব্বাসরসো গণসেবিত ভূতপ্রমথগণবেষ্টিত হর বিশ্বের গঙ্গাধর ডিণ্ডিম করভস্মভূষিত কলেবর কিবা মস্তকোপরি জটাজুট কালকূট বিষোন্দন মত্তফণিরাজ বিরচিত বিল্বপত্র দ্রোণ পুষ্পচ্ছটা তদুপরি কৃতধন্য তরণী সুরধনী মনোহারিণীঃ তদধঃ কষায় রুদ্রপালা কর্ষিত সুপক্ষাচ্ছাদিত ঢুলু ২ ঘোরতর চঞ্চলতার বনয়াঙ্গরীকঃ করধৃতঃ ডমরুরবঃ রামরামবারিত মদোন্মনা কটিবর্ত্ত সর্পডোর বিবিধাঞ্চল পরিধেয় ব্যাঘ্রচর্ম্মসজ্জিত গান তান মান বিসানভান করতাল বররক্ষা রামনামোচ্চারণ করিতেছেন ।

[কথকতার পাতড়া, বিশ্বভারতী সংগ্রহ, ৫০৬৯]

নারদ বর্ণনা :

কিবা প্রাতংকালোমিত রবিমণ্ডলনককৃত মূর্ত্তি শোভা কিবা স্বাঙ্গোত্তমাঙ্গ স্থিত

জটা ঘটা ছটাতে করে দির্গ্বদিক স্থিতান্ধকারধক সন পূর্বক আপাণ্ডরা জটা পাটলা লম্বমানা আগুল্ফ পর্যন্ত আবক্ষ শ্মশ্রুভার বিরাজিত নাভিদেশ কিবা আজানুলম্বিত বাহুযুগল প্রোচ কদম্বকুসুম শম শরীরধ্বজ বজ্রাঙ্কুশাদি শ্রীকৃষ্ণচরণতল তুলসিমালায় লম্বিত হরিচন্দ্র নামাঙ্কিত কলেবর বিশুদ্ধ বক্ষস্থল গোপিচন্দন বিলিখিত শ্রীকৃষ্ণ-নামাঙ্কিত কলেবর ত্রিতন্ত্রী বীণা স্কন্দাবলম্বিনী তাতে ॥

[কথকতার পুঁথি (শ্রীমদ্ভাগবত), ২৭৮৩/১৩ বরাহনগর পাঠবাড়ী। রামপদ ভট্টাচার্যের পুস্তক। শকাব্দ ১২৯০ [১৮৮৩] ২৩শে আশ্বিন সপ্তমি পুজা আরম্ভকালে সমাপ্ত]

বলরাম বর্ণনা :

কিবা মহাবল পরাক্রম বলরামচন্দ্র চন্দ্রকান্ত মণিকান্তি বিনিন্দিত রজতপর্বত শ্বেত-শরীর অতি সুধীর গভীর ধীরবেশ কটিদেশোপরি পরিবেষ্টিত পরিধিতা পরিস্কৃত নবীন নীল নীরদ সম্পদ তিরস্কৃত নীলপট্ট বস্ত্রাঞ্চল অমল কমল পদতল পর্যন্ত আন্দোলিত হতেছে। যেন হলাকর্ষণভীত যমুনা শরণগত হয়্যা সর্বদা পাদপদ্মে পতিত হয়্যা রয়েছেন। কিবা সুবলিতা জানুলম্বিত করিশিশু শুণ্ডদণ্ডিত প্রকাণ্ড বাহুদণ্ড মণ্ডলাকৃতি বলয় প্রভৃতি মণ্ডলমণ্ডিত নানাস্বর্ণাভরণস্ফুরিত বামস্কন্ধোপরি-পরিপাটী মণিমাণিক্যযুক্ত শৃঙ্গজার অঙ্গধ্বনি শ্রবণমাত্র ত্রিজগৎ মোহিত হইতেছে। ইত্যাদি

[বোলপুরের ১২ মাইল পূর্বে গোপডিহি নিবাসী ৺দ্বিজপদ সরকারের পুঁথি সংগ্রহ থেকে উদ্ধৃত। লিপিকার ও লিপিকাল অজ্ঞাত। সূত্র: অমলেন্দু মিত্র, 'কথকতা', কথাসাহিত্য, আষাঢ়, ১৩৬৩, ৭ম বর্ষ। ৭৭৩-৭৭৪]

ভিন্ন কোনো কথকের এক বিষয়ে ভিন্ন চূর্ণী থাকে। রাঢ় অঞ্চলের অন্য এক কথকের **বলরাম রূপ বর্ণন :**

শারদীয় চন্দ্রপ্রভামণ্ডল মণ্ডিত চমৎকৃত রূপলাবণ্য কোমলাঙ্গি সুকোমলরূপ যুগল-শোভা আকণ্ঠ শ্রমমণ্ডিত গজমৌক্তিক হাটক হিরক চরণারবিন্দ শব্দ শোভিতৈক নূপুর রমণীয় বাজিতো রুনু জুগোনদ্ধ মৃগেন্দ্রানিন্দিত ক্ষীণকটিতট সম্ভূত তমালনিল দুকুলোদ্ধ গুরুতর গভীরনাভি সরোরুহ ত্রিবলি বিরাজি দ্বাতিশয় বিশালবক্ষস্থলা··· বিপুল বলয় বিনশিত বাহুযুগলা প্রকাশিত করকমলদ্বয় বামপাণিতলধৃত বারুণী মুদিতমদ বিঘূর্নিতান সবিষদলোল ভ্রমর ভূষিতা মুখমণ্ডল মৃদু ২ মধুর মন্দ হাস্য প্রকাশিতা

[কথকতার পাতড়া, বিশ্বভারতী সংগ্রহ, ৫০৫৫-৫০৬২]

নায়িকা বর্ণনা বা কামিনী বর্ণনা :

পরম কামিনী যুবজন মনোহারিণী রতিরস বিলাসিনী খেলিত খঞ্জন গর্বগঞ্জন নয়না

কোমলা কিশোরী ভ্রূভঙ্গরঙ্গে মদনতরঙ্গে সমাকুলা হাবভাব লাবণ্যগতি রূপবতী গুণবতী ॥ যুবতী অতিশয়রসিকা কনকলতিকা তিলপুষ্পোপমনাসিকা মুক্তাপংক্তি বিনিন্দিত দন্তপংক্তি শোভা নাসাগ্রে গজমুক্তান্দোলায়মানা সুকেশা সুবেসা সুভাষা সুনাসা ভব্যা সভ্যা নব্যা নিবীড় নিতম্বা পক্কবিম্বধরোষ্ঠা মণিময়ভুষণ ভূষিতাঙ্গয়ষ্টি ললাটোত প্রথমসিন্দুরবিন্দু তন্নিকটভাগে চন্দনবিন্দু তন্নিকটভাগে কজ্জলবিন্দু তৎ পশ্চাৎ হরিতালবিন্দু শোভা পেতেছে।

[একই কথক আবার এক বিষয়ের উপর ভিন্ন শব্দে চূর্ণী লিখেছেন। যেটা যখন যুৎসই মনে হবে সেটা পড়া যাবে।]

কামিনী বর্ণনা :

ফুৎ [?] সিত করিকর চরণার্পিত শিঞ্জন মণিময় নুপুরাদ্যাভর নাতিশয় বিপুল নিবিড় নিতম্ব ॥ ক্ষিণ মধ্যদেশার্পিত কাঞ্চিঘন জঘনলগ্ন মগ্ন বাতান্দোলায়মানা তদুপরি ত্রিবলীশোভা কিবা করিকরকুম্ভ বিনিন্দিত স্তনভারানম্র মধ্যদেশ যেন ভেঙ্গে ২ পড়িতেছে। কিবা শিরীষকুসুম কোমল মৃণালায়ত বাহুযুগল তাতে স্বর্ণমণিময় বলয়াঙ্গুরিয়কাদি শোভা কিবা খঞ্জন গঞ্জন যুবজনরঞ্জন নয়নাপাঙ্গ ॥ রীক্ষণ স্মিতোৎ-ফুল্লনিভমুখ পক্কবিম্ববিড়ম্বিতৌষ্ঠা ধরান্তবর্তি দর্শনশোভা তাতে কৃষ্ণবর্ণরেখা কিবা তিলকুসুমনন্দিত নাসাগ্রে গজমুক্তান্দোলায়মানা কিবা কন্দর্পকোদণ্ড দর্পখর্ব্বকৃত ভ্রূভঙ্গভঙ্গি যেন নৃত্য করিতেছে। তন্মধ্যে রাহুপম কজ্বলবিন্দু পরিচন্দ্রমণ্ডল বিড়ম্বিত চন্দনবিন্দু তদুধ্যে মুক্তাঝলক ঝলমলিকৃত স্বর্ণপাত্র ॥ কোপরি শোভিতালক শ্রেণী চমরীচামর চমৎকৃত চিকুরাবেষ্টিতা মল্লিকা মাল্যভূষণা গজেন্দ্রগমনা কোকিলবচনা সহাস্যবদনা পরমকামিনী সভ্যাভব্যা ঝমর ২ শব্দে আগমন করিতেছে।

[কথকতার পুঁথি, শ্রীমদ্ভাগবত,
শ্রী রামপদ ভট্টাচার্য, পূর্বোল্লিখিত]

বর্ষার রূপকথন :

দেবরাজ প্রেরিত গভির ঘোর ঘনরব মেঘগর্জিত ঈশান দিগঙ্গন সৌদামিনী জালমালা স্থীকত চকিত প্রকাশীকৃত দিনকর নিকর কিরণছবি প্রকাশ নিবিড় মেদুরচ্ছন্নাবৃত্ত তিমিরকলাপ দিগ্দিগন্তর করিবর বিপুলকরনিকর সমাসার শীকর কদম্বকরকাদি পত্যনানুপযুতা মহীপূর্ব দিগঙ্গ নাগত্তাতি খরতরবেগাম্বুকণাযুক্তা পবনসঞ্চালিত নমিত বিটপী বিটপ দোদুল্যমান তরুপল্লব শাখাপ্রশাখা বিহগগণ শীতার্তকম্পিত কলেবর নিবীড় বৃক্ষশাখাস্থিত নিঃশব্দ নিজ নিজ নীড়স্থিত রুগ্নহৃদয় ডিম্বশাবকোপরি নিজহৃদয় কলেবর সংযোগে বিজোগাকুল পক্ষবিস্তৃতাচ্ছাদিত শাবকোদিত পূর্বদিগন্তর দেদীপ্যমান শক্রধনুঃ শোভিত নভোমণ্ডল কাদম্বিনী সৌদামিনী চঞ্চলো তদ্দর্শনোদ্বেজিতান্তোকরণ মত্ত করিবরা রোহনকৃত দেবেন্দ্র নিজায়ুধ ॥ বজ্র নিষ্পেশচিত ইরংমদস্খলিত পতিত কণাসমূহ গর্জিত বজ্রপতন ভয়ানক ধ্বনি শ্রবণকারণ সভয়চকিতা নয়নো দ্বেজিত

পান্থজন পক্ষিগণ গান [*sic*] প্রমাদ বিশঙ্কট ত্রাসিত এককালীন কুহু কুহু কলরব চিচিকুচি ধ্বনি করিতেছে।। শ্রী রামপদ ভট্টাচার্য ।।

[সূত্র : ঐ]

নিশিবর্ণনা :

ঘোরা যামিনী, নিবিড় গাঢ় তমস্বিনী, শান্তা নলিনী কুমুদগন্ধামোদিনী, পৃথিবীঝিল্লী-রবোন্মাদিনী, বিহগরবক্ষণবিধ্বংসিনী, নক্ষত্রনিকরজালমালব্যাপ্তা যামিনী সভয়চকিত নয়না কামিনী মনোনায়ক নিকটাভিসারিকা নায়িকাগণ ক্ষণ ক্ষণ দিগভ্রান্তাদিজন্য স্থগিত চকিত গতি কষ্টে সৃষ্টে গমন করিতেছেন। ব্যাঘ্র, ভল্লুক, ভয়ানক জন্তুসমূহ ভোজনাদ্যার্থ গমন করিতেছে। প্রতি যামে যামে জাগ্রতভট ঘোর কঠোর চীৎকারধ্বনি প্রবোধিত কান্তাকান্ত প্রবেশিত হৃদয় সঙ্কোচিত ভঙ্গ বিভঙ্গ দ্বারা গাঢ়ালিঙ্গনে মনোহরণ-পূর্বক পুনর্নিদ্রাবিষ্ট হইতেছেন।

[সূত্র : Dinesh Chandra Sen, *History of Bengali Language and Literature*, Calcutta, 1911, 686]

রাজার যুদ্ধোদ্যম :

পুণ্যবান দানবান জ্ঞানবান ধনবান কলাবান কুলবান শিলবান ফালবান বলবান রূপবান কৃপাবান কলাপবান ক্রিয়াবান মায়াবান ভোগবান ভগবান যোগবান লক্ষিবান বিদ্যাবান সত্যবান দয়াবান এবম্ভূত রাজার প্রতাপে সপ্তসাগর পর্যন্ত আন্দোলয়মানা অতি চমৎকৃত গাঢ় পরিপূর্ণ রঙ্গধূলি অঙ্গে লেপনকে করে বাহুআস্ফালনেতে পর্ব্ব্যত সকল ঘূর্ণা-অমান করিতেছেন। পচ্ছাতে ঢালি সকলেতে লম্ফঝম্ফ খড়গাবলম্বনপূর্ব্বক মার্ম্মার শব্দ উচ্চরণ করে গমনকে করিতেছেন ও খাঁড়া চর্ম্মি রক্ষি রথী সূলী ত্রিসূলীধারি পুরবর্ত্তি নানা অস্ত্র ধারণকে করে সন্য সকল গমন করিতেছেন।

... সর্ণ্য রূপ্য স্ফটিক মরকত মুনীমাণিক্য প্রবালেতে খচিত সেনা নানা অস্ত্র ধারণ করে গমন করিতেছেন। বানে বানে পুঙ্খাণুপুঙ্খ সূর্যের কিরণাষুন্য ধন্য অন্ধকার উরুভুজ-চরণাদি খণ্ড খণ্ড বিপক্ষ পক্ষ সেনা পরাঙ্মুখ পলায়মানা তাতমাত ভ্রাতর দুহিতর মায়াতুল জলংদোহি পিবায়াহি পপাতচ মমারচ।

[রতন লাইব্রেরির সংরক্ষিত পুথি থেকে সংগৃহীত, সূত্র : Siva Ratan Mitra, *Types, of Early Bengali Prose*, Calcutta, 1922, 146]

সন্দেশ বর্ণনা :

গোণ্ডা গোণ্ডা চ মোণ্ডা মধু মনোহরা শুভ্রতাক্ত জিলাপী।
গোল্লা খাজা চ খণ্ডা নিখুতি চ বরফি ক্ষীরতাক্ত মতিচুর।
খুর্মা ছাবা চ পেড়া রসযুত গেঁদড়ী স্বর্ণপাত্রে কচুরী।
সর্বে ক্ষীরান্তভুক্তা রসকর বুঁদিয়া হেমপাত্রে চ বারী।।

ভুক্তা পীত্বা চ নীত্বা নিজ নিজ বসনে ভূরিভারং স্বহস্তে।
দত্বা নীত্বা চ পাত্রং দধ্যপি গৃহীতং দেহি দেহীত্যু বাচে ॥

[নবদ্বীপ কৃষ্ণনগর অঞ্চলের কথকতার পুঁথি, কাল ও লিপিকর অজ্ঞাত। সূত্র : হরিপদ চক্রবর্তী, 'কথকতার পুঁথি', সুবর্ণলেখা, আশুতোষ ভট্টাচার্য ও অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৪, ৫৯০]

৬. মানপত্রের অংশবিশেষ

বৈদ্যনাথধামের অধিবাসীবৃন্দের অভিনন্দপত্র। ১৩৪৬। পৌষসংক্রান্তি।
অভিনন্দন পত্রের সম্বোধন অংশ।
ভাগবতশ্রী শ্রীমতি ক্ষান্তিলতাদেবী, ভাগবতসীমন্তিনী, ভাগবত বিনোদিনী ভক্তি বিভূষণা ভাগবতভারতী মহোদয়ার করকমলে !

ভদ্রে !

আপনি যখন শতশত ভক্ত পরিবেষ্টিতা হইয়া দিনের পর দিন ভাবে বিভোরা ও তন্ময়া হইয়া লীলারূপধারী পরমাত্মা নানা লীলাকাহিনী সুমিষ্ট ও পবিত্রভাষায় অনর্গল বলিয়া যান, তখন সেই সত্যযুগে ঋষিকন্যার চিত্র আমাদের মানসপটে উজ্জ্বলরূপে ফুটিয়া উঠে। 'সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত, শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয়ে হৃদয়ে বৈদিকযুগের শুভ্র-জ্যোতির স্নিগ্ধবিকাশ যথার্থরূপেই অনুভূত হয়।
উপনিষদ, বেদান্ত, পুরাণেতিহাস ও শ্রীশ্রীভাগবতের সারমর্ম এরূপ সুন্দর সুললিত ও প্রাণস্পর্শী ভাষায় প্রকাশ করিতে আপনি সমর্থা যে, শ্রোতার সমস্ত চিত্তটুকু শ্রীভগবানের লীলামাধুর্যে ডুবিয়া আত্মহারা হইয়া যায় এবং প্রাচীন ভারতের শিক্ষাদীক্ষার কৌশল মহিমায় প্রাণ উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠে।
কিন্তু হায়! আজ ভারতের বড়ই দুর্দ্দিন। ব্যাস, বশিষ্ঠ, বাল্মিকী, যাজ্ঞবল্কের ভারত আর নাই। গার্গী, মৈত্রেয়ী, মদালসার ভারত আর নাই। আজ পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষায় ও বর্তমানের যুগসভ্যতায় নূতন ভারতের জাতীয় জীবন কর্ণধারহীন, দারুণ-ঝঞ্ঝাবাতাহত তরণীর ন্যায় প্রাচীনের বন্ধন ছিন্ন করিয়া অতলজলধিতলে নিমজ্জমান হইতে চলিয়াছে। আজ প্রাচীন ঋষিকুলের বিদ্যায় সুশিক্ষালাভ করিয়া ভারতের মর্মবাণী শুনাইবার জন্য আপনার এই অপূর্ব অভ্যুদয় আমরা সাদরে বরণ করিতেছি, এবং আপনার এই সর্বজনহিতকর লোকশিক্ষা পদ্ধতিকে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিতেছি।
আপনি সিন্দুর-সীমন্তিনী থাকিয়াও চিরায়ুষ্মতী হইয়া সুস্থশরীরে ভ্রান্ত ভারতকে সত্যের আলোকদান করিয়া শান্তির পথে লইয়া চলুন, ইহাই ভগবৎসমীপে প্রার্থনা করি।

চ. পরিচয়জ্ঞাপক কার্ড

শ্রীরাম রাম রাম
'জয়গুরু'
শ্রীদ্বিজরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় (বেতার)
"রাম-গীতি চূড়ামণি"
"রাম-গীতি সুধাকর"
পোঃ—সোনামুখী (মনোহরতলা)
জেলা—বাঁকুড়া
পিন—৭২২ ২০৭

কথিকা-সম্রাজ্ঞী
শ্রীমতী ক্ষান্তিলতা দেবী
ভাগবত-ভারতী
C/o. শ্রীকুমুদবন্ধু পুরাণরত্ন
ফটক গোড়া।
২৪ নন্দঘোষ লেন, (চন্দননগর) হুগলী
712136

ছ. উনিশ ও বিশ শতকে বাংলার বিশিষ্ট কথক ও পাঠকদের নামাবলী :

বাঁশবেড়িয়া, হুগলী : উনিশ শতক ঃ লালচাঁদ বিদ্যাভূষণ, শ্রীধর কথক, অতুল্যচরণ ভট্টাচার্য। এঁরা সকলেই একই বংশে জন্ম নিয়েছিলেন। শ্রীধরের ভ্রাতুষ্পুত্র অতুল্যচরণ ভট্টাচার্য নিজে কথকতা করতেন। তাঁর কাছ থেকেই দুর্গাদাস লাহিড়ি শ্রীধরের গান সংগ্রহ করেন।

চন্দননগর, হুগলী : রঘুনাথ শিরোমণি চন্দননগরের শ্রেষ্ঠ কথক, শিক্ষক হিসাবেও সুপ্রসিদ্ধ। রামনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁর পুত্র, বিংশ শতকে পিতৃরীতি অনুযায়ী কথকতা করেন। ৺গুরুচরণ গাঙ্গুলি, বেণীমাধব গাঙ্গুলি, ননী কথক, অক্ষয়চন্দ্র অধিকারী, ভূতনাথ ভট্টাচার্য প্রভৃতি কথকও চন্দননগরে বাস করতেন। বিংশ শতকের গোড়ার দিকে প্রফুল্লচন্দ্র অধিকারী ও তমালচন্দ্র অধিকারী কথকতায় যশস্বী হয়েছিলেন।
উদ্ধব চূড়ামণির জন্ম অন্য জায়গায় (বাগনান বা ধনেখালি)। তাঁর কর্মক্ষেত্র অতিবাহিত হয় চন্দননগরে। রঘুনাথ শিরোমণির মতোই কথকতার শিক্ষক হিসাবে তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর মৃত্যু ১৯১৩ সালে।
ক্ষান্তিলতা দেবী ও তাঁর স্বামী কুমুদবন্ধুও বর্তমানে চন্দননগরে বাস করেন।

কোন্নগর, হুগলী : অধুনা মহিলা কথকী অধ্যাপিকা বাসন্তী চৌধুরীর বাসস্থান এই শহরে।

রাধানগর, আরামবাগ মহকুমা, হুগলী : উনবিংশ শতকের শেষপাদে কথক গোপাল চূড়ামণি নিয়মিত আসর বসাতেন।

ফেলারাম বন্দ্যোপাধ্যায়

সোনামুখী, বাঁকুড়া : কথক রীতির অন্যতম আদি প্রবক্তা গদাধর শিরোমণির জন্মস্থান। আজও শ্রেষ্ঠ পেশাদার কথক পরিবারদের আবাস সোনামুখীতে। বিংশ শতকে ফেলারাম বন্দ্যোপাধ্যায় ও মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী, সোনামুখীর জনপ্রিয় কথক ছিলেন। বর্তমানে লছমন প্রসাদ চক্রবর্তী, রসময় বন্দ্যোপাধ্যায় ও দ্বিজরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় পারিবারিক ঐতিহ্যের প্রতিভূ। অন্য কথক পরিবার হলেন ফকিরনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও হেরম্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। এঁরা গতায়ু। এঁদের বংশধর বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও রাজকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায় আজও কথকতা করেন। বিনোদবিহারী চট্টোপাধ্যায় সুকথক ছিলেন। লক্ষণীয় সোনামুখীতে মূলত রামায়ণী কথকতা হয়।

রাঢ়ের অন্য এলাকার কথক : উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র দেবশর্মার পিতা কথক ছিলেন।

নীলকণ্ঠ দেবশর্ম্মা নান্নুরের জগদ্দুর্লভ ন্যায়ালঙ্কারের শ্যালিকাপুত্র ও রাইপুরে কথকতা করতেন। পুথির পুষ্পিকা থেকে যে সব কথকের ও পাঠকের নাম এই অঞ্চলে পাওয়া যাচ্ছে, তাঁরা হলেন রামধন মণ্ডল, রাধারমণ ঘোষ, বদন চন্দ্র মণ্ডল, বেলে-তোড়ের হরিদাস বৈষ্ণব, শ্যামসুন্দর প্রমুখ। রামায়ণ পালা গায়ক ও কথক অবনী অধিকারী বর্তমানে শান্তিনিকেতনে থাকেন।

মুর্শিদাবাদ এলাকার কথক : ১৮৬২ সালে বেলডাঙগায় প্রাণকৃষ্ণ চৌধুরির পরিবারে রূপচাঁদ অধিকারী জন্মগ্রহণ করেন। কথকতা তাঁর পেশা ছিল। পরে কথকতাকে রূপান্তরিত করে তিনি ঢপ কীর্তনের প্রবর্তক হিসাবে খ্যাতনামা হন। মুর্শিদাবাদ বঁরোয়া থানার কুঁকড়াজোল নিবাসী জীবনকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ও উঁচুদরের কথক ছিলেন। কীর্তনীয়া ফটিক চৌধুরি তাঁর শিষ্য।

কলিকাতা, ২৪ পরগনা ও সন্নিহিত এলাকার কথক : উনবিংশ শতকে খাঁটুরা-কুশদহ কথকতা রীতির বিশিষ্ট কেন্দ্র ছিল। উমাকান্ত শিরোমণি, রামধন তর্কবাগীশ ও এঁদের ভ্রাতুষ্পুত্র ধরণীধর বাংলাদেশের সেরা কথকদের মধ্যে পরিগণিত হতেন।
চব্বিশ পরগণার কোদালিয়া নিবাসী অন্যতম প্রসিদ্ধ কথক ছিলেন কৃষ্ণহরি বা কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য, তারাকুমার কবিরত্নের পিতা। পেশায় গদাধর শিরোমণির সংগে তীব্র প্রতিযো-গিতা ছিল। সময়কাল উনিশ শতকের প্রথমার্ধ।

ঠাকুর পরিবারের মাইনে করা পাঠক ছিলেন মহিম কথক, অবনীন্দ্রনাথ তাঁর কথা লিখেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচিত প্রিয়নাথ কথকের উপর প্রথম দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল 'বন্দেমাতরম' এর সুর দেওয়ার। বিংশ শতকের প্রথমপাদে বাগবাজারের ক্ষেত্রনাথ চূড়ামণির জনপ্রিয়তার তুলনা ছিল না। শ্যামপুকুরের কৃষ্ণ কথক-এর পাণ্ডিত্য ছিল কিন্তু বর্ণনার ভঙ্গিতে তিনি ক্ষেত্রনাথের কাছে হার মানতেন। তাঁদের সময়ে পণ্ডিত হেমচন্দ্র কবিরত্নও নামকরা কথক ছিলেন।

কালীঘাটের গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, খিদিরপুরের ক্ষীরোদচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, আড়িয়াদহের নেপালচন্দ্র ভাগবত রত্ন মহাশয় প্রভৃতি কথকদের নাম উনিশ শতকের শেষে ও বিংশ শতকের গোড়ায় উল্লিখিত হচ্ছে। রামকৃষ্ণ পরমহংসের পরিচিত বরাহ-নগর নিবাসী ঠাকুরদা বা নারায়ণ দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই সময়ের লোক। এই শতকের গোড়ায় মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মোহন গোস্বামীপ্রভু কথকতা করতেন। বিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে, ষাটের দশকে, চুঁচুড়া নিবাসী সীতারাম ভাগবতাচার্যও ভাগবতী কথকতায় যশস্বী হয়েছিলেন।

পুথির পুষ্পিকা থেকে আমরা উনিশ শতকের কিছু কথকের ও পাঠকের নাম পাই। শালিখার শ্রীমন্ত নাগ, ত্রৈলোক্য নাথ গঙ্গোপাধ্যায় রজপুরের মাণিকচন্দ্র ঠাকুর, বাকুন্ডার মতিলাল মুনি বৈষ্ণবী, ইত্যাদি। পানিহাটি-বরাহনগর অঞ্চলে রামপদ ভট্টাচার্য কথক ছিলেন, তাঁর নামাঙ্কিত পুথি পাওয়া গেছে। লক্ষণীয় যে পাঠক বংশানুক্রমিক

পদবি হিসাবে ব্যবহৃত হলেও 'কথক' বংশগত পদবিরূপে উল্লিখিত হয়নি। অবশ্য শ্রীধর কথক, ক্ষেত্র কথক ইত্যাদি পরিচিতির ডাক হিসাবে পরিগণিত হত। পেশা থেকে বংশগত পদবিতে রূপান্তর হবার সম্ভাবনা কথকের ছিল। কিন্তু তা হয়নি।

শান্তিপুর অঞ্চলের কথক :

মদনগোপাল গোস্বামী, রাধিকানাথ গোস্বামী, রাধাবিনোদ গোস্বামী, হরিশ্চন্দ্র গোস্বামী, তারণ গোস্বামী, মোহনলাল গোস্বামী, বীণাবল্লভ গোস্বামী, কিশোরীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, অনাদিনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। আমাদের সূত্রে (কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, শান্তিপুর পরিচয়, ২য় খণ্ড ১৩৪৯, ১৯৭-১৯৮) পাঠক ও কথকদের নাম একসঙ্গে দেওয়া আছে। রাণাঘাট মাঝেরহাট এলাকার উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য উনিশ শতকের শেষ দশকে ও বিংশ শতকের প্রথমে (১৮৯৫-১৯১০) সরস বাকভঙ্গি ও সুকণ্ঠের জন্য এই পেশায় পশার লাভ করেন।

পূর্ব বঙ্গের কথক :

উনিশ শতকে কৃষ্ণকমল গোস্বামীর জন্ম নদীয়া জেলায় কিন্তু কর্মস্থল ঢাকায়। যাত্রাপালা রচনাতে তিনি প্রবাদপুরুষ। কিন্তু তাঁর প্রকৃত পেশা ছিল কথকতা ও ভাগবত পাঠ। ফরিদপুর জেলার কাসাভোগের কৃষ্ণকান্ত পাঠক (১৮২১-১৮৯১) ও ঢাকা বিক্রমপুরের ফুরশাইল বা ফুল্লশালীর কালাচাঁদ বিদ্যালঙ্কার কথক হিসাবে উনিশ শতকে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। বিংশ শতকে ঢাকার ইছাপুরা গ্রামে থাকতেন উমাকান্ত পাঠক। উনিশ শতকে বিক্রমপুরের তেলিরবাগ গ্রামের কথক ছিলেন গোলকচন্দ্র চক্রবর্তী। বিক্রমপুরের আর এক কথক বাসাইল গ্রাম নিবাসী রাখাল চন্দ্র গোস্বামী। ১৯৪৫ সালে ৭০ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কুষ্ঠিয়ায় মেহেরপুরের কালীনাথ ভট্টাচার্যের এই পেশায় বেশ নামডাক ছিল। বিক্রমপুরের বৈষ্ণবপ্রধান গ্রাম পঞ্চসারে চন্দ্রমোহন মহলানবিশ, ভাগবতাদি আখ্যানে কথকতা করে যশ অর্জন করেছিলেন।

ভাগবত-পাঠকের তালিকা :

উনিশ শতকের শেষে ও বিশ শতকের গোড়ায় রঘুনাথ ভাগবতাচার্য ও শ্রীনিবাসাচার্যের ব্যাখ্যাযুক্ত সুললিত ভাগবত পাঠের ঐতিহ্যকে পুনর্নির্মিতির পথে নিয়ে যান প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী। পিতা মহেন্দ্রনাথ গোস্বামী প্রসিদ্ধ পাঠক ছিলেন। অতুলকৃষ্ণের শিষ্যদের মধ্যে প্রধান হলেন ঢাকার প্রভুপাদ প্রাণকিশোর গোস্বামী ও প্রাণগোপাল গোস্বামী। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ ও বিংশ শতকের প্রথমপাদে বাংলাদেশে বিখ্যাত ভাগবত পাঠকদের মধ্যে কলিকাতার কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ মহাশয়, বলাইচাঁদ গোস্বামী প্রভু, শিমুলিয়া নিবাসী শ্যামলাল গোস্বামী, হুগলীর নীলকান্ত গোস্বামী,

বিপিনবিহারী গোস্বামী, জানকীনাথ ভাগবতভূষণ, বর্ধমানের গোকুলচাঁদ প্রভু, সদানন্দ প্রভু, রাধাবিনোদ প্রভু, বৈকুণ্ঠ বাচস্পতি, গৌরগোবিন্দ ভাগবত পরমহংস প্রভৃতি ব্যাখ্যাতৃগণ নানাভাবে রস-পরিবেশনের রীতি উদ্ভাবন করেছিলেন। নীলকান্ত গোস্বামীর (১৮৪৭-১৯২৭) জন্ম হুগলী জেলার বৈঁচিগ্রামে। পিতা কৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামী অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। স্কুলশিক্ষকের পদ থেকে কর্মচ্যুত হবার পর ভাগবত-পাঠই তাঁর উপজীবিকা হয়। অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী পাঠে এঁর রীতিদ্বারা উদ্বুদ্ধ হন। অধুনা প্রভুপাদ প্রাণকিশোর গোস্বামীর বংশধর ব্রজরাজ কিশোর গোস্বামী ভাগবততীর্থ ও শ্রীগুরুরাজ কিশোর গোস্বামী, নবরত ব্রহ্মচারী, বর্ষীয়ান ননীগোপাল গোস্বামী প্রমুখেরা নানা আসরে 'কথা ও সঙ্গীতে' ভাগবত পাঠ করেন। কাটোয়ার খাজুরদিহি গ্রামের প্রণব ভট্টাচার্য নিয়মিত কথকতা করেন।

গায়েনের পরিচয়

রামায়ণ গানে কিন্তু ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য তুলনামূলকভাবে কম। বাংলায় ছড়া আছে,

"ঢপে রূপ, কীর্তনে স্বরূপ,
রামায়ণে রাম ও চণ্ডীতে হাম।"

কীর্তনে স্বরূপ দাস, ঢপে রূপদাস, রামায়ণে রামচন্দ্র হাজরা ও 'হাম' অর্থ চণ্ডীর পালাগায়ক বাঞ্ছারাম মালাকার। হাজরা ও মালাকার, দুজনে ব্রাহ্মণেতর জাতি। তবে এঁদের আর কোনো পরিচয় জানা যায় না। অষ্টাদশ শতকে মেদিনীপুরের দুঃখী শ্যামদাসও ভাগবতানুসারী গোবিন্দমঙ্গল পাঠ ও গেয়ে বেড়াতেন; তিনি নিজে কায়স্থ। এই সময়ে (১৭৮৮) উত্তরপাড়ার রামলোচন গায়েনের নাম আমরা পাচ্ছি। বিংশ শতকের চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে ময়মনসিংহের কাশতলা গ্রামের নরেন্দ্র গাইন রামমঙ্গল গানের অত্যন্ত শক্তিশালী গায়ক ছিলেন। অধুনা কলিকাতায় মহিলা রামায়ণ গায়িকার মধ্যে কাঞ্চনমণিদাস ও তদীয় কন্যা কৃষ্ণকলি দাস এবং কৃষ্ণা বক্সীর নাম উল্লেখ্য।

[তথ্য সূত্র : স্মৃতিচিত্র, পুথির পুষ্পিকা, জেলার ইতিহাস, হরিসভার বাৎসরিক প্রতিবেদন, সরেজমিন তদন্ত ও ইস্তাহার] ☐

□

অকাদেমী প্রকাশিত ধ্রুপদী নাটকের বাংলা অনুবাদ

আন্তিগোনে (গ্রীক) : সোফোক্লেস
অনুবাদ : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত — কুড়ি টাকা

তার্ত্যুফ (ফরাসী) : মলিয়ের
অনুবাদ : লোকনাথ ভট্টাচার্য — কুড়ি টাকা

মৃচ্ছকটিক (সংস্কৃত) : শূদ্রক
অনুবাদ : সুকুমারী ভট্টাচার্য — ত্রিশ টাকা

ব্যাঙের কেত্তন (গ্রীক) : আরিস্তোফানেস্
অনুবাদ : হীরেন্দ্রনাথ দত্ত — কুড়ি টাকা

ইয়োনা (রোমানিয়ান) : মারিন সোরেস্কু
অনুবাদ : অমিতা বসু — কুড়ি টাকা

রসুম ছাঁচের রোবোট (চেক) : কারেল চাপেক
অনুবাদ : সোমেশ্বর ভৌমিক — কুড়ি টাকা

'রবীন্দ্র ভবন'
৩৫, ফিরোজশাহ রোড
নতুন দিল্লি ১১০ ০০১

সাহিত্য অকাদেমি

'জীবনতারা ভবন'
২৩এ/৪৪ এক্স্, ডায়মণ্ড হারবার
রোড, কলকাতা-৭০০০৫৩

□

পুনর্মুদ্রণ

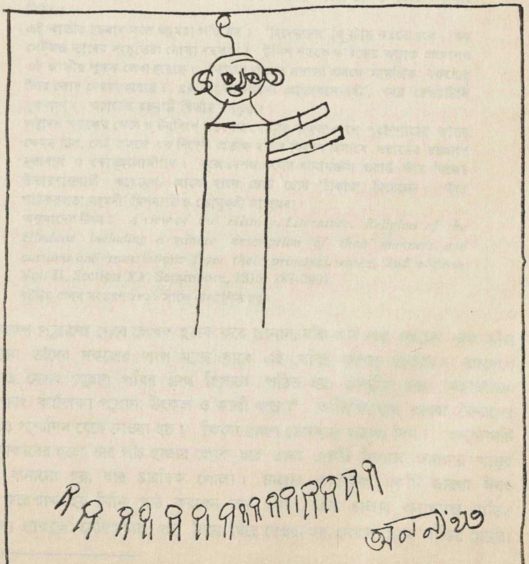

পুরাণ পড়া ও পুরাণ শোনা

উইলিয়ম ওয়ার্ড

শ্রীরামপুর মিশনের প্রথিতযশা উইলিয়ম কেরী ও মার্শম্যানের সহযোগী ছিলেন উইলিয়ম ওয়ার্ড (১৭৬৯-১৮২৩)। বঙ্গদেশে হিন্দু-সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিশাল রচনাটি 'দেশজদের' আচার-আচরণ ও বিশ্বাসের বিবৃতিধর্মী বয়ান। নানা সংস্কার ও আচারের একটি তালিকা করা হয়েছে ; তালিকার প্রত্যেকটি বিষয়ের আগে ক্রমিক সংখ্যা দেওয়া হয়েছে, এবং সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে কিছু না কিছু বলা হয়েছে। মনে হয় যে কোনো সংগ্রহশালার বিস্তৃতপঞ্জী পড়ছি, কী কী দ্রষ্টব্য নথিবদ্ধ আছে, তার উপরেচোখ বুলিয়ে নিচ্ছি।

এই জাতীয় রচনার সঙ্গে আমরা পরিচিত। 'হিদেনদের' খ্রিস্টান করতে হবে ; কিন্তু সেইজন্য তাদের সংস্কৃতিটা বোঝা দরকার। উনিশ শতকে ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও এই জাতীয় পুস্তক লেখা হয়েছে। কোনো পুস্তকে সভ্যতা প্রসঙ্গে সামগ্রিক বক্তব্যের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। কোনো আলোচনা প্রতিবেদন-ধর্মী, খবর দেওয়াটাই মূল লক্ষ্য। ওয়ার্ডের রচনাটি দ্বিতীয় বর্গভুক্ত।

অষ্টাদশ শতকের শেষে ও উনবিংশ শতকের গোড়ায় বাঙ্গলা-দেশে পুরাণপাঠের আসর কেমন ছিল, সেই প্রসঙ্গে এক বিদেশী প্রত্যক্ষ দর্শীর বিবরণ হিসাবে ওয়ার্ডের রচনাংশ মূল্যবান ও কৌতূহলোদ্দীপক। মূলে দেশজ শব্দের বানানগুলি ওয়ার্ড তাঁর নিজের উচ্চারণানুযায়ী করেছেন, মাঝে মাঝে ছোট ছোট 'টীকাও' দিয়েছেন। তাঁর পাঠককুলত' সহমর্মী মিশনারি ও কৌতূহলী সাহেবরা।

অনুবাদের উৎস : *A view of the History, Literature, Religion of the Hindoos including a minute description of their manners and customs and translations from their principal works,* 2nd edition, Vol. II, Section *XX*, Serampore, 1815, 288-2901
বইটির প্রথম সংস্করণ ১৮১১ সালে প্রকাশিত হয়।

অধিকাংশ পুরাণের শেষে লেখক হলফ করে জানান, যাঁরা এটি পাঠ করছেন এবং যাঁরা শুনছেন তাঁদের সকলের পাপ মুছে যাবে এই পবিত্র গ্রন্থের প্রভাবে। বঙ্গদেশে প্রধানত যেসব পুরাণ পবিত্র গ্রন্থ হিসাবে পঠিত হয়, সেগুলি হল, মহাভারত, শ্রীভাগবৎ, কালিকা পুরাণ, উৎকল ও কাশী খণ্ড।* কার্তিক, মাঘ অথবা বৈশাখের কোনও পুণ্যদিন বেছে নেওয়া হয়। কিংবা ব্রাহ্মণ ভোজনের আগের দিন। অনুষ্ঠানটি বড় আকারের হলে, চার পাঁচ হাজার লোক ধরে এমন একটি বিশাল জায়গায় খড়ের চালা বানানো হয়, যার চারদিক খোলা। চালার একদিকে একটি জায়গা ঈষৎ উঁচু করে রাখা হয় যিনি পাঠ করবেন তার জন্য। এবং চালার অন্যপ্রান্তে বাড়ির বারান্দা থাকলে সেদিকটায় পর্দা দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়, সেখান থেকে বাড়ির মেয়েরা

* শেষতম গ্রন্থ দুটি স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত।

পাঠ শোনে ও চিকের আড়াল থেকে দেখে। বসবার জন্য মাদুর বিছিয়ে দেওয়া হয়, একদিকে ব্রাহ্মণ, অন্যদিকে কায়স্থ** এবং আর এক দিকে শূদ্রদের বসার ব্যবস্থা করা হয়। অনুষ্ঠানের দিন ছাউনিতে এসে লোকে প্রথমে শালগ্রাম শিলাকে ও পরে ব্রাহ্মণদের প্রণাম করে। অনুষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহ করছেন যিনি, স্নান সেরে তিনি এই সমাবেশে যোগ দেন। পাঠের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে পণ্ডিতদের অনুরোধ করেন পাঠক নির্বাচন করতে। যাঁরা পাঠ করবেন গৃহস্থ তাঁদের প্রত্যেককে একটি করে বস্ত্র দিয়ে তাঁদের কর্তব্য বলে দেন। পাঠক উচ্চাসনে (ব্যাসাসন) বসেন, তাঁর ডান ও বাম দিকে বসেন ধারকরা। পাঠকের মুখোমুখি থাকেন সদস্য, মূল গ্রন্থ থেকে বিচ্যুতি ঘটছে কিনা তিনি যাচাই করেন। লোকজন (শ্রোতারা) সামনে বসে থাকেন। গৃহস্থের কল্যাণ কামনায় তাঁরা পাঠ শোনেন। পাঠ শুরু হওয়ার আগে এক ব্রাহ্মণ গৃহস্থের নামে শালগ্রাম শিলাকে মাল্যভূষিত ও চন্দনচর্চিত (হোয়াইট পেইন্ট) করেন। তারপর পাঠকের গলায়, হাতে, মাথায় ফুলের মোটা মালা পরিয়ে দেন। তাঁর বুকে এবং কপালে চন্দন লেপে দেন। তারপর কিছু ব্রাহ্মণ এবং শূদ্রকেও মাল্যভূষিত করা হয়। এরপর পাঠক উচ্চকণ্ঠে কোনও একটি পুরাণ পাঠ শুরু করেন (বেলা নটা-দশটায়)। প্রথম দিন পাঠ হয় এক ঘণ্টা কিন্তু পরের দিনগুলিতে পাঠ শুরু হয় সকাল সাতটায়, চলে দুপুর বারোটা পর্যন্ত। বিকেলে আবার আসর বসে, তখন সকালে সংস্কৃতে পঠিত পুরাণের অর্থ বাংলা ভাষায় ব্যাখ্যা করেন কথক (বক্তা), তিনি তখন পাঠকের আসনে (ব্যাসাসনে) বসেন, সামনে সিংহাসনে রক্ষিত হয় শালগ্রাম। সমবেত বহুজন আবেগে উদ্বেলিত হয়ে ওঠেন ব্যাখ্যা শুনতে শুনতে। শ্রোতাদের মধ্যে কেউ তখন পাঠককে অর্থোপহার দেন। আসর ভাঙে সন্ধ্যায়। মানুষজন ঘরে ফিরতে শুরু করে যা শুনলেন সে সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে করতে। যতদিন পর্যন্ত গ্রন্থটি শেষ না হচ্ছে ততদিন রোজ এই চলে। মহাভারত পাঠে লাগে চার মাস, শ্রীভাগবৎ পাঠে এক মাস। কোনও কোনও ক্ষেত্রে অতিথিদের শুরুর দিন ভোজ না দিয়ে ভোজ ও ব্রাহ্মণ বিদায়ের ব্যবস্থা শেষের দিনে করা হয়। এই ধরনের পাঠানুষ্ঠানে ধনী ব্যক্তিরা কখনো কখনো কম করে ১০,০০০ টাকা খরচ করতেন বলে শোনা যায়। পাঠের আয়োজন করায় গৃহস্বামীর ভবিষ্যতে মঙ্গল হবে এই প্রতিশ্রুতি মিলত। □

** কায়স্থের বাড়িতে পুরাণ পাঠের আয়োজন হলে পাঠ শুরুর আগে পুরোহিত ব্রাহ্মণ গ্রন্থটি ও গ্রন্থে বর্ণিত চরিত্রদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ফুল, চাল, ধূপ-ধুনো দিয়ে গ্রন্থটি ও গ্রন্থের চরিত্রদের পুজো করা হয়।

বাঙালার বিলুপ্ত সম্পদ—কথকতা

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন

যে কোনো বাঙালী পাঠক দীনেশচন্দ্র সেনের (১৮৬৬—১৯৩৯) নাম জানেন। তাঁর লেখা ঘরের সাধনা ও যুগসাহিত্য, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বা বৃহৎবঙ্গে নানা প্রসঙ্গে কথকতার কথা এসেছে। কথকতার পালা অবলম্বন করে তিনি নানা জমাটি ছোট ছোট বইও লিখেছেন। সেইসব রচনার তুলনায় আলোচ্য প্রবন্ধটি অজানা। কথকতার বিবরণী অপেক্ষা দীনেশচন্দ্র সেনের মানসিকতার পরিচয় পাবার জন্য প্রবন্ধটি গুরুত্বপূর্ণ। বিংশ শতকের সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে ও রুচি পরিবর্তনের যুগে লোকশিক্ষার অন্যতর দেশজ ধারাকে গুরুত্ব দেবার পেছনে কী কী যুক্তি কাজ করছে, সেইগুলি যে কারুর কৌতূহলকে উসকে দিতে পারে। আরো লক্ষ্য করার বিষয় এই যে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠানিক পাঠ্যক্রমেও কীর্তন ও কথকতাকে জুড়ে দেবার উদ্যোগ দীনেশচন্দ্র সেন নিয়েছিলেন, ধরতাই দিয়েছিলেন প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।

প্রবর্তক / ২২ বর্ষ / ১ম খণ্ড / ৪র্থ সংখ্যা / শ্রাবণ / ১৩৪৪ প্রবন্ধ / বাঙালার বিলুপ্ত সম্পদ—কথকতা / প্রবন্ধকার/রায়বাহাদুর ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন—ডি-লিট।

আমাদের এই সোনার বাঙালার প্রাচীন সংস্কৃতির ঐশ্বর্য কত দিক্ দিয়া যে লুপ্ত হইয়া যাইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কোন প্রকাণ্ড অজগর যেরূপ একখানে শুইয়া থাকিয়া তাহার নিঃশ্বাসের আকর্ষণে দূর-দূরান্তর হইতে অসন্দিগ্ধ জীব-জন্তুদিগকে নিজের কাছে টানিয়া তাহার উদর পূর্তি করে, সেইরূপ বিদেশাগত জড় সভ্যতার প্রবল আকর্ষণে আজ এদেশের আধ্যাত্মিক সম্পত্তি প্রতীচ্যের আদর্শের কবলিত হইতেছে। এ বিষয়ে বেশী বাগাড়ম্বর নিষ্প্রয়োজন ; সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন এদেশের ভক্তি, যাহা শতমুখী গঙ্গার ন্যায় এককালে আনন্দের মহাসাগর-সঙ্গমে আসিয়া লীন হইয়াছিল এদেশের প্রেম, যাহা চৈতন্যদেবের পদরজে পূত হইয়া বঙ্গের কুটিরে কুটিরে শত শত খোল-করতাল ও মন্দিরার নিক্কন-সহকারে পথে-ঘাটে বাহিয়া গিয়াছিল—এদেশের ত্যাগ, যাহা রাজা গোবিন্দচন্দ্রের সন্ন্যাস-গ্রহণ, রূপ-সনাতন-শ্রীজীব, রাজকুমার রঘুনাথ, যুবরাজ নরোত্তম, ধনকুবের উদ্ধারণ দত্ত এবং সেদিনকার পাইকপাড়ার লালাবাবুর ভিখারীর কন্থা-গ্রহণের দৃশ্য দেখাইয়া অধ্যাত্ম-জগতের বাস্তব মহিমা প্রকটিত করিয়াছিল, সেই ভক্তি, সেই প্রেম ও ত্যাগের উৎস জড়-সভ্যতার শুষ্ক মরুভূমিতে পড়িয়া শুকাইয়া যাইতেছে। কোথায় গেল সেই সকল কৃষ্ণযাত্রা, যাহা এককালে শ্রোতৃবর্গের চক্ষে অশ্রুর বান আনয়ন করিয়া মর্ত্যধামে ভক্তি-স্বর্গের শতদল ফুটাইয়াছিল, কোথায় গেল সেইসকল কীর্তন, যাহা শুনিতে শুনিতে রাত্রি কিভাবে পোহাইয়া যাইত, লোকে তাহা বুঝিতে পারিত না, উন্মত্তের মত হাসিয়া কাঁদিয়া রাত্রি জাগরণ

করিত এবং গঙ্গাজলে অবগাহন করিলে যে পুণ্য হয়, তাহা অর্জন করিয়া ধন্য হইত ? কোথায় গেল সে কথকতা, যাহা গল্পচ্ছলে বেদ-বেদান্তের তত্ত্ব লোকদিগকে সহজে বুঝাইয়া হাসি-কান্নার মধ্য দিয়া জীবনের মহা সত্যগুলি জনসাধারণের হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দিত ? হে দেব-বাঞ্ছিত ধর্মক্ষেত্র হিন্দুস্তানের অধিবাসীগণ, তোমাদের পূর্বপুরুষেরা তোমাদিগকে সত্যদ্রষ্টা ঋষিদিগের সাধনালব্ধ মহাসত্য রাজা-প্রজা, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলকে নির্ব্বিচারে হরির লুটের মত বিতরণ করিবার জন্য যে সকল পন্থা সুগম করিয়া গিয়াছিলেন, কালিঘাটের গঙ্গার ন্যায় তাহা যে ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর হইয়া নিরুদ্ধপ্রায় হইয়া আসিতেছে! শত সহস্র বৎসর হইতে এই শিক্ষা সমাজের উর্দ্ধস্থান হইতে অধস্তন স্তর পর্য্যন্ত প্রচারিত হইয়া জনসাধারণকে উন্নতির শৃঙ্গে সমারূঢ় করাইয়াছিল। এদেশের বহু অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন হ্যাভেল সাহেব বলিয়াছেন—"ভারতবর্ষের পটুয়ারা পাশ্চাত্য-মতে মূর্খ, কিন্তু জগতের চিত্রকরদের মধ্যে তাহাদের শিক্ষা সকলের উপরে"[১] ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অগাধ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ডাঃ লিফ্রয় বলিয়াছেন—"দরিদ্রতম এবং নিরতিশয় অশিক্ষিত হিন্দু কৃষকগণ অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দার্শনিক ও নীতিঘটিত আলোচনা করিতে পারে।"[২]
যে দেশের অক্ষর-জ্ঞানের প্রচার খুব ব্যাপকভাবে না হইলেও উচ্চশিক্ষা কুটিরে কুটিরে ঢুকিয়াছিল,—রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, গীতা প্রভৃতির তত্ত্বকথা ও উপাখ্যান এককালে চাষাদের মধ্যেও প্রচলিত হইয়াছিল ; সেই দেশের জনসাধারণ তাহাদের উচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়া সিনেমার নর-নারীদের চুম্বন আলিঙ্গনাদি দেখিয়া হীন লালসা-পন্থী হইতেছে। কোনই উচ্চ আদর্শ নাই ; কলঙ্কিত জীবনের হীন বাস্তবতা ও অর্দ্ধ-উলঙ্গ নর-নারীদের বীভৎসতাপূর্ণ সিনেমা প্রভৃতি পাশ্চাত্য আমোদ-প্রমোদে সত্যই সমাজে একটি ঘূর্ণিবায়ু আনিয়াছে এদেশে সত্যই কি ঋষিদের সাধনা-লব্ধ মহাসত্যগুলি একেবারে অতলে ডুবিয়া যাইবে ? জড়-সভ্যতার এই আকর্ষণ যদি এখনও নিরোধ করা না যায়, তবে হিন্দুস্তান হইতে হিন্দুজাতি একেবারে বিলীন হইয়া যাইবে। হ্যাট-কোট-পরা পুরুষ ও হিলতোলা-জুতা পরিহিত বব্ ফ্যাসনে কেশ-বিন্যাস দুরস্তা রমণী,—এইরূপ একান্ত ফিরিঙ্গীভাবাপন্ন কতগুলি হিন্দুর বংশধর টিকিয়া থাকিতে পারেন। কিন্তু যে হিন্দুরা উপনিষদ লিখিয়াছিল, রামায়ণ, মহাভারতের উচ্চ আদর্শ লোকের সম্মুখে ধরিয়াছিল, যে সকল কবি মহাদেবের নিবাত-নিষ্কম্প-দীপশিখার ন্যায় সমাধির চিত্র আঁকিয়াছিল, যে সকল মহিলারা স্বার্থ জানিতেন না, ত্যাগ ও প্রেমের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া দেবীপদবাচ্যা হইয়া চিরবরেণ্যা হইয়াছিলেন ; তাঁহারা কোথায় ? তাঁহারা কি চিরকালের জন্য বিদায় লইলেন ? ভারতের সীতা, ভারতের সাবিত্রী, ভারতের দময়ন্তী ও বেহুলা,—এককথায় হিন্দুনারীর প্রকৃত আদর্শ কি নিশ্চিহ্ন হইয়া এদেশ হইতে অন্তর্হিত হইবে ? সাধুর নামাবলী, সতীর কপালের সিন্দুর আর এদেশে কুড়াইয়া পাওয়া যাইবে না ? যাহারা হিন্দুস্তানকে ধর্মচ্যুত হইয়া জড় সভ্যতার পান্ডা হিটলার ও মুসোলিনীর তাণ্ডব-লীলার ক্ষেত্রে পরিণত দেখিতে

চান, আমরা তাঁহাদের দলে নই। সোপেনহায়ার, ম্যাক্সমূলার প্রভৃতি বিদেশী পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, উপনিষদ তাঁহাদের জীবনের শেষ আশ্রয়, ইহা সত্যের খনি ও মনুষ্য-জাতির মাথার মুকুট ; আমরা কি আমাদের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গৌরব তত্ত্বজ্ঞান ছাড়িয়া দিয়া "আঁচলে মাণিক বেঁধে কেঁদে কেঁদে—" দুর্গম বাস্তব অরণ্যে ঘসা পয়সার লোভে ঘুরিয়া বেড়াইব ?

সিনেমা ও বর্তমান কালের পাশ্চাত্য আদর্শে গড়া যৌনপ্রেমের বীভৎসতাপূর্ণ থিয়েটার-গুলি হইতে জনসাধারণকে বাঁচাইতে হইবে। আমরা এখন মুমূর্ষু রোগী, আর সময় নাই ; আশা করি ঘুম ভাঙিয়া আবার এ জাতি জাগিয়া উঠিবে। হে হিন্দুস্তানের ব্রাহ্মণ, আমরা তোমাদিগকেই আহ্বান করিতেছি। তোমরা ঊর্ধ্ববাহু হইয়া সাধনা করিয়াছ, তোমরাই পঞ্চাগ্নিক হইয়া জ্বলন্ত আগুনে আসন পাতিয়া বসিয়া তপস্যার অকথ্য কৃচ্ছের আদর্শ দেখাইয়াছ— তোমরাই আহিতাগ্নিক, তোমরাই শবাসনে বসিয়া অমানিশার বিভীষিকায় অটলপণে ইষ্টমন্ত্র জপ করিয়াছ, প্রবল ঝটিকা ও শিলাবৃষ্টিতে তরুরাজ উৎপাটিত হইয়া ও যেরূপ অবশিষ্ট কয়েকটি মূল দিয়া ধরিত্রীর বক্ষ আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে, তোমাদের পূর্ব্বপুরুষ সাধকগণ ও সেইরূপ শত ঝঞ্ঝার মধ্যে ভগবানের নামরূপ পোতাশ্রয় অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সেই মহাজ্ঞান যে আমরা হারাইয়া ফেলিতে বসিয়াছি। হে ব্রাহ্মণ, জাগো, জাগো, এই নিদ্রা যেন মহানিদ্রায় পরিণত না হয়। যুগে যুগে তোমরা সমাজের উচ্চতম আদর্শ বাঁচাইয়া রাখিয়াছ ; আজ যেন সমাজের ভরাডুবি না হয়। জাগো ব্রাহ্মণ,—জাগো মনু, বশিষ্ঠ, পরাশর, জাগো বিশ্বামিত্র যাজ্ঞবল্ক্য,—তোমরা ধর্ম্মশাস্ত্রের পত্রে অমর হইয়া আছ, তোমরা আমাদের চক্ষু-উন্মীলনে সহায় হও। হে পিতৃগণ, এই দুর্দ্দিনে আমাদিগকে বাঁচাও। হে নিভৃত কন্দরবাসী সন্ন্যাসী, অযাচক বৃত্তিসাধক মাধবেন্দ্রপুরী, হে বর্ত্তমান যুগের কিরীটরত্ন রামপ্রসাদ, পরমহংস রামকৃষ্ণ, আমাদের এই ঘোর বিপত্তি কালে আমাদিগকে বাঁচাও। আসুন আমরা উপবাস ও অনিদ্রার ব্রত ধারণ করিয়া ভগবানের পথে জানাই, যেন এই জপ-তপ-সাধনার রাজ্যে জপ, তপ ও সাধনা বিলুপ্ত না হয়।

কি উপায়ে এই জড় সভ্যতার স্রোত নিরোধ করিতে হইবে, তাহাই এখন আমাদের ভাবনার বিষয়। আমরা একটি মাত্র উপায় লইয়া আজ এই প্রসঙ্গের অবতারণা করিব। আরোও দশরূপ উপায় আছে, কিন্তু আমরা একটি মাত্র প্রসঙ্গে আবদ্ধ থাকিব।

১৪ই এপ্রিলের (১৯৩৭) "স্টেটসম্যানে" ভারতের কথা-সাহিত্য সম্বন্ধে একটি আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছে এই কথা-সাহিত্য যে কীরূপ বিস্তৃতভাবে ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, তাহা লেখক দেখাইয়াছেন। কিন্তু তিনি অনেক কথাই লেখেন নাই।

রামায়ণে দেখা যায়, যখন অযোধ্যার বিপদাশঙ্কায় মাতুলালয়ে ভরত দুঃস্বপ্ন দেখিয়া বিমনা হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার মাতুল যুধাজিৎ নানা উপায়ে তাঁহার মন হইতে সেই অবসাদের ভাব দূর করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন ; সেই উপায়ের মধ্যে কথা বলিবার

জন্য নিযুক্ত লোকেরা নানা উপাখ্যান বলিয়া তাঁহার চিত্ত প্রসন্ন করিতে চেষ্টা পাইয়াছিল। হিতোপদেশও রাজদরবারে এইরূপ গল্প করিবার প্রচলিত প্রথারই ফল। ইতিহাসের প্রত্যেক অধ্যায়ে রাজসভায় এইরূপ গল্প-রচয়িতাদের একটা বিশিষ্ট স্থান ছিল। আকবরের সভায় বীরবল ছিলেন; ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন, এই ব্যক্তি মোগল সম্রাটের কত প্রিয় ছিলেন। আওরঙ্গজেব তাঁহার সভার আমোদ-প্রমোদ বহু পরিমাণে ছাঁটিয়া ফেলিয়াছিলেন, কিন্তু "গল্প-বলিয়ের" স্থানটি টলাইতে পারেন নাই। রাজান্তঃপুরে এইরূপ গল্প বলিবার জন্য শিক্ষিতা মহিলারা নিযুক্ত থাকিতেন। চন্দ্রাবতীর রামায়ণে দেখা যায়, ইহাদের উপাধি ছিল "আলাপিনী"। "মুতাক্ষরীণে" দৃষ্ট হয় আলিবর্দী খাঁ প্রত্যহ দুই ঘণ্টা করিয়া আলাপকারীদের কথা শুনিতেন এবং মীরজাফরের পাপিষ্ঠ পুত্র মীরণের যে রাত্রে বজ্রপাতে মৃত্যু হয়, তখন তাঁহার সঙ্গে আলাপিনীরা ছিলেন।

হিন্দু-রাজসভায় গল্পকারকদের স্থান আবহমান কাল হইতে অটুট ছিল। ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ বীরচন্দ্রের সময়ও ১৮৮৪ হইতে ১৮৯৭ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত ঢাকা-ধামরাই নিবাসী ভারতচন্দ্র রায় নামক এক গল্পকারক তাঁহার সভায় মাসিক ৬০্ টাকা বেতনে নিযুক্ত ছিলেন এবং ভাওয়াল মোকদ্দমায় সাক্ষীদের জবানবন্দীতে প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, ভাওয়ালস্টেটেও এরূপ বেতনভোগী গল্পকারক ছিল।

কিন্তু ব্রাহ্মণগণ জনসাধারণের শিক্ষার জন্য কথকতার ন্যায় যেরূপ অমোঘ উপায়ের উদ্ভাবনা করিয়াছিলেন, তাহা একদিকে প্রেম, ভক্তি, ত্যাগ প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের আধ্যাত্মিক জ্ঞান, অপরদিকে বাস্তব জীবনের উপভোগ্য হাস্য-পরিহাস ও কৌতুকাবহ ঘটনা দ্বারা সেই সকল কথা অমৃতময় করিয়া তুলিতেন। অসাধারণ শব্দ-মন্ত্রে খচিত রূপ-বর্ণনা, যুদ্ধবর্ণনা প্রকৃতিবর্ণনা, দেবদেবীর মূর্ত্তি-বর্ণনায় উপাখ্যান-ভাগ এমন জীবন্ত হইত যে, লোকে তাহা শুনিয়া সময়ের জ্ঞান ভুলিয়া যাইত। হয়ত এখনও এরূপ লোক জীবিত আছেন, যাহারা ধরণী পাঠকের কথা শুনিয়াছেন। তাঁহার কথা একই সময়ে হাসি ও কান্নার ফোয়ারা ছুটাইয়া, একসঙ্গে রৌদ্র-বৃষ্টির ন্যায় শ্রোতৃবর্গকে কৌতুক দিতে পারে।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে কথকশ্রেষ্ঠ হাস্যার্ণব গল্পগুলি তাঁহার অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য ও কবিত্বশক্তি দ্বারা বিমণ্ডিত করিতেন; আমরা ৪০ বৎসর পূর্ব্বে বিক্রমপুরবাসী এক কথকের মুখে ধ্রুবোপাখ্যান শুনিয়াছিলাম। "ধ্রুব কি দেখিতেছ"—বলিয়া নারদ প্রশ্ন করিলেন, তখন গলদশ্রুচক্ষে কথক ঠাকুর ভগবানের ময়ূরপুচ্ছের কিরীট হইতে আলতারঞ্জিত চরণযুগের যে মূর্ত্তি সুর করিয়া বর্ণনা করিলেন, তাহা শুনিয়া শ্রোতৃবর্গ অশ্রুবন্যায় ভাসিয়া গিয়াছিল; দীর্ঘনিশ্বাসের তুফান উঠিয়াছিল। যখন জোড়াসাঁকোর খ্যাতনামা ঠাকুর কুলেন্দু গগনেন্দ্রনাথ পুত্রশোকে কাতর হইয়া তাঁহার কোন বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিবেন,—"আমি কিছুতেই মনে শান্তি পাইতেছি না; এরূপভাব বেশী দিন থাকিয়া পাগল হইয়া যাইব, আমার উপায় বলুন।" তখন সেই বন্ধুর অনুরোধে ও

পরামর্শে বাগবাজারের ক্ষেত্র কথক সেই বাড়ীতে নিযুক্ত হইলেন। প্রায় দেড় মাস কাল ক্ষেত্রকথক ব্যাসাসনে বসিয়া মাথায় ফুলের মালা পরিয়া কথকতা করিয়াছিলেন, ঠাকুর গোষ্ঠির সকলে সন্ধ্যাকালে সেই আসর জমাইয়া বসিতেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্র, সমরেন্দ্র, অবনীন্দ্রনাথ এবং তাঁহাদের বহু বান্ধব ও পরিবারের এই কথকতার আসরে উপস্থিত থাকিতেন! রবীন্দ্রবাবুও মাঝে মাঝে দুই-একদিন উপস্থিত হইতেন। ক্ষেত্র কথকের গল্প বলিবার শক্তি এরূপ অসাধারণ ছিল যে, তিনি যেন কথার হরিলুঠ দিয়া যাইতেছেন; এরূপ নিপুণতার সহিত তিনি গল্প বলিয়া যাইতেন যে, মনে হইত যেন ভারত-বিখ্যাত পৌরাণিক নায়ক-নায়িকারা আমাদের নিকটে প্রত্যক্ষীভূত হইতেন গল্পে ও গানে সমৃদ্ধ এই কথকতা যেন উত্থান-পতনশীল তরঙ্গের মত গল্প-সাগরে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য চিত্র প্রকটিত করিত। গগনেন্দ্রনাথ ও তাঁহার দুই ভ্রাতা ভগবানের আশীর্ব্বাদে এখনও বিদ্যমান,—তাঁহারা অবশ্যই বলিবেন, ক্ষেত্র কথকের অমৃতময় কথকতায় তাঁহাদের পরিবারের পুত্র-শোকের নিদারুণ ব্যথা অনেক পরিমাণে প্রশমিত হইয়াছিল। অথচ একথা নিশ্চিত যে; এই কথকতা সিনেমার ন্যায় অল্পদরের কৌতুক ও আমোদ প্রদান করিত না। গল্পগুলি ছিল সারগর্ভ; সুনীতিপূর্ণ ও ভক্তি-গঙ্গার জলে শোধিত। কিছুদিন হইল কৃষ্ণ কথকও স্বর্গীয় হইয়াছেন; ক্ষেত্রকথকও আর নাই। কিন্তু আমার বিশ্বাস, এখনও বাঙ্গালার অলি-গলিতে সেই প্রাচীন ভক্তি-প্রবাহ পাতালের ভোগবতী গঙ্গার ন্যায় বাহিয়া যাইতেছে; উৎসাহ পাইলেই এই কথকশ্রেণী আবার তাঁহাদের প্রতিভা দ্বারা আসর জমাইতে পারেন। প্রাচীন সংস্কৃতির যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়া সমাজে লোক-শিক্ষার ব্যাপকভাবে বিস্তার হইয়াছিল; সেই সকল উপায় ছাড়িয়া দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না। নিম্নশ্রেণীর পাঠশালা দ্বারা শিক্ষার যে প্রচলন হয়; তাহা কি কীর্তন বা কথকতার মত কার্যকরী? কীর্তন ও কথকতায় জাতি ও শ্রেণী-নির্ব্বিশেষে স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ যে জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক জীবনের প্রেরণা পাইত, নিম্ন বা উচ্চ প্রাইমারী স্কুল-গুলি কি তাহার শতাংশের একাংশ জ্ঞানের কণা বিতরণ করিতে পারে? অথচ এই বঙ্গদেশে নিম্নশ্রেণীর আক্ষরিক জ্ঞানের জন্যও যে সকল পাঠশালা ছিল, তাহার সংখ্যাও অল্প ছিল না। লং সাহেব তাঁহার ক্যাটালগে একশত বৎসর পূর্ব্বে লিখিয়াছিলেন—"বঙ্গদেশে শুভঙ্কর নামক এক কায়স্থ, যাঁহাকে বাঙ্গালাদেশের ককার আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে, তাঁহার আর্য্যা দেড়শত বৎসর যাবৎ প্রায় ৪০০০০ পাঠশালায় আবৃত্তি হইয়া আসিতেছে, সুতরাং সংখ্যা-গণিতে হিন্দুরা অগ্রণী, তাহাদের পরে আমাদের ইংলন্ডের শিশুবিদ্যালয়ে শিক্ষার এই রীতি প্রবর্তিত হইয়াছে।"

কিন্তু প্রাইমারী বিদ্যালয়ই হউক, কিংবা হাইস্কুলই হউক কথকতা ও কীর্তন প্রভৃতি-দ্বারা যেরূপ উচ্চশিক্ষা অতি মনোরমভাবে ও ব্যাপকরূপে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইত, সেই সকল যুগ যুগ ব্যাপী, বহু পরীক্ষিত, শিক্ষিত, ফলপ্রসূ উপায় কি আমাদের ছাড়িয়া দেওয়া উচিত? মানুষ আনন্দ চায়। উপদেশ যখন বেতের সাহায্যে

প্রচারিত হয়, তখন তাহা ভয়ের উদ্রেক করে। গুরুমহাশয়ের উপদেশ প্রায়ই তিক্ত হয় ; তৎস্থলে কথক ঠাকুরের ব্যাখ্যা ও গল্প নানারূপ হৃদয়স্পর্শী সঙ্গীতের সহযোগে নিশ্চিত ও অধিকতর প্রেরণা দান করে এবং মধুর রসের মধ্য দিয়ে সমাজকে গড়িয়া তোলে।

এ দেশের প্রাণ মাতানো এই দুই উপায় কীর্তন ও কথকতা ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজ পাদ্রীদের উপদেশে ঘৃণার সহিত ফেলিয়া দিয়াছেন। স্কুলে বেত্রহস্ত শিক্ষকের হাত হইতে ত্রাণ পাইয়া তরুণেরা হয় সিনেমায় আনন্দ খুঁজিতে যায়, নতুবা গোয়েন্দার গল্প বা অতীব অপকারী কুৎসিৎ যৌন গল্প পড়িয়া মনোবৃত্তি কলুষিত করে। আপনারা তাহাদিগকে বঙ্গীয় পল্লীবাহী পবিত্র আনন্দধারা হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের বুভুক্ষিত ও তৃষ্ণার্ত মন সেই আনন্দের খোঁজে যাহা অবলম্বন করে, তাহা যে তাহাদের পক্ষে বিষ।

কীর্তন সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া আমরা এই সন্দর্ভের উপসংহার করিব। কিন্তু এখানে আমি কথকতা সম্বন্ধে একটা প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা দিব। আশা করি, আপনারা এ বিষয়টি একবার চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

ধরুন, দক্ষিণ ও উত্তর কলিকাতার সন্ধিস্থল কলেজ স্ট্রীট বা কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের উপর একটা বাড়ী ভাড়া করিয়া তথায় কথকতার একটা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হউক। সেই গৃহে একটা বড় হল থাকিবে, যাহাতে অন্ততঃ পাঁচশত লোকের স্থান হইতে পারে।

বৎসরে একবার এই স্থানে কথকদের মধ্যে প্রতিযোগীতার পরীক্ষা হইবে। বঙ্গদেশের নানা জেলা হইতে অনধিক ১৫ জন কথকের পরীক্ষা হইবে ; পরীক্ষান্তে তিনজনকে উপাধি ও পুরস্কার দেওয়া হইবে।

এইভাবে উপাধি ও পুরস্কারপ্রাপ্ত কথকগণ বৎসর ভরিয়া পূর্বোক্ত 'হলে' কথকতা করিবেন, কথকতা সপ্তাহে দুইবার হইবে।

গৃহের অপর প্রকোষ্ঠে অধ্যাপকগণ অনধিক দশজন ছাত্রকে কথকতা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিবেন। এই কথকতা আনুষাঙ্গিক উচ্চশিক্ষাও তাঁহারা এইখানে পাইবেন। দুই বৎসর তাঁহাদের 'কোস' (কোর্স) শেষ হইবে এবং তাঁহারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 'কথকরত্ন', 'কথা-প্রদীপ' প্রভৃতি ভাবের উপাধি ও পুরস্কার পাইবেন। যিনি প্রতিযোগীতার পরীক্ষায় বৎসরান্তে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবেন, তাঁহার উপাধি হইবে 'আচার্য্য কথক'।

কথকতার যে প্রাচীন 'কোড' বা শাব্দিক বর্ণনারীতি আছে, যাহা সুললিত শব্দবহুল ও সংস্কৃতাত্মক ; সেই 'কোড' বর্ত্তমান রুচি, সংস্কৃতি ও প্রয়োজনানুসারে কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে।

পৌরাণিক উপাখ্যানগুলির প্রাচীন নীতি ও ধর্ম্মভাব অমূল্য ; তাহার বিষয়বস্তুও চিত্তাকর্ষক, ঘটনা বর্ণনাও কৌতূহলোদ্দীপক ; কিন্তু আধুনিক সময়ে ঐতিহাসিক জ্ঞানের বিস্তৃতি ও গল্পরীতির বিবিধভাবে বিচিত্রতা সাধিত হওয়ার ফলে অনেক নূতন বিষয় কথকতার উপযোগী হইয়াছে সেই সকল নূতন নূতন বিষয় কথকতার অন্তর্গত করিতে হইবে ; তাহা লইয়া 'কথার' খসড়া প্রস্তুত করিতে হইবে। সমস্ত কথাগুলিই

একটা কমিটির বিচারাধীন করিয়া ; তাহা অনুমোদিত করিয়া সাধারণের কাছে উপস্থিত করিতে হইবে।

উপাধি ও পুরস্কারপ্রাপ্ত 'আচার্য্য কথকের' কথা শুনিতে ভীড় হইবে। সিনেমার গল্পগুলি নানারূপ বিজ্ঞাপন দিয়া ভীড় জমায় ; কিন্তু পাশ্চাত্যভাবে গড়া বিষয়গুলি জনসাধারণকে কি তাদৃশ তৃপ্তি দিতে পারে ? কোন কোন সিনেমার কর্তৃপক্ষ আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন,—এখন পৌরাণিক বিষয়গুলি যেরূপ আদৃত হয়, রঙ্গমঞ্চে জড়বাদী মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণমূলক গল্প সাধারণ জনতাকে তাদৃশ আনন্দ দিতে পারে না। পৌরাণিক গল্পগুলি জন্মিয়াছিল সাধনার ক্ষেত্রে ; এখনকার বিষয়বস্তু অনুকরণের ভিত্তিতে দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং এদেশের লোকের প্রাণে সেরূপ সাড়া পায় না। অর্দ্ধশিক্ষিত, কলেজফেরতা ও ফিরিঙ্গিভাবাপন্ন কতকগুলি লোক বিলাতী প্রসিদ্ধ সিনেমার গল্পলেখক ও নটনটীদের সঙ্গে কিছু সাদৃশ্য দেখিয়া বাঙ্গালার রঙ্গমঞ্চে সেই অভিনয়ের বাহবা দেন ; সেই সার্টিফেকেটে ভীড় জমে ; কিন্তু জনসাধারণ তাদৃশ তৃপ্তি পায় না। এখনও 'সীতা' 'পাণ্ডবগৌরব' প্রভৃতি যে সফলতা লাভ করিয়াছে, তাহা রেকর্ড হইয়া রহিয়াছে।

এই মুহূর্তে যখন প্রাচীন আদর্শের দিকে প্রবৃত্তি জাগিয়াছে, এখন যদি কথকতার আনন্দলোকের তোরণ পুনরায় তাহাদের কাছে উদ্ঘাটিত হয় ; তবে সিনেমার এই মহা-অনিষ্টকর আকর্ষণ কমিয়া যাইতে বাধ্য। বিশেষতঃ, যদি শিক্ষিত সম্প্রদায় ইহার ভার নেন ও বিশ্ববিদ্যালয় পৃষ্টপোষক হইয়া পরীক্ষা ও উপাধির ব্যবস্থা করেন, তবে জন-শিক্ষার এই প্রধান উপায়টি পুনরায় সজাগ হইয়া জনসাধারণকে ; বিশেষতঃ তরুণ-দিগকে সুপথে পরিচালনা করিতে পারে।

জার্ম্মানীতে পুনঃ পুনঃ স্বদেশের পূর্ব্ব-সংস্কৃতি ইতিহাসের নব যুগে জাতীয় জীবনে ফিরিয়া আসিয়াছে, স্বদেশের প্রাচীন ইতিহাসে নব কলেবর দিয়া জাপান স্ব-সমাজের কল্যাণসাধন করিয়াছে। আর ঋষি-শাসিত ভারতবর্ষে বেদ-উপনিষদের দেশে, সাধনার নিজ নিকতনে কি আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের অবলম্বিত পন্থাগুলি বর্জন করিয়া আমরা কোন উচ্চ লক্ষ্যে পৌঁছিবার আশা করিতে পারি ?

আশুতোষ ও চিত্তরঞ্জন একত্র সহযোগ করিয়া কীর্ত্তনের প্রতিযোগীতা পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, এতদর্থে একটি ক্ষুদ্র কমিটিও গঠিত হইয়াছিল। প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী ও এই প্রবন্ধ লেখক সেই কমিটির সদস্য ছিলেন। সেই মহারথদ্বয়ের অকাল অন্তর্দ্ধানে তাঁহাদের পরিকল্পনা আকার ধারণ করিতে পারে নাই। কিন্তু কীর্ত্তনের প্রতিযোগীতামূলক পরীক্ষা একটা বৃহৎ ব্যাপার। বহু গায়ক ও বাদক লইয়া এক একটি কীর্ত্তন সম্প্রদায়। দশটি সম্প্রদায়কে আহ্বান করিতে হইলে অনেকরূপ ব্যবস্থা ও বহু ব্যয়ের প্রয়োজন। বিশেষতঃ, এক একটি পালা গাহিতে ৮।১০ ঘণ্টার দরকার ; কথকমাত্র একটি ; সুতরাং কীর্ত্তনের মত কথকতা জটিল ব্যাপার নহে ; ইহা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য। কত টাকা হইলে এইরূপ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়া

কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে, তাহার হিসাব পরে হইবে। শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যদি পৃষ্টপোষক হন, তবে ইহার সফলতা অনিবার্য্য। যিনি বঙ্গদেশের দুরন্ত ছেলেদিগকে শৃঙ্খলার মধ্যে আনিয়া এরূপ অসাধ্যসাধন করিয়াছেন ; তিনি দুর্নীত আমোদদায়ী প্রতিষ্ঠানগুলির হীন আদর্শ হইতে তরুণগণের মানসিক প্রবৃত্তি সহজ ও সুগম ও নীতিমার্গে প্রবর্তিত করিতে অবশ্যই সমর্থ, বিশেষতঃ কথকতার ইক্ষুক্ষেত্রে প্রচুর আনন্দরস সঞ্চিত আছে।

বঙ্গদেশের হাওয়া এখন ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা, ক্যানসার প্রভৃতি মারাত্মক রোগের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যার 'শয্যা'র ব্যবস্থা করিলে যে উপকার না হইবে, তাহা নহে ; সহস্র সহস্র রোগীর মধ্যে দুই-চারিজন উপকৃত হইবে ; তাহাও কম লাভ নহে। কিন্তু ঝিনুক দিয়া সমুদ্র সেঁচার মত ; বহুকালের প্রচেষ্টা এবং সরকার ও সাধারণের সহযোগিতা ও লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই ব্যাধিক্লিষ্ট বঙ্গদেশকে কতক পরিমাণে রোগমুক্ত করা যাইতে পারে। কিন্তু যে উপায়ে শতসহস্র তরুণ-তরুণীর মন ফিরিয়া যায় ; দেশের দূষিত হাওয়া পরিশুদ্ধ হইয়া নির্ম্মল হয় ; ধর্ম্মভাব পুষ্ট হইয়া লোক নীতিমান হয়, ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রেরণা পাইয়া জাতির মেরুদণ্ড নৈতিক বলে বলীয়ান হয়, সেইরূপ একটি প্রতিষ্ঠান সমাজে যে পরিবর্তন আনিতে পারে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিয়া অন্যবিধ উপায়ে জাতি সেইরূপ সফলতার প্রত্যাশা করিতে পারে না। মুসলমানগণও তাহাদের নানা প্রাচীন উপাখ্যান লইয়া এই প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন। তাঁহাদের কারবালা, সখিনা কাসেম এবং এজিদের কথা কথকতার বিষয় হইতে পারে।

এখন বিলাতী আমোদে প্রমোদে দেশ ছাইয়া গিয়াছে ; সেই সকল আমোদ প্রায়ই ঠুন্‌কো। তাহাতে সমাজের অকল্যাণ হইতেছে। এই সময়ে যদি আমরা প্রাচীন রাস্তাগুলি পরিষ্কার করি এবং জাতীয়তার ভাব লইয়া মহাজনগণের পদচারণপুণ্য সেই পন্থাগুলি সংস্কারপূর্ব্বক পুনরায় অবলম্বন করি, তাহা হইলে যোগ্য ও নিরন্ন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ; তথা দেশীয় অন্যান্য সমাজের গুণী ব্যক্তিদের অন্ন-সমস্যার কতক পরিমাণে সমাধান হইতে পারে। শিক্ষিত সম্প্রদায় যদি কথকতার উৎসাহ দেন ; বিশ্ববিদ্যালয় যদি পৃষ্টপোষকতা করেন এবং কথকদের গুণপনা যদি উপাধিবিতরণ দ্বারা নিজশক্তি কর্তৃক স্বীকৃত হয়, তবে এই অসার সিনেমা ও গ্রামোফোনের উৎপাত কতকটা কমিবে এবং পল্লীতে পল্লীতে গুণী ব্যক্তিদের জীবিকা-সংস্থানের কতকটা উপায় হইবে। আজকাল এদেশে মন্দিরে ঘণ্টা বাজাইয়া ও শিষ্যের কাণে ফুঁ দিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ কিছুতেই জীবনধারণের উপায় করিতে পারিতেছেন না। কথকতায়দেশের নৈতিক ও ধর্ম্মজীবনের স্বাস্থ্য পুনরায় ফিরিয়া আসিতে পারে। সুখের বিষয় বঙ্গের বিদুষী কন্যা শ্রীমতি অপর্ণাদেবী ও তাঁহার উদ্যমশীল স্বামী শ্রীযুক্ত সুধীর রায় ; কীর্তনের প্রতি লোকের রুচি ফিরাইয়া আনিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। যেখানে অপর্ণা গান করেন, নাটোরের মহারাজা খোল বাজান, খগেন্দ্র মিত্র মন্দিরার মিষ্ট বোল দ্বারা সহযোগিতা

করেন এবং বঙ্গের একাধিক মহারাণী আসর উজ্জ্বল করিয়া কীর্ত্তনে উৎসাহ দেন, সে আসর ইহার মধ্যেই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে।

আমরা সিনেমা ও গ্রামোফোনের সম্বন্ধে যাহা বলিলাম; পাঠকগণ তাহার ভুল অর্থ করিবেন না। সিনেমা ও গ্রামোফোন যন্ত্রজ ব্যাপার, ইহার সঙ্গীতের এবং দৃশ্যপটের রাজ্যে উপায় মাত্র। এই বৈজ্ঞানিক উপায় জগজ্জয়ী হইয়াছে, সুতরাং ইহারা অবহেলার পাত্র নহে। আমার মন্তব্য যাঁহারা যন্ত্র চালান, শুধু তাঁহাদের প্রতি। ইউরোপে তদ্দেশের সুখ, দুঃখ, সমাজ, আদর্শ ও সাময়িক উত্তেজনামূলক বিষয় এই সকল যন্ত্র-সাহায্যে সাধারণের গোচরীভূত হয়। তাহারা যে আমোদ চায়, তাহা প্রচুর পরিমাণে এই সকল যান্ত্রিক উপায় যোগদান দেয়। কিন্তু আমরা শুধু অনুকরণ করিতে ব্যস্ত। যে সকল বিষয়ে শুধু মুহূর্তের উত্তেজনা হয় এবং আদর্শ ও সমাজ সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন হওয়ার দরুণ আমাদের জন-সাধারণের প্রাণের সাড়া পাওয়ার দাবী করিতে পারে না, অথচ দুর্নীতির পথে পরিচালিত করে, আমরা শুধু সেই সকল বিষয়ের কথাই বলিয়াছি। □

১. "The Indian painters, though illiterate in the western sense, are the most cultured of their class." —(Introduction, XIX, *Ideals of the Indian Art*,—H. B. Havel)

২. "A very competent and independent witness Dr. Lefroy has testified from his long personal experience to the extraordinary aptitude with which the poorest and the most illiterate Hindu peasant will engage in discussion in the deepest philosophical and ethical questions."

□ Space Donated By A Well Wisher □

আলোচনা

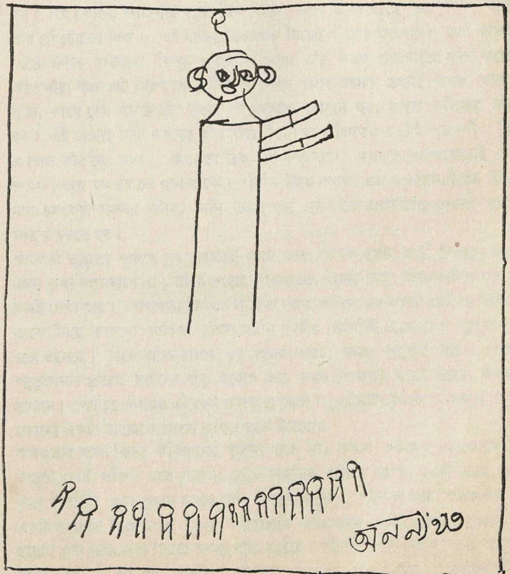

কথকতা

রাজ্যেশ্বর মিত্র

কথকতা বহু প্রাচীন শিল্প যাকে আমরা ইংরেজিতে 'আর্ট' বলি। কথকতা শব্দটাতেই ইঙ্গিত পাচ্ছি যে এ কেবল কথার শিল্প। একটা বিষয়বস্তুকে কেবলমাত্র কথার মাধ্যমে একটি আখ্যানে রূপান্তরিত করাই হচ্ছে কথকতার সার্থকতা। এই যে মৌখিক বাক্যের গ্রন্থনা একে সাধারণ ভাষায় ঘটকালি বলা হয়। যিনি ঘটনার বর্ণনা করেন, তিনিই ঘটক, অথবা যিনি দুই পক্ষের মধ্যে সংযোজন ঘটান তাঁকেও ঘটক বলা হয়। যে কোনো কাহিনীর দুটি দিক থাকে,—একটি যা ঘটছে তার দিক, অপরটি তার প্রতিঘাতের দিক। এই ঘাত-প্রতিঘাতকে নিয়েই ঘটকের কারবার। রাধা অভিসারে যেতে উদ্যত হয়েছেন, কিন্তু গৃহজনের বাধা তাঁর কাছে প্রতিঘাতের সৃষ্টি করেছে। কীর্তনীয়া যখন এই অন্তর্দ্বন্দ্বের বিবৃতি করেন কথার অবসরে তখনই তাকে ঘটকালি বলে, কারণ শেষ পর্যন্ত তাঁর কথায় সব সমস্যার অবসান হয়, রাধার অভিসার সার্থক হয়। এই জন্যেই যিনি যত বড় কীর্তনীয়া, তিনি ঘটকালিতেও ততটাই পারদর্শী। কিন্তু এ গেল কীর্তনের কথা। কথকতা ঠিক এই বস্তু নয়। কথকতা আগাগোড়াই কথার শিল্প ; তবে কথতাতেও গান থাকে। যিনি উত্তম কথক এবং সুগায়ক, তিনি উভয়ের মধ্যে চমৎকার সমন্বয় ঘটান, যিনি ততটা পটু নন তাঁকে বাক্যাংশের ওপরেই প্রধানতঃ নির্ভর করতে হয়।

কথকতা ভারতের সর্বাংশে সব ভাষাতেই আছে এবং আজও সেই আর্ট বিলুপ্ত হয়েছে, এমন কথা বলা যাবে না ; যদিচ শহরে কথকতার আসর নানা কারণে আজকাল খুব কমই দেখা যায়। কথকতা লিখিত সাহিত্য নয় ; অতএব এর যথেষ্ট প্রাচীনত্ব থাকলেও তাকে নিয়ে কোনো সাহিত্য রক্ষিত হয়নি ; সমস্ত শিল্পটিই মুখে মুখে পুরুষানুক্রমে চলে এসেছে। তবে অভিনয়াংশে এর প্রচার আছে, যেমন 'পুতুল নাচ'। আসলে পুতুল নাচ প্রত্যক্ষ দর্শনের বস্তু হলেও তার সমস্ত পালাটি ফুটে উঠছে কথকতার মাধ্যমে। পটচিত্র নিয়েও এইরকম কথকতা আছে। এইভাবে কথকতা কখনো কখনো কোনো একটা মাধ্যমকে আশ্রয় করেও গড়ে উঠেছে।

কথকতার সঙ্গে কিন্তু কবিগানের তুলনা চলে না, কারণ কবিগান কথকতার মতন উৎকৃষ্ট আর্টে পরিণত হতে পারেনি, চটুল সাময়িক রুচিকে কেন্দ্র করেই তার প্রচলন গড়ে উঠেছিল এবং পতন হতেও বেশি বিলম্ব হয়নি। পাঁচালি আর কথকতার মধ্যে একটা ধারাগত মিল আছে, কিন্তু পাঁচালিতে কবিগানের কাব্যধারাকে অনুসরণ করা হয়েছে এবং মধ্যে মধ্যে গানের অবসর রাখা হয়েছে। পাঁচালি গোটাটাই কবিতার আঙ্গিকে নিবদ্ধ এবং এতেও বহু সাময়িক ঘটনাকে অবলম্বন করা হয়েছে। তথাপি পাঁচালি

আসলে পৌরাণিক আখ্যায়িকাকে নিয়েই রচিত হত, তবে তার মধ্যে কবিতার কৃত্রিমতা, অনুপ্রাস, যমক প্রভৃতি প্রচুর থাকত। কিন্তু, যে কারণে কবিগান বিলুপ্ত হয়েছে, পাঁচালির বিলোপও সেই কারণেই ঘটেছে বললে অত্যুক্তি হয়না, কারণ সমাজ এবং জনরুচি পালটে গেছে, আর এইসব মাধ্যম জনগণের মধ্যে সাড়া জাগিয়ে তুলতে সমর্থ হয়না।

কথকতার অনুরূপ আর একটি ধারা প্রচলিত আছে, সেটি হচ্ছে পাঠের রীতি। ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি বিভিন্ন আখ্যায়িকাকে অবলম্বন করে পাঠ করা হয়। এই পাঠের একটি সুচারু পদ্ধতি আছে, কখনো কখনো তাতে সুরের রেশ লেগে থাকতেও দেখা যায়। পাঠ করবার অবসরেও যে গানের অবতারণা ঘটেনা তা নয়, তথাপি পাঠের প্রণালী আর কথকতা এক জিনিস নয়; কথকতার কোনো প্রত্যক্ষ অবলম্বন নেই। সম্পূর্ণ স্মৃতি থেকেই একটি আখ্যানবস্তুকে নির্বাচন করা হয় এবং কথক সেটিকে নাটকের মতন ধীরে ধীরে দৃশ্যের পর দৃশ্য ধরে উন্মোচন করতে থাকেন। এর মধ্যে কোনো চটুল বাক্যবন্ধ প্রবেশ করলে তা স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত হতে বাধ্য। এই কারণেই কথকতার গাম্ভীর্য একটি স্বতন্ত্র বস্তু এবং সম্পূর্ণ কল্পনার মধ্যে এর সঞ্চরণ যে চিত্র ফুটিয়ে তোলে তা প্রতি শ্রোতার মানসপটে এক একটি চলচ্চিত্রের অবতারণা করে বললে অত্যুক্তি হয় না। পাঁচালিকারেরও অবশ্য এই স্বাধীনতা আছে, কিন্তু ছন্দোবদ্ধ পদবন্ধগুলিকে সেই অনুযায়ী সাজিয়ে নিতে হয়। এটি সহজ ব্যাপার নয়, এর জন্য অনেক পরিকল্পনাকে পরিত্যাগ করতে হয়, নতুবা অন্যভাবে প্রয়োগ করতে হয়। কথকতায় এই বাধা কথককে পীড়িত করেনা, তিনি মনের কথা অনায়াসে প্রকাশ করতে পারেন; তাঁর মুখনিঃসৃত গদ্য নানাভাবে অত্যন্ত সুললিত ভঙ্গিতে শ্রোতার মনে প্রবেশ করতে সক্ষম হয় এবং তার কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে তোলে।

কথকতা, কবিগান এবং পাঁচালি,—এই তিনটিই গত শতাব্দীতে প্রচলিত ছিল। এদের মধ্যে কথকতা প্রাচীনতম এবং কথকতার কথনশৈলীকেই কবিগান এবং পাঁচালির মধ্যে গ্রহণ করা হয়েছিল। পদাবলী কীর্তনে এবং পালাকীর্তনেও এর প্রবেশ ঘটেছিল, কিন্তু তা কীর্তনের শিল্পের মধ্যেই ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে গিয়েছিল। কথকতার বৈশিষ্ট্য এই যে পুরাণকাহিনী ভিন্ন অন্য কোনো বিষয়বস্তুকে এর অন্তর্গত করা হয়নি। প্রধানত যে কথকতা শোনা যায়, তা রামায়ণের আখ্যানভাগকে গ্রহণ করেই পরিণতি লাভ করেছে। এই শ্রেণীর কথকদের অনেক সময় 'রামকথক' বলা হয়ে থাকে। কিন্তু, রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনী নিয়েও যে কথকতা রচিত হয়নি এমন নয়, তবে তার দৃষ্টান্ত খুবই কম। এর সবচেয়ে বড় প্রবক্তা ছিলেন শ্রীধর কথক। নিধুবাবু যেমন সর্বাংশে টপ্পার সৃজনশীলতা নিয়ে বাংলার সঙ্গীতে ভাস্বর হয়ে আছেন তেমনি শ্রীধরও তাঁর কথকতাকে অবলম্বন করেই কথকতার শিল্পজগতে তাঁর উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। টপ্পা থেকে বাংলার সঙ্গীতের বহু গায়ক-গায়িকার বিবরণ আমরা জানি; এঁদের সঙ্গীতের সঙ্কলন নিয়ে বড় বড় গ্রন্থ রচিত হয়েছে, অনেক

স্বরলিপির বই-ও পাওয়া যায়, কিন্তু কথকদের জীবনকাহিনী তেমন ভাবে অথবা আদৌ সঙ্কলিত হয়নি। এর প্রধান কারণ কথ্যবস্তুকে নিবদ্ধ করা সম্ভব হয়নি এবং বোধ করি তার উপায়ও ছিল না। শ্রীধর কথকের বিবরণও আমরা পেতুম না, যদি না তিনি উত্তম সঙ্গীত রচনা করে যেতেন। আসলে এই সঙ্গীতগুলিই রক্ষিত হয়েছে এবং সেই প্রসঙ্গেই তাঁর জীবন কাহিনীও বর্ণিত হয়েছে। আমার মনে হয়, বর্তমানে যাঁরা এসব বিষয় নিয়ে গবেষণা বা আলোচনা করছেন, তাঁদের কর্তব্য হবে কথকদের জীবনীসহ একটি তালিকা সংগ্রহ করা। প্রতি জেলায় যদি এই সংগ্রহের উদ্যম করা যায়, তাহলে আজও হয়তো বহু কথকের কার্যধারা এবং কথনশিল্প সম্বন্ধে আমরা অনেক সংবাদ সংগ্রহ করতে পারব। এর একটা ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে, সেটাও অস্বীকার করা যায় না। আমি পশ্চিমবঙ্গের লোক, কিন্তু মানুষ হয়েছি পূর্ববঙ্গে। উক্ত অঞ্চলে আমি কথকতার আয়োজন বা প্রচার দেখিনি। এর একটি প্রধান কারণ, কথকতায় কথার শিল্প গড়ে উঠেছে পশ্চিমবঙ্গের ভাষার আশ্রয়ে, পূর্ববঙ্গের কথিতভাষায় এইরকম শিল্প গঠিত হবার কোনো সুযোগ ছিল না। অবশ্য শুদ্ধ বাংলাভাষায় কথকতাকে যে দাঁড় করানো যেতে পারেনা তা নয়, কিন্তু তাতে যে কৃত্রিমতার সৃষ্টি হবে তা শ্রোতার কাছে উপাদেয় হবে বলে আমার মনে হয় না।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলবার আছে। আজকাল স্ত্রীকণ্ঠে কথকতার একটা প্রচার হতে দেখা যাচ্ছে। এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে অনেক যন্ত্রের সহযোগিতাও থাকে। দেখেছি স্ত্রী-শিল্পীরা আগে থেকেই একটি খাতা থেকে লিখিত আখ্যানভাগ পাঠ করেন এবং তৈরি গান গেয়ে থাকেন। কথকতার আদর্শ এটা নয়, উপযুক্ত কথক কখনো লিখিত গল্পাংশ পাঠ করেন না, তাঁদের সমস্ত অনুষ্ঠানটিই 'একস্‌টেম্‌পোর' (উপস্থিত-মতন বাগ্মিতা) এবং এইটিই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক উপাদান। আমার এও মনে হয়েছে যে স্ত্রীকণ্ঠ কথকতার সর্বতোভাবে উপযোগী নয়, কারণ কথকতায় এমন একটা গাম্ভীর্য থাকে যা কেবলমাত্র পুরুষকণ্ঠেই উচ্চারিত হলে ভাল শোনায়। পদাবলী কীর্তনের ক্ষেত্রে অবশ্য স্ত্রীকণ্ঠের প্রচলন বহুদিন ধরে আছে; কিন্তু তাও অনেক পরিমাণে সীমিতভাবে প্রযুক্ত হয়েছে, কারণ সব আখর স্ত্রীকণ্ঠের উপযোগী হয় না। পাঁচালির ক্ষেত্রেও দেখা গেছে স্ত্রীলোকেরা দল গঠন করলেও নিজেরা গানের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতেন না।

যাই হোক, প্রসঙ্গত, শ্রীধর কথকের জীবনকাহিনী কিছুটা বিবৃত করা যাক, কারণ ইনি শুধু কথকতার ক্ষেত্রেই নয় গানের ক্ষেত্রেও একজন স্বনামধন্য পুরুষ। আরও একটি আশ্চর্যজনক ব্যাপার এই যে কলকাতা থেকে বেশ দূরে বাস করেও, তিনি এই শহরে গায়ক সম্প্রদায়ের মধ্যে অভাবনীয় প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। এটা সেকালে আর কারুর ক্ষেত্রে ঘটেছে বলে জানিনে।

শ্রীধর কথক ১৮১৬ সালে হুগলী জেলায় বাঁশবেড়ে নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। নিধুবাবু তখনো বেঁচে, তবে তখন তাঁর বয়স পঁচাত্তর। শ্রীধর দেখতে খুব ভালো

ছিলেন ; তাঁর ব্যক্তিত্ব তাঁর কথকতায় এবং গানে খুব সহায়তা করেছিল। তিনি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন এবং ভাগবতে তাঁর উত্তম অধ্যয়ন ছিল। তাঁর জ্যাঠা জীবনকৃষ্ণ শিরোমণি তাঁকে মুরশিদাবাদে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত করেন, কিন্তু শ্রীধর ব্যবসায়ে মন লাগাতে পারলেন না। বহরমপুরে কালীচরণ ভট্টাচার্যের কাছে তিনি কথকতা শিক্ষা করেন, কিন্তু নিজস্ব রীতিতে একটি কথনশৈলী গঠন করেছিলেন। তাঁর পিতা রতনকৃষ্ণ শিরোমণিও কথক ছিলেন, কিন্তু বোধ করি পিতার সাহচর্যলাভের সুযোগ তিনি পাননি। তাঁর পিতামহ লালচাঁদ বিদ্যাভূষণও প্রসিদ্ধ কথক ছিলেন। তাঁরা বংশানুক্রমে সকলেই সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু কেউই গান রচনায় খ্যাতিলাভ করেননি। শ্রীধর উত্তম গায়ক ছিলেন, তবে নিধুবাবুর প্রভাব তাঁর ওপর যথেষ্ট পড়েছিল। অনেক সময় তাঁর গানের সঙ্গে নিধুবাবুর গানের পার্থক্য নিরূপণ করা শক্ত হয়ে পড়ে। শ্রীধর তাঁর কথকতার ধারা এবং সঙ্গীত তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র পণ্ডিত অতুল্যচরণ ভট্টাচার্যকে শিক্ষা দিয়ে যান এবং তাঁর কাছেই শ্রীধরের সমস্ত রচনা রক্ষিত ছিল। শ্রীধর কলকাতায় এসে গান করেছেন এরকম প্রসিদ্ধি নেই ; কিন্তু তাঁর গানগুলি গায়কদের মুখে মুখে কলকাতায় যথেষ্ট প্রসিদ্ধিলাভ করেছে। তবে, তাঁর কথকতার রীতি বোধ করি কলকাতায় প্রচলিত হবার সুযোগ পায়নি।

এই বিবৃতি থেকে জানা যাবে বহরমপুর এবং মুরশিদাবাদ অঞ্চল পদাবলী কীর্তনের মতন কথকতাতেও প্রসিদ্ধিলাভ করেছিল। হুগলী জেলাতেও কথকতার প্রচলন মন্দ ছিল না, কিন্তু অন্যান্য জেলাতে কথকতার প্রচার সম্বন্ধে আমরা প্রায় কিছুই জানি না। কথকতার মূল উদ্দেশ্য ছিল লোকশিক্ষা ; সংস্কৃত নাটকেরও প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তাই। কিন্তু নাটকের মধ্যে অনেক কৃত্রিমতা প্রবেশ করেছিল, নাট্যবস্তুর বাইরের কোনো ধারাই নাটকে প্রবেশ করতে পারত না। তাই, নাটক ক্রমে ক্রমে সাহিত্যের মাধ্যমে একটা উচ্চস্তরের আর্টে পরিণত হয়েছিল যা অপর কোনো রীতিতে প্রবেশ করতে পারেনি। তখনকার দিনে লোকশিক্ষা বলতে বোঝাতো রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণের কাহিনী সম্বন্ধে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা। এইসব শাস্ত্রের উপদেশ অনুসারেই সমাজে চরিত্রগঠন ও জীবনধারার গতি নির্ধারিত হত। এই কারণেই কথকতা পুরাণ-কথার বাইরে অন্য বিষয়ে বিস্তৃত হতে পারেনি এবং সেরূপ ইচ্ছাও কথকগণ পোষণ করতেন না।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে লোকশিক্ষা ব্যতীত ভক্তিবাদ কথকতার ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল কিনা এবং করলে তার পরিমাণ কতখানি। কথকতা অবশ্যই ভক্তিবাদে প্রভাবিত হয়েছিল, কিন্তু তা কীর্তন বা ভাগবতপাঠের মতন ভক্তির ঐকান্তিকতায় মুখর হয়ে ওঠেনি। নাটকে ভক্তিবাদ অবান্তর কারণ নাটক তার নির্ধারিত বিষয়বস্তুকে নিয়েই অনুষ্ঠিত হত ; সেখানে প্রতিটি সংলাপ নির্দিষ্ট করাই থাকত এবং নাটক এই সংলাপকে অবলম্বন করেই লিপিবদ্ধ ঘটনাটুকুকে ফুটিয়ে তুলত। এ সবই যেন অপরের গড়া বাগানের পরিকল্পনা অনুযায়ী গাছ-গাছড়ার পরিচর্যা, তার বেশি কিছু

যোগ করে অতিরিক্ত সুষমা সম্পাদনের সুযোগ সেখানে নেই। কথকতা ঠিক এই পর্যায়ে পড়ে না, কারণ বিষয়বস্তু কী হবে সেটা কথকঠাকুর নিজেই ঠিক করেন, তার সম্পূর্ণ সংগঠনের দায়িত্ব তাঁরই। বর্ণনা, সংলাপ, বস্তু পরিকল্পনা এবং বিবৃতি,—সবই কথকের আন্তরিক নির্দেশে পরিচালিত হয়ে একটা পরিণতিতে পৌঁছোয়। শ্রোতা সেখানে তাঁর মনশ্চক্ষে একটা কাহিনীর মনোজ্ঞ অবতারণা দেখবার সুযোগ পান। তাঁর সামনে কোনো পুরাণ নেই যার পাঠোদ্ধারের দায়িত্ব পাঠকের ; অথবা কোনো লিখিত নাটক নেই যা নটনটীদ্বারা অভিনীত হচ্ছে। কথকতা হচ্ছে সম্পূর্ণ মনোধর্মী অনুষ্ঠান যা কথকের মন থেকে শ্রোতার মনে পেঁছে তাকে নানাভাবে আবিষ্ট করে রাখছে। এ হচ্ছে কথকঠাকুরের নিজের গড়া বাগান, যেখানে তৃণ থেকে আরম্ভ করে প্রতিটি পত্র-পুষ্পের সমারোহ তিনি নিজেই সৃষ্টি করে নানাভাবে তার প্রতিকৃতিকে মহিমান্বিত করে তুলছেন, কিন্তু অস্তিত্ব বলতে এর কিছু নেই,—একে প্রতিষ্ঠিত করে রাখা যাবে না,—কেননা এ কথন কাহিনীর জন্যে নয়, কল্পনাকে কল্পলোকে শোভিত করবার জন্যে। কথার সঙ্গে সঙ্গেই কথকতার পরিসমাপ্তি, বাগ্মিতার এ এক অদ্বৈত প্রয়োগ, যার আর কোনো তুলনা খুঁজে পাওয়া যায় না। □

কথকতা পাঠকতা

রমাকান্ত চক্রবর্তী

ভারতে কথকতার, পাঠকতার ইতিহাস এবং ঐতিহ্য প্রাচীন এবং কিছুটা অজ্ঞাত। ঋক্‌বেদের সময় থেকে বেদপাঠ এক অর্থে বেদগান। সামবেদে গানের গুরুত্ব সুস্পষ্ট।[১] গানে গানে সুপ্রাচীন বেদের প্রতিটি শব্দ শ্রুতিরূপে পরিশীলিত হয়েছে। খ্রিষ্টপূর্ব ১৩০০ থেকে ৯০০ শতাব্দের মধ্যে আর্য-ব্রাহ্মণদের বিভিন্ন গোত্র উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়ে; পাঞ্জাবে, হরিয়ানাতে, উত্তরপ্রদেশে, তিরহুতে, এবং কনৌজে অনেক ব্রাহ্মণ ছিলেন পাঠক। রাহুল সাংকৃত্যায়নের দাদামশাই রামশরণ পাঠক ছিলেন সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ। শেষ বয়সে তিনি বৈষ্ণব দীক্ষা পেয়েছিলেন। প্রথমে তিনি ছিলেন সৈনিক, পরে হলেন সম্পন্ন কৃষক; অর্থাৎ, নানান্‌ কারনে 'পাঠক' আর 'পাঠক' ছিলেন না।[২] এভাবে ক্রম ভঙ্গ হওয়ার জন্য পাঠকতার তথা কথকতার ঐতিহ্য অনেক ক্ষেত্রেই অজ্ঞাত কিংবা স্বল্পজ্ঞাত থেকে যায়।

আমাদের দেশে বেদপাঠের ঐতিহ্য এখনও আছে; তবে তা স্তিমিত। ঢাকা-বিক্রমপুরের বাৎস্য গোত্রের ব্রাহ্মণ সুপণ্ডিত করুণাময় সরস্বতীকে, আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে, যাদবপুরের এক উদ্বাস্তু-পল্লীতে, এক বৈদিক ব্রাহ্মণের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে, ঋক্‌বেদ পাঠ / গান করতে শুনেছিলাম। সামনে কোন বই-পুথি না রেখে গম্ভীর স্বরে, বিশুদ্ধ উচ্চারণে করুণাময় প্রায় দু' ঘন্টা ধরে যজ্ঞাগ্নিসেবন করতে করতে বেদপাঠ করলেন, বেদগান করলেন। এখনও সে ঘটনা ভুলিনি। শ্রাদ্ধবাসর তাঁর বেদপাঠে গম্‌গম্‌ করতে থাকল। টালি দিয়ে ছাওয়া মুলীবাঁশের দেয়ালঘেরা সারি সারি ঘর; মাটির মেঝে। চারদিকে দারিদ্র্যের, দুঃখের, বঞ্চনার চিহ্ন। এ সব যেন করুণাময়ের অসামান্য বেদগানে ক্ষণিকের জন্য অদৃশ্য হয়। তিনি কৃষ্ণকায়; তাঁর মাথার সামনের অংশ মুণ্ডিত, পেছনে দর্শনীয় বিপুল টিকি; চওড়া বুকে শুভ্র পৈতা আর রুদ্রাক্ষের মালা। তখন বুঝলাম, শুধু স্মৃতিতেই করুণাময়ের মতো ব্রাহ্মণরা শ্রুতিকে ধরে রেখেছেন; এজন্য তাঁদের বই-পুথির দরকার হয়নি।

যখন পুরাণসমূহ রচিত হ'ল, তখন বিশেষভাবে 'সাত্ত্বিক'-শ্রেনীর বৈষ্ণব পুরাণসমূহ পাঠ করা হ'ত, পাঠের সঙ্গে গানও করা হ'ত, কথায়, সুরে ব্যাখ্যা করা হ'ত। পশ্চিম ভারতে, দাক্ষিণাত্যে পুরাণ পাঠক কথকদের বলা হ'ত 'পৌরাণিক'। ধনীগৃহের শুদ্ধান্তঃপুরে পুরাণপাঠের সুযোগে 'পৌরাণিক'-এর লম্পটতা বর্ণিত হয়েছে কাশীপতি রচিত 'মুকুন্দানন্দভাণ' নামক কৌতূহলোদ্দীপক নাটকে।[৩] পৌরাণিক

তথা তথা পঠতি পুরাণং তথা তথা বক্ষ্যত্যর্থানপি।

তথা তথা প্রেক্ষতে কিতব যথা যথা রজ্যন্তে বালবিধবাঃ॥

আমরা এখানে রামায়ণ-গানের কথা বলছি না ; তার সঙ্গে নৃত্য এবং অভিনয়ের সংযোগ ছিল। আমরা এখানে এটাই বলতে চাইছি যে, প্রধানতঃ পুরাণপাঠই ছিল কথকতা পাঠকতার ভিত্তি। বেদপাঠ ছিল মৌলিক পাঠ ; তার আনুপূর্বিক ব্যাখ্যা পাঠের সময়ে প্রয়োজনীয় ছিল না। কিন্তু পুরাণপাঠ শুধু মূলের আবৃত্তি নয় ; আবৃত্তির পরে তার সহজ ভাষ্যও প্রয়োজনীয় হয়। ভাষ্যকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় হয় গান। ভাষার সাহায্যে ভাষ্যকে নাটকীয় করে তুলতে হয়।

গুপ্ত সম্রাটদের শাসনকালে এবং তার পরে ব্রাহ্মণ্য পৌরাণিক ধর্মের এবং শাস্ত্রীয় ঐতিহ্যের প্রসারের জন্য পূর্ব ভারতে, বিশেষভাবে বলে, ব্রাহ্মণদের বহু উপনিবেশ গঠন করা হয়েছিল।[৪] বহু ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে এসেছিলেন কনৌজ, লাট, কর্ণাটক, এবং উত্তর ভারতের অন্যান্য থেকে। এমন মনে করা যায় যে, এই ঔপনিবেশিক ব্রাহ্মণরাই বাঙ্গালা দেশে পাঠকতার / কথকতার সূত্রপাত করেন। কিন্তু তার পদ্ধতি অজ্ঞাত। কেশব সেনের ইদিলপুর তাম্রলেখতে বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের বিবরণ আছে।[৫] তা থেকে এমন মনে করা যায় যে, কর্ণাটক থেকে আগত সেন-বংশীয় রাজারা বেদপাঠের কর্ণাটকি-পদ্ধতি আমাদের দেশে প্রচলিত করেন।

পৌরাণিক কথকতার / পাঠকতার একটি বিশিষ্ট ধারাতে নিবদ্ধ ছিল ভাগবতপুরাণ পাঠ। এই পুরাণ পুরাণরূপেও ছিল বিশিষ্ট। পৌরাণিক রচনার যে প্রচলিত ধারা ছিল ভাগবতে তা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলা হয়নি। ভাগবতের ভাষা উদ্দেশ্যমূলক-ভাবে কিছুটা আর্য ; এই আর্যতা ভগবদগীতার ভাষাতেও দেখা যায়। ভাগবত প্রথমাবধি উচ্চশ্রেনীর কবিতা, এবং প্রথমাবধি বৈষ্ণবীয় ভক্তির আধার। এই পুরাণের দেবতা কৃষ্ণ অব্রাহ্মণ গোপাল ; তিনি কৃষ্ণকায়। তিনি বাঁশী বাজান, গোয়ালিনীদের সঙ্গে প্রেম করেন, এবং প্রয়োজন হ'লে অত্যাচারী নিষ্ঠুর দৈত্যদানবদের বধ করেন। তিনি তাঁর 'ভক্ত'কে রক্ষা করেন ; তাই তিনি ভক্তের 'ব্যক্তিগত' দেবতা। ভক্তের জাতি-বিচার করা হয় না। কৃষ্ণভজনে ভক্তির যে উচ্ছ্বাস থাকে, তা পাঠকের / কথকের ভাগবতপাঠেও প্রতিবিম্বিত হয়। বাঙ্গালা দেশে বল্লাল সেনের সময়ে ভাগবতপুরাণ জ্ঞাত ছিল।[৫ক] রাষ্ট্রব্যবস্থা যখন দুর্বল, সমাজব্যবস্থা যখন ব্রাহ্মণ্য ধর্মশাস্ত্রদ্বারা নিয়ন্ত্রিত, আধা-ফিউডাল সমাজে ব্যক্তির জীবনে যখন অনিশ্চয়তাই ধ্রুব, তখন ভক্তিতে, বিশেষ ভাবে যৌনতাগ্রস্ত কৃষ্ণভক্তিতে, রূঢ় বাস্তব অবস্থাকে কিছুটা ভুলে থাকা যেত। ভক্তি যদি গানে, বাদনে, নাটকীয় ব্যাখ্যানে একটি শিল্পিত স্বভাব অর্জন করে, তবে তো তো কথাই নেই।

পূর্বভারতে তথাকথিত 'হিন্দু' রাষ্ট্রব্যবস্থার চূড়ান্ত অবনতির কালে প্রতিভাবান কবি, এবং 'পদ্মাবতীচরণ চারণ চক্রবর্তী', জয়দেব রাধাকৃষ্ণের কাহিনী অবলম্বনে রচনা করেছিলেন 'গীতগোবিন্দ', যা ছিল গেয় কাব্য, যার 'অভিনয়' উদ্ভাবিত হয়। অসামান্য এই কাব্যের প্রথম শ্লোকেই অম্বর মেঘমেদুর, বনভূমি তমালশ্যাম, পটভূমি শ্যামময়। সুস্পষ্ট, সুন্দর, এবং নাটকীয় এই প্রেক্ষিত। পরবর্তী সময়ে বৈষ্ণবীয়

কথকতায় শ্লোকের ব্যাখ্যায় যে গীতধ্বনি শোনা গেল, তারও অন্যতম স্রষ্টা ছিলেন 'সম্ভবতঃ' জয়দেব। 'সম্ভবতঃ' বলছি এ কারণে যে, জয়দেবের আবির্ভাবের পূর্বে, ১০৯০-১১১০ খ্রিষ্টাব্দে, বর্ধমানে কাটোয়ার কাছে সিদ্ধলগ্রামে, বঙ্গরাজ হরিবর্মদেবের ব্রাহ্মণ মন্ত্রী 'বালবলভীভুজঙ্গ' ভট্ট ভবদেব একটি নারায়ণ-মন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন; তাতে 'সঙ্গীতকেলি'-বিদগ্ধা একশত 'বিদ্যাধরী' অথবা দেবদাসী ছিলেন।[৬] লৌকিক কৃষ্ণকথা, এবং এই দেবদাসী-ঐতিহ্যদ্বারা জয়দেব প্রভাবিত হয়েছিলেন।

অথচ, এমন ভাবার কারণ নেই যে, কথকতা/পাঠকতা প্রধানতঃ বৈষ্ণবীয় পুরাণপাঠের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে মিথিলাতে তার একটি বিশিষ্ট ধারা ছিল। মৈথিল সঙ্গীতজ্ঞ লোচন লিখেছিলেন:[৭] [মূলাংশের অনুবাদ]

> বিদ্বান এবং প্রতিভাশালী রাজা ভবভূতি এমন কয়েকটি কাব্য রচনা করেন যা ছিল 'পুরাণপ্রতিম', অর্থাৎ পুরাণের মতো। তাঁর রচনাবলী কথকতারপদ্ধতি অনুসারে রাজসভায় পাঠ করা হ'ত; এই বিশেষ কথকতায় খ্যাতি অর্জন করেন কায়স্থ গায়ক সুমতি, এবং তাঁর পৌত্র জয়ত। জয়ত কবি বিদ্যাপতির কাছেও গীতরচনার পদ্ধতি শিখেছিলেন…জয়তের ছেলে কৃষ্ণও ভালো গায়ক ছিলেন। তাঁদের পরে খুব বড় গায়ক এবং কথকরূপে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন 'অগ্নিতুল্য' দেহকান্তিসম্পন্ন হরিহর মল্লিক। হরিহর মল্লিকের তিন পৌত্র রামান্তা, লছিরাখব, এবং টীকা। তাঁরা 'দেশী' গীতের উত্তম গায়ক ছিলেন।

লোচনের আবির্ভাবকাল ১৬৮১ খ্রিষ্টাব্দ। তাঁর বিবরণ থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে, মিথিলাতে কথকতার যে ধারা ছিল, তার সঙ্গে রাগাশ্রিত সঙ্গীতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। সম্ভবতঃ কথক জয়ত যখন বিদ্যাপতির কাছে গীতরচনা শিখলেন, তখন থেকে মৈথিল কথকতায় বৈষ্ণব প্রভাব সঞ্চারিত হয়।

যাতে কথনকালে কথক/পাঠক অবান্তর প্রসঙ্গের অবতারণা না করেন, কথার খেই হারিয়ে না ফেলেন, এজন্য কথকদের প্রয়োজনে কথার 'আদর্শ' রচিত হয়। এরকম 'আদর্শ' রচনা ছিল জ্যোতিরীশ্বর বিরচিত 'বর্ণরত্নাকর'।[৮] 'মৈথিল ভাষায় রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে এ গ্রন্থই প্রাচীনতম; তার রচনাকাল চতুর্দশ শতকের শেষভাগ। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভেবেছেন যে, জ্যোতিরীশ্বর কথকদের জন্য এ গ্রন্থ রচনা করেননি; এটি ছিল, তাঁর ভাষায়, 'unquestionably a book of poetical conventions and of set formulae…'।[৯] কিন্তু কবিপ্রসিদ্ধির অথবা কাব্যরীতির দৃষ্টান্ত এবং ভাষ্য-মূলক অন্য যে সব গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়েছিল, তাদের

সঙেগ 'বর্ণরত্নাকর'-এর কোনই মিল নেই। 'বর্ণরত্নাকর'-এর বিষয়বস্তুর মধ্যে আছে 'নগরবর্ণন' (পৃ. ১-২), 'স্থানবর্ণন' (পৃ. ৮-১০), 'ঋষ্যাশ্রম বর্ণনা' (পৃ. ৪৩), 'মল্লযুদ্ধ বর্ণনা (পৃ. ৪৫-৪৬), 'দেশ বর্ণনা' (পৃ. ৬১-৬২)। এ ধরনের বিশেষ বর্ণনা সংস্কৃত কবিপ্রসিদ্ধিতে স্থান পায় না। বাঙ্গালি কথকরাও এ ধরনের বর্ণনার ধারা পরে অবলম্বন করেন। নব্যন্যায়, নব্যস্মৃতি, এবং বিদ্যাপতির পদাবলীর সঙেগ মৈথিল কথকতার ঐতিহ্যও বাঙ্গালা দেশে আসে, সম্ভবতঃ চতুর্দশ শতকে।

বাঙ্গালা দেশে প্রথমে ভক্তির বিষয়টি খুব বেশি লোকের জানা ছিল না। বৃন্দাবন দাস লিখেছেন : [১০]

গীতা ভাগবত যে যে জনে পড়ায়ে।
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায়॥

এই অবস্থার অবসান হ'ল চৈতন্যের আবির্ভাবের পরে। যখন বৈষ্ণবীয় সংস্কৃতিতে ভক্তির গুরুত্ব অসামান্য হয়ে ওঠে। বৈষ্ণবীয় কথকতার একটি সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ। রূপ গোস্বামীর সভায় ভট্ট রঘুনাথ ভাগবত পাঠ করছেন। কৃষ্ণদাসের ভাষায়, [১১]

রূপ গোসাঞির সভায় করে ভাগবত পঠন।
ভাগবত পড়িতে প্রেমে আলায় তার মন॥
অশ্রুকম্প গদগদ প্রভুর কৃপাতে।
নেত্ররোধ ঝরে বাষ্প না পারে পড়িতে॥
পিকস্বর কণ্ঠ তাতে রাগের বিভাগ।
এক শ্লোক পড়িতে ফিরায় তিন চারি রাগ॥

ভাগবতপাঠে রাগরাগিনীর তরঙ্গবিভ্রম সম্ভবতঃ প্রথমে মিথিলাতে, পরে মথুরা বৃন্দাবনে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছিল। বৃন্দাবন থেকে ভাগবতী রাগতরঙ্গ আসে বঙ্গে এবং কলিঙ্গে ; প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, এখনও হিন্দীতে রচিত কোন কোন কৃষ্ণভজনে একই কালে বিভিন্ন রাগরাগিনীর রূপায়ন অতিশয় উপভোগ্য হয়ে ওঠে। ওড়িষ্যার মুসলমান-বৈষ্ণবকবি সালবেগ-রচিত বৈষ্ণবীয় ভজনেও এই ব্যাপার দেখা যায়।

যাঁরা ভাগবত পুরাণপাঠের বৃন্দাবনী রীতির সঙেগ বৃন্দাবনে পরিচিত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বিখ্যাত বৈষ্ণব গুরু শ্রীনিবাস আচার্য।[১২] সুদর্শন এবং সুপণ্ডিত শ্রীনিবাসের জীবিকা ছিল ভাগবতপাঠ। সেই পাঠ শুনে নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র আনন্দে নেচেছিলেন।[১৩] শ্রীনিবাসের শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন গোবিন্দদাস কবিরাজ। তাঁর কোন কোন পদে যে চিত্রলক্ষণ দেখা যায়, সুরপ্রয়োগের ক্ষেত্রে যে বৈচিত্র্য দেখা যায়, তাতে ভাগবতপাঠের প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়। যখন তিনি লেখেন,[১৪]

ভজহুঁ রে মন নন্দনন্দন
অভয়চরণারবিন্দ রে।
দুলহ মানুষ জনম সতসঙ্গে
তরই এ ভবসিন্ধু রে ॥

তখন ধরে নেওয়া যায় যে, অন্ততঃ ব্রজবুলি ভাষায় রচিত এ গানের একটি ভূমিকাও গায়ককে করে নিতে হ'ত। কথকতা/পাঠকতার মাধ্যমে বাঙালা দেশে এল নতুন নতুন গান, যা প্রচলিত মঙ্গলকাব্য গীতিকা থেকে ভিন্ন ছিল। এখন এরূপ নির্ণয় করা হয়েছে যে, বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যমঙ্গল' (পরে 'চৈতন্যভাগবত' রূপে আখ্যাত) প্রথমাবধি ছিল গেয় কাব্য[১৫] ; এই কাব্যের গায়নে নিশ্চিতভাবেই ভাগবতপাঠের কোনো প্রচলিত রীতি অবলম্বিত হ'ত। পরে কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত'-গ্রন্থপাঠ বৈষ্ণবদের ধর্মীয়কৃত্য হয়ে ওঠে। এই পাঠ শুদ্ধ আবৃত্তি ছিল না ; মূলের ব্যাখ্যাতে গানেরও বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। পদাবলীকীর্তনের প্রাণবস্তুস্বরূপ 'আখর' কথকতা থেকেই উদ্ভাবিত হয়েছে।[১৬]

শ্রীনিবাস আচার্যের সমকালীন, এবং সপ্তদশ/অষ্টাদশ শতকের কোন কথক/পাঠকের নাম জানি না। অথচ কথকতা/পাঠকতা যে সে সময়ে প্রচলিত ছিল, সাহিত্যিক প্রমাণ থেকে তা জানা যায়। শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য রাধবল্লভ চক্রবর্তী ভাগবত অনুসারে রাসলীলার পদাবলী রচনা করেন।[১৭] দাস্যভক্তিমূলক ভাগবত কাহিনী রচিত হয়।[১৮] ষোড়শ শতকের শেষদিকে রাঢ়ে জাতিভেদ বিরোধী সুপণ্ডিত এক বৈষ্ণব গুরু ছিলেন জয়গোপাল দাস ; অব্রাহ্মণ এই বৈষ্ণবগুরুকে ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব গুরুরা সমাজ থেকে বার করে দিয়েছিলেন।[১৯] তাঁর শিষ্য ঘনশ্যাম দাস একটি কাব্য রচনা করেন ; কাব্যটির আখ্যা 'হরিবংশ, ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত'।[২০] সমকালীন কবি বংশীদাস 'শ্রীভাগবতানুসারেণ' বেশ কিছু গান লিখেছিলে।[২১]

উনিশ শতকের শুরুতে কথকতা/পাঠকতা বাঙালি-সংস্কৃতির একটি অঙ্গ ছিল। ভূকৈলাশের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল লিখেছিলেন :[২২]

সঙ্কীর্তন নানা ভাঁতি অপূর্ব সুন্দর
অভিসার মিলনাদি গোষ্ঠের বিহার
পাঁচালী অনেক ভাঁতি রামায়ণ সুর
ভবানীভবের গান মালসী মায়ুর
বাইশ আখড়া ছাপ প্রেমে চুরচুর
চৈতন্যচরিতামৃত প্রেমের অঙ্কুর
কালিয়দমন রাস চণ্ডীযাত্রা ধীর
সাপড়িয়া বাদিয়ার ছাপের লহর
গড়াহাটী রাণীহাটি বিরহ মাথুর

কবি পশতো তালফেরা শুনিতে মধুর
কথকতা তরজাতে শাড়িতে (সারিতে) প্রচুর
গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিনী বিজয়াতে ভোর
গোবিন্দমঙ্গল জারি গাইছে সুধীর
শ্রবণে যাহার গান ভকত আতুর
রচিল চৈতন্যযাত্রা রসে পরিপূর
বাঙ্গালার নবগান নূতন ঝুমুর ॥

জয়নারায়ণ শুধু যে 'চৈতন্যচরিতামৃত প্রেমের অঙ্কুর'কে গানের তালিকায় রেখেছেন তাই নয় ; তিনি আমাদের জানিয়েছেন যে, যে শ্রবণসুখকর 'তালফেরা' কবি, এবং রাগমার্গাশ্রিত 'পশতো' গানে শোনা যেত, তা "কথকতা তরজাতে শাড়িতে (সারীতে) প্রচুর"। লক্ষণীয়, তিনি টপ্পা এবং আখড়াই গানের উল্লেখ করেননি। তাঁর তালিকা থেকে এটা বোঝা যায় যে, উনিশ শতকের শুরুতে বাঙ্গালার সাঙ্গীতিক কৃষ্টিতে উচ্চাঙ্গের গান, এবং 'সাপাড়িয়া বাদিয়ার ছাপের লহর,' তরজা, সারি, জারি গান, 'নূতন ঝুমুর', অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের লোকগীতি সমানভাবেই আদরণীয় ছিল, এবং লৌকিক সংস্কৃতি এবং শিষ্টবর্গীয় সংস্কৃতির মধ্যে সীমারেখা তেমন স্পষ্ট ছিল না।

'করুণানিধান বিলাস'-এর চার দশক পরে রচিত 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'-তে কথকতার বিবরণে এই প্রাচীন চারুশিল্পের অবনতি প্রকটিত হয়েছে।[২৩] মাল্যভূষিত কথকঠাকুর যেন 'বৃষোৎসর্গে'র ষাঁড়' 'বলিদানের মহিষ'। তিনি 'কাশিরাম খুড়ো'-র মহাভারত অবলম্বনে 'রসিকতার একশেষ কচ্চেন'। হুতোম লিখেছেন :

কথকতা পেসাটা ভাল-দিব্য জলখাবার দিব্য
হাতপাখার বাতাস ; কেবল মধ্যে মধ্যে
আহার বিহারে আনুষঙ্গিক প্রহারটা সইতে
হয়, সেইটেই মহান কষ্ট।

হুতোম আদর্শ কথক হিসেবে গদাধর শিরোমণি, রামধন তর্কবাগীশ, হলধর পঞ্চানন এবং শ্রীধর কথকের উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন :[২৪]

বর্তমান দলে শাস্ত্রজ্ঞানের অপেক্ষা করেন না
গলাটা সাধা, চাণক্য শ্লোকের দুআঁখর
পাঠ কীর্ত্তন অঙ্গের দুটো পদাবলী মুখস্ত
করেই মজুরা কত্তে বেরোন ও বেদীতে
বসে ব্যাসবধ করেন।

এই বিবরণ থেকে মনে হয়, হুতোমের কালে শিষ্টবর্গীয় নাগরিক বাঙ্গালিদের উপরে পৌরাণিক হিন্দুধর্মের প্রভাব আর আগের মতো গভীর ছিল না। এ কারণেই কথক/পাঠকরা নিজেদের শাস্ত্রজ্ঞান দেখাবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন না। কিন্তু তাঁদের গলা

সাধতে হ'ত ; সাধাগলায় ভাল গান না গাইতে পারলে তাঁরা সমাদৃত হতেন না। কোন কোন কথক/পাঠকের নৈতিক দুর্বলতা সম্পর্কে হুতোম যে ইঙ্গিত করেছেন, তা তো পূর্বে উল্লিখিত 'মুকুন্দানন্দ ভাণ'-তে আরও বেশি স্পষ্ট।

গদাধর শিরোমণি এবং রামধন তর্কবাগীশ সম্পর্কে অরুণ নাগ কিছু তথ্য দিয়েছেন।[২৫] গদাধর শিরোমণির আবির্ভাবকাল আনুমানিক ১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দ। বাঁকুড়ার সোনামুখীতে তাঁর নিবাস ছিল। বর্ধমানের রাজবাড়িতে ভাগবতপাঠ করে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর কথকতার 'সাট' [রীতি] রাঢ়ের কথকদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। রামধন তর্কবাগীশ ছিলেন কুশদহের পন্ডিত রামরাম তর্কালঙ্কারের পৌত্র। নিজস্ব চতুষ্পাঠী ছিল তাঁর ; তাঁকে বলা হ'ত 'কথক শিরোমণি'। অরুণ নাগের মতে গদাধর ও রামধন ছিলেন 'উনিশ শতকে প্রচলিত কথকতা রীতির প্রবর্তক'।[২৬] কিন্তু তখন অন্যান্য ধরনের রীতিও ছিল বলে মনে হয়। বিখ্যাত টপ্পা-রচয়িতা শ্রীধর কথককে গদাধর-রামধনের 'সাট'-এর বাইরে থেকে বিচার করাই যুক্তিসঙ্গত, কারণ কথকতা তাঁর পেশা হ'লেও প্রধানতঃ উচ্চমানের টপ্পা রচনা করেই তিনি খ্যাতি লাভ করেছিলেন। হুতোম-প্যাঁচা লিখেছেন : "শ্রীধর অল্প বয়সেই বিলক্ষণ খ্যাত হন"।[২৭] এমনও ভাবা যায় যে শ্রীধর তাঁর কথকতায় টপ্পা গানে রাগরাগিনীর তরঙ্গ বিভ্রম সৃষ্টি করতেন। তা রাঢ়-অঞ্চলের 'সাট'-এ শোনা যেত কী না জানি না। এখানে উল্লেখ্য, হাওড়ার কালীপদ পাঠক উচ্চস্তরের টপ্পা-গায়করূপে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন, পাঠকরূপে নয়।

উনিশ শতকের মধ্যভাগে হুগলি-চন্দননগরে, নবদ্বীপে, বহরমপুরে, খরদহ-পানিহাটিতে একাধিক কথক ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম :

অক্ষয় অধিকারী (চন্দননগর)[২৮]
গুরুচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (চন্দননগর)[২৯]
উদ্ধবচন্দ্র চূড়ামণি (হুগলি)[৩০]
কালীচরণ ভট্টাচার্য (বহরমপুর ; শ্রীধর কথকের কথকতাশিক্ষাগুরু)[৩১]
ধরনীধর বন্দ্যোপাধ্যায়[৩২]
জয়গোপাল গোস্বামী (নবদ্বীপ)[৩৩]
কৃষ্ণমোহন ন্যায়পঞ্চানন[৩৪]
প্রাণকিশোর গোস্বামী (খড়দহ)[৩৫]
ভুবনমোহন রায়চৌধুরী[৩৬]
কৃষ্ণকান্ত পাঠক (দক্ষিণ বিক্রমপুর)[৩৭]

দীনেশচন্দ্র সেন একটি কথকতাশিক্ষণের পুঁথিতে কতগুলো বিষয়ের বিবরণ দেওয়ার সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি দেখতে পেয়েছিলেন।[৩৮] এই বিষয়গুলোর মধ্যে অনেকগুলো পূর্বোক্ত 'বর্ণরত্নাকর'-গ্রন্থেও দেখা যায় ; বিষয়গুলো হ'ল :

নগর	মেঘলা দিন	রাম	সরস্বতী
মধ্যাহ্ন	রমনীর রূপ	লক্ষ্মণ	লক্ষ্মী
প্রাতঃকাল	নারদঋষি	শিব	বনভূমি
রজনী	বিষ্ণু	কালী	যুদ্ধ
			ভগবতী।

মেঘলা দিন, বনভূমি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'-এর প্রথম শ্লোকটিকে মনে করিয়ে দেয়। দীনেশ চন্দ্র সেন লিখেছেন :[৩৯]

> There are formulae which every *Kathaka* has to get by heart, set passages describing not only Siva, Laksmi, Visnu, Krisna and other deities, but also describing a town, a battlefield, morning, noon and night, and many other subjects which incidentally occur in the course of the narration of a story. These set passages are composed in Sanskritic Bengali with a remarkable jingle of cousonances the effect of which is quite extraordinary.

দীনেশ চন্দ্র দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি বুঝিয়েছেন। সুনির্দিষ্টভাবে জানা নেই, তাই বলি, মনে হয় পাঠকতা যেমন ভারতচন্দ্রের কবিতার দ্বারা প্রভাবিত হয়, তেমন ভারতচন্দ্র নিজেও পাঠকতা/কথকতার দ্বারা প্রভাবিত হন। 'চণ্ডীনাটক'-এ মহিষাসুরের বিবরণে কথকতার লক্ষণ খুব স্পষ্ট :[৪০]

[মহিষাসুরের আগমন] [মহিষাসুর 'বাজারের হিন্দী'তে কথা বলেন]
খট্ মট্ খট্ মট্ খুরোত্থ ধ্বনি কৃত জগতী কর্ণপূরাব রোধ ঃ
ফোঁ ফোঁ ফোঁ ফেঁাত নাসানিল চলদ চলাত্যন্ত বিভ্রান্তলোক ঃ
সপ্ সপ্ সপ্ পুচ্ছ খাতোচ্ছল দু দধিজল প্লাবিত স্বর্গমর্ত্যো
খর্ খর্ খর্ খোরনাদৈঃ প্রবিশতি মহিষ ঃ কামরূপো বিরূপ ।। ইত্যাদি

[খুরের খট্ মট্ খট্ মট্ শব্দ করে আসছে মহিষাসুর। এই শব্দে পৃথিবীর মানুষের কাণে তালা লাগে। তার নাকের নিঃশ্বাস ফোঁ ফোঁ শব্দে নির্গত হচ্ছে ; তাতে পৃথিবীর মানুষ অত্যন্ত বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছে। তার লেজের সপ্ সপ্ সপ্ আঘাতে সাগরের জল উপচে পড়ে স্বর্গমর্ত প্লাবিত করে। খর্ খর্ খর্ এইরূপ বিকট শব্দ করে বিশ্রী, অথচ ইচ্ছা অনুসারে রূপধারী, মহিষ প্রবেশ করছে।]

ভাগবতের কথকতা / পাঠকতা কিছুটা ভিন্ন ছিল ; তার বিষয়বস্তু ছিল প্রধানতঃ কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা, এবং তাতে কথা এবং গান, এবং ভক্তির প্রকাশ সর্বত্র এবং সর্বদা

বাঁধাধরা পদ্ধতি ধরে থাকেনি। কথকতায় ঠিক কী ধরনের গান উনিশ শতকে গাওয়া হ'ত, তা সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায় না। হুতোম পদাবলী গানের কথা উল্লেখ করেছেন; তাঁরও আগে জয়নারায়ণ ঘোষাল উচ্চাঙ্গের 'তালফেরা'-র আঙ্গিক উল্লেখ করেছেন। শ্রীধর যে টপ্পা গাইতেন, তাও নিশ্চিত। কিন্তু আরও অনেক রকমের গান ছিল। বিশেষভাবে ছিল মধুসূদন কিন্নর-উদ্ভাবিত ঢপ-কীর্তন, যাতে বাউল, পদাবলী কীর্তন, এবং রাগসঙ্গীত মিশ্রিত হয়।[৪১] কোন কোন ঢপের সঙ্গে দীনেশচন্দ্র সেন কথিত 'jingle of consonances'-এর কিছু মিলও আছে। দাশরথী রায়ের পাঁচালীর প্রভাবও কথকতায় পড়েছে, এমনও বলা যায়; আবার এমনও বলা যায় যে, দাশরথী-পাঁচালীর গদ্যাংশে সুস্পষ্ট ভাবে কথকতার প্রভাব দৃশ্যমান।[৪২]

উনিশ শতকে কথকতা / পাঠকতার দুটি বিবরণ উল্লেখযোগ্য। প্রথম বিবরণ দিয়েছেন দীনেশচন্দ্র সেন।[৪৩] তখন তিনি গগনেন্দ্রনাথ এবং অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হয়েছিলেন। টাইফয়েড-জ্বরে পুত্রের মৃত্যুতে শোকাচ্ছন্ন গগন বাবুদের মানসিক শান্তি বিধানের জন্য দীনেশচন্দ্র ক্ষেত্রনাথ চূড়ামণির কথকতার ব্যবস্থা করেন। ক্ষেত্রনাথ দেখতে ভাল ছিলেন না; তাঁর গায়ের রঙ কালো; মাথায় বিশাল টাক্; বিপুল ভুঁড়ি। "কিন্তু", দীনেশচন্দ্র লিখেছেন, "কথা বলিবার ইহাঁর আশ্চর্য শক্তি ছিল, প্রথম দিনই আসর জমিয়া গেল।" সন্ধ্যায় হলঘরে পাঠ হত। পালা ছিল "ধ্রুব, প্রহ্লাদ, জড়ভরত, দক্ষযজ্ঞ, রুক্মিণীহরণ, বকাসুর বধ" ইত্যাদি। "তিনি কথায় কথায় ছবি আঁকিয়া যাইতেন; বর্ণনার ছটায় মেঘ, বৃষ্টি, বসন্ত-সমীরণ এবং পদ্মবন যেন চোখের সামনে উপস্থিত করিতেন…"। ক্ষেত্রনাথ পাঠ করতেন আর গগনেন্দ্রনাথ লুকিয়ে তাঁর চেহারা আর ভঙ্গীগুলো আঁকতেন। প্রচুর উপহার পেয়ে ক্ষেত্রনাথের "ভুঁড়ি বাড়িয়া গেল, চেহারার চিকনাই হইল, কালো রংটা শ্যামাভ হইল"। গগনবাবুদের বাড়িতে পাণিহাটি, বেনেটোলা, এবং শ্যামবাজার থেকে কথকরা এসে কথকতা করেছেন; কিন্তু তাঁরা ক্ষেত্রনাথের সঙ্গে তুলনীয় ছিলেন না। এমন যে ক্ষেত্রনাথের কথকতা, তাও রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক আমন্ত্রিত পাবনার শিবু কর্তনীয়ার গোষ্ঠলীলায় অসামান্য কীর্তনে গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে।

দীনেশচন্দ্রের বিবরণ থেকে এটা স্পষ্ট যে, ক্ষেত্রনাথ কথাই বেশি কইতেন; তাঁর গান গাওয়ার উল্লেখ নেই। দ্বিতীয় কথকতার বিশদ বিবরণে কথকের গান গাওয়ার বিষয়টি বেশ গুরুত্বসম্পন্ন। এই বিবরণ দিয়েছেন অনুরূপা দেবী, তাঁর 'মন্ত্রশক্তি' উপন্যাসে।[৪৪] তাতে দেখা যায় যে এক বৈষ্ণব জমিদার 'গোপীকিশোর'-এর মন্দির নির্মাণ করেন। তাঁরই প্রতিষ্ঠিত চতুষ্পাঠীর প্রধান অধ্যাপক সেই মন্দিরে পৌরহিত্য এবং কথকতা করতেন। এই অধ্যাপকের মৃত্যুর পরে তাঁর প্রধান ছাত্র, সুদর্শন, লাজুক, স্বল্পভাষী, এবং দার্শনিক অম্বরনাথ নিয়ম অনুসারে কথকতা করতে এলেন। তিনি কথাও বলেন কম, গানও জানেন না। তাই তাঁর কথকতা জমল না। তাঁর জায়গায়

কথকতা করলেন তাঁর সহপাঠী আদ্যনাথ। আদ্যনাথের দুর্দান্ত কথকতার বিবরণ এইরূপ :

তাঁর কপালে চন্দনতিলক ; বুকে টগর ফুলের মালা।
তাঁর কণ্ঠস্বর কখন পঞ্চমে, কখন সপ্তমে।
তাঁর গানের সুর কখন ভৈরবী, কখন বেহাগ, কখন ললিত।
তাঁর কথকতার বিষয় 'অভিমন্যু বধ'।
তাঁর ভাষা 'করুণরসসিক্ত' ; তা ছন্দে, তালে যেন 'নৃত্যনিপুণা নর্ত্তকী'।
তাঁর ভাষা শ্রোতাদের কাঁদায়, কখনও বা হাসায়।
শ্রোতাদের প্রতিক্রিয়া কথকঠাকুরে কখনই দেখা যায় না।
তাঁর ভক্তিরসের গান তাল-লয়যুক্ত, 'সুমিষ্ট'।
শ্রোতাদের মনে হয়, 'কী সুন্দর ! কী সুন্দর !' তাঁরা 'ভাবমুগ্ধবৎ স্তম্ভিত'।
পাঠশেষে 'ওঁ শ্রীবিষ্ণুঃ ওঁ শ্রীবিষ্ণুঃ ওঁ শ্রীবিষ্ণুঃ' বলে পাঠকের শান্তিজল বিরতণ।

কথকতা শ্রবণের নিজস্ব অভিজ্ঞতা এখানে সংক্ষেপে লিখি। যে বিশাল একান্নবর্তী পরিবারে আমার জন্ম হয়, তার কর্তাব্যক্তিগণ 'পাঠক'-রূপে সুপরিচিত ছিলেন। আমাদের বাড়ির চতুষ্পাঠীতে স্মৃতি, নবন্যায়, এবং ব্যাকরণ পড়ান হ'ত। আমার এক জ্যেঠামশাই ছিলেন পেশাদার পাঠক। সারা বৎসর ধরেই তিনি বিভিন্ন জেলায় পাঠকতা করতেন ; সুযোগে আমাদের সবার বাড়িতেও তাঁর পাঠের আসর বসত। এরকম একটি আসরের স্মৃতি সময়ের ব্যবধান সত্ত্বেও কিছুটা স্পষ্ট। যতোদূর মনে পড়ে, তাঁর পাঠকতা হয়েছিল আমাদের বাড়ির অন্দরমহলে বিশাল উঠানে সামিয়ানা খাটিয়ে। সময়টা ছিল বৈশাখের শেষ। বিষয়বস্তু ছিল 'কংসবধ'। হ্যাজাক্-লণ্ঠন আনা হয়েছিল আমাদের গ্রামের বাজার থেকে। চার-পাঁচটি জোড়া চৌকিতে স্থাপিত হয়েছে ব্যাসাসন ; যিনি পাঠক, তিনিই সাময়িকভাবে বেদব্যাস। এসেছে একটি বড় হারমোনিয়াম, একটি বেহালা, এক জোড়া খঞ্জনী, একটি খোল, এক জোড়া বায়া-তবলা। ব্যাসাসনে সাদা ফুল, এবং লাল শালু মোড়া ভাগবতের পুঁথি। আসরে তিলধারণের স্থান নেই। জ্যেঠামশাই পাঠ করতে এলেন। সৌম্যকান্তি দীর্ঘাঙ্গ স্বাস্থ্যবান জ্যেঠামশাইয়ের কবাট বক্ষ রজনীগন্ধার মতো শুভ্র চাদরে আবৃত। তিনি মাল্যবান।

পাঠ শুরু করলেন তিনি। তাঁর কথা, এবং কথার পারম্পর্য মনে পড়ে না। কিন্তু তাঁর সাধা গলায় প্রায় অপার্থিব স্বর এখনও যেন শুনি। তাঁর শ্লোকের উচ্চারণে কী মাধুরী ! সুশ্রাব্য সাধু মাতৃভাষায় তাঁর ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ কী সুন্দর। ব্যাখ্যাকালে কখনও করলেন তিনি নাটকীয় আবৃত্তি, কখনও গাইলেন গান। গানের মধ্যে বৈষ্ণব পদাবলী, টপ্পা, দাশরথী রায়ের গান ছিল, মনে পড়ে। কখনও তাঁর তারার মতো উজ্জ্বল চোখে বাষ্পাভাস ; কখনও কিছুটা অঙ্গভঙ্গি এবং মুখভঙ্গিসহ এমন রসিকতা করলেন যে, প্রায় আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত বৌ-ঝিরা হেসে কুটি কুটি। বড় হয়ে জেনেছিলাম,

জ্যেঠামশাই প্রণয় বিরহ প্রসঙ্গে স্বরতরঙ্গ ভঙ্গিমার শিল্পিত প্রয়োগে প্রায়শঃ বাঙ্গালা টপ্পাই গাইতেন। পুরাতন বাঙ্গালা গানের বেশ বড় শিল্পী ছিলেন তিনি। পরে তিনি অন্যত্র চলে যান পেশার তাগিদে। খুব বেশি দিন জীবিত ছিলেন না। এই পাঠকের নাম হরকান্ত পাঠক।(৪৪ক) তিনি পাঠক এবং গায়ক।

প্রথম থেকেই কথকতা / পাঠকতার সঙ্গে অভিজাত সংস্কৃতির নিবিড় সংযোগ লক্ষণীয়। কথকতার ভিত্তি ছিল বিশুদ্ধ সংস্কৃত পৌরাণিকতা। বৈষ্ণবরা কথকতাকে জনসাধারণের শিল্পকলারূপে প্রতিষ্ঠিত করেন; কিন্তু তাতেও আভিজাত্য ছিল। কথকতা ঠিক্ কবি, হাফ্-আখড়াই এবং তরজা গানের লৌকিক স্তরে নেমে আসেনি। হুতোমের ভাষায় 'রসিকতার একশেষ' করে 'ব্যাসবধ' করে যে সব কথকরা নিম্নস্তরে আসেন, তাঁদের দিনও ফুরিয়ে আসছিল কারণ, ক্রমশঃ পৌরাণিক মানসিকতাই ক্রম-বর্ধমান আধুনিক নাগরিক পরিমণ্ডলে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে।

এক সময়ে প্রধানতঃ গ্রামীণ, নাগরিক জমিদার এবং ব্যবসায়ীগণ কথক পাঠক ঠাকুরদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পদ্মানদীর তীরে কালীপাড়া (কাউলীপাড়াও বলা হয়) নামে একটি বড় গ্রাম ছিল।(৪৪খ) পদ্মার ভাঙ্গনে সে গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়। আমাদের পাঠক-পরিবার সে গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়ে নতুন বাসস্থানের সন্ধান করতে থাকেন। আমার পিতামহ মালখানগর গ্রামের বসুঠাকুর জমিদারদের বাড়িতে একদা ভাগবতপাঠ করেছিলেন, এবং পাঠের দক্ষিণাস্বরূপ যে ষাট্-সত্তর কাঠা নিষ্কর জমি পেয়েছিলেন, তাতেই নির্মিত হয়েছিল আমাদের একান্নবর্তী পরিবারের নতুন বাসস্থান।

সব পাঠক / কথক এমন ভাগ্যবান ছিলেন না। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়-সৃষ্ট কথক চরিত্র 'পথের পাঁচালী'র হরিহর ভাল খেতে-পরতে পাননি। জঙ্গলাবৃত গ্রামের প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকার তাঁকে এবং তাঁর পরিবারকে আচ্ছন্ন করেছে। হরিহরের কোনো জমিদার কিংবা ব্যবসায়ী পৃষ্ঠপোষক তো ছিল না। ১৯৪৬-৪৭-এ কুচবিহার শহরে এক নিরন্ন ভ্রাম্যমান কথকঠাকুরকে দেখেছিলাম। তিনি সুদূর ফরিদপুর থেকে এসেছিলেন; পরনে মলিন বস্ত্র; সামান্য থলেতে তাঁর পুঁথি। কলেজের এক দয়ালু অধ্যাপকের গৃহে তাঁর কথকতা হ'ল। ব্যর্থ হ'ল সেই কথকতা কারণ, পেটে ভাত না থাকার জন্য গলায় তাঁর সুর ছিল না।

সাধারণ শ্রোতারাও সর্বদা কথকতার এবং রামায়ণ-পাঠের অর্থ বুঝত না অনেক সময়ে। লেখা হয়েছে [৪৫] :

> রামায়ণ শুনিতে শুনিতে করিম চাচা ভেউ ভেউ
> করিয়া কাঁদিয়া উঠিল…একজন বলিল তুই
> কি বুঝিলি যে কাঁদিচস? করিম চাচা কহিল…
> আমার একটা বোকা ছাগল ছিল, তার দাড়ী
> যেমন সুন্দর তেমন দাড়ী নাড়াও ছিল সুন্দর।

আহা বেচারী আজ একমাস হইল স্বর্গে গেছে।
এই ঠাকুর মহাশয়ের দাড়ী নাড়া দেখিয়া আমার
সেই বোকা ছাগলটাকে মনে পড়িয়া দুঃখ হচ্ছে
তাই কাঁদছি।

গল্পটি হাস্যরসমিশ্রিত করুণরসের অতি বিরল একটি নিদর্শন। কলকাতার টালা পার্কে, কলেজ স্কোয়ারে, এবং অন্যান্য বড় পার্কে কিছুকাল আগেও কথকতা শোনা যেত; তার একটি সুন্দর বিবরণ[৪৬] :

কপালে চন্দন, গলায় চাদর কোন মাঝবয়সী বা
প্রৌঢ় সামনে ছোট ভাঁজ করা টেবিলে ধর্মগ্রন্থ
থেকে পাঠ করেছেন। তাঁর গলায় শব্দ হয়ে উঠেছে
ছবি···বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পার্কের গুমটি-
গুলিতেই বসত এই পাঠের আসর। শ্রোতাদের
মধ্যেই কেউ বাড়ি থেকে বয়ে আনতেন টেবিল,
আসন। কেউ আনতেন ঠাকুর দেবতার ছবি, আর
যৎসামান্য বাসনকোসন। সেই ছবি এখন শুধুই
স্মৃতি···পাততাড়ি গুটিয়েছেন কথক ঠাকুরেরা।

তাদের পাততাড়ি গুটাবার কারণ বোধ হয় এই যে, কলকাতায় এবং কলকাতার উপকণ্ঠে বিবিধ 'আশ্রম' এখন সংগঠিত কথকতা / পাঠকতার কেন্দ্রস্থলরূপে চিহ্নিত হয়েছে। সেখানে কথকতার বিষয়বস্তু রামলীলা, কৃষ্ণলীলা, রামকৃষ্ণলীলা, বিবেকানন্দের প্রতিভা। এসব স্থানে শ্রোতাদের জন্য বসার, শোনার, প্রসাদ পাবার ভাল ব্যবস্থা আছে। তাই কে আর ধূলিমলিন পার্কের ঘরে বসে নিরন্ন দুর্বল বিষণ্ণ কথকের সুরহীন কথকতা শুনতে চাইবে?

কথকতা পাঠকতা

।। প্রমাণ এবং প্রয়োজনানুসারে মন্তব্য ।।

১. রাজ্যেশ্বর মিত্র, 'তত্ত্বমসি' (কলিকাতা, পাণ্ডুলিপি ১৩৯৮) পৃ. ১৮-৩০
২. রাহুল সাংকৃত্যায়ন, 'আমার জীবন-যাত্রা', প্রথম খণ্ড, অনুবাদক প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী এবং অন্যান্য, (কলিকাতা, রাহুল সাংকৃত্যায়ন জন্ম শতবার্ষিকী কমিটি, ১৯৯৩), পৃ. ৪০০-৪০৬
৩. Pondita Durgaprasad and Kasinath Pandurang Parab ed. *The Mukundananda Bhana of Kasipati,* Third ed. (Bombay, Nirnaysagar Press, 1926) পৃ. ২৩-২৫

মূল প্রাকৃত শ্লোক : তহ্ তহ্ পঢ়ই পুরাণং তহতহ বক্খাইং অথ্যোবি/তহ তহ পেক্খই কিদ বো জহ্ জহ্ রজ্জন্দি বালবিহবাও ব্যাভিচারী-পৌরাণিক বিষয়ক শ্লোক : নারায়ণরাম আচার্য, 'সুভাষিত রত্নভাণ্ডাগারম্' (বোম্বাই, নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৯৫২), পৃ. ৪৪ : 'পৌরাণিক নিন্দা'

৪. Puspa Niyogi, *Brahmanic Settlements in Different Subdivisions of Ancient Bengal.* (Calcutta, Indian Studies Past and Present, 1967).

৫. S K. Maiti, R. R. Mukherjee, *Corpus* of *Bengal Inscriptions.* (Calcutta, Firma K. L. Mukhopadhyay, 1967) PP. 333-336, *Sloka*-19

৫ক. Bhavatosh Bhattacharya ed. *The Danasagara* of *Vallalasena,* Fac. I, (Calcutta, Asiatic Society, 1955), PP. 6-7.

৬. *Corpus of Bengal Inscriptions,* পূর্বে উক্ত, P. 353, *Sloka*-30

৭. রাজ্যেশ্বর মিত্র সম্পাদিত, 'লোচন শর্মা বিরচিত রাগতরঙ্গিনী' (কলকাতা, নবপত্র প্রকাশন, ১৩৯১), পৃ. ৫৬-৫৮

৮. Suniti Kumar Chatterjee Babna Misra ed. *Varnaratnakara of Iyotirisvara Kavisekhara* (Calcutta, Royal Asiatic Society of Bengal, 1940)

৯. উপরে উক্ত, introduction, P. XXIII.

১০. বৃন্দাবন দাস, 'শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত' (কলিকাতা, সুচারুকান্তি ঘোষ, ১৩৫৬), পৃ. ১২

১১. শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিরচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' (কালনা, গোপেন্দ্রভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩৩০) অন্ত্যলীলা, পৃ. ৭১০

১২. দ্রষ্টব্য : জীমূতবাহন রায়, 'শ্রীনিবাস আচার্য ও ষোড়শ শতাব্দীর গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ' (বিশ্বভারতী গবেষণা গ্রন্থমালা ১৯৮৪), পৃ. ২৯-২১৫

১৩. নরহরি চক্রবর্তী, 'ভক্তিরত্নাকর', নন্দলাল বিদ্যাসাগর সম্পাদিত, (কলিকাতা, গৌড়ীয় মিশন, ২য় সং, ১৯৬০) পৃ. ৪০১। গোবিন্দদাস তাঁর গুরু শ্রীনিবাস আচার্যের বর্ণনা করে লিখেছেন :

জয়জয় শ্রীশ্রীনিবাস গুণধাম
দীনহীন তারণ প্রেমরসায়ন
ঐছন মধুরিম নাম ॥
কাঞ্চনবরণ হরণ তনু সুললিত
কৌষিক বসন বিরাজে।

প্রেমনাম কহি কহত ভাগবতে
ঐছন বরতনু সাজে ॥ ইত্যাদি । দ্রষ্টব্য : হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, 'বৈষ্ণব পদাবলী' (কলিকাতা, সাহিত্য সংসদ, ১৯৬১) 'শ্রীনিবাস বন্দনা', পৃ. ৫৭৪

১৪. 'বৈষ্ণব পদাবলী,' উপরে উক্ত, পৃ. ৫৬৬

১৫. তারাপদ মুখোপাধ্যায়, 'নিজ প্রিয় স্থান আমার মথুরা বৃন্দাবন' (কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৩), 'বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যচরিত' দ্রষ্টব্য। পৃ. ২৮-৪৮

১৬. সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ২য় খণ্ড (কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৩৯৮), পৃ. ৩৫৬

১৭. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পুঁথি-২৩৫৩

১৮. সুকুমার সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

১৯. Ramakanta Chakrabarty, *Vaisnavism In Bengal* (Calcutta, Sanskrit Pustak Bhandar, 1985), P. 215 ; 'ভক্তিরত্নাকর', প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৮

২০. সুকুমার সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬ ; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুঁথি ৪৭৪২

২১. সুকুমার সেন, তদেব, পৃ. ২৯

২২. জয়নারায়ণ ঘোষাল, 'করুণানিধান বিলাস' (আখ্যাপত্রবিহীন ; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-ভবনে মুদ্রিত গ্রন্থের তালিকাতে সংখ্যা ৯০), পৃ. ২৪৭

২৩. অরুণ নাগ সম্পাদিত 'সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা' (কলিকাতা, সুবর্ণরেখা, ১৩৯৮), পৃ. ৮১। প্রায় একই ধরনের মন্তব্যের জন্য দ্রষ্টব্য, অক্ষয়কুমার দত্ত, 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়', ২য় খণ্ড, বারিদবরণ ঘোষ সম্পাদিত (কলিকাতা, করুণা প্রকাশনী, ১৩৯৭) পৃ. ৩১২

২৪. তদেব ।

২৫. তদেব, ৮৮-৮৯

২৬. তদেব ।

২৭. তদেব, পৃ. ৮৯

২৮. শশীভূষণ বিদ্যালঙ্কার, 'জীবনীকোষ' (ঐতিহাসিক) ৫ খণ্ড প্রকাশিত (কলিকাতা, দেবব্রত চক্রবর্তী, ১৯৪১), ১, পৃ. ৮

২৯. তদেব, ২, পৃ. ৪০৪

৩০. উদ্ধবচন্দ্রের মৃত্যুকাল ১৯১৩ : তদেব, ১, পৃ. ৩৭২

৩১. সুবলচন্দ্র মিত্র, 'সরল বাঙলা অভিধান' (কলিকাতা, নিউ বেঙ্গল প্রেস, ১৯৭৩), পৃ. ১২৪০

৩২. 'জীবনী কোষ', ৪, পৃ. ৪

৩৩. জয়গোপালের তারিখ ১৮২৯-১৯১৬ ; তদেব, ৩, পৃ. ৬২৫-৬২৬
৩৪. 'সরল বাঙলা অভিধান', পৃ. ১০৩১
৩৫. দ্রষ্টব্য, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, 'আদর জানাই' (কলিকাতা, বিনোদ কিশোর গোস্বামী, সুকুমার দাস, তারিখ নেই) এটি প্রাণকিশোর গোস্বামী সম্বর্ধনা গ্রন্থ।
৩৬. 'সরল বাঙলা অভিধান', প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১
৩৭. দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত, 'বাঙ্গালীর গান' [কলিকাতা, বঙ্গবাসী প্রেস, ১৩১২] পৃ. ৮৬২ ; 'জীবনীকোষ', ২, পৃ.১৫১ ; কৃষ্ণকান্তের সময় ১৮২১-১৮৯১
৩৮. Dinesh Chandra Sen, *History* of *Bengali Language and Litreture* (Calcutta, University of Calcutta, 1911), PP. 585-588
৩৯. তদেব।
৪০. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত 'ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী' (কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ৩য় সং ১৩৬৯), পৃ. ৪০৬
৪১. দ্রষ্টব্য : 'বাঙ্গালীর গান', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩২-৩৬০ ; মহেন্দ্রনাথ দত্ত, 'কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা' (কলিকাতা, মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি, ১৯৭৩), পৃ. ৩৩ ; গোপেশচন্দ্র দত্ত, 'কৃষ্ণযাত্রা ও নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়' (কলিকাতা, জিজ্ঞাসা, ১৯৭৬), পৃ. ৭৬-৭৭
৪২. দ্রষ্টব্য : হরিপদ চক্রবর্তী সম্পাদিত, 'দাশরথী রায়ের পাঁচালী', [কলিকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬২]
৪৩. দীনেশচন্দ্র সেন, 'ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য' (কলিকাতা, জিজ্ঞাসা) পৃ. ১৮১-১৮২
৪৪. অনুরূপা দেবী, 'মন্ত্রশক্তি' (কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, ৭ম সং, তারিখ নেই) পৃ. ৬৬-৭১
৪৪ক. এই প্রসঙ্গে ঢাকা বিক্রমপুরের অন্য এক গায়কের নাম উল্লেখ করা উচিত মনে করি। তিনি মুলচর গ্রামের রাজকুমার ভট্টাচার্য। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত লিখেছেন : "বর্ষার শেষে পূজার সময় তিনি নানা স্থানে যাইতেন—বড় জমিদার, মহাজন ও ধনীদের বাড়ী বার্ষিকী আদায় করিতে···তিনি ছিলেন দিব্য দেহ গৌরকান্তি সুপুরুষ···নিধুবাবুর টপ্পা গাহিতেন···দক্ষ শিল্পীর মত তিনি বেহালা, তানপুরা, এস্রাজ, ঢোল, পাখোয়াজ, বাঁয়া-তবলা প্রভৃতি বাজাইতেন···ঢাকার সাহা-সম্প্রদায়, বালিয়াটি, শ্রীনগর, ভাওয়াল, রোয়াইল, মুরাপাড়া, এমন কি নবাব বাড়ীর কোন কোন মজলিশেও তাঁহার নিমন্ত্রণ হইত। সর্বত্র খুব সমাদর···উপহার পাইতেন শাল, কাপড়, অর্থ।" শেষকালে অবিবাহিত এই গুণী যুবকের সঙ্গে একটি 'পুরী' প্রেমে পড়েন। রাজকুমারও এই পরীর প্রেমে একেবারে উন্মাদ হয়ে গিয়ে, পরীকে শেষ পর্যন্ত না পেয়ে, কেবলই

বলতেন : "পাইয়া হারাইলাম!" উর্বশী হরূরবার সুপ্রাচীন কাহিনী এই জীবনবান গায়কের জীবনে যেন মূর্ত হয়ে উঠল ; রাজকুমার "স্বচক্ষে দেখা" ভৌতিক কাহিনী সংকলনে আসর জমিয়ে বসলেন। দ্রষ্টব্য, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, 'অঘটন যা দেখেছি', (কলকাতা, শিশির পাবলিশিং হাউস, তারিখ নেই), "পরীর প্রেম" পৃ. ৩৮-৪৪

৪৪খ. কালীপাড়ার বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, হিমাংশুমোহন চট্টোপাধ্যায় সংকলিত, 'বিক্রমপুর', ২য় খণ্ড (নারায়ণগঞ্জ, দয়াময় চট্টোপাধ্যায়, ১৩৪৪), প্রথম অধ্যায় পৃ. ৪-৬৬

৪৫. কালীকৃষ্ণ শীল সম্পাদিত, 'গোপালভাঁড় রহস্য' [কলিকাতা, অক্ষয় লাইব্রেরী, ৪০ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, তারিখ নেই], পৃ. ৯২

৪৬. 'আজকাল' দৈনিক পত্রিকা, ৫ জুলাই, পৃ. ৪ ॥ □

রামচরিতের ঢোঁড়াইচরিত হয়ে ওঠা

অনিন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

"...'ঢোঁড়াই চরিত মানস' বিষয়ে আমাদের বিস্ময় কখনো কমে না। এ কেমন উপন্যাস যার পাতায় পাতায় দরকার হয় পাদটীকার? এ কেমন উপন্যাস যার নায়কের নাম 'ঢোঁড়াই'? ঘটনাভূমি আমাদের চিরপরিচিত বাংলাদেশ নয়, বিহার। এখানে নেই আমাদের অভ্যস্ত মধ্যবিত্ত জীবনের কোনো ছবি। এর জগৎটা গড়ে উঠেছে 'অন্ত্যজ' ধাঙড় আর আর তাৎমাদের নিয়ে। আর এই সংগঠনের মধ্যে লেখক আমাদের ফিরিয়ে নিয়েছেন আপাত-প্রাচীন যুগে, আদিকাণ্ড-বাল্যকাণ্ড রামিয়াকাণ্ডের মধ্য দিয়ে যেন কোনো তুলসীদাসী রামায়ণের স্বাদে। অথচ, পূর্বাগত কালপ্রবাহ থেকে ছিন্ন না করেও এ বই আমাদের এক নতুন কালের মুখোমুখি নিয়ে আসে; পরিচিত দেশশ্রী থেকে ছিন্ন না করেও এ বই আমাদের এক নতুন দেশের মুখোমুখি নিয়ে যায়।"[১]

সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসটির সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের মাধ্যমে পাঠকের মনে যে বিস্ময়, আবেগ ও আনন্দের সৃষ্টি হয়, উপরের অংশটি তারই এক যথার্থ প্রতিচ্ছবি। সতীনাথের 'ঢোঁড়াই' নিতান্তই সরল, সাদাসিধে অন্ত্যজ ধাঙড় গোষ্ঠীর একজন। এহেন ঢোঁড়াইয়ের মনে লেখক জাগিয়ে তুলেছেন অজানাকে জানবার, অচেনাকে চেনবার ও সবার উপরে নিজের সত্তার পূর্ণ পরিচয় পাবার এক দুর্বার আকাঙ্খা। যে আকাঙ্খার জোরে ঢোঁড়াই হয় পথের পথিক, আটকে থাকে না কোনো ধরাবাঁধা জীবনের মধ্যে, পরিচিত সংসারের গণ্ডীর মধ্যে। সে ছুটে চলে সমাজের এক ধাপ থেকে আর এক ধাপে, চেতনার এক স্তর থেকে আর এক স্তরে।

সতীনাথের 'ঢোঁড়াই' নিশ্চিতভাবেই লেখকের কল্পনাজাত। বাস্তবের সঙ্গে তার তফাত অনেক। সে কোনো এক বিশেষ গোষ্ঠীর শুধুমাত্র প্রতিনিধিত্ব করে না। বরং তার মধ্যে আমরা দেখতে পাই রূপান্তরের এক আকুল প্রচেষ্টা। লেখকের ডায়েরী থেকে নেওয়া উক্তি, আমাদের এই ধারণাকেই আরো সুস্পষ্ট করে তোলে।

"My work/creation was not merely representations but transformation."[২]

'ঢোঁড়াই চরিত মানস' সম্পর্কে এই ছিল সতীনাথের বক্তব্য।

স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে রূপান্তর বা 'transformation' বলতে লেখক কী বোঝাতে চাইছেন। এর উত্তর লুকিয়ে আছে দুটি স্তরে। একটি স্তরে তুলসীদাসের 'রামচরিত মানস' রূপান্তরিত হচ্ছে সতীনাথের 'ঢোঁড়াই চরিত মানসে'। উপন্যাসের 'ঢোঁড়াই'—এক অন্ত্যজ ধাঙড়, রূপান্তরিত হচ্ছে এ যুগের পুরুষোত্তম

'রাম'-এ। অন্য স্তরে রূপান্তর ঘটছে এক অত্যন্ত সাধারণ, নীচুশ্রেণীর 'ঢোঁড়াই' থেকে সমাজের এক জনপ্রিয় নেতা 'ঢোঁড়াই'-এ। এই দ্বিতীয় রূপান্তরটি এক নীচু জাতের সামান্য মানুষের সামাজিক রূপান্তর।
এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় প্রথম স্তরের রূপান্তর—যেখানে 'রাম চরিত মানসের' তুলসী-রামের রূপ নিয়েছে সতীনাথের 'ঢোঁড়াই চরিত মানসের' 'ঢোঁড়াই-রাম'।

ক. সতীনাথ ও তুলসীদাস

প্রায় ইচ্ছাকৃতভাবেই নিজের উপন্যাসের আঙ্গিক হিসেবে তুলসীদাসের রামচরিত মানসকে সতীনাথ বেছে নিয়েছিলেন। বস্তুত ঢোঁড়াই চরিত মানস আর রামচরিত মানস-এর মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে গঠনগত কোনো তফাতই চোখে পড়ে না। কিন্তু উপন্যাসটিকে যখন এক বিশেষ কাল ও দেশের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা হয়, তখনই মূল ফারাকটি চোখে পড়ে।
সতীনাথের কথায়,—
"ঢোঁড়াইকে এ যুগের শ্রীরামচন্দ্র করবার কঠিন কাজ ছিল আমার সম্মুখে। শ্রীরামচন্দ্রের চেয়ে ছোট আদর্শে উত্তর ভারতের সাধারণ লোকের মন ভরে না। রামায়ণের দিকে আমার নজর পড়েছিল আরও কয়েকটি কারণে। আমাদের দেশের সাধারণ লোকের গভীর ধর্মপরায়ণতার সঙ্গে রামায়ণের কাঠামোতে ফেলা বই বেমানান হবে না, এই ছিল আমার ধারণা। এ ছাড়া আরও একটা বড় প্রয়োজনের তাগিদ ছিল। ইচ্ছা ছিল আমার জ্ঞানে গ্রামের নিরক্ষর সাধারণ লোকের মন কেমনভাবে বদলাতে দেখেছি, কেমনভাবে তারা ভুল-ভ্রান্তির মধ্যে দিয়ে মানুষ হিসাবে নিজের অধিকার বুঝে নিচ্ছে, তাই নিয়ে একখানা উপন্যাস লিখব। সমগ্র গ্রামীণ সমাজ তুলে ধরবার ইচ্ছা। মানুষ বদলাচ্ছে পরিবেশকে, পরিবেশ বদলাচ্ছে মানুষকে। এর বিবরণ দিতে গেলে, মূল আখ্যায়িকার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ রহিত কিছু কথা না দিয়ে উপায় নাই। অথচ নিটোল উপন্যাসে প্রত্যেক জিনিসের সঙ্গে অপর জিনিসগুলোর একটা সাক্ষাৎ সম্পর্ক থাকা দরকার। রামায়ণ মহাভারতে কত উপাখ্যান যেমন মূল কাহিনীর সঙ্গে আলগাভাবে গাঁথা, সেইরকমভাবে লিখলে দেখলাম আমার কাজ চলতে পারে। ভেবেছিলাম আদিকবির আড়ালে আশ্রয় নিলে, হয়তো পাঠকরা বইয়ের পরিবেশ-প্রধানতা ক্ষমা করতে পারবেন, আর সর্বজন পরিচিত, দৃঢ়, কালজয়ী কাঠামোটা গাঁথনির আলগাভাব খানিকটা সামলে নিতে পারবে। মোট কথা, এরকম রূপায়ণের সুবিধা অসুবিধা খতিয়ে সুবিধার দিকটাই বেশি মনে হয়েছিল আমার।"[৩]
এই ছিল সতীনাথের প্রকৃত অভিলাষ। তাঁর মতে উত্তর ভারতের সাধারণ মানুষের জীবনে মহাকবি তুলসীদাস ও তাঁর রচিত মহাকাব্য 'শ্রীরাম চরিত মানস' এখনও অনেকটাই প্রভাব বিস্তার করে আছে। উপরের উদ্ধৃতিটি থেকে এই ধারণাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাঁর এই মতকে স্বীকৃতি দিয়েছেন পূব ও পশ্চিম—দু দিকেরই পণ্ডিতবর্গ। যেমন

ধরা যাক স্যার জর্জ গ্রীয়ারসনকে।[৪] পশ্চিমী পণ্ডিতদের মধ্যে তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি তুলসীদাসের সামাজিক তাৎপর্যের গভীরে পেঁছেছিলেন:
"The first thing to be noted about him is his success. India has had many reformers, but none except perhaps the Buddha, has been adopted as a religious teacher by so many professed followers. Kabir's or Dadu's adherents may be numbered by hundreds of thousands, but today at least ninety millions of the people of upper India acknowledge Tulsi as their guide."[৫]
আর তুলসী দাসের দেশজ মূল্যায়ণের মধ্যে অন্যতম নির্ভরযোগ্য হাজারী প্রসাদ দ্বিবেদীর বিশ্লেষণ:
"Tulsi Das was a poet, devotee, learned reformer, popular leader & a creator of the future. Among these feautres no one is less important than the others. Hence he was able to keep the balance in all directions & to create an epic without peer which till today remains the guide of North India and will so remain when the new India is born"—[৬]
ভারতীয় মহাকাব্য সম্পর্কে সতীনাথের বক্তব্য,—
"Ramayana, Mahabharat & Puranas, present the psychology and character of our nation, as also its aspirations, blemishes and follies.
Importance to human personality—to most fundamental thing in Indian mass mind"—[৭]
অথবা,
"রামায়ণ—vast and varied-roots in hoary past and comprises accumulated wisdom of ages. There is hardly any human activity which it does not cover—"[৮]
এই ধরনের বক্তব্যের সঙ্গে এফ আর আলচিন (F. R. Allchin)-এর মতামত অনেকাংশেই মিলে যায় যখন তিনি বলেন,—
"Tulsi exemplifies a profound and integrated world view, arising from his life and times. His total creation exemplifies a unity, as though he had been able to comprehend the whole age in which he lived."[৯]
এখন, এইসব মতামত ও বক্তব্যকে সঠিকভাবে বোঝার জন্য ও 'শ্রীরামচরিত মানসের' পূর্ণ বিশ্লেষণ করার জন্য, তুলসীদাসের সামান্য পরিচয় পাওয়া খুবই আবশ্যক। বলতে

গেলে এই জানার মাধ্যমেই তুলসী-রামের থেকে ঢোঁড়াই-রামে যে রূপান্তর হয়েছে তা অনেকটা স্পষ্ট হয়ে উঠে।

পূর্বসূরী কবীর দাসের মতো, মহান সন্ত রামানুজ ও রামানন্দের আধ্যাত্মিক ধারাই তুলসীদাস গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু কবীর যেমন অনেকটা বৈপ্লবিক ভাবেই সমাজের সবরকম বিভেদ ও বর্ণবৈষম্যবাদ মুছে ফেলতে চেয়েছিলেন, তুলসীর লক্ষ্য ছিল হিন্দু সমাজ ও সংস্কৃতির ভিতর থেকে উন্নতি সাধনের। হিন্দু ধর্মকে পরিপূর্ণভাবে পুনরুজ্জীবিত করাই ছিল তাঁর সাধনা। আলচিনের ভাষায়,—

"Tulsi wanted to revitalise every aspect of Hindu society and culture as he found it from within. For this task he had to harmonise the divergent facets of that culture and to integrate them into his spiritual ideology."[১০]

আর একটা ব্যাপার এখানে উল্লেখ করা দরকার তা হল, তুলসীদাসের 'শ্রীরামচরিত-মানস' বাল্মীকির রামায়ণের নিছক ভাষান্তর নয়। রামায়ণ সংক্রান্ত অন্যান্য আকর-গ্রন্থের সাহায্য তিনি নিয়েছিলেন, এবং তথ্য ও অন্তরের ভক্তির মিশ্রণে যে কাব্য তিনি রচনা করেছিলেন তা হয়ে উঠেছিল ভক্তিবাদের এক অমূল্য নিদর্শন। এই প্রসঙ্গে শ্রী সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন—

তুলসীদাসের কোসলী (হিন্দী) রামায়ণ, যাহার কবি-দত্ত নাম হইতেছে 'শ্রীরামচরিত-মানস', এইরূপ আর একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক, ইহাতে কেবল বাল্মীকি-রামায়ণের অনুসরণ করা হয় নাই—তুলসীদাস স্বয়ং বলিতেছেন—

নানা-পুরাণ-নিগমাগম-সম্মতং যদ্
রামায়ণে নিগদিতং, ক্বচিদ্ অন্যতোঽপি বা।
স্বান্তঃ সুখায় তুলসী রঘুনাথগাথা—
ভাষা নিবন্ধম্ অতিমঞ্জুলম্ আতনোতি ॥

"অনেক পুরাণ, বেদ ও শাস্ত্রসম্মত যে কথা রামায়ণে আছে, আরও অন্যত্র হইতে (নিজের অনুভব) একত্র করিয়া, নিজের অন্তরের সুখের জন্য রঘুনাথজীর গাথা, ভাষায় মনোহর ছন্দাদিরূপে বিস্তারপূর্বক তুলসীরচনা করিতেছে।"

(শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের বঙ্গানুবাদ)[১১]

আদি কবির সঙ্গে তুলসীদাসের আর একটি বিশেষ পার্থক্য আমাদের নজরে পড়ে, আর তা হল,—

"আদি কবি তাহার গ্রন্থের নামকরণ করিয়াছেন 'রামায়ণ'। অয়ণ শব্দের অর্থ —গতি, মার্গ, আশ্রয়। 'রামায়ণ' শব্দের অর্থ নরোত্তম রামের প্রদর্শিত পথ। বাল্মীকির রামচন্দ্র নর মধ্যে শ্রেষ্ঠ আদর্শ, কর্তব্যে স্থির, বিপদে নির্ভীক, সম্পদে সন্ত্রস্ত সর্বেশ্বর হইয়াও সর্বস্ব বিসর্জন দিতে কার্পণ্য করেন নাই। ইহাই লোকোত্তর চরিত্র। তুলসীদাসের রামচন্দ্র নির্গুণ ব্রহ্মের সগুণ প্রতীক। সীতাদেবীর বিরহে তিনি সগুণ

সবিকার, প্রতিটি বৃক্ষ, লতাকে তিনি আকুলভাবে প্রশ্ন করিতেছেন—"সীতা কোথায়, তোমরা কি আমার প্রাণপ্রিয়া সীতাকে দেখিয়াছ?" আবার সীতাদেবীর অগ্নিপরীক্ষার সময় তিনি নির্গুণ নির্বিকার। তিনি নরদেহধারী সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম, তাঁকে ধ্যান করা যায়, অনুকরণ করা যায় না। তুলসীদাস সেই কারণে, সম্ভবত, রামচরিত্র বর্ণন গ্রন্থের নামকরণ করিলেন 'রামচরিত মানস'। তুলসীদাসের রামচন্দ্র তাঁহার মানসপটে সদা জাগ্রত। রামচরিত মানসের ছত্রে ছত্রে এই ভাব পরিস্ফুট।"[১২]

বস্তুতপক্ষে যে গ্রন্থটি তুলসীদাসকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে তাঁর কাব্যের একটি নিজস্ব রূপ দিতে তা হল, 'অধ্যাত্ম রামায়ণ'[১৩]—একটি ছোট সংস্কৃত পুঁথি হাজার চারেক পদ সমেত, সেখানে আদি কবির 'রামায়ণ' ২৩,০০০ পদের সমাহার। পি, সি, বাগচীর (P. C. Bagchi) মতে রামের যে রূপান্তর আমরা দেখি কবীরের নির্গুণ ভাব থেকে তুলসীর সগুণ ভাবে, তার জন্য এই ছোট গ্রন্থটির ভূমিকা অনেকখানি।

রামের ভক্তরূপে তুলসীদাসের যে অনুভূতি বা উপলব্ধির প্রকাশ আমরা 'শ্রীরাম চরিত মানসের' প্রায় প্রতিটি ছত্রেই পাই তাকে পণ্ডিতের কথায় বলা যেতে পারে 'দাস্য''।[১৪] প্রভুর সঙ্গে ভক্তের প্রায় এক দাসত্বের সম্পর্ক আর সে দাসত্বের আধার কিছুই না পূর্ণ ভক্তি। এই প্রসঙ্গে আলচিন লিখেছেন,

"it is the majesty and lordliness of Rama which call for worship, the rule of Rama as ideal King which provides the worldly ideal of government and the yearning of the soul to be of service which establishes the bond of the servile relationship of the soul with god.'[১৫] তুলসী দাসের নিজের ভাষায় এই একই মত ফুটে ওঠে,—

"উপজই রামচরণ বিস্বাসা, ভবনিধি তর নর বিনহিঁ প্রয়াসা।
শ্রীরামচরণে হয় বিশ্বাস অপার, অনায়াসে ভবনিধি হয় নর পার।"[১৬]

হিন্দু শাস্ত্র দর্শনের বিভিন্ন ধারা, উপধারাকে একই খাতে প্রবাহিত করাতে চেয়েছিলেন তুলসীদাস এবং তিনি বিশ্বাস করতেন একমাত্র সগুণ ভক্তির মাধ্যমেই এই মিলন সম্ভব। এইখানেই তুলসীর নিজস্বতা।

কিন্তু প্রসঙ্গান্তরে, সতীনাথ ভাদুড়ীর উপন্যাস 'ঢোঁড়াই চরিত মানসে' এই ভক্তির কোনো স্থানই নেই। তাঁর 'ঢোঁড়াই-রাম'কে খুঁজতে হবে সমাজের একদম সাধারণ শ্রেণীর ভিতরে—ভারতের আপামর জনসাধারণের মধ্যে।

"এ যুগে শ্রীরামচন্দ্র নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন সাধারণ মানুষদের মধ্যে। এখানেই হল ঢোঁড়াই-রামের আবির্ভাব আমার মনে।"[১৭]

এখন এই ক্ষেত্রে, স্বাভাবিকভাবেই একটি প্রশ্ন মনে উঠতে পারে—সতীনাথ তাঁর উপন্যাসের জন্য কেন বাংলা সাহিত্যের বিবিধ আঙ্গিকের ধারা থেকে একটিকে বেছে নিলেন না। লেখকের ডায়েরী থেকে যে উত্তর আমরা পাই—

"চেষ্টা করেছিলাম যতদূর সম্ভব সম্পূর্ণ ছবি তুলে ধরতে of essential social

factors which determined the world of Dhorai—তখন প্রশ্ন উঠেছিল কীরকম ভাবে সাজানো যায়। একটি particular form—যা গরীব লোকদের নিয়ে লেখা বইয়ে সবচেয়ে বেশি প্রচলিত (বামপন্থী) সাহিত্যে—সেটা সাহিত্যের পক্ষে একটু স্থূল মনে হয়েছিল আমার। আর উত্তর ভারতের এ যুগের (১৯৪৫-এ যা শেষ হয়েছে) তার পক্ষে অনুপযোগী হতো আমার বিবেচনায়। (ও জিনিসটা marshalling of facts—এর উপর নির্ভর করে) আর সত্যের অপলাপও হতো। প্রচারমূলক হওয়ারও সম্ভাবনা। আমার চোখ দিয়ে সত্যের বিরুদ্ধে যাবার আমার ইচ্ছা ছিল না।'[১৮]

তাই যদিও সতীনাথের মতে,—

"রামায়ণের কাঠামো এ কাজের পক্ষে artificial form ঠিকই,"[১৯]

তবুও যেহেতু,—

"রামায়ণের কাঠামো কৃত্রিম হলেও—কিন্তু এর tradition ভারতের লোকের মজ্জায় মজ্জায়"—[২০]

তিনি আঙ্গিকের এই ধারাকেই বেছে নিয়েছিলেন ও এর মাধ্যমেই আসল সামাজিক চিত্রকে অত্যন্ত সাবলীল ভঙ্গীতে সাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে পেরেছেন। বলাই বাহুল্য আঙ্গিকের এই রূপ তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন তুলসীদাসের 'শ্রীরামচরিত মানসের' মধ্যে।

সতীনাথের মতে এই বিংশ শতাব্দীতেও মহাকাব্যটির যথেষ্ট সামাজিক তাৎপর্য্য রয়েছে। যদিও উপন্যাসের চরিত্র অনেকাংশেই ব্যক্তিকেন্দ্রিক; কিন্তু যেখানে ব্যক্তিকে একটি পুরো সম্প্রদায় বা কমিউনিটির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা হয়, সেখানে মহাকাব্যের এই ধারাই পারে সমগ্র সমাজের প্রতিটি স্তরকে একই গভীরতায় বহন করতে, তাদের পূর্ণ আলোয় ফুটিয়ে তুলতে। এবং সতীনাথ যেহেতু ব্যক্তি, সমাজ ও সম্প্রদায়—প্রত্যেককেই সমান গুরুত্ব দিয়েছেন, তাই তাদের ধারক ও বাহক হিসেবে তাঁর উপন্যাসও বেছে নিয়েছে আঙ্গিকের এই বিশেষ রূপটিকে। এ ছাড়াও মহাকাব্যের যে এক নিজস্ব বর্ণনা শৈলী আছে—তার প্রতি সতীনাথ আকৃষ্ট হয়েছিলেন প্রথম থেকেই। তিনি দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করতেন যে এই বর্ণনা পদ্ধতির অসাধারণ জনপ্রিয়তাই তাঁর 'ঢোঁড়াই-রামকে সাধারণের মনের গভীরে পৌঁছে দেবে নিপুণ হাতে। অথচ একই সঙ্গে তাঁর রচনার বিশেষত্ব বা নিজস্বতা ফুটে উঠবে ছত্রে ছত্রে কারণ উপন্যাসটির দেশ কাল ও বিষয় সবই আধুনিক, নতুন—'শ্রীরামচরিত মানসের' সঙ্গে তাদের কোনো সম্বন্ধই নেই। এর জন্যই তিনি লিখেছিলেন,— "এ যুগে মহাকাব্য অচল কিনা সে প্রশ্ন আমার কাছে অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়েছিল। কেন না আমার কাজ ছিল শুধু পুরনো মহাকাব্যের ফ্রেমে ঢোঁড়াই-রাম বাঁধানো।"[২১]

খ. ঢোঁড়াই চরিত মানসে রামচরিত মানসের ব্যবহার

সতীনাথের মতে,—

Form is nothing but the power to extract the fullest from the material'—[২২]
এবং তিনি এও বলেছেন,—
'The test is to what extent the novelist has embodied in words the Material of the book ; realised in language the possibilities of the material'[২৩]
লেখকের এই কথা অনুসারে, প্রবন্ধের দ্বিতীয় ভাগে আমাদের মনোযোগী হতে হবে উপন্যাসের গভীরে, যেখানে 'রামচরিত মানসের' আঙ্গিকের মধ্যে খুঁজে পাব এ যুগের 'ঢোঁড়াই রামকে'।
উপন্যাসের শুরুতেই আমরা 'রামচরিত মানসের' ব্যবহার দেখতে পাই যেখানে লেখক প্রথম পরিচ্ছেদ 'আদিকাণ্ডে' তাঁর গল্পের স্থানের বিবরণ দিয়েছেন।

'আদি কাণ্ড'
'জিরানিয়ার বিবরণ'

'অযোধ্যাজী নয়, এখনকার জিরানিয়া রামচরিত মানসে এর নাম লেখা আছে 'জীর্ণারণ্য'। পড়তে না পারো তো মিসিরজীকে দিয়ে পড়িয়ে নিও। তখনও যা ছিল, এখনও প্রায় তাই।'[২৪]
সুতরাং লেখার শুরুতেই সতীনাথ তাঁর পাঠককে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে তাঁর গল্পের স্থান শ্রীরামচন্দ্রের জন্মভূমি অযোধ্যা নয়। বরং ঘটনার কেন্দ্রস্থল বিহারের পূর্ণিয়া শহরের কাছে একটি শহরতলী জিরানিয়া। এখানেই ঢোঁড়াই-রামের আবির্ভাব।
মহাকাব্যের আর একটি খুব উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল সতীনাথের কাছে আর তা হল,—
'যেখানে সংকট আসে, বাছাবাছির সময় আসে, তখন আমাদের average লোক রামায়ণ মহাভারত পুরাণের মনের মতো একটা কাহিনীর উপদেশ পেলে বর্তে যায়—খোঁজে। ওসব বইয়ে যা খোঁজ তাই পাওয়া যায়।'[২৫]
লেখকের এই মতের মধ্যে দিয়েই বোঝা যায় কেন তিনি তাঁর উপন্যাসের প্রায় সব স্তরেই 'দোহার' ব্যবহার করেছেন কারণ, সামাজিক স্থান ও কাল বদলে গেলেও, এখনও সাধারণ মানুষ তাদের মনের অনুভূতি ও উপলব্ধির সঠিক প্রকাশ বা রূপ দিতে মহাকাব্যের দোহার বা পদেরই আশ্রয় নেয়।
এই জন্যই যখন শিশু ঢোঁড়াইয়ের বাবা ক'দিনের জ্বরে মারা যায়, তার বউ বুধনীকে সান্ত্বনা দিতে মহতো নুনুলাল বলে,—

'ছিতি জল পাবক গগন সমীরা
পঞ্চ রচিত অতি অধম শরীরা।'[২৬]

এই দোহাটি শ্রীরামচরিত মানসের 'কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড' থেকে নেওয়া হয়েছে যেখানে শ্রীরাম মৃত বালির স্ত্রী তারাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন এই বলে যে মনুষ্যদেহ নশ্বর কিন্তু

তার আত্মা অবিনশ্বর। সুতরাং মৃত্যুজনিত শোক প্রকাশ করা কখনই উচিত নয়।

'ছিতি জল পাবক গগন সমীরা, পঞ্চ রচিত অতি অধম শরীরা।
প্রগত সো তনু তব আগে সোবা, জীব নিত্য কেহি লগি তুম্হ রোবা।।'
'ক্ষিতি অপ্ তেজ আর মরুৎ ও ব্যোম, পঞ্চভূতে সৃষ্ট এই নশ্বর জীবন।
প্রত্যক্ষ শরীর শুধু আত্মা অনশ্বর, তবে কেন কাঁদিতেছ হতেছ কাতর।।'[২৭]

আরেক জায়গায়, ঢোঁড়াইয়ের মা বুধ্নী যখন বাবুলাল তাৎমাকে দ্বিতীয়বার বিয়ে করবার জন্য, কচি ছেলে 'ঢোঁড়াই'কে বোবা সন্ন্যাসী বৌকা বাওয়ার কাছে ফেলে দিয়ে গেল, তখন বাওয়ার মনে হলো যেন শ্রীরামই শিশু ঢোঁড়াইরূপে তার কাছে এসেছে, তাই আমরা পড়ি,—

'অনেকদিন গড়িমসি করবার পর বুধ্নী মন ঠিক করে ফেলে। একদিন সকালবেলায় গোঁসাইথানে বৌকা বাওয়ার পায়ের কাছে ছেলেটাকে ধপ্ করে নামায়। কিছুক্ষণ কান্নাকাটি করে নিজের দুঃখের কথা বলে। তারপর ঢোঁড়াইকে এখানে রেখেই বাবুলালের বাড়ি চলে যায়। ঢোঁড়াই তখন আঙুল-চোষা ভুলে বাওয়ার ত্রিশূলটা নিয়ে খেলা করছে। বাওয়া দেখে যে তার গভীর নাভিকুণ্ডের উপর তিনটি রেখা পড়েছে, ঠিক বালক শ্রীরামচন্দ্রজীর যেমন ছিল।'

'কটি কিংকিণী উদর এর রেখা।	'কটিতে মেখলা শোভে ত্রিবলি উদরে।
নাভি গভীর জান জিন্হ দেখা।।	সেই জানে গভীরতা যে দেখে নাভীরে।।'[২৮]

তুলসীদাসের এই দোহাটির মধ্যে দিয়ে বালক রামচন্দ্রের অপরূপ রূপের একটু আভাস আমরা পাই রামচরিত মানসের 'বালকাণ্ডে'।

এই একই অনুভূতির পুনঃপ্রকাশ আমরা বাওয়ার মধ্যে দেখতে পাই, যখন যুবক ঢোঁড়াই অত্যন্ত দ্বিধাভরে তার কাছে কিছু টাকা চায়, যার সাহায্যে সে তার ভালোবাসার 'রামিয়া'-কে বিয়ে করতে পারবে। এই 'পশ্চিমা উরতটিই' তখন ঢোঁড়াইয়ের জীবনের প্রাণ, স্বপ্নের নারী। বাওয়ার কাছে ঢোঁড়াইয়ের এই আর্জি মনে হয়,—

'...ঢোঁড়াইটা এখনও ছেলেমানুষ আছে, মোচ উঠলে কী হয়। না হলে আজ যে খানিক আগে সকলে টাকা খরচ করবার নানারকম রাস্তা দেখাচ্ছিল তখন সে কারও জবাব দেয়নি কেন। ওরে মুখ্যু, এই সোজা কথাটুকু বুঝতে পারলি না। থানে মন্দির তৈরী করবার চাইতেও বেশি আনন্দ আমার তোকে সুখী দেখলে, একথাও কি মুখ ফুটে তোকে বলতে হবে নাকি ? ছোটবেলায় যখনই তোকে কোলে নিয়েছি, তখনই মনে হয়েছে যে বুড়ো রাজা দশরথ অযোধ্যাজীতে এমনি করেই একদিন তাঁর রামচন্দ্রজীকে কোলে নিয়েছিলেন।

'ধূসর ধূরি ভরে তনু আয়ে।	'ধূলি ধূসরিত অঙ্গ আসিয়া দাঁড়ায়,
ভূপতি বিহঁসি গোদ বৈঠায়ে।।'	রাজা হাসি নিতে ক্রোড়ে দু বাহু বাড়ায়।'[২৯]

উপরের এই দুটি ক্ষেত্রেই এক অদ্ভুত নজরকাড়া সাদৃশ্য চোখে পড়ে সতীনাথের ঢোঁড়াই-রাম ও রামচরিত মানসের তুলসী-রামের মধ্যে। বস্তুতপক্ষে সতীনাথের উপন্যাস

আমাদের একটা কথা খুব ভালোভাবে বুঝিয়ে দেয় যে, দেবতা থেকে একদম সাধারণ মানুষে রূপান্তর ঘটলেও, মানুষের মনের যে মূল অনুভূতি, তার প্রকাশ দেশ স্থান কাল নির্বিশেষে প্রায় একই থাকে। বাওয়ার মনে ঢোঁড়াইয়ের জন্য যে পিতৃস্নেহের ছায়া আমরা দেখি, শ্রীরামচন্দ্রের জন্য মহারাজা দশরথ ও মহারাণী কৈকেয়ীর মনেও সেই একই অভিব্যক্তির মূর্ছণা বাজে।

শুধু এই নয়, সতীনাথের নারীচরিত্র 'রামিয়ার' মধ্যেও এই একই রূপান্তর লক্ষ্য করা যায়। 'পশ্চিমা ঔরত' রামিয়া, ঢোঁড়াই-পত্নী রামিয়া ঢোঁড়াইচরিত মানসের 'সীতা', এ এ যুগের 'সীতা'। সাধারণের মধ্যে থেকেও সে যে অ-সাধারণ তা তাকে আর তার পাশে সব তাৎমা 'ঝোটাহাদের' দাঁড় করালেই বোঝা যায়। আর তাই জন্যই বোধহয় তাকে দেখেই ঢোঁড়াইয়ের মনের স্বপ্নরাজ্যের দুয়ার খুলে যায়, যেখানে শুধু সে আর তার রামিয়া—তাদের নিজস্ব জগৎ গড়ে তোলে, আর কেউ থাকে না, বাওয়া পর্যন্ত নয়। কিন্তু 'শ্রীরামের' মতই ঢোঁড়াইও তার রামিয়াকে সারা জীবনের সাথীরূপে পায় না। দেখতে না দেখতেই তাদের ছোট্ট সাজানো শান্তির সংসারের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়ায় রাবণরূপী 'সামুয়র'—এক ক্রীশ্চন ধাঙড়। তুলসীদাসের সীতার অগ্নিপরীক্ষার মতো সতীনাথের রামিয়াকেও এ যুগের এক অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। রামিয়াকে পিছনে ফেলে ঢোঁড়াই এগিয়ে চলে এক নতুন পথের পথিক হয়ে। এ যুগের রাম ও সীতার—ঢোঁড়াই ও রামিয়ার মিলন অসম্পূর্ণই থেকে যায়। সতীনাথের উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছদ—'স্বর্ণসীতা' এই অসমাপ্ত মিলনের কাহিনীই বহন করে যখন ঢোঁড়াই তার পুরণো গৃহে, ফেলে যাওয়া নারী ও জীবনের কাছে ফিরে আসে নতুন জীবনের নতুন আশা নিয়ে কারণ তার কাছে তখন 'অবধ তঁহা জঁহ রামিয়া নেবাসু', যেখানে রামিয়া সেখানেই অযোধ্যা'।৩০* কিন্তু তার গৃহ তখন নতুন লোকের বাসা—রামিয়ার কোনো উপস্থিতিই সেখানে নেই।

রামচরিত মানসের 'সীতামার' মত সে ঢোঁড়াই চলে যাওয়ার কিছুদিন বাদেই এ পৃথিবী ছেড়েই চলে যায় অনাদরে, বিনা সু-বিচারে। সতীনাথের উপন্যাস তাই এক নিঃসঙ্গ, ক্লান্ত, শ্রান্ত মানুষের জীবনের অসমাপ্ত কাহিনী। কারণ ঢোঁড়াই আবার নতুন যে যাত্রা শুরু করে তার শেষ কোথায় সে নিজেই জানে না। এই চলাই এ যুগের-কলিযুগের ঢোঁড়াই-রামের যাত্রা।

সতীনাথ ও তুলসীদাস—দুজনেই তাঁদের লেখায় 'কলিকাল' শব্দটির বেশ ঘন ঘনই ব্যবহার করেছেন। এবং অনেকটাই এক অর্থে। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে যা সমার্থক মনে হয়, একটু গভীরে প্রবেশ করলেই বোঝা যায় যে তুলসীদাসের 'কলিকাল' থেকে সতীনাথের 'কলিকালের' মধ্যে একটি সূক্ষ্ম রূপান্তর ঘটেছে আর সেটা বোঝা যায়

---

* তুলসীদাস এই একই দোহা লিখেছেন,—
'অবধ তঁহা জঁহ রাম নেবাসু'৩১—অর্থাৎ যেখানে রাম সেখানেই অযোধ্যা।

বিষয়বস্তুর পরিবর্তন থেকে। দুটি ক্ষেত্রেই 'কলিযুগ' বলতে এমন এক সময় বা কালকে বোঝানো হয়েছে যেখানে সমাজ বা জীবনে মূল নীতিগত সুস্থ স্বাভাবিক গুণগুলিই অনুপস্থিত। কিন্তু এখানেই মিলের শেষ, কারণ সতীনাথের 'কলিকাল' এক নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক কালের বাহক আর তুলসীদাসের 'কলিযুগ' ইতিহাস-উদাসীন অনির্দিষ্টতায় পরিব্যাপ্ত।

তাই ঢোঁড়াই যখন মনস্থির করে 'বুরবক কিরিস্তান্'[৩২] (বোকা খৃষ্টান) ধাঙড়গুলোর সঙ্গে 'পাক্কী' মেরামতের কাজে যোগ দিতে, তার এই কাজকে তাৎমার দল মোটেই সুনজরে দেখে না। বরং তাদের মনে হয় যে এর দ্বারা তাৎমা গোষ্ঠীর বড়ই সম্মানহানি হয়েছে। এবং এর জন্য ঢোঁড়াইয়ের অভিভাবক হিসেবে বাওয়ার ওপরই তাৎমা পঞ্চায়েতের যত ক্রোধ গিয়ে পড়ে। পঞ্চর ধারণা হয় বাওয়ার আস্কারাতেই ঢোঁড়াই আজ এমন লাগামছাড়া কাজ করতে পারে।

'বাওয়াটাই যত নষ্টের গোঁড়া।
জাকে নখ অরু জটা বিশালা।
সেই তাপস প্রসিদ্ধ কলিকালা॥
লুটিশ দাও বাওয়াকে।'[৩৩]

উপন্যাসের এই সামাজিক চিত্রের পাশে, তুলসীদাসের এই 'চৌপাই'টি আমরা পাই রামচরিত মানসের 'উত্তর-কাণ্ডে' যেখানে ত্রিকালজ্ঞ 'ভুশুন্ডী কাক' বিষ্ণুর বাহন 'গরুড়'কে কলিকালের বর্ণনা দিচ্ছেন। এই কাল এমন একটি সময় যখন মানুষের বাইরের রূপই তার মূল্যের মাপকাঠি হয়, ও সত্য এবং জ্ঞান মিথ্যা ও অজ্ঞানতার অন্ধকারে চাপা পড়ে থাকে।

'নিরাচার জো স্রুতিপথ ত্যাগী, কলি জুগ সোই জ্ঞানী বৈরাগী।
জাকে নখ অরু জটা বিশালা, সোই তাপস প্রসিদ্ধ কলিকালা॥
আচারবিহীন আর শ্রুতিপথ ত্যাগী, কলিযুগে সেই জ্ঞানী পরম বৈরাগী।
যাহার বর্দ্ধিত নখ শির জটাতলে, প্রসিদ্ধ তাপস মানে তারে কলিকালে॥[৩৪]

আরেক জায়গায়, তুলসীদাস লিখছেন 'কলিকালে',—

'কুলবন্ত নিকারহিঁ নারি সতী, গৃহ আনহিঁ চেরি নিবেরি গতী।
সুত মাতুপিতা তব লোঁ, অবলা নহিঁ ডীঠ পরী জব লো॥
কুলবতী সতী-স্ত্রীরে বহিস্কার করি, কুলনষ্ট করে আনি দাসী ঘরে ধরি।
পিতামাতা মানে পুত্র শুধুই তখন, নারী প্রতি দৃষ্টি নাহি পড়ে যতক্ষণ॥'

অথচ, এই চোপাইটিই সতীনাথ ব্যবহার করেছেন বাওয়ার মনের ভাব বোঝাতে যখন ঢোঁড়াই রামিয়াকে নিয়ে নতুন ঘর বাঁধার স্বপ্নে চঞ্চল, অস্থির।

হ্যাঁরে, "ঢোড়াই, তোর কি একটুও কষ্ট হচ্ছে না, আমাকে ছেড়ে থাকতে হবে বলে"—দূর একথা কি জিজ্ঞাসা করা যায়? হাবভাবেই বোঝা যাচ্ছে।

সুত মানহিঁ মাতু-পিতা তব পোঁ।
অবলা নহিঁ ডীঠ পরী জব জব লো ॥'৩৬

বৃটিশ রাজ ও স্থানীয় জমিদার বর্গের অসাধু আঁতাতে যে চরম আর্থিক ও সামাজিক দুর্দশার দিন ঘনিয়ে আসে দেশের সাধারণ মানুষের উপর, তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সতীনাথ আরেকটি 'কলিকাল' সম্পর্কিত তুলসীদাসী দোহার প্রয়োগ করেন। মহাত্মা গান্ধীর রাজনৈতিক আন্দোলনের ঢেউ পরোক্ষ ভাবে হলেও তাৎমাটুলি ও ধাঙড়টুলির গায়ে এসে ঠিকই ধাক্কা মারে। বৃটিশ ম্যাজিসট্রেট এসে তাদের সাবধান করে দেয় যে তারা যদি কংগ্রেসী লোকদের সঙ্গে মেলামেশা করে তাহলে তাদের প্রত্যেককেই জেলে পুরে দেওয়া হবে। আবার অন্যদিকে 'মাষ্টার সাহেবের' কংগ্রেসী ছেলে এসে তাদের জানায় যে,—

'...রংরেজ সরকারের জন্যই তাৎমাদের রোজগার নেই। অনেকদিন আগে নাকি 'সরকার' তাৎমাদের হাতের বুড়ো আঙুল কেটে নিয়েছিল।'৩৭

অবশ্যই এই ধরণের খবর তাৎমাদের বড়ই উত্তেজিত করে ও তুলসীদাসের সঙ্গে তারা একমত হয় যে 'কলিকালে,'—

'নৃপ পাপ পরায়ণ ধর্ম নহিঁ।
করি দণ্ড বিড়ম্ব প্রজা নিতহী।।'৩৮

এর মানে,—

'নৃপ পাপ পরায়ণ ধর্মে নাহি মতি, বিড়ম্বিত দণ্ডে প্রজা ইহা রাজনীতি ॥'৩৯

দেখা যাচ্ছে তুলসীদাসের 'শ্রীরামচরিত মানস' থেকে সতীনাথের 'ঢোঁড়াইচরিত মানসের' মধ্যে একটি সূক্ষ্ম রূপান্তর ঘটেছে। এবং যতই আমরা উপন্যাসের গভীরে ঢুকে আরো দোহা বিশ্লেষণ করব ততই এই পরিবর্তনের বিভিন্ন স্তরগুলি আমাদের চোখের সামনে পরিষ্কার ভাবে ফুটে উঠবে।

রূপ বদলের প্রথম ধাপটি মহাকাব্যের দৈব বিশ্বাসের সার্বিকতা থেকে উপন্যাসের মানবিক সুনির্দিষ্টতায়। এই ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি উদাহরণই দেওয়া যেতে পারে। প্রথমেই, তাৎমাদের 'বকরহাট্টা' এস্টেটের জমিদারবাবু যখন কতকটা ঈর্ষাতুর হয়েই ধাঙড়দের বসতি সংক্রান্ত বাঙালি উকীল হরগোপালবাবুর সুচিন্তিত সিদ্ধান্তের কথা চিন্তা করেন,—

"ঐ কিরিস্তান ধাঙড়গুলোর বাংগালীদের সঙ্গেই খাপ খায়। যাক্‌গে মরুকগে! রামচন্দ্রজী! 'কৃপা তুমহারি সকল ভগবানা"।৪০

অথচ বালকাণ্ডে এই দোহাটি তুলসীদাস লিখেছেন শ্রীরামের জন্মের আগে দৈব ঘটনার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে। দোহাটির বক্তব্য ভগবান বিষ্ণুর কাছে নারদ মুনির দম্ভ প্রকাশ শ্রেষ্ঠ ভক্তরূপে।

'নারদ কহেউ সহিত অভিমানা, কৃপা, তুহ্মারি সকল ভগবানা।
করুণানিধি মন দীখ বিচারী, ঔর অঙ্কুরেউ গরব তরু ভারী ॥'

নারদ কহিল তবে মনে অভিমান, সকলি তোমার কৃপা জানি ভগবান।
কৃপাসিন্ধু কাছে মুনি-মন উদ্ভাসিত, দর্প তরু নারদের মনে অঙ্কুরিত ।।'[৪১]

আবার যখন, বাওয়া প্রভু রামজীর কাছে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানায় একমাত্র বন্ধন ঢোঁড়াইকে তার কাছে পাঠানোর জন্য, তার ভাষা হয়,—

'করউঁ কাহ মুখ এক প্রশংসা'...মাত্র একটা মুখ, তাও কথা বলতে পারি না।...তা দিয়ে তোমার আর কতটুকু প্রশংসা করতে পারি রামজী।"[৪২]

বালকাণ্ডের এই দোহাটির মধ্যে দিয়ে রাম ও লক্ষ্মণের প্রতি পরশুরামের প্রশংসাবাক্যই প্রকাশ পায়।

'করোঁ কাহ মুখ এক প্রশংসা, জয় মহেস মন মানস হংসা।
অনুচিত বহুত কহেউঁ অগ্যাতা, ছমহু ছমামন্দির দোউ ভ্রাতা।।'
'কত বা প্রশংসা করি এক মুখে আমি, মহেশ মানস হংস জয় হোক স্বামী।
বহু অনুচিত বাক্য কহেছি অজ্ঞাণে, ক্ষমার মন্দির ক্ষম ভ্রাতা দুই জনে'।'[৪৩]

আরেকটি ক্ষেত্রে ত্রিকালজ্ঞ ভুশন্ডি কাক ও খগ-রাজ গরুড়ের ভিতর কথোপকথনের মধ্যে উত্তরকাণ্ডে তুলসীদাস লিখেছেন,—

'নহীঁ দরিদ্রসম দুখ জগ মাহীঁ, সন্ত মিলন সম সুখ কহুঁ নাহীঁ।
পর উপকার বচন মন কায়া, সন্ত সহজ সুভাব খগরায়া।।
দারিদ্র সমান দুঃখ নাহি এ জগতে, সাধু সঙ্গ সম সুখ না পারে মিলিতে।
কায়মনোবাক্যে হয় পর উপকারী, সাধুর স্বভাব ইহা জেনো হে, সর্পারি।।'[৪৪]

এই একই দোহার উদয় হয় বৌকা-বাওয়ার মনে, যখন তাৎমারা গানহী-বাওয়ার মুরতটিকে কোথায় রাখবে তা নিয়ে বড়ই সমস্যায় পড়েছিল।

'মুরতটাকে' নিয়ে মহা বিপদ। এখন কী করা যায়। কী করা যায় ওটাকে নিয়ে। এমনভাবে মুরতের 'দর্শন' পাওয়া গিয়েছে। রাম-সীতার পাশে যদি না রাখতে পারা যায়, তা হলে 'থানেই' বা 'গোঁসাইয়ের' পাশে কী করে রাখা যাবে? বাওয়া ঘাড় নাড়ে —সে তো হতেই পারে না। তবে উপায়? এ কী পরীক্ষায় ফেল্‌লে রামজী। এত কৃপা করে, আমাদের ঘরে এলে গানহী মহারাজ, আর আমরা তোমাকে রাখবার জায়গা দিতে পাচ্ছি না। থাকত টাকা সাহেবদের মতো, বাবুভাইয়াদের মতো, রাজস্বারভাঙ্গার মতো, দিতাম একটা ঠাকুরবাড়ী বানিয়ে, গানহী বাওয়ার জন্যে। ঠিকই বলে গিয়েছে তুলসীদাসজী—'নহি দরিদ্র সম দুখ জগমাহীঁ'। বাওয়ার চোখের কোণ জলে ভরে ওঠে। সারাজীবন তার ভিক্ষে করে কেটেছে। জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত, কখনও দুবেলা ভাত খেয়েছে বলে মনে পড়ে না। একবেলা 'জলপান', একবেলা ভাত—তাও জুটলে, এই তো সব তাৎমাই খায়। এ কেবল তার একার কথা নয়, তবুও 'নহি দরিদ্র সম দুখ জগমাহীঁ'—এই আবছা কথাগুলোর মানে, এই বিপদের ঝলকে হঠাৎ যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে।'[৪৫]

আবার যখন, ভাগ্যের এক অদ্ভুত খেলায়, বাওয়া হঠাৎ বেশ কিছু টাকার মালিক হয়,

তাৎমারা প্রত্যেকেই তাকে বহু পরামর্শ দিল কীভাবে সেই অর্থ খরচ করা যেতে পারে। কিন্তু নিরুত্তাপ বাওয়ার কাছ থেকে কোনো প্রকার সম্মতি না পাওয়ায় তারা বড়ই হতাশ হয়। তাদের মনে হয়,—
'নভ দুহি দুধ, চহত এ প্রাণী'। এর কাছ থেকে থানের আর পাড়ার কোনো জিনিস আশা করা, আকাশ দুয়ে দুধ চাইবার মতোই অবাস্তব।[৪৬]
চোপাইটি আমরা পাই অরণ্যকাণ্ডে যেখানে, দৈত্য-সম্রাট রাবণের বোন সূর্পনখা তার সব প্রকার ছল চাতুরী দিয়ে শ্রীরাম ও লক্ষণের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার বৃথা চেষ্টা করছিল। তার এই আশা যে কত দুরাশা তা ব্যাখ্যা করতেই তুলসীদাস এই পদটি রচনা করেন।

'সেবক সুহ চহ মান ভিখারী, ব্যসনী ধন সুভগতি ব্যাভিচারী।
লোভী জস চহ চারু গুমানী, নভ দুহি চহত এ প্রাণী॥
সেবকের সুখ আর মান ভিখারীর, ব্যাভিচারী গতি আর ধন জুয়াড়ীর।
লোভী যশাকাংখা আর রূপ অভিমানী, আকাশ দুহিয়া দুগ্ধ যেন পায় প্রাণী'॥[৪৭]

আরেকটি ক্ষেত্রে, শ্রীরাম ও সিন্ধু-রাজের ভিতর কথোপকথনের সময় সুন্দরকাণ্ডে লিখেছেন,—

'প্রভু ভল কীন্হ মোহি সিখ দীন্হী, মরজাদা পুনি তুম্হরিয় কীন্হী।
ঢোল গঁবার সুদ্র পশু নারী, সফল তারণা কে অধিকারী॥
ভালই দিয়েছো মোরে শিক্ষা সমুচিত, সকল মর্যাদা প্রভু তোমারি রচিত।
গোঁয়ার দাম্ভিক শূদ্র পশু আর নারী, তাড়না পাবার এরা হয় অধিকারী॥'[৪৮]

এই একই দোহার ব্যবহার ঢোঁড়াই করে যখন তার কাছে তার স্বপ্নের নারী রামিয়া হয়ে ওঠে বিশ্বাসঘাতিনী রামিয়া। যাকে নিয়ে সে একদিন ভালোবাসার ঘর বেঁধেছিল, সেই রামিয়ার জন্যই সে হয় আজ গৃহছাড়া। শুরু হয় তার নতুন পথচলা, চিরপরিচিত পাক্কীর উপর দিয়ে এক নিঃসঙ্গ মানুষের অজানা পথের যাত্রা। বঞ্চনার জ্বালায় জর্জরিত ঢোঁড়াইয়ের মনে হয়,—
'ঢোল, গঁবার, সুদ্র, পশু, নারী' এদের সব সময় মারের উপর রাখতে বলেছে রামায়ণে। প্রথম থেকে যদি এ কথা সে মনে রাখত। কী ভুলই করেছে সে রামায়ণের কথা না মেনে।"[৪৯]
সুতরাং, এতগুলি দোহার বিশ্লেষণের শেষে স্পষ্টই বোঝা যায় যে তুলসীদাস যে পদ রচনা করেছেন দৈব বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে এবং যার ব্যাখ্যা ও অর্থ অ-সাধারণত্বে নিহিত, সেই একই দোহা সতীনাথের উপন্যাসে হয়ে ওঠে অনেক বাস্তবধর্মী, জীবন্ত, মাটি ও মানুষের সঙ্গে একাত্ম।

পরবর্তী স্তরে, দেখতে পাই, সতীনাথের লেখায় কীভাবে কিছু দোহার মাধ্যমে একটি সম্প্রদায়ের নীতিগত মানবিক চেতনার বিকাশ কোনো বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ও

কোনো বিশেষ চারিত্রিক গুণকে ফুটিয়ে তুলে। বিশেলষণের এই ধাপকে বুঝতে গেলে, এই ধরণের কিছু দোহার বিচার অবশ্যই দরকার।

'শ্রীরামচরিত মানসের' বালকাণ্ডে দৈত্যসম্রাট রাবণের রাজত্ব-কাল সম্পর্কে তুলসীদাস লিখেছেন,—

'সুভ আচরণ কতহুঁ নহিঁ হোঈ, দেব বিপ্র গুরু মান ন কোঈ।
নহিঁ হরি ভগতি জগৎ তপ গ্যানা, সপনেহুঁ মুনিঅ ন বেদ পুরানা॥'
'শুভ কর্ম নাহি হয় আর কোন স্থানে, দেব বিপ্র গুরু আর কেহ নাহি মানে।
নাহি হরিভক্তি নাহি যজ্ঞ তপ জ্ঞান, স্বপ্নে নাহি শুনে কেহ বেদ ও পুরাণ॥'[৫০]

এই একই দোহার ব্যবহার তাৎমাদের পুরোহিত 'মিসিরজী' করেছেন তাঁর অসন্তোষ জানাতে, যখন ঢোঁড়াই ও তার সঙ্গী সাথীরা নিজেদের নিছক 'তাৎমা' থেকে একটু সম্মানিত পদ 'তন্দ্রিমাছত্রি'তে উন্নীত করতে উপবীত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পৈতে নেওয়ার জন্য প্রায় ক্ষেপে উঠেছিল এবং মিসিরজীর নিষেধ একপ্রকার অবজ্ঞার সঙ্গেই তুচ্ছ জ্ঞান করেছিল।

কিছু নিজের নেতৃত্বে তাৎমাদের তন্দ্রিমাচ্ছত্রি হতে সাহায্য করলেও, ঢোঁড়াইয়ের অবশ্য সবসময়ই মনে হয়,—

"...রামজীর মর্জি ছাড়া তো কিছু হওয়ার উপায় নেই। কখন না কখন গরীবদের কথা তাঁর মনে পড়বেই।

'গই বহোর গরীব নেবাজু
সরল সবল সাহিব রঘুরাজু॥
তিনি ছাড়া আর গরীবকে দেখার কে আছে ?'[৫১]

শুধু ঢোঁড়াই নয়, এ-বিশ্বাস প্রত্যেক তাৎমার মনেই লুকিয়ে আছে।

আর এই বিশ্বাসের ভিত যেখানে, সেই 'শ্রীরামচরিতমানসের' বালকাণ্ডে তুলসীদাস এই চৌপাইটি লিখছেন প্রভু শ্রীরামের অপার মহিমা বর্ণনা করতে।

'গঈ বহোর গরীব নেবাজু, সরল সবল সাহিব রঘুরাজু।
বুধ বরনহিঁ হরি জস অস জানী, করহিঁ পুনীত সুফল নিজবাণী॥
'পতিতপাবন স্বামী দীনবন্ধু নাম, সারল্য শক্তির সীমা রঘুপতি রাম।
বর্ণনা করিয়া হরি যশোরাশি জ্ঞানী, সার্থক সফল করে নিজ পুণ্যবাণী॥'[৫২]

এইভাবেই মহাকাব্যের ভক্তিমূলক পদগুলি উপন্যাসের পটভূমিতে একটি সম্প্রদায়ের মানবিক ও চারিত্রিক বিকাশের উপলক্ষ হয়ে দাঁড়ায়।

আবার যখন, বালকাণ্ডে নারদমুণি গিরিরাজ হিমালয়ের কন্যা পার্বতীর বর্ণনা দেন,—

'সব লচ্ছন সম্পন্ন কুমারী, হোই হি সন্তত পিয়হি পিয়ারী।
সদা অচল এহি কর অহিবাতা, এহি তেঁ জসু পৈহহিঁ পিতু মাতা॥
সর্ব সুলক্ষণযুক্তা তোমার কুমারী, পতিপ্রিয়া রহিবেন আজীবন ধরি।
অটল সৌভাগ্য রবি ভাতিবে ইহাঁর, পিতা মাতা গর্বান্বিত গৌরবেতে তাঁর॥'[৫৩]

—এই একই অর্থে, গোষ্ঠীগত প্রথা অনুসারে, মহতো ও মিসিরজী, ঢোঁড়াই ও রামিয়ার বিবাহ উপলক্ষে রামায়ণ থেকে পাঠ করে,—

'মহতো ঢুলছিল বসে। সে নেশার আমেজে আছে এখন। হঠাৎ চমকে উঠে হড়বড় করে বলে ফেলে—

'সব লচ্ছন সম্পন্ন কুমারী।
হোইহি অন্তত পিয়হি পিয়ারী॥'

সব সুলক্ষণ আছে এ মেয়ের। এ চিরকাল 'পুরুষের' পিয়ারী থাকবে। এইবার মিসিরজী বলেন,—

'সদা অচল এহি কর অহিবাতা।
এহি তেং জসু পইহহিঁ পিতুমাতা॥'

এর এয়োতি অচল থাকবে, এর জন্য এর বাপ-মার নাম হবে।'[৫৪] তাই, তুলসীর লেখায় যা হয়ে ওঠে দৈবত্বের বর্ণনা, সতীনাথের উপন্যাসে তারই ব্যবহার হয় সাম্প্রদায়ের প্রথার অঙ্গ রূপে।

অন্য ক্ষেত্রে, রাণী কৈকেয়ীর নিষ্ঠুর চক্রান্তে শ্রীরামের বনবাসে যাত্রার কথা শুনে অযোধ্যাবাসীর মনের ক্ষোভের প্রকাশ তুলসীদাস করেছেন,—

'সত্য কহহিঁ কবি নারি সুভাউ, সব বিধি অগহু অগাধ দুরাউ।
নিজ প্রতিবিম্বু বরুকু গহি জাঈ, জানিন জাই নারি গতি ভাঈ॥
পণ্ডিতে ঠিকই বলে নারীর স্বভাব, দুর্গম অগাধ গুপ্ত সতত এ ভাব।
নিজ প্রতিবিম্ব ধরা সাধ্য তবু হয়, নারীর মনের কথা বোঝা নাহি যায়॥'[৫৫]

এই চৌপাইটি যে মোটেই বিস্মৃত নয় এবং আজও মানুষের মুখে মুখে বড়ই প্রাণবন্ত সেটাই সতীনাথ দেখিয়েছেন যখন তাৎমা পঞ্চায়েতের সভ্যগণ বারবার ঢোঁড়াইকে বোঝাবার চেষ্টা করছিল যে রামিয়া তার স্ত্রী হিসেবে বড়ই অনুপযুক্ত। তাদের কথায়,—

'হাঁ, দেখলি তো ঢোঁড়াই, বিয়ের আগেই আমরা মানা করেছিলাম। হাতির মতো জোয়ান মেয়ে পাচ্ছিমের পানির। 'কান করই অবলা প্রবল'···মহতোর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বাবুলাল পাদপূরণ করে দেয়—'কে হি জগ কালু ন খাই।'

হেঁপো তেতরও···ছড়া কাটে—

'নিজ প্রতিবিম্বু বরুকু গহি জ্যাঈ।
জানি ন জাই নারি গতি ভাই॥'

আরশির উপর নিজের ছায়া যদি বা ধরে রাখা সম্ভব হয়, তবু মেয়েদের মনের গতি জানা সম্ভব নয়।"[৫৬]

'শ্রীরামচন্দ্রের বনবাসে যাওয়ার আসল কারণ শুনে মাতা কৌশল্যার যে অবর্ণনীয় শোক তার প্রকাশ অযোধ্যাকাণ্ডে তুলসীদাস করেছেন,—

'রাখি ন সকই প কহি সক জাহু, দুহু ভাঁতি ঔর দারুণ দাহু।

লিখত সুধাকর গা লিখি রাহু, বিধি গতি বাম সদা সব কাহু ॥
না পারে রাখিতে কিংবা যাও বাছা বলা, উভয় প্রকারে হৃদে নিদারুণ জ্বালা।
বিধাতার বিধি দেখ বিপরীত সাজে, সুধাকর লিখিবারে রাহু হয় কাজে ॥'[৫৭]

অথচ, সতীনাথের উপন্যাসে এই দোহাটির মাধ্যমে এক অত্যন্ত বিশৃঙ্খল আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে একটি সম্প্রদায়ের মানসিক চিন্তা ও উদ্বেগই প্রকাশ পায়। যে গ্রামটিতে ঢোঁড়াই তার জীবনের পরবর্তী পরিচ্ছেদ শুরু করে তার নাম—বিস্‌কান্ধা। জমিই সেখানে অন্নদাতা—অর্থোপার্জনের একমাত্র পথ। সুতরাং এই প্রথম জীবিকার জন্য ঢোঁড়াইকে চাষ-বাসের কথা ভাবতে হয়। কিন্তু গ্রামবাসীদের কাছ থেকে খুব একটা সাদর অভ্যর্থনা সে পায় না। তার একটাই কারণ। সে সময়কার ওই কঠিন আর্থিক পরিবেশে নিজেদের রোজগারেরই কোন ঠিক নেই, তার ওপর আবার নতুন মানুষকে জমি জায়গা দিয়ে বসবাস করানোর কথা ভাবাই দুস্কর। প্রবীণ গ্রামবাসী 'বুড়হাদাদার' মুখে তাই শোনা যায়,—

"...ভাল গাঁ বেছেচ রোজগারের জন্য। আমাদেরই আজকাল খাওয়া জোটে না। যা দিনকাল পড়েছে। দিন দিনই খারাপ হচ্ছে। 'বিধিগতি বাম সদা সব কাহু।' ভগবান সবসময় সকলের উপর নারাজ।...[৫৮]

শুধু এই নয়, জমিদারদের অপেক্ষাকৃত বিলাসবহুল জীবন যাত্রার সঙ্গে নিজেদের দুঃখ দারিদ্রের তুলনা করে গভীর হতাশার সুরে বুড়হাদাদা বলে,—

'রামচন্দ্রজীর রাজ্যের নিয়মকানুন সব বদলে গেল নাকি ?
'অউর করই অপরাধ
কোউ আউর পাব ফল ভোগু।'
একজন দোষ করে, আর একজন তার ফল পায়! আশ্চর্য।[৫৯]

অথচ, এই দোহাই অযোধ্যাকাণ্ডে শ্রীরামচন্দ্রকে বনবাসে যাওয়া থেকে বিরত করতে রাজা দশরথের মুখে শোনা যায়,—

'ঔর করৈ অপরাধ কোউ, ঔর পাব ফল ভোগু।
অতি বিচিত্র ভগবন্ত গতি, কো জন জানৈ জোগু ॥
অপরাধ করে এক ফল পায় আর, বিচিত্র বিধান কেবা জানে দেবতার ॥'[৬০]

অবশেষে তুলসীদাসের 'রামরাজ্যের' যে বর্ণনা আমরা উত্তরকাণ্ডে পাই,—

'অল্প মৃত্যু নাহিঁ কবনিউ পীরা, সব সুন্দর সব বিরুজ সরীরা।
নহিঁ দরিদ্র কোউ দুখী ন দীনা, নহিঁ কোউ অবুধন লচ্ছনহীনা ॥'
অকাল মৃত্যুতে কেহ ব্যথিত না হয়, সবারি সুন্দর দেহ সবে নিরাময়।
নহেক দরিদ্র কেহ নহে দুঃখী দীন, নহে মূর্খ কেহ সেথা সুলক্ষণহীন ॥'[৬১]

ঢোঁড়াই চরিত মানসে এই একই 'রামরাজ্যের' ডাক 'গান্ধীজী' দিয়েছেন। সাধারণের চেতনায় এ এমনি এক রাজ্য যেখানে দুঃখ নেই, দারিদ্র নেই, জাত-বিচার নেই, অজ্ঞানতার

আঁধার নেই। 'রামজীর' রাজ্যে সবাই সমান, সবাই এক।
'রামরাজ্যে'—

নহিঁ দরিদ্র কোউ দুখী ন দীনা
নহিঁ কোউ অবুধ না লচ্ছনহীনা।

রামরাজ্যে দরিদ্র, দীনদুঃখী, নির্বোধ বা অলুক্ষুণে কেউ থাকবে না।[৬২]

সুতরাং উপরের সবকটি ক্ষেত্রেই তুলসীদাসী দোহা সতীনাথের হাতে এক অন্য রূপ পেয়েছে—যে রূপের মধ্যে দিয়ে এক 'সাব অলটান' বা নিম্নশ্রেণীর গোষ্ঠীর মানবিক চিন্তা ও চেতনার বিকাশ হয়েছে। 'তুলসীদাসী রামায়ণ' এদের কাছে নিজেদের জীবনের মতোই বাস্তব ও সজীব।

গ. পরিশিষ্ট

এই বিস্তারিত আলোচনার শেষে এসে একটি সত্য খুবই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। 'শ্রীরামচরিত মানসের' 'তুলসী-রাম' রূপান্তরিত হয় 'ঢোঁড়াইচরিত মানসের' 'ঢোঁড়াই-রামে'—মহাকাব্যের পুরুষোত্তম রাম থেকে উপন্যাসের সাধারণ মানুষের নায়করূপে। তুলসীদাসী 'রামচরিত মানস' এমনি এক গ্রন্থ যার কোনো ক্ষয় নেই, সে সজীব হয়ে মানুষের মনে, মুখে, ভাষায়, কথায় বেঁচে থাকে যুগ থেকে যুগে। তার যাত্রা চিরন্তনের যাত্রা, ইতিহাস ছাড়িয়ে ভক্তির পথ ধরে। কিন্তু এই 'মানস'-ই সতীনাথের উপন্যাসে ইতিহাসের সীমার মধ্যে বাঁধা পড়ে ; মহাকাব্যের চিরন্তন যাত্রা উপন্যাসের জাগতিক পথচলায় এসে মিশে যায়। এখানেই ফুটে ওঠে একাধারে 'শ্রীরামচরিত মানসের' অসামান্য তাৎপর্য্য ও সতীনাথের অসাধারণ সৃজনী শক্তি। একে অন্যের পরিপূরক এবং তাই 'যাত্রার' পরিসমাপ্তি ঘটে তুলসীদাস থেকে সতীনাথে ; 'শ্রীরামচরিত মানস' থেকে 'ঢোঁড়াইচরিত মানসে।'

সূত্র ঃ

শঙ্খ ঘোষ ও নির্মাল্য আচার্য সম্পাদিত

১। 'সতীনাথ গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা ১৯৭৩, পৃ. ক
২। সতীনাথ গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৭৩, পৃ. ৪৯৭
৩। তদেব, পৃ. ৪৯৪
৪। The first account of the life of Tulsidas in English was by sir George Grirson, 'Notes on Tulsi Das,' Indian Antiquary XXII 1893.

৫। F. R. Allchin, 'Tulsidas : The Petition to Ram', UNESCO 1966, P. 19. Taken from Imperial Gazetteer, Vol. II (1908) P. 418

৬। Quoted in F. R. Allchin's 'Tulsidas : The Petition to Ram', UNESCO 1966, P. 19. Quotation taken from Hazari Prasad Dvivedi's 'Hindi satitya Ki Bhumika', 1[st]ed. 1940, P. 107 (in Hindi)

৭। সতীনাথ গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, প্‌. ৪৯৮

৮। তদেব

৯। F. R. Allchin, 'Tulsidas : The Petition to Ram', P. 20

১০। ibid, P. 18

১১। শ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'রামায়ণ' (সাংস্কৃতিকী), কলিকাতা ১৩-৬৮, প্‌. ৩৩

১২। শ্রী সনৎকুমার মজুমদার অনূদিত, 'শ্রীরামচরিত মানস' প্রথম খণ্ড, কলিকাতা ১৯৮৪, প্‌. ৯৫

১৩। P. C. Bagchi, 'studies on the Adhyatma Ramayana', Calcutta, 1935

১৪। তুলসীদাসের দাস্য-রসের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা পাওয়া যায় ডঃ : ভগীরথ মিশ্রের 'সাহিত্য সাধনা ঔর সমাজ' লক্ষ্ণৌ ১৯৫৯, প্‌প্‌. ৫০-৫৭

১৫। F. R. Allchin 'Tulsidas : The Petition to Ram', P. 20

১৬। শ্রী সনৎ কুমার মজুমদার অনূদিত,' শ্রী রামচরিত মানস', দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা ১৯৮৪, প্‌. ৩০২-৩০৩, দোহা-৭৭, চৌপাই-৫

১৭। সতীনাথ গ্রন্থাবলী, ১৯৭৩, খণ্ড, প্‌. ৪৯৪

১৮। তদেব, প্‌. ৪৯৯

১৯। তদেব

২০। তদেব

২১। তদেব, প্‌. ৪৯৪-৪৯৫

২২। তদেব, প্‌. ৪৯৫

২৩। তদেব

২৪। তদেব, প্‌. ৩

২৫। তদেব, প্‌. ৪৯৮

২৬। তদেব, প্‌. ৩৩

২৭। শ্রী সনৎ কুমার মজুমদার অনূদিত 'শ্রীরামচরিত মানস', দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৮৪, দোহা-৩০, চৌপাই-৪, প্‌. ৭৮-৭৯

২৮। 'সতীনাথ গ্রন্থাবলী', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩২ দোহাটি নেওয়া হয়েছে শ্রী সনৎ কুমার মজুমদার অনূদিত 'শ্রীরামচরিত মানস', 'বালকাণ্ড', দোহা-২০৪, চৌপাই-২, পৃ. ১৫০-১৫১

২৯। 'সতীনাথ গ্রন্থাবলী' দ্বিতীয় খণ্ড, প. ১০৮, দোহা—'শ্রীরামচরিত মানস' 'বালকাণ্ড', দোহা-২০৮, চৌপাই-৫, পৃ. ১৫৪-১৫৫

৩০। 'সতীনাথ গ্রন্থাবলী', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৯১

৩১। 'শ্রীরামচরিত মানস', 'অযোধ্যাকাণ্ড', দোহা-৭২, চৌপাই-২, পৃ. ৩১৮

৩২। 'সতীনাথ গ্রন্থাবলী', দ্বিতীয় খণ্ড পৃ. ৪

৩৩। তদেব, পৃ. ৫০-৫১

৩৪। 'শ্রীরামচরিত মানস', 'উত্তরকাণ্ড', দোহা-১৪০, চৌপাই-৪, পৃ ৩৩৬-৩৩৭

৩৫। তদেব, ছন্দ-২৮, পৃ. ৩৩৮-৩৩৯

৩৬। 'সতীনাথ গ্রন্থাবলী', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১১৪

৩৭। তদেব, পৃ. ১২৪

৩৮। তদেব, পৃ. ১২৫

৩৯। 'শ্রীরামচরিত মানস', 'উত্তরকান্ড', দোহা-১৪৫, চৌপাই-২৯, পৃ. ৩৩৯

৪০। সতীনাথ গ্রন্থাবলী', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ৩

৪১। 'শ্রীরামচরিত মানস', বালকাণ্ড, পৃ ১০২-১০৩

৪২। 'সতীনাথ গ্রন্থাবলী', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৪

৪৩। 'শ্রীরামচরিত মানস', 'বালকাণ্ড', দোহা-২৮৬, চৌপাই-৩, পৃ. ২১০-২১১

৪৪। তদেব, 'উত্তরকাণ্ড', দোহা-১৯০, চৌপাই-৭, পৃ. ৩৬২-৩৬৩

৪৫। 'সতীনাথ গ্রন্থাবলী', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৯

৪৬। তদেব, পৃ. ১০৬-১০৭

৪৭। 'শ্রীরামচরিত মানস', 'অরণ্যকাণ্ড', দোহা-২৬, চৌপাই-১, পৃ. ২৬-২৭

৪৮। তদেব, 'সুন্দরকাণ্ড', দোহা-৬০, চৌপাই-৩, পৃ. ১৪০১৪১

৪৯। 'সতীনাথ গ্রন্থাবলী', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৪৯

৫০। 'শ্রীরামচরিত মানস', 'বালকাণ্ড', দোহা-১৯০, চৌপাই-৪, পৃ. ১৩৮-১৩৯

৫১। 'সতীনাথ গ্রন্থাবলী', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৮৭

৫২। 'শ্রীরামচরিত মানস', 'বালকাণ্ড', দোহা-১৭, চৌপাই-৪, পৃ. ৩৬-৩৭

৫৩। তদেব, 'বালকাণ্ড', দোহা-৭৮, চৌপাই-২, পৃ. পৃ. ৫৬-৫৭

৫৪। 'সতীনাথ গ্রন্থাবলী,' দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৩৪

৫৫। 'শ্রীরামচরিত মানস', 'অযোধ্যাকাণ্ড', দোহা-৪৬, চৌপাই-৪, পৃ. ৩০০-৩০১

৫৬। 'সতীনাথ গ্রন্থাবলী', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৪২-১৪৩

৫৭। 'শ্রীরামচরিত মানস', 'অযোধ্যকাণ্ড', দোহা-৫৩, চৌপাই-১, পৃ. ৩০৬-৩০৭

৫৮। 'সতীনাথ গ্রন্থাবলী', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৫৫
৫৯। তদেব, পৃ. ১৭০
৬০। 'শ্রীরামচরিত মানস', 'অযোধ্যাকাণ্ড,' দোহা-৭৫, পৃ. ৩২০-৩২১
৬১। তদেব, 'উত্তরকান্ড', দোহা-৪২, চৌপাই-৩, পৃ. ২৭৮-২৭৯
৬২। 'সতীনাথ গ্রন্থাবলী', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২০৩

বানপট : গান এবং পালা

অদিতিনাথ সরকার

মেদিনীপুর বন্যায় ভাসেনি এমন একটা বছর খুঁজে পাওয়া কঠিন। সরকারি নথি ঘাটলে দেখা যায় উনিশ শতকেও বন্যারোষে বারবার বিপর্যস্ত হয়েছে এই জেলা। ইংরেজ প্রশাসকের লিপিতে এই ছবি পরিষ্কার। একটি দশকের কথা ধরা যাক : ১৮৩০-১৮৪০। এই এক দশকেই '৩১, '৩২, '৩৩, '৩৪, '৩৯ এবং '৪০ সালে ছ'বার বন্যায় ভেসেছে এই দেশ। উপকূলবর্তী জেলা হওয়ার ফলে কয়েকবার জলোচ্ছ্বাস আর ঝড়ের কবলেও পড়তে হয়েছে মেদিনীপুরকে। এরকমই প্রলয়ঙ্কর ঝড় হয়েছিল ১৮৬৪ সালেও। সেবার গোটা জেলায় ঝড়ে মৃত্যু হয়েছিল ৩৩,০০০ মানুষের।

পরে রোগ ও খাদ্যাভাব মিলিয়ে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের শেষে মোট ৬৬,০০০ লোক প্রাণ হারান মেদিনীপুরে। তাণ্ডবের শেষে গোটা তমলুক শহরে মাত্র সাতাশটি বাড়ি ধ্বংস থেকে রক্ষা পায়। সাম্প্রতিক অতীতে জেলায় সব থেকে ভয়াবহ বন্যা হয় ১৯৭৮ সালে। কেবল মেদিনীপুরে নয়, পশ্চিমবঙ্গের আরও অন্তত আটটি জেলা প্লাবিত হয়েছিল সেবারের বন্যায়। প্রায় চার মাস কাল পশ্চিমবঙ্গের বিরাট অংশ ছিল জলের কবলে। সেনা নেমেছিল উদ্ধারের কাজে। হেলিকপ্টার থেকে মেদিনীপুরের সেই বন্যা দেখার পর মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বলেন, 'ভয়াবহ বন্যা'। "যেদিকে তাকাই শুধু জল। যেন সমুদ্র। কোনও কোনও এলাকা বিশ ফুট জলের নিচে", লেখেন সাংবাদিকরা।

এমনই এক প্রলয়ঙ্কর বন্যার পরে সেই বানভাসি নিয়ে গান বেঁধেছিলেন দুখুশ্যাম চিত্রকর—তাঁর "বন্যার বিবরণের"[১] গান। দুখুশ্যামের সেই 'বানপট'-ই বর্তমান নিবন্ধে মূল আলোচ্য। এই পট আমি সংগ্রহ করেছিলাম মেদিনীপুর জেলার তমলুক থেকে, ১৯৮১ সালে।

পট বলতে এখানে জড়ানো পটের কথা বলা হয়েছে। ১৪"×২২" 'কার্ট্রিজ পেপার' পর পর চারখানা জুড়ে তৈরি হয় একটা জড়ানো পট। ওই কাগজের উপর বিষয়ভিত্তিক ছবি আঁকেন চিত্রকর। আলোচ্য পটটি নয়াগ্রামের দুখুশ্যাম চিত্রকরের আঁকা। তমলুক শহরের সংলগ্ন এলাকায় বহু পটই চিত্রিত করেন দুখুশ্যাম।

আলোচ্য পটটি খাড়াখাড়ি নয় ভাগে ভাগ করা। প্রত্যেকটি ভাগ পৃথকভাবে চিত্রিত। পটে ছবি এমনভাবেই আঁকা হয় যাতে পটটাকে জড়ানো অবস্থা থেকে খাড়াখাড়িভাবে খুলে দেখানো যায়। এই ধরনের "শোভন" সংস্করন ছাড়াও রয়েছে সাধারণ পট।

১. দুখুশ্যামের পটটির নাম : 'বন্যার বিবরণ'পট

সেগুলি অপেক্ষাকৃত পাতলা এবং ছোট (১১"×১৬") কাগজে করা। সাধারণ পটের জন্য ফুলস্কেপ মাপের লেখার কাগজ ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

"বন্যার বিবরণ" পট-এর চিত্রিত ছবি ১১ ইঞ্চি চওড়া। ছবিগুলোর আবার দু রকমের আকার রয়েছে। প্রথম ছবি ১১"×১২" দৈর্ঘ্যের। বাকি ছবিগুলো ৬ থেকে ৭ ইঞ্চি লম্বা। প্রথম ছবিটি দেখানো শুরু হয় উপর দিক থেকে। সঙ্গে শুরু হয় গান। আর ছবিটি হল বিস্তীর্ণ নীল জলরাশির উপর মকর বাহনে উপবিষ্ট গঙ্গাদেবী। জলে ঢেউ। আর সেই জলে ভাসছে মানুষের মাথা। তাদের চোখ বোজা। সম্ভবত তাদের মৃত বোঝাতে। গরু মোষের মাথাও ভাসতে দেখা যায়। জলে অবশ্য মাছও থাকে। সবকটি ছবির-ই চারপাশে দেড় ইঞ্চি ঘের দিয়ে ফুল লতা পাতা চিত্রিত। এ হল ছবির ফ্রেম। ঘেরের ভিতরাংশে ওপরে এবং দুপাশে কালো রেখা।[১]

দ্বিতীয় ছবিতে (৬"×১১") দুটি বাড়িতে দু'জন করে লোক। একটি খড়ের চালা ঘর, অন্যটি ইটের তৈরি পাকা বাড়ি। তৃতীয় ছবিটি সামান্য বড় (৬½"×১১")। ছবিতে শুধুই বন্যার জল। জলে ভাসছে মৃত মানুষের মুণ্ডু। ভাসছে খড়কুটো আর মাছ। আর ভাসছে গৃহস্থের আসবাবপত্র। ছবিতে আর একটা অদ্ভুত জিনিস রয়েছে : একটা কলা গাছের ভেলা ভাসছে। তার উপরে এক সধবা নারী। তিনি সন্তান প্রসব করছেন। পরের ছবিতে দুটি পুরুষ মূর্তি একটি ঘরে ও দুটি নারীমূর্তি অপর ঘরে। হাসপাতালের দৃশ্য। চতুষ্টয়ের দুজন মৃতপ্রায়। দেওয়ালের তাকে ওষুধের শিশি। পরের ছবিতে চশমা পরা দুই ডাক্তার রোগী চিকিৎসায় রত। মধ্যে দণ্ডায়মানা চতুর্ভুজা মা কমলা।

পরের ছবিটা বেশ মজার, প্রথম দর্শনেই একটা ধাক্কা লাগে। একটি নল-আকৃতি বস্তু। তাতে জানলা রয়েছে। সেখানে দুটি পুরুষ মুখ। সেই নল-আকৃতি বস্তুর নিচে এবং ওপরে লাল কালো চাকতি। চাকতিগুলো ওই নল-আকৃতি বস্তুর সঙ্গে জুড়ে আছে। ওই চাকতি আসলে ঘূর্ণায়মান রোটর্ ব্লেড আর গোটা ছবিটা হল হেলি-কপ্টারের। আর জানলায় ওই পুরুষ মুখ দুটি মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর ও প্রধানমন্ত্রী দেশাইয়ের। বন্যা দেখছেন আকাশ থেকে। পরের ছবিতে আবার বন্যার জল, ভাসছে মৃত মানুষ ও পশু। তবে তারই মধ্যে চলেছে ধোঁয়া উড়িয়ে স্টীম-লঞ্চ। আর চলেছে দুই আরোহী নিয়ে, চাকাওয়ালা "গাড়ী নৌকা, বা অ্যাম্ফিবিয়াস্ যান।"

পরের দুটি ছবিতে দাঁড়িয়ে দুজন লোক আর অন্যরা তাঁদের সামনে করজোড়ে নতজানু। এটা হল স্থানীয় মানুষের কাছে সরকারি এবং বেসরকারি বিভিন্ন সংগঠনের অফিসারদের জরুরি ত্রাণ বিলি করার দৃশ্য। তার পরের ছবিটি ৭"×১১" মাপের। ছবিতে নীল জলের ওপর একটি নৌকার গলুইয়ে দাঁড়িয়ে এক মাঝি। নৌকার তিনদিকে

১. দুখুশ্যামের ছাপা পটটি দেখে নিতে পারেন। পটটি বহুবর্ণ চিত্রিত। ছাপায় অবশ্য রঙ রাখা সম্ভব হয়নি।

তিনটি ভাসমান শব। অপর পার্শ্বে আবার সেই গঙ্গাদেবী। মকর বাহনে উপবিষ্ট, পটের প্রথম ছবিরই পুনরাবৃত্তি।

এই পটগুলো আঁকেন পটুয়ারা। এঁদের পটিদার বা চিত্রকরও বলা হয়ে থাকে। এঁরা পট নিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে উবু হয়ে বসে সেই জড়ানো পটগুলি খুলে দেখান। আর পটের দৃশ্যমান অংশের চিত্রণ বর্ণনা করে গান করেন। বিনিময়ে গৃহস্থের কাছ থেকে চিত্রকররা পেয়ে থাকেন টাকা পয়সা, চাল ডাল বা অন্য কোনো সামগ্রী। মেদিনীপুরের তমলুক অঞ্চলে বসবাসকারী এই পটুয়াদের মধ্যে সগোত্রে বিবাহের রীতি। পটুয়াদের বাস পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে। তবে মেদিনীপুর আর বীরভূম জেলাতেই এঁদের এখন বসবাস সবচেয়ে বেশি।

দুই জেলার পটুয়াদের পট চিত্রণের রীতিতে স্পষ্ট ফারাক রয়েছে। তা ছাড়া বীরভূমের পটুয়ারা তাঁদের বিষয় নির্বাচনের দিক থেকে অনেক বেশি রক্ষণশীল। পটের বিষয় তাঁরা মোটামুটি পুরাণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন। বাংলার জাতিতত্ত্বের ইতিহাসে অদ্ভুত রহস্যে-ঘেরা এই সম্প্রদায়টির অবস্থান স্পষ্টতই হিন্দু এবং মুসলমান ধর্মের মধ্যবর্তী জায়গায়। কারও মতে এঁরা 'ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ' কথিত 'নবশাখ' বা সৎ শূদ্রদের নয় শাখার একটি। আবার কেউ মনে করেন এঁদের উদ্ভব আদিবাসী মূল থেকে। মুসলমান ধর্মের চিরন্তন রীতি অনুযায়ী এঁদের মধ্যে খতনা প্রথা চালু আছে। বিবাহ, মৃত্যু এবং তালাক সংক্রান্ত সব অনুষ্ঠানই হয় কাজির উপস্থিতিতে। কিন্তু তাঁরা জীবনের যাবতীয় কাজকর্মে হিন্দুদের মতোই পদে পদে পঞ্জিকা মেনে চলেন। আবার অষ্টমঙ্গলা এবং বধূবরণের মতো হিন্দু লোকাচার মেনে বিয়ে করেন পটুয়ারা। বাংলার গ্রামীণ হিন্দু দেব দেবী—সবার প্রতিই এঁদের অগাধ শ্রদ্ধা। হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে কোনো বাড়িতেই গান শোনাতে যেতে বাধা নেই পটুয়াদের তরফ থেকে। বিষয় নির্বাচনে তাঁরা মুসলিম ধর্মের চেয়ে হিন্দু ধর্মের উপরেই বেশি নির্ভর করেন। কিন্তু সব থেকে রহস্যের ব্যাপার হল : পটুয়াদের দুটি করে নাম, একটি মুসলমান অন্যটি হিন্দু।

পট দেখিয়ে বা গান গেয়ে পটুয়াদের আজ আর পেট চলে না। এবং নিকট অতীতেও কখনো পটুয়ারা এই জীবিকায় পেট ভরাতে পারতেন কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ থেকে যায়। ফলে পেট চালানোর আরও সব নানান উপায় খুঁজতে হচ্ছে। কেউ হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি গড়েন, কেউ গড়েন মাটির গয়না কিংবা ঘর সাজানোর জিনিস, মাটির পুতুল বা খেলনা বেচে পেট চালান কেউ। এঁদের এক বড় অংশ ঝালাইয়ের কাজে পারদর্শী। আবার এইসব শিল্পীদের কেউ কেউ দূর দূর গ্রামে সাইকেলে করে সস্তার সামগ্রী ফেরি করেন, কেউ হাতুড়ে ওষুধ বেচেন আর বহু পটুয়াই এখন ঘরামি কিংবা নিতান্তই দিন মজুর।

এমনই এক সম্প্রদায়ের লোক দুখুশ্যাম। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। তমলুকের আশপাশের অঞ্চলে পটুয়া হিসাবে তাঁর বেশ নাম ডাক। আবার পটের

ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ আছে বাইরের এরকম বহু মানুষও তাঁকে চেনেন। এই দুখুশ্যাম প্রকৃত অর্থেই একজন সমকালীন, এমনকি আধুনিক মানুষও বটে, এবং সর্বোপরি তিনি একজন ঐতিহাসিক। এই তাঁর গান :

১। শুনেন শুনেন সর্বজন শুনেন দিয়া মন
বের করেছি নতুন বই, বন্যার বিবরণ।

২। [বলে] তেরশ পঁচাশি সালে চোদ্দই ভাদ্রেতে
[বলে] দুর্ঘটনা ঘটে গেল মেদিনীপুর জেলাতে ॥

৩। ডিভিসি'র জল [ভাই] প্রবল বেগে আসে
ছাগমেষ আর গরুবাছুর আসছে ভেসে ভেসে।

৪। [ভাই] ভেসে আসে রুই কাতলা কতই পোষা মাছ
লিখিতে পারিনি আমি, পেটে নাই যে ভাত ॥

৫। গঙ্গা বাহির হ'ল বেগে [বলে], বলে গুরুজন
মা গঙ্গার খেলা যেমন, অসুর দলন।

৬। বন্যা দেখে সরকার থেকে সাহায্য দিতে এল
[তখন] ধনী গরিব সকলকে সাহায্য নিতে হল ॥

৭। আমাদের জীবনে [ভাই] বন্যা দেখি নাই
সেই কারণে ডিঙ্গি নৌকা কিছুই মোদের নাই।

৮। কলার মান্দাসে চড়ে রিলিফ আনতে হল
তার মধ্যে এক যুবতি প্রসব হইল ॥

৯। এসব দৃশ্য দেখে [ভাই] চোখে জল আসে
মানুষ কিংবা জিনিষপত্র আসছে ভেসে ভেসে।

১০। পোনা মাছের দাম মাত্র দুতিন টাকা হ'ল
মাছ খেয়ে কত লোক, পরলোকে গেল ॥

১১। সেই জন্য সরকার থেকে ডাক্তার পাঠাইল
[সেই] ভেক্সিন ইন্জেক্সন ডাক্তার বাড়ী বাড়ী দিল।

১২। কোথা ওগো মা কমলা জগত জননী
[বলে] ষাট কোটি জীবের মুখে আহার যোগাও তুমি ॥

১৩। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু দ্বিতীয় ভগবান
দয়া করে বাঁচাও মোদের ছেলেপুলের প্রাণ।

১৪। কোথায় ওগো প্রধান মন্ত্রী মুরারজী দেশাই
আপনার কাছে আমরা সবাই আপত্তি জানাই ॥

১৫। ঋণ দাও, সার দাও, দাও বীজ ধান
চাষকরে বাঁচাইব সকলের প্রাণ।

১৬। বার জেলায় বন্যা হল বলে গুরুজন
শত বৎসরের বুড়া বলে, দেখিনা কখন ॥

১৭। চিড়া দিল গুড় দিল দিল চাল গম
যদিনা পেতাম মোরা ছেড়ে যেত দম।

১৮। হোগলা দিল ত্রিপল দিল দিল জামাকাপড়
বাবুরা দেখে বলে গেল যেন লঙ্কা গড় ॥

১৯। হেলিকপ্‌টারে চেপে বাবুরা সাহায্য দিতে এল
কারও কোন দোষ নেই ভাই মা গঙ্গা মারিল।

২০। "সিড্" সংস্থা হল্যান্ড মেদিনীপুরে এল
ভ্যাক্‌সিন, ব্লিচিং পাউডার তারা ঘরে ঘরে দিল ॥

২১। গাড়ি নৌকা নিয়ে তারা লোকজন তুলিল
রামকৃষ্ণ মিশন এসে খিচুরি রান্না দিল।

২২। অন্নবস্ত্র সাহায্য করে ভারত সেবাশ্রম
'জেঠু' নাম প্রকাশিল বাবু নিরঞ্জন ॥

২৩। বিক্রম সেন, জয়নাল সাহেব সাহায্য দিয়ে গেল
মাদুর, সার বীজধান তারা ঘরে ঘরে দিল।

২৪। নৌকা নিয়ে একজন মাঝি মাছ ধরিতে গেল
নদীর মাঝে এক যুবতী দেখিতে পাইল।

২৫। সেই মেয়েটি বলে "আমি খেয়েছি তিনপাশ"
মাঝি বলে "হায় হায় একি হ'ল সর্বনাশ" ॥

২৬। "তিন পাশ খেয়ে এক পাশে করেছি বসতি।
আমায়ে ছুঁয়ো না বাবা করি যে মিনতি।

২৭। আমি সেই গঙ্গা" বলে বলিল মাঝিরে
মাঝি এসে সেই কথাটি দিল প্রকাশ করে ॥

২৮। এইখানেতে থেকে গেল আরও অনেক বাকী
আরও কিছু লিখব [বাবু] যদি বেঁচে থাকি ॥

২৯। এইখানেতে শেষ করিলাম কবিতার বন্দনা
নাম দুখুশ্যাম চিত্রকর নয়া হয় ঠিকানা।

'বন্যার বিবরণ' পট

দুখুশ্যাম চিত্রকর

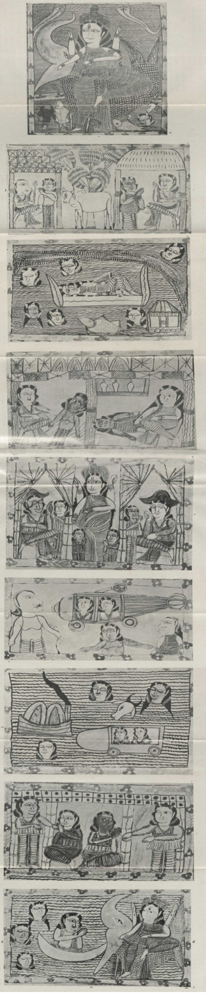

৩০। পিংলা আমার থানা বটে রাস্তা বহুদূর
সবং আমার হয় পরগণা, জেলা মেদিনীপুর ॥[১]

দুখুশ্যামের গানের দুটি বৈশিষ্ট্য আমাদের চকিতেই আকৃষ্ট করে : বিশদ বিবরণ চারপাশের পরিবেশ-পরিস্থিতি সম্পর্কে সমৃদ্ধ প্রতিবেদন এবং তাঁর অদ্ভুত বিন্যাস কৌশল। কিন্তু কেউ যদি দুখুশ্যামের গানে 'গবেষণামূলক বাস্তবতা' খুঁজতে চেষ্টা করেন, তাহলে তিনি এর প্রাসঙ্গিকতাটাই বুঝতে পারবেন না। আবার 'অন্যের' জ্ঞানতত্ত্বীয় রীতি-নিয়মকে অস্বীকার করার যে কর্তৃত্ববাদী কৌশল আছে, তার দ্বারাও প্রভাবিত হন অনেকে। অথচ কলকাতা থেকে প্রকাশিত ওই বন্যার সপ্তাহের খবরের কাগজ, কিংবা 'ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি'-তে প্রকাশিত রিপোর্টগুলো থেকে ঘটনা এবং বিষয় সংক্রান্ত এমন কিছু বাড়তি বিবরণ পাওয়া যায় না, যা দুখু-শ্যামের গানে নেই। বন্যারোধে ডিভিসি-র ব্যর্থতা এবং কোথাও কোথাও বন্যার কারণ হয়ে ওঠার ঘটনাগুলিই ছিল প্লাবনের প্রথম কয়েক সপ্তাহে প্রধান খবর। বন্যার ত্রাণ নিয়ে রাজনীতি, ত্রাণ সামগ্রীর অপ্রতুলতা এবং বন্যা নিয়ে কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাত ইত্যাদি বিষয়গুলো তখন চকিতে জাতীয় রাজনৈতিক স্তরে পৌঁছে গিয়েছিল।

ওই বিধ্বংসী দুর্যোগের অবস্থা নিয়ে দুখুশ্যামের যে প্রতিবেদন তা ভুক্তভোগী দর্শকের পক্ষেই সম্ভব। এবং সে প্রতিবেদনে প্রত্যক্ষদর্শীর অনুপুঙ্খ বর্ণন। দুখুশ্যাম আবার ডিভিসি-র ভূমিকার ব্যাপারেও রীতিমতো ওয়াকিবহাল। যদিও কেবল অব্যবহিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই তাঁর সেই জ্ঞান। যে সব ব্যক্তি বা সংগঠন ত্রাণের কাজ করেছেন তাঁদের ত্রাণ এবং ত্রাণের ধরন-ধারণ সব কিছুর প্রতিই তাঁর সতর্ক নজর। ত্রাণের রাজনীতিটাও লক্ষ করেছেন দুখুশ্যাম, যে রাজনীতির সঙ্গে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং অবশ্যই দেশের প্রধানমন্ত্রীও যুক্ত। যে দক্ষতায় দুখুশ্যাম তাঁর বর্ণনাকে বিশদ করেছেন তা মনে রাখার মতো। সাধারণভাবে কোনো বর্ণনাই এক লাইনের বেশি নয়, দু লাইনের বেশি কদাচ ব্যয় করেননি তিনি। এবং প্রত্যেকটি বর্ণনাকে পাশাপাশি সংস্থাপিত করে তা থেকে ক্রমান্বয়ে একটি গোটা চেহারা ফুটিয়ে তোলেন। এখানেই তাঁর কাজের ধরন সম্বন্ধে আমরা কিছুটা রহস্যের মধ্যে পড়ে যাই। বর্ণনার এই রীতি আমাদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে খাপ খায় না। পারম্পর্যগত যুক্তি মেনে কোনো কিছুকে সংগঠিত করতে না পারলে আমাদের মন ভরে না। আমরা দুখুশ্যামের গানে কিছু বিচ্ছিন্ন ঘোষণাত্মক বাক্যমালার ভিতরে ব্যাখ্যামূলক নীতির ব্যর্থ সন্ধান করি। একটা কাজের আসল বিচ্ছিন্নতা তার বিষয়ের মধ্যে নয়, আঙ্গিকে। তেমনি দুখুশ্যামের গানের বন্দনা অংশটুকু বুঝতে হলেও আমাদের বুঝতে হবে আঙ্গিক এবং দুখুশ্যামের স্টাইল।

১. বন্যার বিবরণ : দুখুশ্যাম চিত্রকর (গ্রাম : নয়া)।

একটা সম্পূর্ণ ছবিকে ফুটিয়ে তুলেছেন অগণিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বর্ণনায়। ধ্বংসের পৃথক পৃথক দৃশ্য, মানুষের দুর্দশা, ক্ষমতাবানের কাছে প্রার্থনা, দুর্দশা দূর করার বিভিন্ন ব্যবস্থা ইত্যাদি নানান টুকরো বর্ণনা মিলে মিশে তৈরি ওই গোটা ছবিটা। প্রত্যেকটি পৃথক বর্ণনা, একটার সঙ্গে পরেরটা জুড়ে দেওয়া হয়েছে সংযোগকারী অব্যয় কিংবা অন্তর্ভাবার্থক অব্যয়ের সাহায্যে। আবার কোথাও কোথাও সেটুকুও ব্যবহার করা হয়নি। বাচনিক আঙ্গিকে সরল উপস্থাপনার মাধ্যমে এমন একটা ছবি ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে যা চলমান। সবটা মিলে যেন বা একটা নাটকীয় উপস্থাপনা। বিবরণ শুনতে শুনতে শ্রোতার মধ্যে যেন ওই দুর্যোগের ভয়াবহতায় আটকে পড়ার একটা অনুভূতি হতে থাকে। এবং সেই অনুভবটাই যেন বার বার ফিরে ফিরে আসে, কারণ একটা ঘটনার উপর আর একটা ঘটনা এসে মিশে যেতে থাকে—ঘটনাগুলোকে পৃথক করাও প্রায় অসম্ভব। কোনও একটা বর্ণনার উপর কখনই স্বতন্ত্রভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। ফলে কোনো ঘটনাকেই প্রায় অন্যটির থেকে আলাদা করা যায় না। পৃথক পৃথক ঘটনাগুলো অতএব তাদের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে একটি সরল নিসর্গ দৃশ্য রচনা করে এবং তা দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। সেই নিসর্গ দৃশ্যে যেন ছোটখাট টুকরো রচনা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। কবিতাটি তাই কোনও নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যায় না। তবে ওই কবিতায় রয়েছে চারটি ভিন্ন ধরনের বিবৃতি। শুরুতেই পটুয়া তাঁর দর্শক-শ্রোতাকে সরাসরি সম্বোধন করেন। প্রথম লাইনেই শ্রোতাকে 'নতুন' শুনতে আহ্বান জানানোর পর ঘটনার দিনক্ষণ বলে দেওয়া হয়। শেষ চার পঙক্তিতে 'ভণিতা'—যেখানে পটুয়া তাঁর নিজের পরিচয় দেন। আবার একদিক থেকে কবিতার সবকটি পঙক্তিই ওই প্রথম পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত বলে ধরা যায়, কারণ সংযোগকারী অব্যয়ের মাধ্যমে তিনি বর্ণনাগুলোকে জুড়ে জুড়ে নিরন্তর শ্রোতার কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন। ঘটনাগুলি একটি আর একটির পিছনে প্রায় পরম্পরাহীনভাবে চলতে থাকলেও স্বতন্ত্র এবং পৃথক ওই ঘটনাগুলোকে জুড়ে দেওয়ার কাজ করছে ওই সংযোগকারী অব্যয় (গানে [ ] ব্র্যাকেটে চিহ্নিত করা রয়েছে)। গানের ধরনটাই এমন যে তা ঘটনার গতির সঙ্গে সঙ্গে এগোয় না। কোনও ঘটনারই ব্যাখ্যা নেই। যেন, সত্যি সত্যিই বন্যার কাহিনী শুরু 'ডিভিসি' দিয়েই। কিন্তু বন্যার বাস্তব কারণ হিসেবে তা কখনোই দেখানো হয়নি। দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে প্রচুর ঘোষণামূলক বাক্য, এমন কিছু বাক্যবন্ধ, যা অসম্বন্ধ বিচিত্রসব ঘটনার বিবরণ দেয়। বিবৃতির এই অংশে মূলত প্রকৃতি, ব্যক্তি পুরুষ অথবা নারী কিংবা কোনও গোষ্ঠীর কাজের বিবরণ। এই অংশটির আরও একটি ভাগ করা যায়, যেখানে কানে শোনা বিবৃতির প্রতিবেদন রয়েছে—সেগুলোর উপস্থাপনাও অবশ্য ঘটনার মতোই। এর সংখ্যা অবশ্য মাত্র তিনটি, দ্বিতীয় এবং তৃতীয়টি শুরু হয় এভাবে ঃ

> বার জেলায় বন্যা হল বলে গুরুজন
> শত বৎসরের বুড়া বলে "দেখিনা কখন" ।।

আমাদের বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী 'তথ্যগতভাবে' বিবৃতিগুলি 'সত্য'। সত্যিই পশ্চিমবঙ্গে দক্ষিণ অংশের ১২টি জেলা নজিরহীন বর্ষণে প্লাবিত হয়েছিল। পরিবেশ দফতরের রেকর্ড মোতাবেক বিগত একশ বছরে ওইরকম বর্ষণ হয়নি। কিন্তু অধিক গুরুত্বপূর্ণ হল তাঁর গানের অন্য একটি সংলাপ—তা থেকে দুখুশ্যামের গোটা কাজটার প্রকৃতি উপলব্ধি করার দিকনির্দেশ পাওয়া যায় ঃ

"গঙ্গা বাহির হল" [বলে] বলে গুরুজন
মা গঙ্গার খেলা যেমন অসুর দলন ॥

আবার 'উচ্চতর ক্ষমতাগুলোর' কাছে আবেদন করা হয়েছে পরপর কয়েকবার। এবং এটাকেই আমরা বলছি তৃতীয় ধরনের বিবৃতি। পয়লা আবেদন দেবী লক্ষ্মীর কাছে। দ্বিতীয় আবেদন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে, শিশুদের প্রাণ রক্ষার জন্য। তিনিই তো 'দ্বিতীয় দেবতা'। তৃতীয় এবং শেষ আবেদন 'এক নম্বর দেবতা' প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাইয়ের কাছে। কারণ তিনিই তো ঋণ এবং সারের ব্যবস্থা দুর্গতদের পুনর্বাসনের সংস্থান করবেন। এঁরা এমন তিন 'শক্তি', যাঁদের শক্তিশালী প্রভাব সাধারণ মানুষের ভাগ্যের ওপর এবং এঁরা কাজ করেন সরাসরি এবং সাধারণের নিয়ন্ত্রনের বাইরে। এই তিন 'শক্তির' কাছে সমানভাবে আবেদন করা হয়েছে যথোচিত আশীর্বাদ চেয়ে—লক্ষ্মীকে খাদ্য উৎপাদনশীলতার জন্য, জ্যোতিবসুর কাছে জরুরিভিত্তিক সহায়তার জন্য এবং মোরারজি দেশাইকে দীর্ঘমেয়াদি পুনর্বাসনের জন্য। দুখুশ্যাম বেশ স্পষ্ট করেই জানেন কার কাছ থেকে কী পাওয়া যাবে।

চতুর্থ পর্বের বিবৃতির একটিই মাত্র নমুনা রয়েছে, কিন্তু গোটা কবিতাটি উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে তা "মডেল" হতে পারে। কবিতার একেবারে গোড়ায়, বানের জল ঢুকে পড়ার বর্ণনা শেষ করে যখন আমরা শুনি···

"গঙ্গা বাহির হ'ল" [বলে] বলে গুরুজন"

এটা বলা হয়েছে এমনভাবে যেন এ সবই মা গঙ্গার 'খেলা'। এর পরে আরও কয়েকটি পঙক্তি রয়েছে যাকে চতুর্থ পর্যায়ের একমাত্র নমুনা হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ

নৌকা নিয়ে একজন মাঝি মাছ ধরিতে গেল
নদীর মাঝে এক যুবতী দেখিতে পাইল।
সেই মেয়েটি বলে "আমি খেয়েছি তিনপাশ"
মাঝি বলে "হায় হায় একি হল সর্বনাশ" ॥
"তিন পাশ খেয়ে এক পাশে করেছি বসতি
আমারে ছুঁয়ো না বাবা, করি যে মিনতি।
আমি সেই গঙ্গা" বলে বলিল মাঝিরে
মাঝি এসে সেই কথাটি দিল প্রকাশ করে ॥

এই একমাত্র জায়গা যেখানে বন্যার চূড়ান্ত একটা কারণ হাজির করা হয়েছে। মা গঙ্গা

'গ্রাস' করেছেন তিন দিক। বন্যা হয়েছে তাঁরই ইচ্ছেয়। কারণ তিনি চান অন্য তিন দিকের মানুষ গিয়ে ওই একটা দিকে বসবাস করুক। আরও একটি কারণেরও ইঙ্গিত রয়েছে, তা হল মা গঙ্গার 'খেলা'। এই কারণগুলো যদি একবার বিশ্বাস করে নেওয়া যায় তাহলে অন্য কোনও কারণ খোঁজার আর প্রয়োজন থাকে না। অন্তত দুখুশ্যাম এবং শ্রোতা-দর্শকের কাছে অন্য কোনও কারণের অস্তিত্ব থাকারই প্রয়োজন নেই। কিন্তু এই পঙক্তি কটির বৈশিষ্ট্য হল এখানে 'প্রকাশ'-এর কথা বলা হয়েছে। একে ব্যাখ্যা না করা গেলেও কবিতার অন্য ঘটনাগুলো এই অংশটুকু দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। বহু দুর্যোগের পর মা গঙ্গা নিজেকে প্রকাশ করেছেন।

দুখুশ্যাম খুব যত্ন করে অনুপুঙ্খ বর্ণনা করেছেন নির্দিষ্ট কিছু ঘটনার। দুখুশ্যামের বর্ণিত ঘটনার মধ্যে যদি আমরা 'প্রামাণিকতা' খুঁজতে যাই তাহলে আমাদের সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য সূত্রের বর্ণনার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে। দুখুশ্যামের 'কীভাবে'-র মধ্যে সত্যিই কোনও রহস্য নেই। আর 'কেন' হল তার ব্যাখ্যার উপকরণ, এবং তা আমাদের খুবই একটা অচেনাও নয়, যদিও হয়ত আমাদের কাছে তা গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। আবার দুখুশ্যামের গানের নান্দনিক বিন্যাসকে নিয়ন্ত্রণ করে এই 'কেন'।

দুখুশ্যাম অতএব ঘটনাগুলির ভাষ্য দেওয়ার একটা প্রকরণ নির্মাণ করেন। হেরোদোতাস থেকে টয়েনবি পর্যন্ত তাবৎ ঐতিহাসিকরা কি এটাই আরও ভালভাবে করতে চেয়েছিলেন? তথ্যের পৃথক পৃথক উপাদানগুলো আর ছড়ানো ছেটানো নয়, তা আর বিচ্ছিন্নও নয় বরং তার একটা স্বীকৃতিযোগ্য সাংস্কৃতিক আঙ্গিকও রয়েছে।

'প্রকাশ'-এর জন্য যে সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতি, তা দুখুশ্যামের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিবর্তন এবং সুনির্দিষ্টতা এই প্রকরণের পক্ষে জরুরি। এ কোনও অনির্দিষ্ট 'প্রকাশ'-এর বিবরণ নয়। এ ঘটনা ১৩৮৫ সনের এবং এর ভাষ্যকার দুখুশ্যাম চিত্রকর, সাকিন গ্রাম নয়া। এখানেই বেশ একটা মজার প্রশ্ন উঠে আসে : তমলুকের জনসাধারণের মধ্যে এই যে 'গঙ্গার' ধারণা, তা কি এই রকম ধারাবাহিক প্রকাশে'রই সংকলন মাত্র? তাহলে কি ইতিহাসই সেই মাধ্যম যেখানে দেব দেবীদের ঠাঁই? দুখুশ্যামের মতো একজন পেশাদার বুদ্ধিজীবী এবং সাংস্কৃতিক বিশেষজ্ঞের কাছে 'গঙ্গা' কী অর্থ বহন করে? এই শব্দটি কি কেবল যুগবাহিত সাংস্কৃতিক শৃঙ্খলারই ইঙ্গিত দেয়?

দুখুশ্যাম তাঁর কাজকে বলেন 'বই'। এবং তাঁর কাজের ওপর একটা মালিকানার স্বত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যই তিনি এটা করেন। কিন্তু এই দুটি কাজের মধ্য দিয়ে 'লোককৃষ্টি' বিষয়ে দুটি অতি প্রচলিত বিশ্বাস ধ্বংস করে দেন। বিশ্বাস দুটি হল : 'লোককৃষ্টি' গোষ্ঠীগত এবং মৌখিক। এই দাবির সত্যতা বিচার করা খুবই কঠিন। একই বিষয় নিয়ে অন্য পটুয়াদের জড়ানো পট এবং আনুষঙ্গিক গান আরও পাওয়ায়। সেগুলোর মধ্যে ফারাক নাম মাত্রই। পটুয়া সম্প্রদায়ের নিজেদের মধ্যে, একজনের ছবি বা গানের অংশে অন্যজন হামেশা ব্যবহার করে বিশেষত জনপ্রিয় বিষয়গুলোতে। নিজেদের মধ্যে এ ব্যাপারে বোঝাপড়া রয়েছে। একজন পটুয়ার গান বা কবিতার যে সংগ্রহ তার সঙ্গে

অন্যদের সংগ্রহের খুব ফারাক থাকে না। কখনও কেউ হয়ত অন্যের চেয়ে একটু ভাল গান বাঁধে কিংবা ভাল ছবি আঁকে।

১৯৭৮-এর বন্যার মতো কিছু কিছু নজিরহীন ঘটনা নিয়ে লেখা কবিতার বই বেরোয়। বইগুলো স্থানীয় প্রেসে ছাপা সস্তার বই। গাঁ গঞ্জের মেলায় হাটে বিক্রি হয়। এমনও নয় যে ওই কবিতাগুলো সবসময় পটুয়ারাই লিখছেন। তবে এমন কোনও বই আমি খুঁজে পাইনি যেখানে দুখুশ্যামের গান আছে। কিংবা তাঁর অনুকরণও তেমন চোখে পড়েনি। অবশ্য দুখুশ্যামের কবিতাগুলোও আয়তনে ছোট। তা দিয়ে এক ফর্মার (১৬ পৃষ্ঠা) একটা বই করাও সম্ভব নয়। বই কথাটা অবশ্য এখানে নানা অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। গ্রাম শহর নির্বিশেষে সিনেমার দর্শককুল কাহিনীচিত্রকে 'বই' বলে উল্লেখ করেন। এক সময় নিশ্চয়ই বহু সিনেমাই হত উপন্যাস অনুসারী এবং সে উপন্যাস বই হিসেবেও পাওয়া যেত। কিন্তু এখন আর ওই মুদ্রিত গল্প, উপন্যাসের সঙ্গে চলচ্চিত্রের প্রায়শই কোনও যোগাযোগ নেই। দুখুশ্যামের 'বই'-এর অবশ্য এরকম বহুবিধ ব্যবহার নেই।

দুখুশ্যামের কাজের মাধ্যম হতে পারে মৌখিক বা লিখিত, মুদ্রিত বা পাণ্ডুলিপি আকারে, কিংবা ছবি অথবা গান। প্রকরণ যাই হোক না কেন তা অবশ্যই একটি আলোচনার অংশ। 'উৎপত্তি' অলীকত্বের ওপর জোর না দিয়ে বরং কোনও কাজের বিষয়ই বিবেচ্য হওয়া উচিত। দুখুশ্যামের ক্ষেত্রে এই কাজ হল : গান এবং পালা।

যাঁরা 'নিচের তলার' তাঁরা সব সময় 'চুপ' থাকেন না। দুখুশ্যামের কথোপকথনের শ্রোতৃবৃন্দের যে সচেতনতা, তা কিন্তু কলকাতার দৈনিক সংবাদপত্রগুলোর পাঠকদের চেয়ে মোটে বেশি নয়। এটাও স্পষ্ট করে জেনে রাখা দরকার যে তিনি এই সত্যটির ব্যাপারে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। কিন্তু এটাকে তিনি অন্ধ ভক্তির পর্যায়ে নিয়ে যেতে চান না। তাঁর উদ্দেশ্য ঘটনাবলীর একটা "মানে" করা।

গান এবং জড়ানো পট নিয়ে দুখুশ্যামের কাজের গোটা সংগ্রহটাকে ভাগভাগ করতে গেলে তা হবে নিছকই একটা বহিরঙ্গের ভাগাভাগি। দুখুশ্যাম নিশ্চয়ই তা ওভাবে করবেন না। উল্টে, মহাভারতের গল্প থেকে বন্যা পর্যন্ত তার যাবতীয় কাজ যেন একটানা একটি কথোপকথন। প্রত্যেকটি পট এবং গানের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল, তা একটি ঘটনা বা নাটকীয় পরিস্থিতি-নির্ভর। এবং একটি 'প্রকাশ'-এর বিষয়গত ভিত্তিও বটে। আবার এই ভাগাভাগি কেবলমাত্র কোনও সূত্র এবং 'যুগ'-কে চিহ্নিত করে না। দুখুশ্যামের গানগুলোর এক ধরনের সূত্র হল দুটি মহাকাব্যের ঘটনা। যেমন : তাড়কা বধ, সেতুবন্ধন, রাবন বধ, দাতা কর্ণ। দ্বিতীয় সূত্রটি হল পুরাণ। যেমন : সতী-সাবিত্রীর গল্প, এবং রাজা হরিশচন্দ্র। বৈষ্ণবীয় গানগুলিকে আবার দুভাগে ভাগ করা যায় : রাধা-কৃষ্ণের বিভিন্ন লীলা এবং শ্রীচৈতন্যের জীবনের নানান উপাখ্যান। এই ধরনের আখ্যানের উপাদান যেমন রয়েছে মঙ্গলকাব্যে, তেমনি রয়েছে দেবী চণ্ডী এবং মনসাকে নিয়ে রচিত জড়ানো পট এবং গানেও। যেমন : চণ্ডীমঙ্গল,

মনসার ভাসান, শ্রীমন্ত-মশান, বেহুলা লক্ষীন্দর পালায়। গাজি এবং সত্যপীরদের নিয়ে অন্য আর এক ধরনের গান এবং জড়ানো পটও পাওয়া যায়। (আমাদের মনে রাখতে হবে হিন্দু এবং মুসলমান ধর্মের মিশ্রণে একটি 'ব্যতিক্রমী' ধর্ম পালন করেন পটুয়ারা)।

দুটি গুরুত্বপূর্ণ আখ্যান-বৃত্তের অনুপস্থিতি দুখুশ্যামের গানগুলিতে। সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগ থেকে রচিত মঙ্গলকাব্যের যে পাণ্ডুলিপি দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের বদ্বীপ অঞ্চলে পাওয়া যায় তা শীতলা দেবীকে নিয়ে। এবং সেগুলি অতি জনপ্রিয় কাব্য-আখ্যান। অন্যদিকে তমলুক সংলগ্ন খুব সীমিত একটি ভৌগলিক এলাকায় অষ্টাদশ শতকের মধ্যবর্তী পর্বে রচিত হয়েছিল শীতলা দেবীর আখ্যান। টানা তিন দশক ধরে নয় জন কবি শীতলামঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন। দেবী শীতলা বসন্ত রোগের সঙ্গে সম্পর্কিত। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগের দশকগুলিতে বসন্ত রোগের মহামারীর সঙ্গে ওই সাহিত্য সৃষ্টির কোনও সম্পর্ক নিশ্চয়ই রয়েছে। আজও তমলুক অঞ্চলের বহু গ্রামে শীতলা পূজিত হয় 'গ্রামের মা' হিসেবে।

শীতলা যদি হন মহামারী এবং দুর্যোগের ধর্মীয় প্রতিক্রিয়া, তাহলে অন্নদা বা দেবী দুর্গার উদ্ভাবনাও একই রকমভাবে দুর্ভিক্ষের কারণে। 'খাদ্য-দাতা' দেবী অন্নদাকে নিয়ে আখ্যান অন্নদামঙ্গলও রচিত হয় অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে। দুর্ভিক্ষের পিছন পিছন আসে মহামারী। বঙ্গদেশের পশ্চিম অঞ্চলে বর্গি হানার পর থেকে, ১৭৪২ এবং তার পরবর্তী সময়ে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ এবং মহামারী দেখা দেয়। বারাণসীতে অন্নদার পুজো হয় সব সময়েই শিবের স্ত্রী হিসেবে। কিন্তু ১৭৫২-৫৩ সালে ভারতচন্দ্র রায় অন্নদামঙ্গল রচনা করে দেবী অন্নদাকে সমকালীন বাঙালি হিন্দুর মনে একটি স্বতন্ত্র আসনে প্রতিষ্ঠা করেন।

কিন্তু আপাতত ঐতিহাসিক সত্যটা এই যে, মনসা এবং চণ্ডীকে নিয়ে প্রচুর জড়ানো পট এবং গান রচিত হলেও, দুখুশ্যাম বা অন্য পটুয়ারা শীতলাদেবী এবং দেবী অন্নদাকে নিয়ে একটিও গান রচনা করেননি। অথচ দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গদেশে শীতলা এবং অন্নদা জনপ্রিয় হয়েছিলেন অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে। (আর পাণ্ডুলিপির সূত্রে জানা যায় যে, চণ্ডী এবং মনসার জনপ্রিয়তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার বহু আগেই।) শীতলা ও অন্নদার এই অনুপস্থিতি খুবই অদ্ভুত, কিন্তু এর গ্রহণযোগ্য কোনও ব্যাখ্যাও নেই। এমন হতে পারে, অন্নদাকে কখনোই দুর্গা এবং গৌরীর থেকে পৃথক করে দেখা হত না। এবং স্থানীয় ভূস্বামীশ্রেণী শরৎকালে খুব জাঁক করে দুর্গাপুজো করতো। এমনও হতে পারে, ভূস্বামী এলিটদের বাইরে অন্নদার তেমন পরিচিতি ছিল না। অন্য দিকে, বসন্তকালে প্রত্যেক গ্রামেই শীতলাকে নিয়ে গান গাওয়া হত, তা রীতিমতো জনপ্রিয় ছিল। ফলে হয়ত, শীতলার আখ্যান উপস্থাপনার জন্য সেটাকেই একমাত্র সাংস্কৃতিক মাধ্যম বলে গ্রহণ করেছিল মানুষ। দুটি ব্যাখ্যার কোনটাই সম্পূর্ণভাবে সন্তোষজনক নয়।

আর আছে সত্যপীরের পট। সত্যপীর হল হিন্দুদের প্রধান দেবতা নারায়ণ আর মুসলমান পীরের মিশ্রিত রূপ। সত্যপীরের গানে সন্তানহীন রাজা সিন্ধুর কাহিনী বর্ণনা করা হয়। সত্যপীরের আশীর্বাদে রাজা পুত্রের পিতা হন, কিন্তু তারপরেই রাজা ভুলে যান পীরকে। পরে রাজার বিপর্যয়ের মুহূর্তে ফের তিনি সত্যপীরকে স্মরণ করেন এবং বিপর্যয় থেকে উদ্ধার পান। কিন্তু এই গল্পে আর একটা বাঁক আছে। রাজার গল্প থেকে পটকথা লাফ দিয়ে পেঁছে যায় জনৈক সনাতন মণ্ডলের দুর্ভাগ্যের কাহিনীতে। কৃপণ এই লোকটি, রাজার মতোই, দেবতার কাছে দেওয়া তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করেননি। পটের চিত্রণে আমরা দেখতে পাই বাঘ তাঁকে ওপর থেকে আক্রমণ করছে আর একটা কুমীর তেড়ে আসছে নিচ থেকে। একজন সেখানে হাজির হয়ে তাঁর দুর্ভাগ্যের জন্য সমবেদনা জানাতে থাকেন—এখানেই সনাতন মণ্ডলের গল্প শেষ। অভাগা এই লোকটিকে সত্যপীরের পটে এনেছেন দুখুশ্যাম। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চলে দলত্যাগী মানুষের এই পরিণতি খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। এবং সেই স্মৃতিই সম্ভবত এখানে কাজ করেছে। তবে রাজা সিন্ধু থেকে লাফ দিয়ে সনাতন মণ্ডলে পেঁছে যাওয়াটা আমাদের কাছে কাঙ্ক্ষিত ছিল না। গল্পের এই চমকপ্রদ উল্লম্ফন আসলে অতীত থেকে বর্তমানে 'নেমে' আসা। সিন্ধু রাজার বিপর্যয়-মুক্ত হয়ে 'ঘরে' ফেরার পাশে সনাতন মণ্ডলের কাহিনী একটা আধুনিক উদাহরণ। এখানে সনাতন আধুনিক মানুষ। চিরকালের মতোই তিনি উপকার নিয়ে দাতাকে বিস্মৃত হন। কিন্তু এযুগে দেবতা আর ফিরে কৃপা করেন না। এখানে লক্ষ করার বিষয়টা হল এই যে, সত্যপীরের পটের এই চিত্রটির বিপরীত প্রতিবিম্ব পড়েছে যেন বন্যার পটে। বানপটে সময় 'ঊর্ধ্বমুখী'—দুখুশ্যাম সেখানে গঙ্গাদেবীর সঙ্গে কথোপকথনরত এক মাঝিকে হাজির করেন।

সম্পূর্ণ ভিন্ন মেজাজের কিছু ব্যক্তি এবং ঘটনা নিয়ে তৈরি আর এক ধরনের কিছু জড়ানো পট রয়েছে দুখুশ্যামের ঝুলিতে। শেষ পর্যায়ের এইসব পটে আছে 'মনোহর ফাসুড়ে' বা 'ট্যাক্সির মধ্যে খুন'-এর মতো রোমহর্ষক গল্প। এবং গল্প শেষ হয় এক দিব্য 'প্রকাশ'-এর মধ্যে দিয়ে, আবার কখনও কথোপকথনে। 'প্রকাশ'-এর এই রূপটিকে আমরা সহজেই 'ঐতিহাসিক' বলে চিহ্নিত করতে পারি। দুখুশ্যামের যে পটগুলি লণ্ডনে 'আর্ট অব বেঙ্গল' একজিবিশন-এ প্রদর্শিত (হোয়াইটচ্যাপেল আর্ট গ্যালারি, ১৯৭৯) হয়েছিল, সেগুলি সবই এই পর্যায়ভুক্ত। (যেমন : চুয়াড় বিদ্রোহের শহিদদের নিয়ে তৈরি 'সাহেব পট'।) এই পর্যায়ে 'দুর্ভিক্ষের কাহিনী', 'কাকদ্বীপের ফেরি বিপর্যয়' এবং 'স্বাধীনতা ১৯৪৭'-এর মতো কিছু পট রয়েছে। বস্তুত শিরোনামগুলো বিবেচনা করলে 'বানপট'-কে নিশ্চিতভাবেই এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। কিন্তু একটা বিষয় আমাদের বোঝা দরকার যে দুখুশ্যামের 'গানে' রামায়ণ থেকে ১৯৭৮ সালে বন্যা পর্যন্ত সবই পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। যেন একটিই অবিচ্ছিন্ন কথোপকথন। একটি অন্যটিকে ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে, আবার প্রত্যেকটি 'পালা' যেন সমগ্র কাজের

ভেতর থেকে একটা অবলম্বন পায়। অর্থময় এই প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়েই যেন বা কিছু একটার 'প্রকাশ' ঘটে।

দুখুশ্যামের এই বিষয় ও প্রতিক্রিয়াগুলির সম্মিলিত ঐতিহাসিক একীকরণ আমরা বাংলার 'জনপ্রিয়' সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রে দেখতে পাই। যেমন: তমলুক অঞ্চলে বসন্তকালে সবচেয়ে বড় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শীতলা দেবীর মঙ্গলকাব্যের আখ্যান নিয়ে পালা। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, দেবী হিসেবে শীতলার জনপ্রিয়তা অষ্টাদশ শতকে—সে সময় দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গদেশে কালান্তক বসন্ত রোগের মহামারী ছড়িয়ে পড়েছিল। তমলুক অঞ্চলের বেশিরভাগ গ্রামে আজও শীতলা কেন্দ্রিয় দেবী—গ্রামের 'মা'। শীতলার মন্দির ঘিরেই আবর্তিত গ্রামের ধর্মীয় জীবন। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ বহিঃশত্রুর হানা, অভ্যন্তরীণ বিপর্যয়, দুর্ভিক্ষ এবং মহামারীর মতো প্রবল দুর্যোগের মধ্যে মঙ্গলকাব্যে শীতলার আখ্যান এসেছে। যদিও ষোড়শ শতকেই শীতলা বাঙালি হিন্দুর বাৎসরিক পার্বণের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে, কিন্তু তারও অনেক পরে ১৬৯০ সালে শীতলার প্রাধান্য বর্ণনা করে কাব্য রচিত হয়েছে বাংলায়। সে কবির নাম কৃষ্ণরামদাস। কলকাতার উত্তরে অল্প দূরেই একটি গ্রামে ছিল তাঁর বাস। এবং ওই বছরই সেই গ্রামে ইংরেজ 'কোম্পানি' তার বাণিজ্য শুরু করে। বস্তুত, এই ঘটনাগুলো অসম্পৃক্ত নয়। যতদূর মনে হয়, ওই এলাকার বসতি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বসন্ত রোগের মহামারীও চলছিল। শীতলাকে নিয়ে পরবর্তী কাব্যগুলি রচিত হয় ১৭৪৫/৫০ থেকে ১৭৭০ সালের মধ্যে। এই সময়ের মধ্যে অন্তত নয় জন কবি শীতলাকে নিয়ে আখ্যান রচনা করেন। এবং এই কবিদের কলকাতা থেকে তমলুকের মধ্যে তাঁদের বসবাস। ১৭৪২ থেকে ১৭৬২ সালের মধ্যে বর্গিরা একাধিক বার হানা দিয়েছে, লুটতরাজ চালিয়েছে বাংলায়। ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে জিতে ইংরেজ গোটা অঞ্চলের দখল নিয়ে নেয় এবং রাজস্ব আদায়ের জন্য জোর-জুলুম শুরু করে। ১৭৬৯ সালে শুরু হয় খরা, তার পিছনে পিছনে হাজির হয় দুর্ভিক্ষ এবং তারই পরিণতিতে ১৭৭০ সালে বসন্ত রোগের মহামারীতে ছেয়ে যায় দেশ। এর ফলে গোটা পূর্বভারতে দশ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি ঘটেছিল। ঘটনা, আখ্যান বা ইতিহাসের কোনও যান্ত্রিক যোগাযোগে নয়, এতদঞ্চলের গ্রামে গ্রামে শীতলা পুজোর ভিত্তি নিশ্চিত-ভাবেই বিগত দুই শতাব্দীর অভিজ্ঞতার স্মৃতির ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে।

তমলুকের গ্রামগুলোতে শীতলা অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই প্রধান দেবী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। শীতলাকে নিয়ে যে যাত্রা পালা হয়ে থাকে তাও অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে রচিত আখ্যাননির্ভর। মৎস্যদেশের রাজা বিরাট কীভাবে শীতলার পুজারী হয়ে উঠলেন তার গল্প। শীতলা মৎস্যদেশ এবং তার রাজপরিবারকে বসন্ত রোগ দিয়ে আক্রমণ করেন। রোগের প্রকোপে গোটা দেশ উজাড় হয়ে যায়। শেষে বিরাট রাজা শীতলা দেবীর কাছে নতি স্বীকার করে তাঁর পুজো প্রবর্তন করেন। শীতলা পালার যাত্রা চলতে চলতেই এক সময় রাজা এবং শীতলাকে মঞ্চে রেখে রানি এবং রাজবধূরা

দর্শকদের মধ্যে নেমে পড়ে দর্শকদের কাছে চাল আর টাকা পয়সা "মাগ"তে শীতলা পুজোর জন্য। এই পালায় রাজার বাড়ির মেয়েরা শীতলা পুজো করে আজকালকার শীতলা পুজোর ধাঁচে—ভিক্ষা করে যে পুজো করার নিয়ম। শীতলার এই 'প্রকাশ'-এর ক্ষেত্রে বিরাট রাজার গল্প এবং আজকের গ্রামবাসীদের প্রতিক্রিয়া একাকার হয়ে যায়। পুনরাবৃত্তির মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে ইতিহাস।

কিন্তু পুনরাবৃত্তির কী প্রয়োজন ইতিহাসে? ইতিহাসের আলোচনা থেকে কি মানুষ নতুন জ্ঞান অথবা সৌন্দর্য আশা করে? দুখুশ্যামের চিত্রণ, আবৃত্তি, বর্ণনা এবং তার সামগ্রিক প্রতিক্রিয়া নিয়ে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের যে টুকরো গড়ে ওঠে তা দুখুশ্যামকে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকে চারপাশে। আমরা যখন দেখি দর্শকের সামনে দুখুশ্যাম তাঁর জড়ানো পট দেখিয়ে গান গাইছেন তখন আমরা আসলে সম্মিলিত জ্ঞানের উন্মেষ ও বিস্তার প্রক্রিয়ার সাক্ষী হয়ে যাই। একারণেই দুখুশ্যামের কাজে এত বৈচিত্র্য এসেছে এবং খানিকটা এজন্যই তাঁর কাজ যৌক্তিকতা অর্জন করেছে। প্রতিটি আখ্যানের সঙ্গে মিলে যায় বহু সাংস্কৃতিক ধারার নানা অনুষঙ্গ। এবং একজন পটুয়ার পক্ষেও শুদ্ধ কোনো তথ্য পরিবেশন করা সম্ভব নয়। আবার পটুয়াদের গান শ্রোতারা শোনে নির্বিকার উদসীনতায়।

তবে এই পট দেখা / শোনার মধ্য দিয়ে দুটি প্রয়োজন সিদ্ধ হয় স্পষ্টতই : প্রথমত, কীভাবে কী ঘটছে তা ব্যাখ্যা করে, যেমন বানপটে। আর দ্বিতীয়ত, এতে আত্ম-সচেতনতা এবং ইতিহাসের নতুন জ্ঞানের সম্মিলিত উন্মেষ ঘটায়। তা ছাড়া এই বানপটে এমন কতগুলো সত্য ঘটনা সন্নিবিষ্ট হয়েছে যা পরিবর্তনের জ্ঞানকে চিহ্নিত করে। □

এই প্রবন্ধটি আমার অপ্রকাশিত ইংরাজি নিবন্ধ "The Scroll of the Flood" (1986) 'র ওপর ভিত্তি করে রচিত।

এই প্রবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে প্রয়াত বন্ধু ডঃ তারাশিস ভট্টাচার্য (তমলুক) এর কাছে আমার ঋণ অশেষ। প্রবন্ধের তথ্য ও প্রসঙ্গ নির্দেশের জন্য নিম্নলিখিত আকরের উপরে আমি প্রধানত নির্ভরশীল :—

1. W. W. Hunter : *A Statistical Account of Bengal*. Vol. 3, (London 1876).
2. R. W. Nicholas : "The Village Mother in Bengal", in J. J. Preston (ed) *Mother Worship*, (Chapel Hill, North Caroline, 1982).
3. ——— : "The Golden Sitala and Epidemic Smallpox in Bengal", *Journal of Asian Studies*, *41 : 1* November 1981

4. R. W. Nicholas & A. N. Sarkar : "The Fever Demon and the Census Commissioner : Sitala Mythology in 18th and 19th century Bengal," in Bengal *Studies in Literature Society and History,* (ed) M. Dairs (East Leansing michigan, 1976).

5. L. S.S. O'malley : *Bengal District Gazetteers : Medinipur* (Calcutta, 1911).

6. R. Skelton & M. Francis (Ed) : *Arts of Bengal : the Heritage of Bangladesh and Eastern India* (London, 1979).

7. সমসাময়িক সংবাদপত্রের সমাহার : *The Statesman,* আনন্দবাজার পত্রিকা, যুগান্তর

8. "Man Made Calamity", Economic and Political Weekly, Bombay, 14 October 1978.
"Some Self Help Too"—ঐ— ।
"DVC and Flood Control" —ঐ—, 11 November 1978.

অনুবাদ : মিলন দত্ত

কথকতার নানা কথা

গৌতম ভদ্র

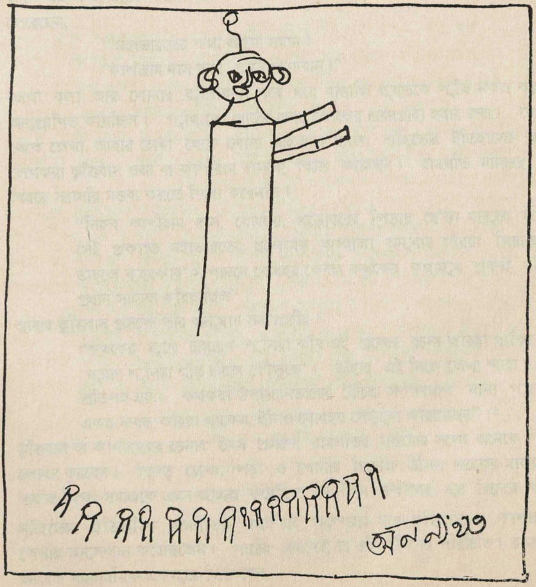

□ পর্ব / ১ □

ক. পাঠের জগৎ ঃ

ছোট্ট ছেলে বাবাই। নতুন পিসেমশায়ের উপর তার রাগের অন্ত নেই। পিসেমশায়ের জন্যই তো আদরের 'তি' অন্য বাড়িতে চলে এসেছে। আবার পিসেমশায়টা খুব জ্বালাতনেরও বটে। পিসির কাছে বেড়াতে এসে একদিন তাই রাগের মাথায় সে বলে বসে "সারাদিন পিসেমশায় শুয়ে থাকে, কিচ্ছু করে না। শুধু শুয়ে বই পড়ে। বইও বা পড়ে কোথায় ? তাও পড়ে না। বই খুলে পাতার দিকে চুপ করে চেয়ে থাকে।" বাবাইয়ের চোখে, পড়াটাও শোনার জিনিস, আওয়াজ করে বলার কথা। তাকে তো সেভাবে সকলকে শুনিয়ে পড়তে হয়। 'পড়া-শোনা' কথাটা তো আর ফ্যালনা নয়।
বাবাই এই কথা জানে আর জানতেন কাশীরাম দাস। কত স্বচ্ছন্দে না তিনি লিখতে পেরেছেন,

> "মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
> কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান।"

লেখা বলা আর শোনার যুগলবন্দী ঘরে ঘরে বাঙালি গৃহস্থকে পুথি নকল করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। পুথি তো পাঠের জন্য, লোকের শ্রবণগ্রাহ্য হবার জন্য। শোনা থেকে লেখা, আবার লেখা থেকে শোনা এই ছকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের আদি লেখকরা কৃত্তিবাস ওঝা বা কাশীরাম দাসকে বিচার করেছেন। রামগতি ন্যায়রত্ন এই বিষয়ে সরাসরি মন্তব্য করতে দ্বিধা করেননি।

> "নিঃস্ব কাশীরাম দাস, বোধহয়, খড়োঘরের পিড়ায় ছেঁড়া মাদুরে বসিয়া সেই প্রকাণ্ড মহাভারতের ছন্দোবদ্ধ বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। তাহলে বৃহৎকার্য সম্পাদনে বোধহয় কেবল কথকের কথামুখ শ্রবণই তাঁহার প্রধান সাহায্য করিয়াছিল"।

আবার কৃত্তিবাস প্রসঙ্গে তাঁর অনুমান সমগোত্রীয়।

> "কথকের মুখে রামায়ণ শুনিয়া কবি এই গ্রন্থের রচনা করিয়া থাকিবেন। 'পুরাণ শুনিয়া গীত রচিল কৌতুকে'। তাঁহার এই নিজে লেখা দ্বারা তাহাই প্রতিপন্ন হয়। কথকরা উপাখ্যানভাগের বৈচিত্র্য সম্পাদনার্থ নানা পুরাণের একত্র সম্বদ্ধ করিয়া থাকেন, ইনিও বোধহয় সেইরূপ করিয়াছেন"।[১]

কৃত্তিবাস বা কাশীরামের রচনার উৎস প্রসঙ্গে রামগতির মন্তব্যের সঙ্গে অনেকে দ্বিমত পোষণ করবেন। কিন্তু লেখা, পড়া ও শোনার মিশেল উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বিদ্বৎ সমাজকে এমন আচ্ছন্ন করেছিল যে উৎস সন্ধানের সূত্র বিচারে বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক রামগতিও কথকতার পরম্পরার মধ্যে কৃত্তিবাস ও কাশীরামের লেখার অনুসন্ধান করেছিলেন। পাঠের জগতেই যে এই কবিদের পরিচিতি। রামগতির আরেক সমসাময়িক একসুরে লিখেছেন,

"এই গ্রন্থদ্বয় সাধারণের আদরের ধন, অদ্যাপিও ইহা গৃহস্থের গৃহে এবং বণিকের বিপণে বিপণে এবং কখন কখন পল্লীগ্রামের বৃদ্ধ মণ্ডলী মধ্যে পঠিত হইয়া থাকে।"[২]

পুঁথি লেখা হচ্ছে, অনুলিপি তৈরি করা হচ্ছে পাঠের জন্য। পুষ্পিকায় এর প্রমাণ আকছার পাওয়া যায়। যেমন,

"এত দূরে দাতাকর্ণের পালা হইল, জেবা শুনে জেবা গায় যে জন গায়ায় ॥
তাহার কামনা পূর্ণ কবিচন্দ্রে গায়।
হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায় ॥"
ইতি দাতাকর্ণ পালা সমাপ্ত। পাঠক শ্রী শ্রীমন্ত নাগ। সাং সালিখা। লিখিতং শ্রী বারাণসি ঘোষ, সাং খাত ঘোষ। সন ১২৪৩ তারিখ ২৮শে ফাল্গুন।"[৩]

১৮৩৬ সালের এই পুঁথি কোনো দলছুট নজির নয়। গজেন্দ্রমোক্ষণ, গুরুদক্ষিণা, ইত্যাদি পালা লেখা হচ্ছে পড়ার জন্য, কোনো না কোনো পাঠকের ফরমায়েস মাফিক। পুঁথিও জমাটি হওয়া চাই কারণ পাঠক জবরদস্ত। 'যেমন পাঠক তেমনি গ্রন্থ মাহাত্ম্য।' পুঁথি পড়া, পুঁথি শোনা ও পুঁথি লেখা সংস্কৃতির তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে জড়িয়ে পড়েছে।[৪] আবার পুঁথি যেমন তেমন করে পড়লে চলবে না। পুঁথি পড়াটা শিল্প, সবাই শুনবে কারণ "অন্তঃকরণে ততই নানা রসের উচ্ছ্বাস হইবে, কখন হাসিবেন, কখন কাঁদিবেন, কখন চমৎকৃত হইবেন, কখন ভক্তিস্রোতে ভাসিয়া যাইবেন।"[৫]
গ্রন্থ বিশেষে পুঁথি পাঠ আবার সাধনার সমতুল্য। কোরআন পড়ার জন্য কারী হতে হয়, গ্রন্থসাহেব পড়ার জন্য গ্রন্থীরা আছেন। ভিনদ্রানওয়ালা ছিলেন ভারতের অন্যতম সেরা গ্রন্থী, দমদমী তাকশালে গ্রন্থসাহেব পাঠে শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রাক চৈতন্য আমল থেকে বাংলাদেশে ভাগবতীরা আছেন। চৈতন্য প্রবর্তিত আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বৈষ্ণব সাধনায় ভাগবত পাঠ ভক্তিমার্গে পদক্ষেপ বলে বিবেচিত হত, ভাগবত পাঠ ও চর্চা এক বিশেষ পাঠককুল তৈরি করেছিল। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে চৈতন্য জীবনীনির্মাণ প্রক্রিয়ায় বৃন্দাবন দাস ভাগবত পাঠকে কীর্তন তুল্য বলে গণনা করেছেন। একদা পণ্ডিত সমাজে শ্রীচৈতন্য শাস্ত্র ব্যাখ্যারত, "চারি দণ্ড রাত্রি তভু নাহি অবসর"। এমন সময়,

"রত্নগর্ভ আচার্য, বিখ্যাত তার নাম।
প্রভুর বাপের সঙ্গী, জন্ম এক গ্রাম ॥...
ভাগবত পরম আদরে বিপ্রবর।
ভাগবত শ্লোক পঢ়ে করিয়া আদর ॥...
ভক্তি যোগ শ্লোক পঢ়ে পরম সন্তোষে।
প্রভুর কর্ণেতে আসি করিল প্রবেশ ॥

ভক্তির প্রভাব মাত্র শুনিল থাকিয়া।
সেইক্ষণে পড়িলেন মূর্চ্ছিত হইয়া ॥"৬

ভাগবত শ্লোকের এমন শক্তি, তার্কিক বিশ্বম্ভরও পাঠ শুনে তর্ক ভুলে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। আবার বেমক্কা শ্লোক পড়লে চলবে না, ব্যাখ্যা ভক্তিমার্গ অনুগত হওয়া চাই। দেবানন্দ পণ্ডিত হলেন 'পরম সুশান্ত বিপ্র', 'জ্ঞানবন্ত তপস্বী আজন্ম উদাসীন'। তাঁর নাম ডাক প্রচুর, 'ভাগবতে মহা অধ্যাপক', কিন্তু অপরাধ একটা, 'তথাপি ভক্তিহীন'। তাই যখন বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যদেব "তান ব্যাখ্যা শুনিবারে পায়", তখন তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে পুঁথিটা ছিঁড়ে ফেলতে যান।

"প্রভু বোলে, 'সে অধম কিছুই না জানে।
নিরবধি ভক্তিহীন এ বেটা বাখানে।'
আজি পুঁথি চিরোঁ এই দেখ বিদ্যমানে।"৭

আবার সঠিক ভক্তিমার্গ ভাগবত পাঠের জন্য বরাহনগরে শ্রী পাট গড়ে উঠেছে। পরিক্রমায় বেরিয়ে শ্রীচৈতন্য পানিহাটি থেকে ত্যাগ করে বরাহনগরে এসেছেন।

"তবে প্রভু আইলেন বরাহ নগরে।
মহাভাগবৎবন্ত এক ব্রাহ্মণের ঘরে ॥
সেই বিপ্র বড় সুশিক্ষিত ভাগবতে।
প্রভু দেখি ভাগবত লাগিল পড়িতে ॥
শুনিঞা তাহান ভক্তিযোগের পঠন।
আবিষ্ট হইলা গৌরচন্দ্র নারায়ণ।...
সেহো বিপ্র পড়ে পরানন্দে মগ্ন হৈয়া।
প্রভুও করেন নৃত্য বাহ্য পাসরিয়া ॥...
এইমত রাত্রি তিন প্রহর অবধি।
ভাগবত শুনিঞা নাচিলা গুণনিধি ॥
বাহ্য পাই বসিলেন শ্রী শচীনন্দন।
সন্তোষেতে বিপ্রেরে করিলেন আলিঙ্গন ॥
প্রভু বোলে "ভাগবত এমত পড়িতে।
কভু নাহি শুনি আর কাহারো মুখেতে ॥
এতেকে তোমার নাম 'ভাগবতাচার্য'।
ইহা বই আর কোন না করিহ কার্য ॥"৮

রঘুনাথ পণ্ডিতের একমাত্র কাজ হবে ভক্তিশেষে ভাগবত পাঠ, সেটাই তাঁর কৃত্য। এই-ভাবে ষোড়শ শতকে পাঠ ও পাঠকের স্বাতন্ত্র্য আর মহিমাকে বৃন্দাবন দাস চৈতন্যের মুখ দিয়ে বৈষ্ণব সাধনায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই ধারার অনুসৃতি চলেছে। চৈতন্য ভাগবতে প্রায় সব পাঠক ব্রাহ্মণ। পরবর্তীকালে তার কিছুটা ব্যতিক্রম দেখা যায়। ব্রাহ্মণেতর বৈষ্ণব-গুরুরাও ভাগবত পাঠে সিদ্ধ, তাঁদের চরিত্র মহিমা ভাগবত পাঠের

আসরে স্ফুরিত হয়েছে। নরোত্তম বা শ্যামানন্দের মহিমা ভাগবত চর্চা ও পাঠে ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু পেশাদার পাঠকরূপে ব্রাহ্মণ শ্রীনিবাসাচার্য "সদগ্রন্থ-ব্যবসায়ে" অর্থাৎ গ্রন্থ পঠন-পাঠনের অনুষ্ঠান করে বেশ ভালোমত আয় করেছিলেন।[৯] দীনদারি ও দুনিয়াদারির মেলবন্ধন তাঁর জীবনে হয়েছিল। অষ্টাদশ শতকে 'রসুয়ে নরহরি' রচিত 'ভক্তি রত্নাকরে' শ্রীনিবাসাচার্যের মাহাত্ম্য বার বার ভাগবত পাঠক হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে; প্রচলিত আখ্যানে হাম্বিরের সভায় রাজার পাঠক ব্যাসচক্রবর্তীর পাঠকে ম্লান করে শ্রীনিবাসের 'শ্রী কথা' সভাস্থ সকলকে মুগ্ধ করে।[১০] তাঁর সময়ে বৈষ্ণব মহোৎসবে পাঠ আবশ্যিক হয়ে ওঠে। শ্রীখণ্ডে নরহরি ঠাকুরের তিরোভাব তিথিতে অনুষ্ঠিত উৎসবে সকালে পাঠ ও রাত্রে কীর্তন গানের আয়োজন করা হয়।

"শ্রীমদ্ভাগবত অদ্য দিবসে শ্রবণ।
রাত্রিযোগে সঙ্কীর্তনানন্দ আস্বাদন।।"

পাঠের আসরের বর্ণনা বাস্তবসম্মত,

"সকল মহান্ত শ্রীনিবাস প্রতি কয়।
"শুনিতে তোমার মুখে বড় সাধ হয়।।
শ্রীমদ্ভাগবত পড় বসি এ আসনে।
না কর সঙ্কোচ আমা সবার বচনে।।...
পুনঃ পুনঃ অনুমতি পাইয়া সবার।
বসিলা আসনে—শোভা হৈল চমৎকার।।
পুস্তকে অর্পিয়া পুষ্প তুলসী চন্দন।
করয়ে আরম্ভ চারু মঙ্গলাচরণ।।
কোকিল জিনিয়া অতি সুমধুর স্বরে।
উচ্চারয়ে শ্লোক—যেন সুধাবৃষ্টিকরে।।"

সেদিন শ্রীনিবাস পড়ছিলেন 'শ্রীরাসবিলাস কথা রসের পাথার।'

"কি অদ্ভুত কথার মাধুর্যে! ধৈর্য নাশে।
উপমার স্থান নাই যে মধুর ভাষে।।"

শ্রোতারা মুগ্ধ, শুকদেবের শক্তি যেন শ্রীনিবাসের মধ্যে সঞ্চারিত, গদাধর পণ্ডিত বা শ্রীবাসের কৃপায় তাঁর এই পাঠ শক্তি। সারাদিন ধরে পাঠ চলে।

"শ্রীমদ্ভাগবত-কথামৃত আস্বাদনে।
কৈছে দিন যায় তাহা কিছুই নাহি জানে।
শ্রীনিবাস দেখে দিবা অবসান হৈল।
প্রার্থনাপূর্বক কথামৃত সাঙ্গ কৈল।।"

ষোড়শ শতকে শ্রীখণ্ডে ঠিক এরকম কোনো 'কথার' আসর বসেছিল কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন থাকতে পারে। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের প্রথমভাগে এইরকম আসরকে স্বীকার করে

নিতে কোনো দ্বিধা থাকার সুযোগ ছিল না, নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকরের' লোক গ্রাহ্যতা তার প্রমাণ। সেই কালে পাঠ ও পাঠের আসর ভক্ত হৃদয়ের প্রকাশক্ষেত্র,

"কেহ কহে কত না করিয়া আশীর্ব্বাদ।
ধরিয়া হিয়ায় কহে,—পূর্ণ হৈল সাধ ॥
হৈয়াছে সকল শূণ্য—তা'তে দগ্ধ হিয়া।
করিয়া শীতল কথামৃত পিয়াইয়া।...
কেহ প্রণমিয়া বলে, "কৃতার্থ করিলা।
শ্রীমদ্ভাগবত কথারসে ডুবাইলা।"[১১]

এই পাঠের চর্চা কিন্তু সম্প্রদায় বা গ্রন্থ বিশেষে আটকে থাকেনি। পুরাণ চর্চা ও পাঠ ব্রাহ্মণেতর জনে ছড়িয়ে পড়েছে। উনিশ শতকের শুরুতে পাদ্রি ওয়ার্ড তাঁতি, নাপিত, চাষা, তেলি, ব্যবসায়ী, গন্ধবণিক, শুঁড়ি, স্বর্ণকার ইত্যাদি নানারকম জাতের লোকেরা পুরাণ পাঠে দক্ষ এই কথা উল্লেখ করেছেন।[১২] সদ ব্রাহ্মণ ডেকে পুঁথি পাঠের আসর বসানোও জনপ্রিয় রীতিতে পরিণত হয়েছিল। এই সব পুঁথি পূজ্য পাঠকরা নিজেরা পড়েন ও অন্যদেরও পড়ান। কিন্তু পড়ার আগে তাঁরা পুঁথি পূজা করতে ভোলেন না। যদি কয়েকদিনব্যাপী পাঠের আসর বসানো হত, প্রথম ও শেষদিন তো পাঠ্য পুঁথিকে খানিকটা সময় ধরে অর্চনা করা হত। প্রত্যেকদিন পাঠের আগে ও শেষে পুস্তক বন্দনা কর্তব্য ছিল।[১৩] প্রাত্যহিক কাজেও পাঠ ও বন্দনা মিশে যেতে লাগল। পাঠ ও পূজা অর্চনা করা তো সদ গৃহস্থের দৈনন্দিন কাজ হয়ে উঠল। উনিশ শতকের শেষ দশকে (১৮৯০) কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী তাঁর পরিবারে এই পাঠচর্চাকে মাতৃসেবার অঙ্গ বলে মনে করতেন। প্রত্যহ বেলা ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত নিয়মিত শ্রীমদ্ভাগবত রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ করে মাকে শোনাতেন, পাড়ার লোকও ভিড় করে শুনতে আসত।[১৪] পূজা অর্চনা ছাড়াও বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতির চর্চায় পাঠ তার জায়গা খুঁজে পায়। বৈষ্ণব গ্রন্থ ব্যতীতও অন্যান্য দেশজ আখ্যান আসরে পাঠের উপজীব্য হয়। উনিশ শতকের সংস্কৃতিতে সুর করে পড়া, উদাত্ত কণ্ঠে পুঁথি শোনানো তারিফ পেত, গুণ বলে বিবেচিত হত। পিতৃদেবের নানা গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে নবীনচন্দ্র সেন লিখেছেন,

> "তিনি (পিতা) এমন সুপাঠক ও সুকণ্ঠ ছিলেন, তাঁহার মূর্তি এমন মনোমোহন ছিল, তাঁহার কবিতা পড়া বিশেষতঃ পুঁথি, যে একবার শুনিয়াছে সে ভুলিতে পারিবে না। তাঁহার বিদ্যাসুন্দর ও কবিকঙ্কণ পাঠ এখন যেন কোন আধস্বপ্ন বিস্মৃত সুদূরশ্রুত বীণাসঙ্গীতের মত শুনিতে পাই। মনসা-পুঁথির 'দংশন', 'বিষ নামান' ও 'বেহুলা লক্ষীন্দরের সন্ন্যাস'—এই তিনটি অংশ তিনি নিজে বাড়ী গিয়া পড়িতেন। সময়ে সময়ে তাঁহাদের চক্ষে জলের ধারা বহিত। 'দংশন' ও 'সন্ন্যাসের' সুকোমল কণ্ঠোচ্ছ্বসিত করুণরসে শ্রোতাগণ চিত্রিতবৎ বসিয়া কাঁদিত, রমণীগণ কাঁদিতে কাঁদিতে আত্মহারা

হইত। 'বিষ নামান' পাঠে তাঁহার সেই গগনস্পর্শী গলার ঝঙ্কারে সমস্ত গ্রামখানি যেন কম্পিত হইত।"[১৫]

গোপীমোহন রায় জজ আদালতের পেশকার। সারাদিন পেশকারি কাজের পর সন্ধ্যায় পাঠ প্রায়শ তার ক্লান্তি অপনোদনের উপায়।

পেশাদার পাঠকের আসরের সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঘরে পাঠের আসর বসছে। গ্রামে যৌথ পরিবারে দৈনন্দিন অবসরের সময় বসত পাঠের ঘরোয়া আসর। উনিশ শতকের মধ্যপাদে গ্রামের গৃহস্থ বাড়িতে কোনো না কোনো পুঁথি পাঠের জমাটি ঘরোয়া আসরের বর্ণনা নবীনচন্দ্র সেন দিয়েছেন। একটু পড়তে শিখে নবীনচন্দ্র সেনও এইরকম আসরের পাঠকে রূপান্তরিত হলেন।

"...আমি সুর করিয়া ও শব্দ জোড়াইয়া পুঁথি পড়িতাম। আর পিতামহী বুড়ি ও আমার মা খুড়ীরা সেই অপূর্ব্ব পাঠ শুনিয়া হাসিতেন, কাঁদিতেন। সময়ে সময়ে তাঁহাদের চক্ষে জলের ধারা বহিত।"

এই সব গেরস্থালির আসরে পাঠ্যবিষয় চয়নে সবসময় যে খুব বাদ-বিচার করা হত, এইরকম মনে হয় না। যেমন, করা হত—

"তখন বঙ্গ সরস্বতী দেবীর দীনাক্ষীণা মূর্ত্তিখানি বটতলায় স্থাপিতা। সেইখানে নিকৃষ্ট কাগজে অস্পষ্ট অক্ষরে জননী যন্ত্রমুখে যে সকল ছাইমাটি প্রসব করিতেন, আমি সকলই পড়িতাম।"[১৬]

বাড়ির কোনো বাচ্চা ছেলে একটু লেখাপড়া শিখলেই সে হয়ে উঠত কথক, তার পাঠাভ্যাস তৈরি হত পারিবারিক আসরে। পাড়া-প্রতিবেশীর সামনে। উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে মনোমোহন বসু তাঁর শৈশব অতিবাহিত করেছেন মাতুলালয়ে, যশোহরের গ্রামে, সর্দার পোড়ো বলে তাঁর খ্যাতির অন্ত ছিল না। তাঁর ভাষায়,

"ক্রমে আমার পুঁথি পড়ার খ্যাতি পাড়ায় বড় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, ক্রমে আমাদের দরদালানে বৈকালবেলা পাড়ার যত প্রাচীনা, প্রৌঢ়া ও দুই একজন নব্যাও আমাকে মধ্যে রাখিয়া মণ্ডলাকারে বসিতে লাগিলেন। আমি স্বীয় প্রবৃত্তি, তাঁহাদের অনুরোধ ও মাতৃআজ্ঞাতে প্রত্যহ তাঁহাদিগকে পুঁথি পড়াইয়া শুনাইতাম। ক্রমে আমাদের দরদালান নৈমিষারণ্য, পাড়ার মেয়ে ঋষি-মণ্ডলী এবং আমি সাক্ষাৎ উগ্রশ্রবা হইলাম।"[১৭] ...(নজরটান আমার)

একেবারে পুরাণ পাঠের আসর, বিষয়ও হয় দাতাকর্ণ, গুরুদক্ষিণা, প্রহ্লাদ চরিত্র বা কাশীদাসী মহাভারত। কিন্তু বাচ্চা ছেলে পড়ছে আর পরিবারে নিয়মিত পাঠ চলছে ; ছেলের দারুণ কদর এমনকি "পাঠশালায় যাওয়া একপ্রকার বন্ধ হইল।" পড়তে পারলে অপরকে শোনাতে হবে, এই ব্যবহার পরিবারে ও পাড়ায় প্রত্যাশিত, সেইকাজ থেকে সদ্য পড়ুয়ার রেহাই নেই। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বর্ধমানের জমিদারবাড়ির অন্তঃপুরে এক রীতি দেখা যায়। জমিদার গৃহিনী রাখালমনি পরিবারে কাজের ফাঁকে ফাঁকে আসর বসাতেন এবং তার দৈনিক বৈঠকে পরিবারের পড়ুয়া ছাত্র 'ফেলু' বা

রামকৃষ্ণ মিত্র পাঠকপদ অধিকার করিতেন। কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীর পরিবারের মতো এই পরিবারেও মালা গাঁথা সদগ্রন্থ পাঠ ও শ্রবণ ইত্যাদি কাজ প্রাত্যহিক সাংসারিক ক্রিয়া-কলাপের অংগ বলে বিবেচিত হত ; তার জন্য দিনমানে সময় ঠিক করা থাকত।[১৮]

বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকেও আখ্যান শোনা ও গল্প বলার রীতি চালু ছিল। বীরভূমের লাভপুরে তারাশঙ্করের শৈশব ও কৈশোর স্মৃতি জুড়ে আছে পাঠ ও গল্প শোনার অনুষংগ। গ্রামে সব নামজাদা গল্প বলিয়ে ও বাচক থাকত। বড়দের ও ছোটদের আসরে তাঁদের খাতির ছিল সমান।[১৯] ত্রিকাল ভট্টাচার্য পেশাদার গল্প বলিয়ে, তাঁর সংগে তারাশঙ্করের পরে আলাপ হয়। কিন্তু ছেলেবেলার গ্রামে ছিলেন আরো অনেকে—ব্রজ জ্যাঠা, কেদার চাটুজ্যে, তারাশঙ্করের বাবা গোঁসাইবাবা এমনকি গাঁয়ের লাঠিয়াল। সবাই গল্পের মজলিশ বসাতেন, ছেলেবুড়ো একমনে শুনত। সেরকম আন্দুলেও বদনচন্দ্র চৌধুরির মতো লোক ছিলেন, জমিয়ে কথকতার ঢঙে গল্প বলতেন। গ্রামের ছেলেপুলেদের কাছে তিনি 'গল্পদাদু'। কিন্তু 'বড় বড় সম্ভ্রান্ত মজলিশে'ও তাঁর ডাক পড়ত। মজলিশে আখ্যান শোনা আর তার তারিফ করা তখন রসিকের অভিজ্ঞান হয়ে দাঁড়িয়েছিল।[২০]

ভদ্রলোকের বাড়িতে শুধু এই বলা আর শোনার সংস্কৃতি আবদ্ধ ছিল না। পাঠের আসরের চৌহদ্দিতে আম জনতাও ঢুকে পড়েছিল। ১৮৭৯ সালে এক সরকারি প্রতিবেদক লিখেছেন[২১]

> "কলকাতা শহরে একটু খেয়াল করলেই কোন দর্জির বা দেশীয় মুদির দোকানের সামনে বেশ কিছু লোকের জমায়েত প্রায়শ পথচারীর চোখে পড়ে। এদের মধ্যে একজন লোকের উপর তার নজর প্রথমে আটকে যায়। মুসলমানি বাংলায় [*sic*] লেখা একটা আখ্যান সেই লোকটা পড়ছে এবং অত্যন্ত সুশৃংখল ও শান্তভাবে, গভীর আগ্রহের সংগে, বাকিরা সেই পাঠ শুনছে। সামান্য ব্যাঘাতে তারা চটে যায়। তাদের চোখে পাঠক মহাশয় পরম বিদ্বান। তার গুণ হয়ত একটি। বর্ণ প্রয়োগে ও শব্দ পাঠে তার দখল আছে ও সুর সহযোগে গম্ভীর স্বরে সে দ্রুতগতিতে পড়ে যেতে পারে। পড়ার তালে তার শরীর ও মাথা দোলে। না দুলে সে পড়তেই পারে না।"

প্রতিবেদকের মতে, যে কোনো আরবি জানা মৌলভি এইরকম আসরে আসতে নাক সিঁটকোবে। নাদান ও জাহিল লোকেদের জন্য এই রকম পাঠের মজলিশ বসে। পাঠক এঁরা সবাই ; রঘুনাথ ভাগবতাচার্য, শ্রী নিবাসাচার্য থেকে গ্রাম্য 'কেঁড়েল' মনোমোহন বসু, বাচ্চা ফেলু বা দুলে দুলে পড়ায় ওস্তাদ নাম না জানা কোনো এক 'মিঞা' সাহেব। আসর সব কিছুই ; কোথাও সেটা বরাহনগরের পাঠবাড়ি, শ্রীখণ্ডের মহান্ত সমাবেশ, আবার কোথাও বা দর্জি বা মুদির দোকানের দাওয়ার সামনে 'নাদানদের' জমায়েত। সবাই নিজের নিজের মতো করে রসজ্ঞ, পাঠের জগতে তারা সবাই শরিক। শ্রীখণ্ডে মহান্তরা যেভাবে আত্মমগ্ন হয়ে পাঠ শোনেন, কলকাতার গরিব-গুর্বোরাও সেভাবে একনিষ্ঠ হয়ে

কিস্যার পুঁথি শোনেন। শোনাটা প্রত্যেকের কাছে জ্ঞাতব্য, শোনার মধ্য দিয়ে তারা জগৎকে চিনছে। তারাশঙ্করের মা দারুণ সব দেহাতি গল্প করতেন ; সেইসূত্রে বলা ও শোনার এক মোক্ষম 'মুহাবরা' তিনি তাঁর ছেলেকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন, "বলনে-ওয়ালা ঝুটা, শুননেওয়ালা সাচ্চা।"[২২]

যে শোনে সেই সত্যি, তার কাছেই আখ্যানটা জীবন্ত। শোনাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে বলার জগৎ, পড়ার কাজ, পাঠক থাকেন শ্রোতার মধ্যে। এখানে পাঠের রূপ সামূহিক। গ্রন্থাগারে বসে পড়া যায়, পড়া সেখানে স্বগত, মনে মনে। নৈঃশব্দ রক্ষা করা যে কোনো গ্রন্থাগারের বিধি। হাজারো লোক পড়ে অথচ কোনো আওয়াজ নেই। পড়ুয়ারা এখানে ব্যক্তি, তাদের পাঠ একান্ত, প্রত্যেকের পাঠের সঙ্গে অপরের অধ্যয়ন পৃথক। পুঁথির সঙ্গে, বইয়ের সঙ্গে পড়ুয়ার যোগ একক, নিঃসঙ্গ। অথচ পড়ার অন্য এক প্রেক্ষিত, অন্য এক আবহাওয়া থাকতে পারে।

রাসসুন্দরী দেবী ভীরু ও লাজুক। একদম ইচ্ছা নয় যে কেউ জানুক, তিনি পড়ছেন বা পড়ার চেষ্টা করছেন। অথচ সবাইয়ের চোখ এড়িয়ে যখন তিনি চুপিসারে চৈতন্য-ভাগবতের পুঁথির পাতা ওলটাচ্ছেন, তখনও দু-একজন প্রতিবেশিনী তাঁকে ঘিরে বসে আছেন, শুনছেন।[২৩] মহিলাদের জোট দৃঢ়-সংবদ্ধ। তাঁর একান্ত পড়ার চেষ্টায় শরিক হচ্ছেন আরো দু-একজন। 'সমজুটীদের' কথা তিনি বার বার বলেছেন, না শুনলে, শরিক না থাকলে, পড়ার অর্থ, গান গাওয়ার মজা রাসসুন্দরী দেবীর কাছে কি মার খেত?

শরিকত্বের ধারণাটি গুরুত্বপূর্ণ। ইংরাজিতে সাক্ষরতা (Literacy)-র সঙ্গে সাহিত্য (Literature) জড়িত হয়ে পড়েছে। অথচ আমাদের কাছে সাহিত্যের ধারণা অন্যভাবে নিষ্পত্তি হয়েছে। কুন্তকের ভাষায় "সহিতয়োর্ভাবঃ সাহিত্যম্।" (সহিতের ভাব=সাহিত্য)।[২৪]

সাহিত্যে অর্থ যে দুইটি সহভাবে অবস্থিত। যে কোনো পদে শব্দ ও অর্থ যে প্রকারে সহভাবে অবস্থিত ঠিক সেইপ্রকার পাঠেও পড়া আর শোনা সহভাবে থাকতে বাধ্য, পদ বিন্যাসের লালিত্য, অর্থের গাম্ভীর্য শব্দধ্বনির মধ্যে গ্রাহ্য হতে পারে। 'সাহিত্যে', সহভাবের চিন্তার মধ্যে নিহিত আছে পড়া ও শোনার যুগলবন্দী।

সাহিত্যে 'রসকে' ব্যাখ্যা করা হয়েছে 'ধ্বনি'র বিশিষ্ট বিশ্লেষণ দ্বারা। ভারতীয় নন্দন-তত্ত্বের প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম তো ধ্বন্যালোক। তাঁর 'বাক্য-পদীয়তে' ভর্তৃহরি ধ্বনি ও নাদ (আওয়াজ)-কে এক পর্যায়ের শব্দ হিসাবে প্রয়োগ করেছেন, 'স্ফোটাত্মকশব্দ' বা শব্দের অখণ্ড প্রতীতি কীভাবে ধ্বনি বা নাদের মধ্য দিয়ে অভিব্যক্ত হয়, সেই বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন।[২৫] এবং এই স্ফোটতত্ত্বকেই অন্যভাবে প্রসারিত করে আনন্দবর্ধন ও অভিনবগুপ্ত শব্দের ব্যঞ্জকত্বকে 'ধ্বনি' অভিধা দ্বারা ভূষিত করে রস তত্ত্ব গড়ে তুলেছেন, তাদের প্রস্থানের নাম হয়েছে 'রসধ্বনি' বা 'ধ্বনি'।[২৬] তাদের রসতত্ত্বে ধ্বনি অর্থ শুধু নাদ বা আওয়াজ নয় ; কিন্তু নাদ ব্যতিরেকে 'রসতত্ত্ব' গড়ে তোলা সম্ভব

নয়। কারণ আনন্দবর্ধন স্পষ্ট স্বীকার করেছেন যে আদি গুরু তো বৈয়াকরণিকরাই ('প্রথমে হি বিদ্বাংসো বৈয়াকরণাঃ ব্যাকরণমূলত্বাৎ সর্ববিদ্যানাম্ ।)[২৭] ফলে ভারতীয় নন্দনতত্ত্বে নাদ বা ধ্বনির বা আওয়াজের সঙ্গে রসের সহযোগ স্বীকৃত, বর্ণের ব্যঞ্জকত্ব নাদের মধ্য দিয়ে সিদ্ধ হয়।

ধ্বন্যালোকের 'তৃতীয় উদ্যোতে' আনন্দবর্ধন ও অভিনবগুপ্ত এই বিষয়ে স্পষ্ট সিদ্ধান্তের অনুসারী।[২৮] বিভাবাদির সংযোগেই রস নিষ্পত্তি হয়। কিন্তু কখন? বিশিষ্ট শ্রুতি শব্দের (বিশিষ্টশ্রুতিকশব্দ) সাহায্যে যদি বিভাবাদিরূপ অর্থের উপস্থাপন হয়, তবে রসের প্রতীতি সম্ভব হতে পারে। এতদূর যেতেও তারা দ্বিধা করেননি যে পদহীন গীতধ্বনিতে অর্থের প্রতীতি নেই অথচ শ্রবণ মাধুর্যের জন্য রসের বোধ হয়। তাই শুধু কর্ণগ্রাহ্য হলে বর্ণ স্বভাবহেতু রসনিষ্পত্তিতে সহযোগী হয়। 'শ্রোটএক গ্রাহ্যোর্থাপি চ স্বভাবো রসনিস্যন্দে ব্যাপ্রিয়ত এব, অপদগীতধ্বনিবৎ।)"[২৯]

শোনার মধ্যে রস আছে। রসসৃষ্টিতে বর্ণের দ্যোতনা শ্রবণগ্রাহ্যত্বের মধ্যে, শ্রুতি মাধুর্যের মধ্য দিয়ে সম্ভব। বর্ণ তো ধ্বনির লৈখিকরূপ, বর্ণ উচ্চারিত হলে ধ্বনিতে ফিরে যাই। এবং রসধ্বনিতত্ত্বে এই বলা, পড়া, শোনা ও লেখার সাযুজ্য 'ঔচিত্য', তার অভাবে রসাভাস ঘটে। এই বোধকে কুন্তক সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন: "তস্যাং স্পর্ধিত্বেন যাসাববস্থিতিঃ পরস্পর সাম্যসুভগমবস্থানম্" অর্থাৎ প্রতিদ্বন্দ্বিতার সঙ্গে "পরস্পরের সাম্যে সুন্দর অবস্থান।"[৩০] নানা টানাপোড়েনের মধ্যে শব্দের সঙ্গে অর্থের, বলার সঙ্গে লেখার, লেখার সঙ্গে পড়ার, পড়ার সঙ্গে শোনার প্রতিদ্বন্দ্বিতা অথচ যৌগপদ্য, এইরকম অবস্থিতি সাহিত্যপদবাচ্য। তখন শোনা হয়ে ওঠে জানা, উভয়ের উপলব্ধি এখন যুগপদভাবী। লেখা অধ্যয়ন করা যে জ্ঞানের একমাত্র পথ নয়, শুধু লেখার মাধ্যমে জ্ঞান অভিব্যক্ত হয় না বরং বলার সঙ্গে সঙ্গে ভাবনা দানা বাঁধে, জ্ঞানে অধিকার আসে—এই চিন্তার রেশ রবীন্দ্রনাথের জ্ঞানতত্ত্বেও আমরা পাই। 'আশু মুখুজ্যের' অনুরোধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য নিয়ে তিনি তিনদিন ধরে 'বকেছিলেন', তাঁর বক্তৃতায় কেতাদুরস্ত অধ্যাপকরা আদৌ খুশি হননি। তাদের বেজার হবার কারণ দেখাতে গিয়ে, লেখাপড়াভিত্তিক জ্ঞানতত্ত্বের বিপরীতে স্বকীয় সাহিত্যবোধ ও রসতত্ত্বকে কবি হাজির করেছিলেন। তাঁর নিজের জবানিতে, "আমি যা কিছু শিখেছি সে কেবল বলতে বলতে সাহিত্য সম্বন্ধে যে কি বলব আগেভাগে তা জানবার শক্তিই ছিল না। একটা অন্ধ ভরসা ছিল যে বলতে বলতেই বিষয় গড়ে উঠবে...ভেবে বলতে পারি না, বলতে বলতে ভাবি, মৌমাছির পাখা যেমন উড়তে গিয়ে গুণগুণ করে।"[৩১] কুন্তক, ভর্তৃহরিরা তো সেকালের লোক, রবীন্দ্রনাথ কিন্তু একালের।

অনস্বীকার্য যে পড়া আর শোনার সঙ্গে সাক্ষরতার সম্পর্ক আছে। অক্ষরজ্ঞান থাকলে নিজে পড়া যায় বা নিজে লেখা যায়। অক্ষরজ্ঞান না থাকলেও শুনতে কোনো অসুবিধা

নেই। রাসসুন্দরী দেবীর আত্মজীবনীতে লেখা, পড়া আর শোনার সম্পর্কে অক্ষর জ্ঞান ও অক্ষর লেখার অভ্যাসের সম্বন্ধ ধরা পড়ে। কিন্তু কেবল সেই অভিজ্ঞতার নিরিখে পাঠের জগতের সব কিছু বিচার করা মুশকিল।৩২ প্রথমত, পাদ্রি ওয়ার্ডের প্রাগুক্ত সাক্ষ্য থেকে পরিষ্কার যে অষ্টাদশ শতকের শেষে ও উনিশ শতকের গোড়ায় বাংলার নিম্নকোটির লোকেরা নিজেরা পুরাণ পড়তে পারত ও পড়ত। তবুও তারা আসরে ব্রাহ্মণ পাঠককে নিয়োজিত করে পাঠ শুনত। কথকতার আসরে শ্রোতাদের সবাই নিরক্ষর, তার কোনো প্রমাণ নেই। দ্বিতীয়ত, পড়ার মধ্য দিয়ে যে অন্য অনুভূতি হয়, রবীন্দ্রনাথ সেটা জানতেন। ছেলেবেলায় গদ্যরীতিতে ছাপা 'গীতগোবিন্দ' থেকে তিনি পড়ে পড়ে জয়দেবের ছন্দকে আবিষ্কার করেছিলেন। বড় বয়সে তিনি বন্ধ ঘরে 'সুর করে করে' মেঘদূতের আবৃত্তি করতেন, পড়ার আওয়াজ কানে শুনতেন, ধ্বনিমাধুর্যে মন ভরিয়ে তুলতেন।৩৩ শব্দের ঝংকার, ধ্বনিমাধুর্য বুঝতে গেলে আবৃত্তি করতে হবে, সুর-লয় যোগে পড়তে হবে। নিরক্ষর ও সাক্ষর, উভয়ের ক্ষেত্রে সমরীতি প্রযোজ্য। তৃতীয়ত, শিক্ষার ক্ষেত্রে, শেখানোর ক্ষেত্রেও এই পড়া আবৃত্তি করা, ও শুনে সবাই মিলে আবার আবৃত্তি করা, স্বীকৃত পদ্ধতি ছিল। পাঠে শিশু মনোমোহন বসুর শিক্ষানবিশি এইভাবে শুরু হয়েছিল। চিত্তাকর্ষক বিবৃতিটি তোলা যাক,

"আমার বেস মনে পড়ে, আমার পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রমের পূর্বে আমার বাটীস্থ গুরুমহাশয় আমাকে উলঙ্গ করিয়া আমার পরিধেয় ধুতিখানা আমার মস্তকে জড়াইয়া **গাছ রামায়ণ গায়কের** ন্যায় পাকড়ী বাঁধিয়া দিতেন। পাঠশালার সকল ছাত্রকে সারি দিয়া দাঁড় করাইয়া আমাকে ঘোষাইতে কহিতেন।" (নজরটান আমার)

'এখনকার বাবুরা' ঘোষানো কী তা, বুঝবে না। এই কথা মনোমোহন বসু জানতেন। তাই তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে নানা আরিজা (আর্যা)

"এবং চাণক্য শ্লোক প্রভৃতি সুর করিয়া এক নিঃশ্বাসের উপযুক্ত চরণভেদ করিয়া পড়াইত, তাবৎ বালক তদনুসরণে পড়িত।··· অনেক প্রাচীন মহাশয়েরা আমোদ করিয়া শুনিতেন এবং গুরুমহাশয়ের আদেশে আমি যখন তাহা বালকদিগকে পড়াইতাম, তখন ভদ্রাভদ্র, স্ত্রীপুরুষ অনেকেই দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শুনিতেন।" পাঠশালায় 'ঘোষানোও' একার নয়, অনেকের, শুধু ছাত্রদের নয়, পাড়া-প্রতিবেশীরও শ্রবণীয়। ঘোষানোর উদ্দেশ্য ধরা পড়ত সবার শেষে, সরস্বতীর বন্দনায়,

"গলায় গজমতি মুক্তার হার।
দেও মা সরস্বতী বিদ্যার ভার।"৩৪

রস ও বিদ্যা সাধিত হয় ধ্বনি ও আওয়াজের মধ্যে, শোনা ও শোনানোর মাধ্যমে। পাঠের মাধ্যমে রসভুক্তি সামূহিক, লেখার ঐকান্তিক প্রাধান্য তখনো স্বীকৃত নয়! অবশ্য সেক্ষেত্রে লেখা নাকচ হয়ে যায়নি, হওয়া সম্ভবও নয়। কিন্তু পড়া আর শোনার অভিব্যক্তিরূপে লেখা গৃহীত হয়, পড়া আর শোনার যুগলবন্দীতে লেখার অবস্থান। 'সহিত' এই ধারণা পরিব্যাপ্ত আছে সর্বত্র, শ্রবণগ্রাহ্যতা, শ্রুতিমধুরতাকে স্বীকার করে

সাহিত্যের অস্তিত্ব দানা বেঁধেছে। পাঠের এই সরণিতেই কথকের আবির্ভাব। এরকম একটা জগতে তারা হয়ে ওঠেন স্বরাট, মর্যাদা পান শিল্পীর।

খ. কথকের স্বরাজ্য

পাঠ নানারকমের আছে, কথকতা এক বিশেষ প্রকারের পাঠ। সূত, পাঠক, ব্যাস ইত্যাদির ধারণা পুরাণে আছে। বুদ্ধদেব বসু মহাশয় সূতের সঙ্গে কথকের ব্যঞ্জনা খুব সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন সঞ্জয়ের স্বকীয় ও পৈতৃক বৃত্তি সূতের, তাঁর মুখে ধৃতরাষ্ট্র কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শুনেছেন। মহাভারতের কথক উগ্রশ্রবা, তিনিও সৌতি। মূল ধারণা 'বাহকের', রথে চড়িয়ে তিনি লোকদের স্থান থেকে স্থানান্তরে নিয়ে যান আর কাব্য আবৃত্তি করে কীর্তিকাহিনীকে, সূত দৌত্য কর্মও করে থাকেন। তা কেবল দুই রাজার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; পুরাণ কথকের ভূমিকায় তাঁরা একের সঙ্গে অন্য বহুমনের যোজকও বটে।

বৃহদ্ধর্ম পুরাণে এই কথকতা ও পাঠ সম্পর্কে সুন্দর এক গল্প আছে। রামায়ণ লিখে আদি কবি বাল্মীকি রণে ভঙ্গ দিলেন, ব্রহ্মার হাজার অনুরোধেও আর কলম ধরতে রাজি হলেন না। তিনি কৃতার্থ। অতএব মহাভারত লিখবেন বেদব্যাস, তাঁর কাছে বাল্মীকি 'কাব্যবীজং সনাতনম্' দিয়ে যাবেন। অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও অষ্টাদশ উপপুরাণ লেখার প্রকল্পও তৈরি, কিন্তু তা শ্লোকে নিবদ্ধ হয়নি এবং সংক্ষিপ্ত।

সেইগুলি পূরণ করার ভারও বর্তাল ব্যাসের উপর। এতে অনেক মুনি ঋষি চটে গেলেন। তাঁরাও বা কম যান কীসে? নানা লোকের মধ্যস্থতার ফলে ঠিক হল যে সমস্ত শ্লোক ব্যাস রচনা করবেন কিন্তু অন্যরা "কেহ লেখক, কেহ বক্তা, কেহ অর্থ নিরূপয়িতা হইবেন" (লেখকোঃ কোঽপি বক্তা চ কোঽপি চার্থ নিরূপকঃ) বক্তা বা পাঠক নিছক যে কেউ নন, তিনিও কেউকেটা, মুনিবংশ জাত, 'সনাতন কাব্যবীজ'-এর ভাগীদার তিনি, একটি পরম্পরায় স্থিত। পৌরাণিকোত্তম সূত নিজে বদরিকাশ্রমে ব্যাসের মুখে কথা শুনেছেন, পাঠ নিয়েছেন তবেই তাঁর উপরে পুরাণবর্ণনার অধিকার দেওয়া হয়েছে। (ন্যস্তং পুরাণমমলং বক্তায়মিতি সর্বতঃ) অতঃপর বদরিকাশ্রমে শিক্ষিত লোমহর্ষণ পুত্র মহাজ্ঞানী সূত উগ্রশ্রবা পুণ্যাত্মা মুনিদের কাছে নৈমিষারণ্যে পুরাণ ব্যাখ্যা ও পাঠে রত হলেন কারণ সমুদয় দ্বীপের মধ্যে জম্বুদ্বীপ প্রশস্ত, জম্বুদ্বীপের মধ্যে পবিত্র স্থান ভারত, আবার ভারতের সর্বোত্তম তীর্থ নৈমিষারণ্য।[৩৫]

'কাব্যবীজ' এক জনের কাছ থেকে আরেকজনের কাছে যাচ্ছে, সবাই পবিত্র, কথক ও শ্রোতা উভয়ে, স্থানও পুণ্যময়। পুরাণ রচিত হয়েছে পাঠের জন্য। তার বিস্তৃত বিধিও তৈরি আছে। পুরাণ মাহাত্ম্যের বর্ণনার মধ্যে রীতি, লাভালাভ বেঁধে দেওয়া হয়েছে। পাঠের মধ্যে ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা ও সুযোগ স্বীকৃত, প্রাকৃতজনের কাছে অর্থ বলে দেওয়ার দায়িত্ব পাঠকের (এতেষাং কেঽপি বক্তারঃ কেঽপি শ্লোকার্থ কারকঃ।) পৌরাণিক মাহাত্ম্য গাথায় পরিষ্কার যে পুরাণ পাঠ সবাইয়ের জন্য, সবাই শুনবে,

পুরাণ পাঠ করা হবে নানা ব্রত ও সামাজিক অনুষ্ঠানে। কোনো ব্রত বা কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে কোনো কোনো পুরাণকাহিনী শ্রবণযোগ্য, তার বিস্তৃত বিধি আছে। সেই বিধি অনুসরণ করে সময়োপযোগীভাবে পুরাণ ব্যাখ্যা করা ব্যাখ্যাতৃর কাজ। পুরাণ হল সংহিতা, নানা জায়গা থেকে জোড়া দেওয়া সংগ্রহ, সকলে সেই সংগ্রহ চয়নে সাহায্য করেন। বলতে বলতে, শুনতে শুনতে পুরাণ রূপ পায়. পুঁথি বদলে যায়;[৩৬] আদি কবি বাল্মীকি বেদব্যাসকে কাব্যবীজ দিয়ে যান, তিনি মূল শ্লোকও লেখেন। কিন্তু সেই সব শ্লোক পড়েন ও ব্যাখ্যা করেন অন্যরা, তাঁরাও হয়ে ওঠেন কবি (ব্যাসস্যানুগ্রহাদ্ যূয়ং কবয়োঽপি ভবিষ্যথ)[৩৭] পুরাণ পাঠ ও শোনায় পুণ্যও আছে, কাব্যও আছে।

রচিত পুরাণ সাম্প্রদায়িক; কিন্তু পাঠে ও শোনায় অধিকার সর্বজনীন। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে ব্রাত্যরা, দস্যু, শূদ্র, রমণী, গণিকা, সবাই পুরাণ পাঠ শুনে পুণ্য লাভ করছে, এই ধারণা নানা উপাখ্যানে বিবৃত হয়েছে। এক ধরনের পাঠের নাম পারায়ণ। "সঙ্কল্পপূর্বক ভাগবতাদি পুরাণ আদ্যন্ত পাঠ হইলেই তাহাকে পারায়ণ বলে।" মূল গ্রন্থ পাঠ এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য; নিজস্ব ব্যাখ্যা, গান, যোজনা বা কাহিনী পুনর্বিন্যাস পারায়ণের লক্ষ্য নয়। পারায়ণ পুরোপুরি পুণ্যলাভের অনুষ্ঠান, কঠোরবিধি শাসিত। যেমন, যিনি পাঠ দিবেন ও যাঁরা পাঠ করবেন, প্রত্যেককে হবিষ্যান্ন খেতে হবে। রাত্রে আহার নিষিদ্ধ, পাঠকালীন দিনগুলিতে মৈথুন পরিত্যাজ্য বিধিমতে বৈশাখ, অগ্রহায়ণ ও মাঘাদি পুণ্যমাসে পারায়ণ প্রশস্ত।[৩৮] পারায়ণ আরম্ভ হয় সকালে, দিবাকালে পাঠ সিদ্ধ।

পারায়ণে মূল ও সঠিক পুঁথিনিষ্ঠ হওয়া ও সঠিক উচ্চারণে পাঠ করা একান্ত আবশ্যক। রামগতি ন্যায়রত্ন এই রীতির এক নিদর্শন দিয়েছেন।[৩৯] একজন ব্রাহ্মণ সঙ্কল্প করে রামায়ণ পাঠ করেন এবং ওই কাজের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করেন। কারণ 'গঙ্গাজল ও তুলসী' হাতে নিয়ে তিনি "বাল্মীকিপ্রোক্ত সমস্ত রামায়ণ পাঠ করিব, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, পাঠক ও ধারকের কাছে সমুদায় তিনখান পুস্তক ছিল—ঐ তিন পুস্তকেরই স্থানে স্থানে পাঠের এরূপ ন্যূনাধিক্য ও বিপর্যয় যে, পরস্পরের কিছুমাত্র ঐক্য হয় নাই।... ঐ সকল পাঠের মধ্যে কোন পাঠ প্রকৃত, তাহার কিছুই বুঝিবার যো নাই—হয়ত আমাদের সংগৃহীত তিন পুস্তকেই বাল্মীকি রচিত প্রকৃত পাঠের অনেক ন্যূনতা আছে,—তাহা হইলে আমি যে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, তাহার ভঙ্গ হইয়াছে, সুতরাং তৎ প্রতীকারার্থ প্রায়শ্চিত্ত করা অবশ্য-কর্তব্য"।

পারায়ণ অনুষ্ঠানে মূল গ্রন্থকে হুবহু অনুসরণ করতে হবে, কোনোখানে কোনোভাবে ব্যত্যয় হলে চলবে না। পারায়ণের পরে হল ব্যাখ্যা সহযোগে পাঠ। ব্যাখ্যাতৃর ভূমিকা পাঠকের অপেক্ষা কিছুটা স্বতন্ত্র। পারায়ণে ব্রতী পাঠক ও সাধারণ কথকের মধ্যবর্তী স্তরে ব্যাখ্যাকারের অবস্থান। পদ্মপুরাণে ব্যাখ্যাতার ভূমিকা নিয়ে বর্ণনা আছে, গল্পও আছে। ঘোর পাপী ছাড়া যে কেউ ব্যাখ্যাতা হতে পারেন। ধীর গতিতে পাঠের পরে প্রাজ্ঞ পাঠক বিচারপূর্বক আস্তে আস্তে ব্যাখ্যা করবেন। পড়ার

রীতিও বলা হয়েছে : শ্লোকগুলির অন্বয় ভাগ করবেন ও তার পরে অর্থ বলবেন। মূল গ্রন্থের প্রতি অনুগত থেকেও 'দেশভেদে' ব্যাখ্যাতার বলার ভাষাও আলাদা হবে। ব্যাখ্যা যে কোনো লোক যেভাবে খুশি দিতে পারেন কারণ পৌরাণিক ব্যাখ্যা হিত-সাধক হতে বাধ্য। সৎ ইচ্ছা থাকলে পৌরাণিক পাঠক হওয়া যায়। তবে তাতে যে ঝামেলা একেবারে নেই, এইরকম নয়। শ্রোতারা বিপাকে ফেলতে পারেন। এই প্রসঙ্গে নানা গল্প বলা হয়েছে। গৌতম বলে এক দুষ্ট ব্রাহ্মণ "প্রতোলীমণ্ডপাস্থিতঃ" বা রাজ পথের মোড়ে এক মণ্ডপে ব্যাখ্যাকারের শ্লোক শুনে প্রশ্ন করেছিল কারণ তার মনে খটকা লেগেছিল। আবার রামের রাজসভায় দ্বিজবর শম্ভু বলে ফেলেছিলেন যে রাবণ বধের পর রাম কুম্ভকর্ণকে বধ করেছিলেন। রাম রেগে আগুন। 'অন্যথা কথা' বলে দ্বিজ সভাস্থ লোককে নাস্তিক করে তুলেছে, অতএব দণ্ড বিধেয়। অবশেষে জাম্বুবান উঠে 'পুরাকল্পীয়' রামায়ণের কথা বলে রামের ক্রোধকে শান্ত করেন। পুরাণে আছে যে পাঠকের কাছে 'ব্যাখ্যাসংগ্রহ' থাকত, বেমক্কা প্রশ্নের জবাব তাঁরা সেই 'নোটবই' থেকে দিতেন।[৪০]

অতএব পাঠের সঙ্গে অর্থ বলা ও বিবৃতি দেওয়া ব্যাখ্যাকারের কাজ। ভাষান্তর হচ্ছে, টীকা-ভাষ্য জোড়া হচ্ছে। এই সবই ব্যাখ্যাকারের কৃতি, তাঁর যোজনা। শ্লোক পরিবর্তন করার কোনো অধিকার তাঁর নেই কিন্তু পাঠের দিক নির্দেশে, অর্থের দ্যোতনা-সৃষ্টিতে তাঁর স্বকীয়তা স্বীকার্য। শ্রোতাও সেখানে সক্রিয়, তাঁর ব্যাখ্যাকে প্রশ্ন করতে সমর্থ। একটি স্তরে আদান-প্রদান পার্থিব, আধিদৈবিক নয়।

অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকে এই সব পাঠের আসরে দুয়েকটা পার্শ্বচরিত্র থাকত। ধারকের নাম পারারণ বা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে পাই। তৎকালীন একটি অভিধান অনুযায়ী, ধারকের অর্থ হল "পুরাণ পুস্তক ধরিয়া যে পুরাণ পাঠকের প্রমাদাদি অপনীত করে।[৪১] শ্রাবক বা প্রধান শ্রোতাও নির্বাচিত হতেন, পাঠের আসরে তিনি নিয়মিত হাজিরা দিতেন কারণ উপযুক্ত শ্রোতা না থাকলে তো আসরের উদ্দেশ্য ব্যর্থ। এই পাঠের আসরে কথকদের আবির্ভাব পার্শ্বচরিত্ররূপে। সাধারণের কাছে সহজে পাঠককে বুঝিয়ে দেওয়া তাঁদের কাজ। তাঁরা পাঠের বা ব্যাখ্যার পরে আসরে উঠতেন। দিনমানে পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং সন্ধ্যায় ঠিক সেই পাঠের অনুসরণে কথক ঠাকুরের সরল বর্ণনা চলত। আসরে কথকরা সহযোগী। কিন্তু ক্রমে ক্রমে ঊনবিংশ শতকের গোড়ায় কথকরা পাঠের জগতে হয়ে উঠলেন স্বরাট, এক বিশেষ রীতির প্রবক্তা।

এখন ব্যাখ্যাকারকেও কথক ঠাকুর ছাপিয়ে গেলেন। তিনি দেওয়া পুঁথি পড়েন না, পুরাণ ও কাব্যের বিন্যাসকে পুনর্বিন্যস্ত করে নিজে পুঁথি তৈরি করেন, নিজের লেখা পুঁথিটা পড়েন। রামগতি ন্যায়রত্ন কথকের লক্ষণ ব্যাখ্যা করেছেন প্রাগুক্ত উক্তিতে "কথকেরা উপাখ্যান ভাগের বৈচিত্র-সম্পাদনার্থ নানা পুরাণের একত্র সম্বদ্ধ করিয়া থাকেন।" নানা আখ্যানের মিশেলে একটি নতুন "কথা" বা পালা তৈরি করা কথকের এখতিয়ারভুক্ত। মাঝে মাঝে গীত গাওয়া হয়, বর্ণনার জন্য "সাট" বা "চূর্ণী" তৈরি

করা হয়। প্রাকৃতজনের কাছে ধর্মকথা বলতে গিয়ে পারায়ণের নিগড় থেকে তাঁরা মুক্ত হয়েছিলেন। তখন দোভাষীরা, অনুবাদকরা হয়ে উঠলেন শিল্পী।
পারায়ণে আছে নিছক ধর্মের শ্রুতি। কথকতায় লোকশিক্ষা, ধর্মশিক্ষার সঙ্গে মিলেছে সাহিত্য ও কাব্যবোধ। পুরাণধৃত রক্ষণশীল নীতিবোধের সঙ্গে কল্পনা মেশে, তৈরি করা হয় নানা রসের গল্প। পদ্মপুরাণের সম্পাদক ভট্টপল্লীর চরম রক্ষণশীল পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন একবাক্যে বলেছেন, "কাব্যোকরণান্বেষী কবি, থিয়েটার বা যাত্রাদলের অধ্যক্ষ ও ধর্মপ্রচারক কথক প্রভৃতি সকলেই এই স্বর্গখণ্ড পাঠে প্রভূত উপকার লাভ করিবেন।"[৪২]
ধর্মবক্তা ও কবির সহাবস্থান কুন্তকের তত্ত্বে থাকায় অসুবিধা নেই। কাব্য "সুকুমার ক্রমোদিতঃ" "সুকুমার পরিপাটরূপে কথিত", তাই তার দ্বারা সহজে চতুর্বর্গের কথা বলা যায়, লোকশিক্ষা সহজসাধ্য হয়। কিন্তু 'চতুর্বর্গফলাস্বাদ' অতিক্রম করেও সাহিত্য 'রসনিস্যন্দী' সেখানে সাহিত্যের প্রধান জোর।[৪৩]
আমাদের পড়া গল্পেও দেখেছি পৌরাণিকরা সবাই কবি হতে চেয়েছিলেন, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করেছিলেন, মহাকাব্য রচনা করার ইচ্ছা তাঁদের ছিল। তাঁদের দাবি পুরোপুরি মানা হয়নি, বাল্মীকির প্রসাদে ব্যাস 'সনাতন কাব্যবীজের' সন্ধান পেয়ে মহাকাব্য ও পুরাণ লেখেন, তাঁর প্রসাদেও পরম্পরায় কথকরা রচনা করেন তাঁদের আখ্যান, বসেন তাঁরা ব্যাসের আসনে। ধর্মপ্রবক্তাদের হাতে চলে আসে রসের ভাণ্ডার।
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৌলতে আমরা জানি যে পুঁথির পাতা পুড়ে গেলে বটতলায় কিরপানাথ নতুন পুঁথি তল্লাস করতে যান। তাতে চটেমটে 'পাকা কথক' চাঁইবুড়ো বলে উঠেছিলেন "মারুতির পুঁথি ছাপা হয় নাই বাপ, বাজারে পাবে রামানন্দী রামায়ণ, দাম চারিটাকা।" তখন 'দোতকলম' নিয়ে বুড়ো নিজেই পুঁথি ঠিক করতে বসলেন, শোধন করার দায়িত্ব তাঁর, পুঁথিটা তো এ কার্যে তাঁর নিজের।[৪৪]

□ পর্ব / ২ □

কথকের জন্ম : পাঠ থেকে 'কথা'

বাংলাদেশে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে কথকদের বোলবোলা ছিল বলেই মনে হয়। 'সুরধুনী' কাব্যে গঙ্গা-প্রবাহের যাত্রাপথের সঙ্গে সঙ্গে দীনবন্ধু মিত্র বিখ্যাত জায়গা ও তাদের খ্যাতির কারণ বলছেন। তাঁর মতে, বাঁশবেড়িয়া (বংশবাটি) বা ভাট পাড়ার খ্যাতির পিছনে আছেন শ্রীধর কথক বা রামধন 'কথকরতন'।[১] অপরপক্ষে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রতিপক্ষদের জব্দ করতে কৃষ্ণহরি শিরোমণি নামে কথক চূড়ামণি সম্পর্কে চালু লোকগল্পকে মোক্ষম অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন।[২] গৌড়দেশ-খ্যাত কথকদের জন্ম ও কৃতি এই সময়কালে আবদ্ধ।

'বাগ্‌জীবন' বা কথোপজীবীরা মানুষজনকে আনন্দ দিয়ে দুই পয়সা কামাই করে এবং সেইজন্য কর দিতে তারা বাধ্য, কৌটিল্য সেইদিকে সজাগ দৃষ্টি কতকাল আগেই রেখেছিলেন।[৩] তবে উনিশ শতকে প্রচলিত দেশজ রীতিতে পুথি তৈরি করে পৌরাণিক আখ্যান বলার চল অষ্টাদশ শতকের আগে চালু ছিল বলে মনে হয় না।[৪] উনিশ শতকের প্রারম্ভে ওয়ার্ড সাহেবের বর্ণনায় স্পষ্ট যে, সেকালে মূল গ্রন্থ, পাঠ বা পারায়ণ হত। বিকেলে সাধারণের জন্য বাংলায় মূল গ্রন্থের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করতেন যাঁরা 'কথক' বলা হত তাঁদেরই।[৫] সংস্কৃত ও বাংলা, দুই ভাষার দুই গোত্রের পড়ুয়া : পাঠক ও কথক। ঊনবিংশ শতকের গোড়াতে জয়নারায়ণ ঘোষাল তাঁর 'করুণা নিধান বিলাসে' (১৮১১) পাঁচালি, রামায়ণ, তরজা ইত্যাদি অবসর বিনোদনের নানা অনুষ্ঠানের তালিকাতেও কথকতাকে স্থান দিয়েছিলেন।[৬]

লোকগ্রাহ্য জনশ্রুতি অনুসারে প্রতিযোগিতার চাপে ভাগবত পাঠকে চিত্তাকর্ষক করতে বাঁকুড়ার সোনামুখীর গদাধর শিরোমণি বঙ্গদেশে কথকতার ঢঙ চালু করেন। অন্ততঃ-পক্ষে বাংলা সাহিত্যের আদি ইতিহাসের চটি বইগুলিতে এই কথা বার বার লেখা হয়েছে।

> "বৈকালে শিরোমণি মহাশয় বেদীতে বসিয়া ভাগবতের কোন কোন স্থান ব্যাখ্যা করিতেন। তিনি উত্তম ব্যাখ্যাতা ছিলেন। অন্যান্য স্থানে তাঁহার ব্যাখ্যা শুনিতে বিস্তর লোক উপস্থিত হইত। কিন্তু ঐ স্থানে অধিক শ্রোতা আসিতেছে না দেখিয়া শিরোমণি মহাশয় তাঁহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শুনিলেন, নিকটে একস্থানে রামায়ণ গান হইতেছে। শিরোমণি মহাশয় বলিলেন 'আচ্ছা, সকলকে বলিবে কল্য হইতে আমার নিকট ভাগবত গান শুনিতে পাইবে'। তিনি যেমন সুপণ্ডিত তেমনি গায়ক ও কবি ছিলেন। রাত্রিতে পরদিনের ব্যাখ্যেয় অংশকে তাঁহার স্বকপোল উদ্ভাবিত কথকতার রীতিতে পরিণত করিয়া রাখিলেন। পরদিন বৈকালে নতুনরীতির কথকতা আরম্ভ করিলেন; চারিদিক হইতে লোক ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাঁহার স্বরসংযোগ, বাক্যবিন্যাস, ব্যাখ্যা ও সঙ্গীত পদাবলী শুনিয়া লোকে বিস্মিত ও মোহিত হইল। এইরূপে শিরোমণি মহাশয় প্রতিদিন ধ্রুবচরিত্র, প্রহ্লাদ-চরিত্র, দক্ষযজ্ঞ, বামনভিক্ষা প্রভৃতি শ্রীমদ্ভাগবতের অংশ সকল ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। ইহাই কথকতার প্রথম সৃষ্টি"।[৭]

প্রচলিত এই কাহিনীর সত্য-মিথ্যা নিরূপণ করা শক্ত। কিন্তু গ্রন্থ পাঠের ব্যাখ্যাংশ গীত ও গল্প সংযোগে পুনর্কথনই যে কথকতা এই ধারণা স্পষ্ট। গ্রন্থের পাঠ এই প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত হচ্ছে। ওয়ার্ডের সাক্ষ্যও অনুরূপ ধারণাকে সমর্থন করে। পরে দেখব পুথির প্রকরণ বিচারও একই ধরনের সিদ্ধান্তের অনুযায়ী। নির্দিষ্ট স্থান ও পাত্র নিয়ে অবশ্য বিতর্কের সুযোগ থেকে যাবে। স্থানমাহাত্ম্যের ক্ষেত্রে স্মর্তব্য যে পশ্চিমবঙ্গে আজও পেশাদার কথকদের অন্যতম প্রবীণের বাসস্থান হল বাঁকুড়ার সোনামুখী।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধের নামকরা কথক শ্রীধর ও রামধন শিরোমণি। তাঁদের জীবনীর তথ্য বিচার করলে কথক তৈরি হবার একটা ছক পাওয়া যায়। জীবনীগুলি মৃত্যুর পর লিখিত, পারিবারিক আত্মীয়দের কাছ থেকে সরেজমিন তদন্তে সংগৃহীত। ব্যক্তি বিশেষে তথ্যের হেরফের হতে পারে কিন্তু উনিশ শতকের আদর্শ কথক চরিত্র গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সংগৃহীত সাক্ষ্যগুলির ঐতিহাসিক তাৎপর্য অনস্বীকার্য।

১২২৩ সনে বাঁশবেড়িয়াতে এক পণ্ডিত বংশে শ্রীধরের জন্ম। বংশে কথকতা বা ভাগবত পাঠের ধারা ছিল। পিতা রতনকৃষ্ণ শিরোমণি সংস্কৃত চর্চা করতেন। তবে পিতামহ লালচাঁদ শিরোমণি ছিলেন কথক। ছেলেবেলা থেকে শ্রীধর ভাগবত পাঠে দীক্ষা পেয়েছিলেন হুগলির মালিপাড়া গ্রামের রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের কাছে। শ্রীধরের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত অতুল্যচরণ ভট্টাচার্যও কথকতাকে পেশা হিসাবে নিয়েছিলেন। অতএব পরম্পরা ছিল, বংশের আবহাওয়ায় শ্রীধর শিক্ষিত হয়েছিলেন। কিন্তু এই পাঠের ঘরাণায় শ্রীধর পাঁচালি গানে মেতে উঠলেন। ঘরানার প্রতিভূ জ্যেষ্ঠতাত জীবনকৃষ্ণ শিরোমণি আদৌ তা পছন্দ করলেন না। বিবাদ দেখা দিল। বহরমপুরে শ্রীধর ব্যবসায়ে দু-পয়সা উপার্জনের চেষ্টা করলেন। সেইখানেই তিনি কথক কালীচরণ ভট্টাচার্যের কাছে তালিম নিলেন। তালিম প্রধানত অভিনয়ের, মুখভঙ্গিমার। জীবনীকারের ভাষায় :

> "কথকতা নাট্য ভাবরসাদির অভিব্যক্তি। কোন অবস্থায় মানুষের কিভাব হইয়া থাকে, কথকতার অঙ্গভঙ্গে বা বাক্যরঙ্গে তাহা বিকশিত করিতে হয়। কথকতা শিক্ষার কালে শ্রীধর কখনো কোন বালকের হাতে সন্দেশ দিয়া কাড়িয়া লইতেন, আর দুইটি বিশাল চক্ষুর অন্তর্দৃষ্টিতে বালকের ও তখনকার সেভাব তুলিয়া লইতেন। আবার কখন বা বৃদ্ধের দন্তহীন মুখের কথার ভাব গ্রহণের জন্য কোন বৃদ্ধের সঙ্গে কথা কহিয়া, নির্নিমেষে তাঁহার রসনার গতিপ্রকৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করিতেন। সর্ববিধি ভাবাভিব্যক্তির বিকাশ সাধনায় তাহার এমনই সাধনা ছিল। তাই তিনি আদর্শ কথক হইয়াছিলেন।"[৮]

বর্ণনায় পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, শ্রীধর কথকতার রীতিতে ভাবাভিনয় যোগ করেন, সুরতালে গীত বসান। পাঠ্য কাহিনীর চরিত্রানুযায়ী অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তোলায় তিনি দক্ষ ছিলেন। নানা বিষয়ে গান লিখেছিলেন। দারুণ জনপ্রিয় হয়েছিল তাঁর গান, নানা লোকের নামে গানগুলো চলে আসে। কথকতার জন্য বিশেষভাবে পদাবলীও লেখেন। আদর্শ কথক গান গাইবেন ও অভিব্যক্তি অনুযায়ী অভিনয় করবেন, তা প্রত্যাশিত। পাঠ থেকে উনিশ শতকীয় কথকতার রূপান্তরের দুটি সূত্র এইভাবে পরিস্ফুট হল।

শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের পিতা রামধনের জীবনী প্রসঙ্গে আমরা আরেকটু বেশি খবর পাই।[৯] উনিশ শতকের প্রথমার্ধে তাঁর জন্ম, চব্বিশ পরগণার বারাসত মহকুমায় অবস্থিত খাঁটুরার

লব্ধপ্রতিষ্ঠ বড় বাড়িতে রামপ্রাণ বিদ্যাবাচস্পতির তৃতীয় পুত্র রামধন তর্কবাগীশ। রামচন্দ্র ন্যায়বাচস্পতির টোলে কৃতি ছাত্র ছিলেন রামধন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বেশ পসার হয়েছিল অথচ রামধনের অবস্থা অনুরূপ ছিল না। শিক্ষক রামরুদ্রের পরামর্শে সুকণ্ঠী ও পণ্ডিত রামধন কথকতাকে পেশা হিসাবে বেছে নেন, কারণ 'ইহাতে বিলক্ষণ দুই পয়সা উপার্জনের সম্ভাবনা আছে।' পণ্ডিতবংশে তিনিই প্রথম কথক কারণ জ্যেষ্ঠ রামরতন সুকণ্ঠী ও বাগ্মী হওয়া সত্ত্বেও কথকতাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেননি।

কথকতার রীতিতে রামধনও পরিবর্তনের কথা ভেবেছিলেন। ১৮ বছর বয়স থেকে পেশায় নামবার কথা তাঁর মাথায় ঢুকেছিল। কিন্তু প্রতিযোগিতা জোরদার, কৃষ্ণহরি ও গদাধরের রীতিকে টেক্কা দিতে হবে, শুধু মিষ্টি গলার জোরে পার পাওয়া যাবে না। প্রথমে তিনি ভাগবতীয় পণ্ডিতের কাছে পুরাণাদি পাঠ করে ভাগবতের গল্পকে নিজে সাজান এবং নিজস্ব বর্ণনা বা সাট বা চূর্ণী তৈরি করেন। কথকতার রীতিতে আখ্যানের টানে অনুপ্রাসবহুল বর্ণনার টুকরো টুকরো ছক জুড়ে দিলেন।
এরপরে তিনি সঙ্গীতে পারদর্শী চাকদ্বীপের (চাকদহ) নিকটবর্তী নারায়ণপুর গ্রামের পতিত ব্রাহ্মণ ভ্রাতৃদ্বয় রাম-শ্যামের সঙ্গে পরামর্শ করেন ও তাঁদের মতামত চান এবং তাঁরা 'রামধনের স্বরচিত ভাগবত ও চূর্নিকা শুনিয়া মোহিত হইল'।

তাঁদের উপদেশমতো রামধন কথকতার রীতিতে দ্বিতীয় অভিযোজন করলেন। শিমুলিয়ার কাঁসারিপাড়ার রাধানাথ দত্তের আনুকূল্যে একজন হিন্দুস্তানি গায়কের কাছে দুই বৎসর সঙ্গীত শিক্ষা করেন ও রাগ-রাগিনী-সহ কথকতার আখ্যানে 'মহাজনী পদাবলী' যুক্ত করেন। এটা রামধনের 'প্রণালী' যাকে উনিশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে 'অদ্ভুত সৃষ্টি' বলা হয়েছিল। মনে হয় যে ভাগবত থেকে কথকতার জন্য নির্দিষ্ট আখ্যান বাছা ও লেখা এবং সেই কাহিনীর মাঝে মাঝে পরিস্থিতি অনুযায়ী নির্দিষ্ট গানের বিন্যাসের রীতি রামধনের হাতে পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছিল। রামধনের কথকতার এই ধারা তাঁদের পরিবারের কেউ কেউ অনুসরণ করেছিলেন। লোকশ্রুতি অনুসারে কথকতায় উমাকান্তের সহজাত ক্ষমতা ছিল। কিন্তু মাত্র ৩৫ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। ভ্রাতুষ্পুত্র ধরণীধর শিরোমণি (১৮১৩-১৮৭৫) কথকতা করতেন। ধরণীধরের পসারের সীমা ছিল না, লক্ষাধিক টাকা আয় করেছিলেন, বর্ধমান রাজসভার কথক ছিলেন তিনি। আবার বঙ্কিমচন্দ্রের বাবা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতেও তিনি ডাক পেতেন। ধরণীধরের গলা সুরেলা ও পাঠে দক্ষতা ছিল অসাধারণ কিন্তু 'বিদ্যাসাধ্য' সেরকম ছিল না, নিষ্ঠাও পিতৃব্যতুল্য নয়। নতুনত্বের জন্য রামধনের পদাবলী বা সাট নানা লোকে ব্যবহার করত। কিন্তু ধরণীধরের রচনায় সেইরকম কোনো অভিনবত্ব ছিল না। চরিত্রদোষও নাকি ছিল। কিন্তু কথকতার অতুলনীয় গলাতেই তিনি আসর মাত করতেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর স্মৃতিতে সেই ছবি ধরা পড়েছে।

> "ধরণী কথক মহাশয় খুব ভালো কথা কহিতেন তাঁহার সুমিষ্ট অথচ গম্ভীর উচ্চ স্বরে প্রথম হইতেই আসর গম গম করিত। কিন্তু তিনি যখন হাঁ করিয়া গালের কাছে হাত আনিয়া গান ধরিতেন, তখন সমস্ত লোক মুগ্ধ হইয়া যাইত। আমরা তখন গানের কি বুঝি ? কিন্তু এখনো সে সুর কানে লাগিয়া আছে"।[১০]

চূর্ণী বা সাট তৈরি, গান রচনায় দক্ষতা ইত্যাদি নানা প্রকরণে রামধনী রীতি ও শৈলী গড়ে ওঠে।

ধরণীধর শিষ্য-প্রশিষ্য সৃষ্টি করেন। ঝোঁক ছিল ভাগবতী কাহিনীতে। অপরপক্ষে রাঢ় অঞ্চলে গদাধরী রীতি চালু ছিল। জোর দেওয়া হয়েছিল রামায়ণী কথকতায়। অন্যান্য অঞ্চলেও কথকতার নিজস্ব রীতি গড়ে উঠেছিল। যেমন কথকতার শিক্ষকরূপে উদ্ধব চূড়ামণির নামডাক ছিল। হাওড়ার বাগনান বা হুগলির ধনিয়াখালিতে তাঁর জন্ম হয়। হাটখোলার ভৈরবচন্দ্র বিদ্যালঙ্কারের টোলে তিনি পড়েন এবং পণ্ডিত রঘুনাথ শিরোমণির কাছে পাঠের শিক্ষা নেন। চন্দননগরে রঘুনাথ শিরোমণির টোল ছিল। প্রথম জীবনে রঘুনাথ গুপ্তিয়াতে ও বরানগরে ব্যাকরণ পড়াতেন। পরে গোন্দলপাড়া নিবাসী গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মাতার আগ্রহে চন্দননগরে বাস করতে শুরু করেন। দক্ষিণেশ্বরে তাঁর কথকতার আসর বসত। উদ্ধব চূড়ামণি তাঁর শ্রেষ্ঠ ছাত্র। এই উদ্ধব ঠাকুরেরই ছাত্র মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৩২০ সালে উদ্ধবের মৃত্যু হয়। রঘুনাথ শিরোমণির পুত্র রামনাথ চট্টোপাধ্যায়ও যশস্বী কথক ছিলেন। ১৩৩১ সালে তিনি জীবিত, চন্দননগরে বাস করেছেন এবং হুগলির অগ্রগণ্য কথক। সঙ্গে সঙ্গে টপ্পা গেয়েও তিনি আসর জমাতেন।[১১]

পূর্ববঙ্গের কথকদের মধ্যে কৃষ্ণকান্ত পাঠকের বেশ নামডাক ছিল। ১২২৮ বঙ্গাব্দে ফরিদপুর জেলার কাসাভোগে তাঁর জন্ম ও ১২৯৮ বঙ্গাব্দে মৃত্যু হয়। ৭০ বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি গান তৈরি করেছিলেন ও দাপটে গান গাইতেন। ঢাকা জেলার বিক্রমপুর ফুরশাইল বা ফুল্লশালী গ্রামের কালাচাঁদ বিদ্যালঙ্কারের খ্যাতি ছিল অভিনব আখ্যান ও শ্লোক ব্যাখ্যায়। ভাগবতের কাহিনীর তাক লাগানো ব্যাখ্যা করতেন তিনি। অঞ্চলে 'কিশোরী ভজন' সম্প্রদায়ও তিনি প্রতিষ্ঠা করেন, ভক্তরা তাঁর নিজস্ব পাঠ ও ব্যাখ্যাকে মান্য করত। উনিশ শতকে কথক হিসাবে ধর্মসম্প্রদায় তৈরি করার কৃতিত্ব তাঁর।[১২]

কথকদের রাজত্বে পুরুষদেরই আধিপত্য ছিল। দ্বারকানাথের আমলে ঠাকুরবাড়িতে নিয়মিত একজন বৈষ্ণবী ঠাকুরাণী আসিতেন। এ প্রসঙ্গে স্বর্ণকুমারী দেবীর সাক্ষ্য :

> "সংস্কৃত বিদ্যায় ইহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল অতএব বাঙ্গালা ভাল জানিতেন ইহা বলা বাহুল্য। উপরন্তু ইহার চমৎকার বর্ণনশক্তি ছিল, কথকতা-ক্ষমতায় ইনি সকলকে মোহিত করিতেন। যাঁহাদের বিদ্যালাভের ইচ্ছা নাও বা

থাকিত, তাঁহারাও বৈষ্ণবী ঠাকুরাণীর দেবদেবী বর্ণনা, প্রভাত বর্ণনা, শুনিতে কুতূহলী হইয়া পাঠগৃহে সমাগত হইতেন।"[১২ক]

বৈষ্ণবী ঠাকুরাণী অন্তঃপুরে বৈঠকী কথকতা করতেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও বিপিন পালের লেখা থেকে জানা যায় যে বৃন্দাবনে একজন বাঙালি মহিলা আসরে ভাগবত পাঠ করতেন। তাঁর ব্যাখ্যা ও পাঠ শুনতে জনসমাগমও হত। বিংশ শতকের গোড়ায় হাওড়ার আমতা অঞ্চলের রামচন্দ্রপুর গ্রামে কলকাতা থেকে একজন পেশাদার গায়িকা এসে কয়েকদিন ধরে ভাগবত পাঠ করেছিলেন।[১২খ] কিন্তু পুরুষ কথকদের নাম জানলেও মহিলা কথক ও পাঠকদের নাম ধাম কোনো কিছুই জানা যায় না। সভায় পেশাদার মহিলা কথক হিসাবে এই শতকে চন্দননগরের ক্ষান্তিলতা দেবীই বোধ হয় প্রথম। পরে কোন্নগরের বাসন্তী দেবী, কৃষ্ণা বকসী প্রমুখ বিদুষী মহিলারা আসরে পাঠ ও কথকতা করে সুনাম অর্জন করেছেন। কথকতায় পরিবার ও পরম্পরার কথা ঘুরে ফিরে আসছে। দেখা যায় যে কথকতার রবরবার যুগে কথকতার শিক্ষক হিসাবে কয়েকজন নাম করেছেন। অধিকাংশই ব্রাহ্মণ, পরন্তু কথকতা বৈষ্ণবদের একচেটিয়া। শাক্ত সাধনার ধারায় পেশাদার কথক হিসাবে কাউকে দেখা যাচ্ছে না।[১৩] ডাকসাইটে কথকদের সবাই পণ্ডিত, সংস্কৃতে কিছু না কিছু অধিকার সকলেরই আছে। তবে সংখ্যায় অল্প হলেও কিন্তু অন্য ধরনের কিছু কথকেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতকে মেদিনীপুরের হরিহরপুর গ্রামে ভরদ্বাজ গোত্রের দে বংশীয় কায়স্থ ছিলেন দুঃখী শ্যামদাস। সংস্কৃত জানতেন না। ভাগবতের পাঠ শুনে নিজেই পাঠ ও গাইবার উদ্দেশ্যে "গোবিন্দ মঙ্গল" কাব্য লেখেন এবং সেই গ্রন্থটি তাঁর পরিবারে পূজিত হয়। পাঠক ও গায়ক হিসাবে তাঁরা গুরুবংশ, অধিকারী পদে সম্বোধিত। শিষ্যরা প্রায়শই নিম্নবর্ণের। গ্রামে গ্রামে ঘুরে গ্রন্থ পাঠ করা শ্যামদাসের (আমৃত্যু ১৭৮৩) জীবিকা ছিল, গেয় গ্রন্থের আখ্যান তাঁরই সৃষ্টি।[১৪]

আধুনিককালে শান্তিনিকেতনের ভুবনডাঙা নিবাসী অবনী অধিকারী অনুরূপ আরেকটি চরিত্র। জাতে শূদ্র, আদি নিবাস বীরভূমের থানা মেজিয়া, গ্রাম রাইডিহি। পূর্বপুরুষ রামদুর্লভ অধিকারী ও মাঘারাম অধিকারী রামায়ণ গান গাইতেন, নিজেদের দল ছিল। তিনি নিজে পড়েছেন অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত। পরে গানের দলে পাচকের কাজ করেন, সঙ্গে সঙ্গে বাজনা বাজাতে শিখলেন। দাদা কানাই অধিকারী প্রধান গুরু, তাঁর কাছ থেকে পালা তৈরি করার কায়দা অবনী আয়ত্ত করেন।[১৫] শ্যামদাস ভাগবতী গাইতেন। অবনী গান রামায়ণী।

কিন্তু শ্যামদাস বা অবনীর পরম্পরাতে ও পারিবারগত শিক্ষানবিশির চিহ্ন আছে। অবশ্য একক প্রচেষ্টাতে কথক হয়ে ওঠার নিদর্শন পাওয়া যায়। শিবপুরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ মুন্সেফ বসন্ত কুমার পাল-এর বিশেষ পরিচিত ছিলেন রাণাঘাটের মাঝের গ্রামের বাসিন্দা উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। গলা খুব ভাল, গান গাইতেন। হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত জজ রমেশবাবুর [সেনের ?] আনুকূল্যে তার ভাই পাখোয়াজবাদক কেশববাবুর কাছে

সঙ্গীতে কিছুটা শিক্ষা নেন। পরে কথকতা করাটাই পেশা হিসাবে বেছে নেন। রমেশবাবুর সুপারিশে প্রেসিডেন্সি কলেজের নীলমণি পণ্ডিতের কাছে কিছুটা সংস্কৃতও শেখেন। ভাল কথক হবার অন্যতম প্রাকশর্ত ভাল সংস্কৃত জানা। ১৮৯৫ সন নাগাদ ঢাকায় তিনি বসন্তবাবুর পরিবারে আশ্রয় নেন এবং নতুন পেশায় হাতে-কলমে নেমে পড়েন। ঢাকার উকিল ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ দুর্ঘটনায় বিপর্যস্ত, তাঁদের বাড়িতেই আসর বসানোর বন্দোবস্ত হল। বসন্তবাবুর তত্ত্বাবধানে ও উৎসাহে উপেন্দ্রনাথ কথক হিসাবে জীবন শুরু করলেন।[১৬]

> "সংস্কৃতে খুব বড় পণ্ডিত না হোলেও গলাটি ছিল অতি মধুর, তাই যত সময়োচিত গান বেশী হয়, তার জন্যে আমি তাঁকে অনুরোধ করি, কারণ তাহাতেই লোক বেশী আকৃষ্ট হবে।
>
> "আমি তখন বেকার বসে থাকি—সমস্ত দুপুরবেলা কথক মহাশয়ের রিহারসেল দেওয়া—কথকতার মহলা শুনতাম, আর যেখানে পরিবর্তন করলে ভাল মনে লাগত তা তাঁকে বলে দিতাম। সন্ধ্যা থেকে আরম্ভ হয়ে ৩/৪ ঘণ্টা পাঠ হতো সহরের গণ্যমান্য প্রায় সকলেই আসতেন, স্বামীজীও এসে বসতেন। চির প্রথামত দুই চারটি সংস্কৃত পদাবলী না গাইলে নয়, প্রচুর বাংলা গান, এমনকি আধুনিক গানও সময়মত লাগিয়ে দিতেন তাতে সকলের আরো মনোরঞ্জন করতেন। একমাস সেখানে কথকতা হয়েছিল সকলেই বেশ খুশী হয়েছিলেন ব্রাহ্মণের প্রাপ্তিও আশাতীত হয়।"

উপেনী কথকতা স্পষ্টতই পরম্পরা বহির্ভূত, রামধনী বা গদাধরের রীতির সঙ্গে বড় একটা মিল নেই। কিন্তু জমাটি গানের জোরে তাঁর বেশ পসার হয়েছিল। বর্ধমান রাজবাড়িতেও 'বাঁধা বেদি' পেয়েছিলেন। ১৯১৪ সালে অসুখে তাঁর কণ্ঠস্বর নষ্ট হয়, কথকতার পেশাও তিনি আর করতে পারেন না। উনিশ শতকের শেষে উপেনী কথকতার ঢঙ ঐতিহ্যানুসারী রীতি তরলীকরণের নিদর্শন। এই রীতির বিরুদ্ধে এই সময় প্রতিক্রিয়া দেখা যায়।[১৬ক] কথকতা ও পাঠের ধারায় তৃতীয় প্রতিসরণ আসে, যদি গদাধর প্রথম এবং রামধন ও শ্রীধর দ্বিতীয় প্রতিসরণের জনক হন, তবে তৃতীয় রীতির উদ্ভাবক হলেন প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী (১৮৬৬-১৯৪৪) ও তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যরা। প্রথমত, উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে একটি সংগঠিত আন্দোলন শুরু হয়। নিখুঁত সম্পাদনাসহ বৈষ্ণব গ্রন্থ মুদ্রণ, বিধিবদ্ধ নিয়ম প্রবর্তন ইত্যাদি পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী নানা স্থানে 'হরিসভা' প্রতিষ্ঠিত করতে লাগলেন ও শ্রীপাটগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করতে যত্নবান হলেন। ভাগবত পাঠ ও কাহিনী বর্ণনা, বৈষ্ণব মহোৎসবের আয়োজন করা ইত্যাদি হরিসভাগুলির নিত্যকর্ম ছিল।

গ্রন্থাগার স্থাপন করাও শুরু হল। অন্যত্র নানা বৈষ্ণব 'উপসম্প্রদায়ের' উপর আক্রমণ চলল, গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মতানুগ 'নিষ্কলুষ' 'শাস্ত্রসম্মত' ব্যাখ্যার জন্য গোস্বামীরা

একজোট হলেন, হাত মেলালেন বিমানবিহারী মজুমদারের মতো সুপণ্ডিত।[১৭] এই প্রেক্ষাপটে গৌড়ীয় সম্মিলনীর (১৪ই বৈশাখ, ১৩৩৮ সন) উদ্যোগে প্রচলিত কথকতা ও পাঠ-রীতিকে সংশোধিত করার কথাও ভাবা হয়। দীনেশচন্দ্র সেনের সহযোগিতায় প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ কীর্তন ও কথকতাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমের অন্তর্গতও করতে চেয়ে ছিলেন ; পরীক্ষা নেবার ও ডিগ্রি দেবার কথা ভেবেছিলেন।[১৮]

দ্বিতীয়ত, এই আন্দোলনে পাশ্চাত্য শিক্ষিত পণ্ডিতরা অংশ নিলেন। টোলে পড়া সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের জায়গায় এলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত, অধ্যাপনা পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিরা। ঢাকার প্রভুপাদ প্রাণকিশোর গোস্বামী (১৮৯৯-১৯৮০) এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পূর্ব বাংলার মফস্বলে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের মাধ্যম হিসাবে পাঠ ও কথকতাকে তিনি ব্যবহার করেন। কৃতি ছাত্র অধ্যাপকরূপে তখন ননী ঠাকুরের নামডাক ছিল।[১৯] পাশ্চাত্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত কথক ও পাঠকদের ধারা বৈষ্ণব সম্মিলনী আন্দোলনের সময় থেকে শুরু হয়। আধুনিককালে অধ্যাপিকা বাসন্তী চৌধুরি এই রীতির পদাঙ্কানুসারী।

প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর জন্ম নিত্যানন্দ বংশে। পাঠ ও কথকতার আবহাওয়ায় তিনি মানুষ হয়েছেন। পিতা মহেন্দ্রনাথ গোস্বামী স্বয়ং যশস্বী পাঠক ছিলেন। চাকরি ছেড়ে পাঠকতা তাঁর পেশা হয়। কাঁসারিপাড়ার তারকনাথ প্রামানিকের বাড়িতে কথকতা, পাঠ, কীর্তন লেগেই থাকত এবং সেই বাড়িতে অতুলকৃষ্ণের নিত্য যাতায়াত ছিল। কিন্তু নীলকান্ত গোস্বামীর ব্যাখ্যাই তাঁকে অভিভূত করত। ঘটনাচক্রে পাটনার বাঁকিপুরে মথুরবর্মনের বাড়িতে তাঁকে একটি অনুষ্ঠানে ব্যাসাসনে বসতে হয় ও স্মৃতির উপরে নির্ভর করে "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত" (ভাগবত, ১ম স্কন্ধ, ১ম অধ্যায়) শ্লোকের ব্যাখ্যা নীলকান্ত গোস্বামীর অনুসরণে প্রদান করেন। 'পুঁজির ভিতর একটি মাত্র শ্লোক।' তবুও সেই দিনের প্রশংসা ও বাহবা যুবক অতুলকৃষ্ণকে পাঠক হিসাবে আবির্ভূত হতে প্রণোদিত করে। ডাকও আসতে লাগল, কারণ 'গোঁসাইয়ের ছেলে, ভাগবত জানে না, এ কখন হতে পারে!' নানা অন্য খেয়ালে অতুলকৃষ্ণ ছেলেবেলায় মত্ত ছিলেন। গুরু বংশের এই দায়িত্বে তাঁর, সেই অর্থে, শিক্ষা ছিল না, জানতেন মাত্র একটি শ্লোকই। তাই দিয়ে কতদিন চালান যায়! কিন্তু অবস্থা বেগতিক। এ প্রসঙ্গে অতুলকৃষ্ণের নিজের জবানি শোনা যাক :

> "মনসাতলাগলির ৮ নং দর্প নারায়ণ ঠাকুরের ষ্ট্রীট। ৺গয়া প্রসাদ মল্লিক বাবার শিষ্য। তাঁহার স্ত্রীর ইচ্ছা হইল—নিয়মসেবার সময় একটু করিয়া ভাগবত শুনেন। আমাকে অনুরোধ করায় রাজি হইলাম। দশম স্কন্ধ পাঠ আরম্ভ হইল। পাঠের শেষে তাঁহারা একটু ব্যাখ্যা শুনিবার আব্দার করিলেন। তাহাও পূর্ণ করিতে হইল। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া ব্যাখ্যার উপকরণ সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। রাত্রে নীলকান্ত গোস্বামী মহাশয়ের ব্যাখ্যা এখানে ওখানে শুনিয়া বেড়াইতে ও বেদান্ত

আলোচনা করিতে লাগিলাম। আমার ব্যাখ্যা সকলের পছন্দসই হইতে লাগিল। কিছু টাকাও পাইতে লাগিলাম। উৎসাহ খুব বাড়িয়া যাইতে লাগিল। এইরূপে আমি ক্রমশঃ একজন ব্যাখ্যাতা হইয়া পড়িলাম।"[২০]

ছেলেবেলার বখাটে ছেলে অতুলকৃষ্ণ ধীরে ধীরে বংশগত পেশায় ফিরে এলেন। ভূদেব কবিরত্নের অনুরোধে ও যোগেন্দ্র নাথ কবিরাজ প্রমুখ পণ্ডিতদের উপস্থিতিতে ১৩০১ সনে অতুলকৃষ্ণ রামকানাই অধিকারীর ঠাকুরবাড়িতে হরিসভার সাংবাৎসরিক উৎসবে 'যমলার্জুন ভঞ্জন' ব্যাখ্যা করলেন, শিষ্যবাড়ির আঙিনা ছাড়িয়ে এতদিনে সভাসমিতিতে অতুলকৃষ্ণ তাঁর স্বীকৃতি পেলেন, নিজস্ব রীতিও উদ্ভব করলেন। প্রচলিত পাঠ ও কথকতার রীতি থেকে তা ভিন্ন। হরিসভা আন্দোলন গড়ে ওঠার সময় ঢাকা জেলার বুধনী গ্রামের প্রাণগোপাল গোস্বামী তাঁর সহযোগী হন। অতুলকৃষ্ণের তালিমে সতেজ কণ্ঠের অধিকারী প্রাণগোপাল হরিসভার আসরে পাঠের এই রীতিকে প্রতিষ্ঠিত করায় সচেষ্ট হলেন। প্রাণকিশোর প্রাচীনের সঙ্গে নতুন ও প্রচলিত রীতির সুন্দর তুলনা টেনে লিখেছেন :

"সেই প্রাচীন কথকরা দিনের পর দিন ভাগবতীয় প্রসঙ্গ লইয়া কথকতা করিতেন। এই কথকতার রীতি ব্যাখ্যা-রীতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের। কথকেরা গান গাহিতেন, অঙ্গভঙ্গী করিতেন, **অথবা** প্রায়শঃ রসিকতার অবতারণা করিতেন, পুরাণকথা অবলম্বন করিয়া **বিচিত্র উপন্যাস সৃষ্টি করিতেন,** শুধু তাহাই নয় এক পুরাণের কথায় বহু পুরাণের কথা ও দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করিয়া কখনও বা ভাষার ছটায় কখনও বা গুরু গৌরবকণ্ঠের গাম্ভীর্যে পুরাণ কথাকে একটি অভিনয়ের পর্যায়ে নিয়া ফেলিতেন। **গীতি-নাট্যের মত এই কথকতা** আগাগোড়া **ধারাবাহিক সঙ্গীতের মতই মনে হইত।** কথকগণের কথকতায় নানা রাগ-রাগিনীর আলাপ হইত—কখনও কখনও বা প্রাণগলানো কীর্তন আবার কখনও বা হাসির ফোয়ারা ছুটিত শ্রোতৃ-বৃন্দের মহলে। প্রাণগোপাল প্রভু পাঠ আরম্ভ করিলেন **পূর্বাচার্যগণের ব্যাখ্যা** টীকার মাধুর্য পরিবেশন রীতিকে অবলম্বন করিয়া। শ্রীরূপসনাতন শ্রীজীব ভাগবতের ব্যাখ্যায় যে সিদ্ধান্ত সম্পুটিত করিয়াছেন, শ্রীপাদ বিশ্বনাথ যে রসবিন্যাস পরিপাটী দেখাইয়াছেন, সেই সকল বিষয় হইল প্রাণগোপালের পাঠের মূল উপাদান। এই অভিনব রীতি প্রদর্শনে শ্রোতাদের চমক লাগিল, ভাবুকের ভাব উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, ভক্তের প্রাণ গলিয়া গেল আর সর্ব-সাধারণের মনে ভাগবতের মহিমা প্রসারলাভ করিল দ্রুতগতিতে।"[২১]
(নজরটান আমার)

প্রাণকিশোরও এই রীতিভুক্ত। কথকতার আদর্শ সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব বক্তব্য :

"যে যত আবোলতাবোল বলতে পারবে সেই-ই তত ভালো কথক হে।... এখন ছাপা বই থেকে কিছু টুকে নিলে আর নিজের মনোমত কতগুলো

গান ছড়া, রচনায় একটু রঙ্গরস জমাতে পারলেই হল। কাজেই গান আর গল্পই হয় কথকতার প্রধানতম অঙ্গ। যথার্থ শাস্ত্র তাৎপর্য, সে পড়ে থাকে অনেকটা পশ্চাতে। যারা নিছক শাস্ত্র কথা নিয়ে এ বাজারে নামবে তাদের জমাতে ঘটাতে একটু বেগ পেতেই হবে।"২২

আসলে অতুলকৃষ্ণ, প্রাণগোপাল ও প্রাণকিশোর ফিরতে চেয়েছিলেন তত্ত্বআলোচনায়। কথকতার দুটি মেরু আছে, শ্রোতাদের চিত্ত বিনোদন এবং ভাব ও তত্ত্বের ব্যাখ্যা। লোক মনোরঞ্জনের জন্য কথার সুকুমার বিন্যাস কথকরা করতেন। কিন্তু উনিশ শতকের প্রান্তে সংস্কারবাদী ভাগবতী পণ্ডিতদের মনে হল যে এই বিন্যাসে তত্ত্ব হারিয়ে যাচ্ছে, কথকতাটা তো কাব্য নয়; তার উদ্দেশ্য ধর্মপ্রচার, শুকদেব পরীক্ষিৎকে যেভাবে পরকালের পথ চিনিয়েছিলেন। তাঁরা গদ্য বিন্যাসকে মেনে নিলেন, টীকা অনুমোদিত পাঠে নিজেদের বিন্যাস আনলেন। সংস্কৃত ভাষাকে পরিহার করে টুকরো টুকরো ছোট বাক্যে কথা সাজালেন। কিন্তু উদ্দেশ্য কথকতার বিন্যাসকে তত্ত্ব আলোচনার কাঠামোয় আনা। উদাহরণ দেওয়া হল কোনো গভীর তত্ত্বের অনুষঙ্গে, গল্পও বলা হল সেই প্রসঙ্গে। গল্পের অনুষঙ্গে তত্ত্ব এল না। প্রাণকিশোর ঘরোয়া ধরনের সংলাপে তত্ত্ব ব্যাখ্যা করার রীতি নিলেন, জীবের ব্রহ্মসাযুজ্য দেখাতে গিয়ে বললেন :

"তেল সলতে যতক্ষণ আছে, প্রদীপও জ্বলিতেছে। কামকামনা আছে। জীব একযোনি হতে অন্য যোনিতে চলিতেছে। তেল সলতে গেল, প্রদীপ নির্বাপিত।"২৩

পাঠের এই রীতি বরানগরের পাঠবাড়ির কেদারনাথ রায় কাব্যপুরাণ-ব্যাকরণতীর্থও নিয়েছিলেন। তাঁর ভাষণ বিন্যাস চিরাচরিত আখ্যান অনুযায়ী নয়, বরং তত্ত্ব অনুযায়ী, সমস্যা অনুযায়ী। যেমন—গুরুতত্ত্ব, জীবস্বরূপ ইত্যাদি। সমস্যা তোলা হয়েছে, ভাগবতে ভক্ত চরিতের প্রবেশ কেন ? উত্তর দিতে লৌকিক উদাহরণ টানা হল :

"চিকিৎসক যখন রোগী দেখেন, তখন রোগ সম্পূর্ণ নিরাময় না হলে শক্ত জিনিশ খেতে দেন না। তরল জিনিশ খাইয়ে রাখেন, ক্ষুধা বাড়লে ধীরে ধীরে শক্ত জিনিশ খেতে দেন। শিশু ভূমিষ্ট হলেই তার অন্নপ্রাশন হয় না। ছমাস দুধ খাইয়ে অন্ন হজমের পাকস্থলী তৈরী করা হয়। তারপর অন্নভক্ষণ। তেমনি করেই শুকদেব পরীক্ষিতের কৃষ্ণতৃষ্ণা জাগবার জন্য ভক্তচরিত বলেছেন।"২৪

এই পাঠেও বক্তার নিজস্ব বিন্যাস আছে, ক্রম তিনিও অনুসরণ করেছেন। কিন্তু স্বর গীতি বা নাটিকার প্রবন্ধে গ্রন্থনা নিহিত নেই বরং তত্ত্ব প্রচারের বন্ধনে আবদ্ধ।

আসলে পাঠক ও কথকের মধ্যে, তত্ত্ব বিন্যাস ও গল্পের দাবির মধ্যে টানাটানি, কামড়া-কামড়ি আছে। রামধনের জীবনের দুটি প্রচলিত কাহিনীতে এই টানাপোড়েন সুস্পষ্ট। পাঠক বা পণ্ডিতরা যে জনপ্রিয় কথকদের সবসময় খুব পাত্তা দিতেন, তা নয়। প্রচলিত লোক কাহিনী অনুসারে রামধনের জীবনে এইরকম অভিজ্ঞতা বার বার হয়েছে। উনিশ

শতকের ধনিয়াখালি ছিল পাঠক ও কথকদের বড় আড্ডা। একসভায় একদিন রামধন বেদিতে বসে ভাগবত ব্যাখ্যা করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে 'পাঠক মহাশয় প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন যে কথকতা করাই কথকের কর্তব্য ; কথক কর্তৃক ভাগবত ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন নাই'। সেদিনের শাস্ত্র আলোচনায় পরাস্ত রামধন কাশীতে বেদ ও বেদান্ত অধ্যয়ন করে তাঁর জ্ঞানের খামতি পূর্ণ করেন। আবার আরেকবার রামধনের কথকতা শুনে ভট্টপল্লীবাসী পণ্ডিতগণ 'রামধন লেখাপড়ায় জল দিয়াছেন বলিয়া ব্যঙ্গ করেন।' প্রত্যুত্তরে রামধন সংস্কৃতে আলোচনা শুরু করেন। পুরুষরা তুষ্ট হলেও মেয়েরা একবর্ণ কিছু বুঝল না। "তখন রামধন পুনরায় সাধুভাষায় কথা কহিয়া ভট্টপল্লী-বাসিনী বামাগণকে পরিতৃপ্ত করিয়া স্বকীয় বাসভবনে প্রত্যাগত হইলেন।"[২৫]
কথকতা আখ্যানমূলক। কথাকাহিনী ও সঙ্গীতে বিধৃত পাঠে এই সব থাকতে পারে কিন্তু তা বিধিমার্গে আবদ্ধ, তত্ত্ব আলোচনা ও সমস্যা নিরসন পাঠকের উদ্দেশ্য। পাঠ একটি ওজনে বাঁধা, সেখানে হালকা হবার জো নেই। কথকতা এবং পাঠে নিজস্ব বিন্যাস বিংশ শতকে সবাই করেন কিন্তু স্বর ও কাঠামোতে থেকে যায় বেশ কিছু ফারাক। প্রকরণ বিচারের সময় এই শাস্ত্রে আবার ফিরে আসব।

□ পর্ব / ৩ □

ক. কথকতার পেশা : পোষ্টা ও প্রণামী

কীর্তন বা রামায়ণী গানের দল থাকে, কথক বা পাঠক একাই অনুষ্ঠান জমান। কিন্তু দুটোই পেশা, দুটোর জন্য প্রতিযোগিতা আছে, দুটোর পোষ্টা দরকার। সমাজের অবয়বে রদবদলের সঙ্গে সঙ্গে পোষ্টাও বদলে যায়। জমিদার পরিবাররা কথকদের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিল। কিছু কিছু জমিদারবাড়ির বাঁধা কথক ও পাঠক থাকত। বিক্রমপুরের তেলিরবাগের ভূঁইঞারা যখন বসতি স্থাপন করেছিলেন তখন 'বৃত্তি' বা চাকরান জমি দিয়ে গ্রামে লোক বসিয়েছিলেন—যেমন, নাপিত, ধোপা ভূঁইমালি ইত্যাদি। এদের সঙ্গে নিয়ে আসা হয়েছিল সংস্কৃতজ্ঞ গোলকচন্দ্র চক্রবর্তীকে। বাবুদের বাড়িতে কথকতা ও পাঠ করা তাঁর কাজ। গ্রামে তাঁর ভিটাকে সবাই পাঠকবাড়ি বলত। রামকৃষ্ণ পরমহংসের কাছে বরানগর থেকে আসতেন যুবক নারায়ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কথকতা ছিল তাঁর পেশা। সেই সূত্রে বেলঘরিয়ার জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে দেবোত্তর জমি দেন এবং বরানগরের কুঠিঘাটে তাঁর বসতবাটি সেই ভূখণ্ডের উপরে আজও আছে।[১] হুগলির রাধানগরের জমিদার তীর্থভ্রমণ প্রণেতা যদুনাথ সর্বাধিকারীর সান্ধ্য আসরে নিয়মিত হাজিরা দিতেন গ্রামের পাঠক ও কথক গোপাল চূড়ামণি। প্রত্যেকদিন অনেক রাত্রি পর্যন্ত ভাগবতের পাঠ হত। কিন্তু কার্তিকমাসে বিশেষ উৎসব উপলক্ষে গোঁসাই মালপাড়া গ্রাম থেকে একজন গোস্বামী আসতেন। ঠাকুর

দালানে সমস্ত কার্তিক মাস ধরে সকালে ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং অপরাহ্নে কথকতা হত। জমিদারবাড়িতে এই সময় পাঠ করার জন্য তাঁর আসর বাঁধা থাকত।[২] কথা ব্যবসায়ী হিসাবে ঢাকা জেলার সাভার নিবাসী ভারতচন্দ্র রায় ত্রিপুরার রাজসভায় নিয়োজিত ছিলেন। তার মাসিক বেতন ছিল ৬০৲। তবে দীনেশচন্দ্র সেনের বর্ণনা থেকে মনে হয় যে ভারতচন্দ্র ঠিক কথক নয়, গল্প বলিয়ে ছিলেন।[২ক] লক্ষ করার বিষয়, ছেলের গানের খ্যাতির খবর শোভাবাজারের রাজবাড়িতে অনুষ্ঠিত এক কথকতার আসরে নিধুবাবুর মা শুনেছিলেন।[৩] নানা উপলক্ষে এই রকম আসর বসত। শ্রাদ্ধ ইত্যাদি দশকর্মাদিও উপলক্ষ হতে পারত, তীর্থভ্রমণ সমাপ্তি শেষেও গিন্নিমা আসর বসাতে পারতেন। আবার ব্রত উদযাপন সংকল্পে ও পারিবারিক বিপর্যয়ে মনে শান্তি পাবার জন্য কথকদের ডাকা হত। কথকরা আসতেন। দোল, রাস ইত্যাদি বাৎসরিক উৎসবেও কথকদের ডাক পড়ত। তবে পুরাণ পাঠ ও কথকতার নাকি উৎকৃষ্ট সময় ছিল অন্তর্জলি যাত্রা। মৃত্যুর প্রাকমুহূর্তে শুকদেব পরীক্ষিৎকে ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করে শুনিয়েছিলেন। তাই কৃষ্ণমোহন শিরোমণি বা কৃষ্ণহরি কথক গঙ্গাতটে ওইরকম কথকতার আসরে দানগ্রহণ পর্যন্ত করতেন না।[৪]

সময়মাফিক আসর নানা রকম হতে পারত : বৈঠকী আসর, একদিনের কথা বা মাসাধিক পাঠ। আয়োজন বা দক্ষিণাও সেই অনুযায়ী হত। কথকদের অবশ্য আসর পাবার জন্য চুক্তি করতে হত, চুক্তির খেলাপ হলে আসর হাতছাড়া হবার সম্ভাবনা ছিল। তাই 'দেহকৃৎ ঠাকুরকে' (পিতাকে) বীরভূমের সেবক শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র দেবশর্মা লিখছেন—

> "সাঁখপুর হইতে মনুষ্য আসিতেছে ৪ রোজ জৈষ্ঠ না জয়া হইলে জবাব হইবে দ্বিতীয় কথক আসিবে অতএব ৩ রোজ জৈষ্ঠ সাঁখপুর মোকাম জাইতে হইবেক জানিবেন...পুনুছ নিবেদন কুনুক মোতে ওজর না হয় তাহা করিবেন সে স্থানেতে দিন দুয় কথা কহিয়ে আসিবেন য়ধিক কি লিখিব"[৫]

জমিদার ছাড়াও গ্রামে উঠতি সম্পন্ন গৃহস্থরা কথকদের বেশ বড় পৃষ্ঠপোষক ছিল। উনিশ শতকে নানা জাতি সমাজে মর্যাদা লাভে সচেষ্ট হয়েছিল। উন্নতিকামী 'নবশাখ' গোষ্ঠীরা বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেছিল। নানা উপলক্ষে তাঁরা কথকতার আসর বসাতেন। এই পরিস্থিতিতে রামধন তর্কবাগীশ কথকতার পেশায় ঢুকে পড়ার সুযোগ পান। খাঁটুরার সিদ্ধরাম রক্ষিত জাতে তাম্বুলি, দালালির কাজে বেশ কিছু উপার্জন করেন। পাঁচ টাকা বায়না নিয়েও শেষপর্যন্ত গদাধর শিরোমণি তাঁর বাড়িতে কথকতা করতে অস্বীকার করেন। শেষ মুহূর্তে কৃষ্ণহরিকে ধরে আনা হয়, রামধনকে কথকতার ধারক হিসাবে নিযুক্ত করা হয়।[৬] তারাশঙ্করের লাভপুর গ্রামে ব্যবসায়ীরা কথকতার আসর দিতেন।[৭] কানুঠাকুরের বংশধর নদীয়ার ভাজনঘাটের কৃষ্ণকমল গোস্বামীর প্রধান পৃষ্ঠপোষক তো ছিলেন সুবর্ণ বণিক সম্প্রদায়। ঢাকা নিবাসী মদনমোহন পোদ্দার সাহাদের নেতা, তিনি ঢাকাতে কৃষ্ণকমলের থাকার প্রথম বন্দোবস্ত করেন। সুবর্ণ-বণিকদের আনুকূল্যে তিনি 'পৌরাণিক বৃত্তি' অবলম্বন করে জীবিকা নির্বাহ করেন।

এই ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের যোগাযোগ সূত্রে কলকাতাতেও তাঁর ডাক আসে, ঢাকা নিবাসী ব্যবসায়িগণের যত্নে তিনি বড় বাজারে কথকতা করেন। আবার সেই আসরে উপস্থিতির সূত্রে টালিগঞ্জেও রামদিয়াবাসী কুণ্ডুদের আড়তবাটিতে তিনি পাঠের আমন্ত্রণ পান। এক আসর থেকে অন্য আসরে যাবার যোগাযোগ হয়। সেখান থেকে খিদিরপুর নিবাসী কায়স্থ নীলরতন সরকারের ভবনে এক সপ্তাহ ধরে তাঁর পাঠ ও কথকতা চলে।[৮] ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের নিজস্ব যোগাযোগ, আসরে উপস্থিত ভক্ত শ্রোতাদের আগ্রহ এবং নিজ বাড়িতে কথকতার আয়োজন করবার ইচ্ছা, এইগুলি ছিল কথকদের পসার বৃদ্ধি হবার সূত্র। ক্ষান্তিলতা দেবীও এইভাবে আসরে মুগ্ধ শ্রোতাদের কাছ থেকে নিত্য নতুন জায়গায় বলতে যাবার আমন্ত্রণ পেতেন। একটা আসরে ভাল পাঠ করা হয়ে ওঠে অন্য আসরে বসবার অন্যতম শর্ত।

পরবর্তীকালে বারোয়ারি পূজা অনুষ্ঠানে কথকদের ডাক পড়ত। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে হাওড়ার ব্যাঁটরার কদমতলার বারোয়ারি দুর্গাপুজোর সময় কথকতা হত। বারোয়ারি থেকে কথককে প্রত্যেকদিন পারিশ্রমিক দেওয়া হত।[৯] একবার মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ও গ্রামের বারোয়ারিতলায় 'তরণীসেন বধ' কথকতা করেছিলেন।[১০] উনিশ শতকের শেষে ও বিংশ শতকের গোড়ায় স্থাপিত হরিসভাগুলিতে কথকরা প্রায়ই অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ পেতেন। ১৯২৮ সালে বেহালা হরিভক্তি প্রদায়িনী সভার ৭৬ তম সাম্বৎসরিক উৎসবে দুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ, প্রমথনাথ তর্কভূষণ প্রমুখ পণ্ডিতদের গুরুগম্ভীর বক্তৃতার শেষে কথকতার অনুষ্ঠান রাখা হয়েছিল। তখন, 'শেষে আড়িয়াদহ নিবাসী প্রসিদ্ধ কথক শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র ভাগবত রত্ন মহাশয় উঠিয়া সরস বাগবিন্যাসে সমাগত জনগণের চিত্ত বিনোদন করেন'। নানা কথক এইসব হরিসভায় আসতেন। খিদিরপুরের ক্ষীরোদ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় বা কথক গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য কোনো কোনো বৎসরে নিযুক্ত হতেন। আবার কোনো বছর উল্লেখ পাওয়া যায় যে বিশ্বেশ্বর শাস্ত্রী মহাশয় শাস্ত্র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে দুই মাস কথকতা করেছিলেন। ১৯৬১ সালেও আমরা খবর পাই যে 'চুঁচড়ো নিবাসী সীতারাম ভাগবতাচার্য আষাঢ় ও শ্রাবণ প্রায় দুইমাসকাল ভাগবতীয় উপাখ্যানগুলি কথকতার মাধ্যমে অতি সুন্দরভাবে সভায় পরিবেশন করিয়াছেন।' হরিসভার এইসব আসরের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে যাঁদের নাম পাচ্ছি তাঁরা সবাই উঠতি গোষ্ঠী, 'আঢ্য, সাহা, কুণ্ডু, নস্কর, শীল, দাস, কর্ম্মকার' ইত্যাদি। একবার নীলমণি মান্না কথকতার আসরের জন্য বিশেষ দান হিসাবে পাঁচ টাকা দিয়েছেন।[১১]

জমিদার বা উঠতি ব্যবসায়ীদের টাকার জোর আছে, সমাজে প্রতিষ্ঠা পাবার ইচ্ছা আছে, তাঁরা শহরে ও গ্রামে কথকতার আসর বসাবেন, কীর্তন গানের বন্দোবস্ত করবেন, যাত্রার দল খুলবেন, এই সব তথ্যে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু কথকতা শোনা ও শোনানো পুণ্য লাভের পথ, শুধু শুনতেও ভাল লাগে। কথকতার বোলবোলাওয়ের সময় গ্রামের সাধারণ গৃহস্থ বাড়িরাও এই শিল্পের গুণগ্রাহী ছিল। এইসব আসরের

পৃষ্ঠপোষকতা করতে বাড়ির মেয়েরা বেশি করে এগিয়ে আসতেন। প্রসঙ্গক্রমে বীরভূমের হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় স্মৃতি-নির্ভর রচনায় লিখেছেন,

> "বেশী দিনের কথা নয়, পঞ্চাশবৎসর পূর্বেও দেখিয়াছি—কথক গ্রামে আসিয়াছেন, কিন্তু একবৎসর পূর্বে গ্রাম হইতে বাহির হইতে পারেন নাই। দক্ষিণা ছিল দিন দুইটি মাত্র টাকা। কখনো একাকী আসিতেন, কখনো সঙ্গে একজন মাত্র সেবক থাকিত। সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ যাহারা তাঁহারাই পাঁচ দিন দশ দিন পনের দিন পর্যন্ত কথক ঠাকুরকে সযত্নে গৃহে রাখিতেন। ব্রাহ্মণেতর জাতি হইলে কোন ব্রাহ্মণবাড়িতে তাঁহার আহার ও বাসের ব্যবস্থা হইত। কখনো বা নিজেদের চণ্ডীমণ্ডপে বা বৈঠকখানায় স্থান দিয়া আহারের ব্যবস্থা করিতেন ব্রাহ্মণগৃহে। **অতিদুঃখিনী শূদ্র বিধবা অন্ততঃ একটা দিনও কথকতা দিতেন।** সন্ধ্যায় গ্রামের কোন দেবস্থানে অথবা গ্রাম্য প্রধানের কিম্বা কোন ভক্তিমান গৃহস্থের চণ্ডীমণ্ডপে কি বিষ্ণুমন্দিরে কথক কথকতা করিতেন।"[১২] (নজরটান আমার)

সময়কালে গ্রামে কথকতার পৃষ্ঠপোষকতার ব্যাপ্তি উদ্ধৃতাংশের ছত্রে ছত্রে ধরা পড়ে। সেরকম কিছু না জুটলে কলকাতা শহরে কথকরা নিজেরাই বসে যেতেন এবং শ্রোতা সমাগমও হত। কথকতার রসজ্ঞ যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি তাঁর একটি অভিজ্ঞতা এইভাবে লিখেছেন,

> "সাত আট বছর পূর্বে একবার কলিকাতায় কয়েকমাস ছিলাম, বৈকালে গোলদীঘিতে বেড়াতে যেতাম। দেখতাম দীঘির দক্ষিণ পাড়ের মণ্ডপে একটি লোক কি বলত, বিশ পঁচিশজন একমনে শুনত। কথক কৃষ্ণবর্ণ, কিঞ্চিৎ স্থূলকায়, চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়স। গা খোলা, উড়ানী কখনও কোলে, কখনও ভূমিতে পড়ত। দক্ষিণবাহু কখনও প্রসারিত, কখনও বক্ষলগ্ন ; স্বর কখনও উদাত্ত, কখনও অনুদাত্ত হ'ত। লোকটির দেবদত্ত শক্তি ছিল, নইলে এতগুলি লোক প্রত্যহ শুনতে আসত না।"[১৩]

বিংশ শতকে যানবাহনের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কথকের চাহিদা অঞ্চলে আবদ্ধ নেই। আসরের ডাক দূর-দূরান্ত থেকে আসে। প্রয়াত ফেলারাম বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, অধুনা বাংলাদেশ, আসাম, উত্তরপ্রদেশ' প্রভৃতি এলাকায় রামায়ণী কথকতা করেছেন। অধুনা তাঁর পুত্র দ্বিজরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভৌগোলিক পরিক্রমা একই ধরনের। গত জুন মাসে, (১৯৯৩) এক মাস ধরে উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জের রাজালোকায় শ্রীশচন্দ্র দাসের বাড়িতে দ্বিজবাবু কথকতা করেছেন ; সভায় মাইক ছিল, আসরে সহস্রাধিক লোক হত। বাসন্তী দেবী বিদেশেও পাঠ করেন। প্রবাসী বাঙালিরা সাধারণত আসর বসায়। আবার ১৯৯৩ সালের জানুয়ারি মাসে নিউ-আলিপুরের এন-ব্লক-এ রঙিন পোস্টার দেখা যায়। লন্ডননিবাসী বিশ্ববিখ্যাত 'যুবমানস প্রবক্তা' শ্রীকিরীট ভাই কলকাতায় 'সঙ্গীতময় ভাগবত প্রবচনের' অনুষ্ঠান করবেন। প্রচার মাধ্যম ও সময়ের সঙ্গে সবাইকে মানিয়ে নিতে হয়।

১৮৩৪ সালে কার্তিক মাসে **বীরভূমে** কথকতায় আয় কীরকম হত? বীরভূমে প্রাপ্ত একটি জমা খরচের হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে কথকের আয় নিজস্ব একটাকা এক আনা।[১৪] উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে পাদ্রি রেভারেন্ড জেমস লঙ কথকদের স্মৃতিশক্তি ও বলার ক্ষমতায় মুগ্ধ হয়েছিলেন।[১৪ক] সেই প্রসঙ্গে জানিয়েছিলেন যে দক্ষ কথকদের কয়েক-জন মাসে ৫০০৲ আয় করতেন। কোনো কোনো ঋতুতে কেউ কেউ ২০০০ টাকা পর্যন্ত উপার্জন করেছেন। এঁদের মধ্যে দুয়েকজন কোনো বাড়ির বাঁধা কথক হয়ে থাকতেন। ঘরে জনা পঞ্চাশেক মহিলাকে দৈনিক দুঘণ্টা কথা শোনাবার জন্য কলকাতার একজন ধনী লোক কথক নিযুক্ত করেছিলেন। কথকতার জনপ্রিয়তা এই সময় তুঙ্গে উঠেছিল। বিংশ শতকের গোড়ায় বাঁকুড়ায় যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির মা গ্রামে রামায়ণী কথকতার আসর দিয়েছিলেন। তিন ক্রোশ দূর থেকে কথক ঠাকুর শিষ্য নিয়ে এসেছিলেন; ওই অঞ্চলের নামকরা কথক। একমাস পাঠ চলেছিল, ৩০০৲ দক্ষিণা নিয়েছিলেন।[১৫] ১৩১১-১২ সনে ১৩ই ফাল্গুন থেকে বৈশাখ পর্যন্ত কবিরাজপুরে পার্বতীচরণ রায়ের স্ত্রী বগলাসুন্দরী দেবী মহাভারত পাঠ ও কথকতার আসর বসান। পাঠক ছিলেন হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ও কথক ছিলেন তাঁর কাকা জানকী নাথ শিরোমণি। পাঠ ও কথকতা বাবদ তাঁদের প্রাপ্তি হরিদাসবাবুর হিসাবের খাতা থেকে উদ্ধৃত করা যাক,[১৬]

"পূর্ব সনের ১৭ ফাল্গুন	৫৲
৭ চৈত্র	২০৲
মোট	২৫৲
১১ বৈশাখ লক্ষ্মী বাটী আসিবার কালে তাহার মাং	২৫৲
২ জৈষ্ঠ খুড়া বাটী আসিবার কালে তাহার মাং	২৲
৫ জৈষ্ঠ্য মহাভারতের দক্ষিণাদি—	১১০৲
সোনা একভরি সাড়ে ছয় আনা (মূং অং)	৩৪৷৷০
শাল এক জোড়া (মূং অং)	২০৲
গরদ এক থান ঐ	৪৲
চেলির জোড়া ১টা, ,,	৪৲
চেলির সাড়ি ১ খানা ,,	৩৲
কাঁসার বাটি ৭টা (মূং অং)	৩৷৷০
পিতলের ঘটি ৩টা ,,	১৷৷০
কাসার থাল ১ খানা ,,	২৷৷০
সূতার কাপড় মোট ,,	২৫৲
সংসারে পিতৃঠাকুরের নিকট দত্ত মোট—	২৫০৲

মাং=মারফত, বাং=বাবদ, মূং অং=মূল অনুমান"

আসলে আয় দুই রকমের। কথকতা বা গানের জন্য যজমানের কাছে বরাদ্দ দক্ষিণা ও আসরে পাওয়া প্রণামী। রামায়ণী গান দলবদ্ধ; রামায়ণী কথকতা একক কিন্তু

দক্ষিণাদির বন্দোবস্ত একইরকম ছিল। কলকাতার পুরনো এক বাসিন্দা লিখছেন, 'তখন [উনিশ শতকের শেষপাদে] মধ্যবিত্ত গৃহস্থ বা গরীবগুরবো যাদের বাড়ীতে একটু উঠান আছে তাঁরাই বাড়ীতে রামায়ণ গান দিতেন।' এর জন্য বন্দোবস্তের নাম ছিল 'মালা নাবানী', অবস্থা বিশেষে তা হতে পারত 'পাঁচ টাকা থেকে পনের টাকা পর্যন্ত।'

"মালা নাবানী ব্যাপারটা হ'ল, কথক ঠাকুর জামাকাপড় ছেড়ে গলায় পৈতে বার করে বেগুনী রংয়ের বেনারসী জোড়, গলায় চাদর, খালি গায়ে বসলেন, যিনি গান দিয়েছেন তিনি এসে কথক ঠাকুরের গলায় এক ছড়া গোড়ে মালা পরিয়ে দিলেন। গান শেষ হলে তার গলা থেকে মালা ছড়াটা খুলে নিয়ে চুক্তি মোতাবেক টাকা দিয়ে দেবেন। কথক ঠাকুর তখন হাতের চামরটা কর্তার মাথায় ৰার তিনেক ছুঁইয়ে আশীর্বাদ করলেন। শ্রোতারা গান শুনে যে প্যালা কথক ঠাকুরের থালায় দিয়েছেন, সেটা তাঁর উপরি প্রাপ্য। যদি কেউ সিদে দিয়ে থাকেন সেটাও ধর্তব্যের মধ্যে নয়।"

এই প্যালা দেওয়া আসরের অপরিহার্য অঙ্গ। প্যালা না দিলে, না নিলে, কোনো কথকতার আসর সিদ্ধ হয় না।

অনুপম ভঙ্গিতে বনেদী বাসিন্দাটি লিখেছেন,

"বাড়ীর বিধবা ঠাকুমা বা জ্যাঠাইমারা একখানি চাদর জড়িয়ে দুই একটি নাতি নাতনীর হাত ধরে কথা শুনতে যেতেন। সঙ্গে দুটো এক আনি বা দোয়ানী নিতেন বা দুচারটে পয়সা আঁচলের খুঁটে বেঁধে নিতেন, প্যালা দিতে হবে। 'রামায়ণ গান শুনে মূল্য না দিলে কানে কালা হয়ে যাবে। তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে প্যালা না দিয়ে গান শুনে এসে কানে কালা হয়ে নরকে যাবে নাকি ?' ছোট উঠান, তার উপর সতরঞ্চি পাতা, ফরসা চাদর দিয়ে মোড়া, শ্রোতারা সব অধিকাংশ ঠাকুমা ও জ্যাঠাইমার দল। গুটি গুটি এসে কথক ঠাকুরের জায়গাটা ফাঁক রেখে, গোল হয়ে বসে গেল।"[১৭]

প্যালা আদায় করার কায়দাও কথকদের জানতে হত। মেহেরপুরের কথক ঠাকুর কালীনাথ ভট্টাচার্য এইকাজে বেশ পোক্ত ছিলেন। যেমন,

"এক কথকতা উপলক্ষে মধ্যে মধ্যে তাঁহার উপরি প্রাপ্তিও মন্দ হত না। সন্ধ্যার পর কথা শেষ হইলে কোনদিন চিকের অন্তরালস্থিত পুরমহিলাগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন, 'মা সকল, কাল রামের বিবাহ, বিবাহে 'নকতা' দিতে হয়,—তা যেন মনে থাকে।' কোনদিন বলিতেন, 'কাল লক্ষ্মণভোজন, সিধা আনিতে ভুলিও না।'—কেহ নূতন কাপড় দিত, কেহ কাঠের বারকোশ পূর্ণ করিয়া সিধা দিত, কেহ নূতন কাঁসার ডিসে নানা মিষ্টান্ন দিত; এতদ্ভিন্ন ডাব, পেঁপে, তরমুজ, সুপক্ক কলা, এবং নানাবিধ তরকারিও তাঁহাকে উপহার দেওয়া হইত।"[১৮]

প্রণামী ও সিধার মাধ্যমে কথকের নানা প্রাপ্তিযোগ হত। আসর জমাতে পারলে লোক

আসবে, আয়ও হবে। আসরে প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা ধরা পড়ে এক কথকের নিজের জবানিতে,

> "...গিন্নীমার একটু আগেই বাড়ী ফিরে যেতে হচ্ছে। তিনিই সবার আগে দাঁড়ালেন সিধের ডালাটি দুহাতে করে। তার ডালার ভেতর চাল ডাল তেল নুন মশল্লা গব্যঘৃত তৈল আলু কুমড়ো সবই আছে। সঙ্গে একখানা ছোট গীতা, একটি পৈতে আর একটি ক্ষুদ্র চামরও রয়েছে দেখা গেল।
>
> "...কাপড় একখানা, তার সঙ্গে রূপোর টাকা, একটি তামার পয়সা আর একটি সোনার তুলসীপাতা কাগজে মোড়া, এগুলিও ঠাকুরের হাতে দিলেন নন্দর মা। ঠাকুর এগুলি নিজের পাশেই আসনের উপর রেখে দিলেন। বামনভিক্ষার কথা তো পড়ে রইল সেদিনের মত ঐ পর্যন্ত। নন্দী গিন্নীর পর মেয়েমহলে ক্রমশই চঞ্চলতা ঘনিয়ে উঠলো। এক এক করে মায়েরা সব ডালা থালা চুপরি রেকাব করে সিঁধে নিয়ে এগুতে শুরু করলেন, আর তখন কথকতা চলে? ডাব আর নারিকেল স্তূপীকৃত হতে লাগলো ঐ তুলসী মঞ্চের একপাশে।"[১৯]

সফল কথকের স্বপ্ন এটা। বাস্তবে কাপড় বা সিঁধে পাওয়া যায় কিন্তু অনেকদিন ধরে কথকতা চললে প্যালার পরিমাণ হয় ৫ পয়সা বা ১০ পয়সা। চালতাবাগানের আসরে দ্বিজবাবুর থালায় ওইভাবেই পাড়ার জ্যাঠাইমা বা মাসিমারা তাঁদের সাধ্যমত প্যালা দেন। দ্বিজবাবুর হাতেও চামর থাকে, তাই বুলিয়ে তিনি তাঁদের আশীর্বাদ করেন, সেটা রীতি। আসরে বাসন্তীদেবীকে যিনি যাই দেন, বাসন্তীদেবী হাসিমুখে তাই নেন। শ্রোতারা ভক্ত, তাঁদের দান শিরোধার্য। সেই দানকে ফিরিয়ে দেওয়া অসম্মানের কাজ, ধর্মবিগর্হিত। এই শোভনতা কথকদের আচার আচরণে প্রত্যাশিত।

খ. জনপ্রিয়তার পট পরিবর্তন : একটি বিতর্ক

উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে কথকতার জনপ্রিয়তায় ভাটা দেখা দিচ্ছে। সঞ্জীবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখদের চোখে সেটা ভাল করে ধরা পড়েছে। বিংশ শতকের তৃতীয় দশকে দীনেশচন্দ্র সেন 'কথকতাকে' বাংলার 'লুপ্ত সম্পদ' বলছেন। অধুনা কথকতার ক্ষীণ ধারা দেখা যায়। সোনামুখীর কথক রাজকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায় নিজেদের প্রজন্মকে এই পেশার শেষ প্রতিনিধি বলে মনে করেন। দ্বিজবাবুর বংশেও আগামী প্রজন্মে এই পেশা কেউ অবলম্বন করবে না। রাজকৃষ্ণবাবুদের বংশের সবাই কথক; প্রয়াত হেরম্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও ফকিরনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এই পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর জ্ঞাতি ভ্রাতা বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ও কথকতা করেন। রাজকৃষ্ণবাবুর বাঁধা আসর আছে, শান্তিনিকেতনেও গৃহস্থবাড়িতে তাঁর আসর বসে। কিন্তু উপার্জন কমেছে। আগে যেখানে জমাটি সময়ে আয় হত আট হাজার, এখন সেখানে আয় দুই হাজারের বেশি হয় না। রাজকৃষ্ণবাবুর কথায় এক বংশানুক্রমিক পেশাদার শিল্পীর আক্ষেপ স্পষ্ট।[২০]

এই জনপ্রিয়তার হ্রাসবৃদ্ধি প্রসঙ্গে আমেরিকার গবেষকদের কিছু বক্তব্য আছে। মিল্টন সিঙ্গারের নির্দেশে ডামলে মহারাষ্ট্রে কতকগুলি হরিকথা পাঠের আসর সমীক্ষা করেছিলেন, কথকদের ও শ্রোতাদের জাতপাত-এর একটা হিসাব তাঁর রচনায় পাওয়া যায়। সাম্প্রতিককালের একটি সুলিখিত প্রবন্ধে ফিলিপ লুটগেনডর্ফ (Philip Lutgendorf) বারানসি শহরে রামচরিতমানসের পাঠের জনপ্রিয়তাকে ব্যাখ্যা করেছেন উচ্চবর্গের পৃষ্ঠপোষকতার সূত্রে; তাঁর লেখায় পাঠের রীতিবদলও বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই পোষ্টাদের রদবদলের কার্যকারণ সম্পর্কে। এই প্রসঙ্গেই কথকদের চাহিদা ও আয়ের তেজী বা মন্দাভাব আলোচিত হয়েছে। সমাজ 'সংস্কৃতায়নের' নির্দেশক হল রামায়ণ পাঠের জনগ্রাহ্যতা।[২১]

কথকতা প্রসঙ্গে আমেরিকার পণ্ডিতদের বক্তব্যের সঙ্গে বৈমত্য আছে। সমাজে কিছু লোক সব সময় ওঠে, কিছু লোক সবসময় পড়ে। প্রকৃতপক্ষে, ওঠা-পড়া, পোষ্টাদের খাই, উচ্চবর্ণের সংস্কৃতির অনুবৃত্তি, কোনোটাই নির্দিষ্ট শিল্পের প্রতি সামাজিক আনুকূল্য বা উদাসীনতার 'করণ' হতে পারে না। শিল্পের নিজস্ব ভূমিকা আছে, শ্রোতাদের রুচি ও রসবোধ আছে।

সংস্কৃতায়ন ও পোষ্টাদের সামাজিক বিবর্তনের ছকের বিচারে শিল্পরীতির নিজস্ব সামাজিক ভূমিকা এবং শ্রোতাদের রুচি ও রসবোধের পরিবর্তনের সমস্যা একদম আমল পায় না। গোষ্ঠীর ওঠানামার সমান্তরাল প্রতিফলন বলে বিবেচিত হয় কথকদের পেশার জোয়ার-ভাটা।

উনিশ শতকের প্রাসঙ্গিক সাক্ষ্যগুলি খুঁটিয়ে পড়লে আপত্তির সারবত্তা বোঝা যাবে। লুটগেনডর্ফের গবেষণার অন্যতম প্রতিপাদ্য বিষয় হল—হিন্দি ছাপাখানার আগমন রামায়ণ পাঠের জনপ্রিয়তা বাড়িয়েছে। ছাপাখানা আসার ফলে সুলভ মূল্যে রামায়ণ কাশীর মধ্যবিত্তের হাতে এল, বাড়িতে বাড়িতে রামায়ণ পাঠের দৈনিক আসর বসতে শুরু হল, 'রামায়ণীজী'দের শিক্ষা আরো সহজসাধ্য হল।[২২] পাঠের জনপ্রিয়তার পেছনে সুলভে বই পাবার চাইতেও বড় প্রশ্ন হল, বারানসি শহরের মধ্যবিত্তদের পাঠের রুচি, বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ। বাজারে চাহিদা আছে বলে সস্তায় বই ছাপা হচ্ছে, উল্টোভাবে শুরু নয়। অনুরূপ অবস্থায় বটতলার ছাপাখানাও সুলভ মূল্যে রামায়ণ ছাপিয়েছিল, হাজারো অন্যরকম ধর্মগ্রন্থও ছাপানো হয়েছিল। আজও সেই ধারা অব্যাহত আছে। কিন্তু তারও মধ্যে পাঠের রুচিতে, সাহিত্যের রুচিতে বদল দেখা দিল, বাঙালি পাঠক-সমাজ বদলাতে শুরু করল। তাতে ছাপাখানার ভূমিকাও বদলে গেল। দীনেন্দ্রকুমারের প্রাসঙ্গিক মন্তব্য শোনা যাক।

> "আমাদের পল্লী হতে কথকতা উঠিয়াই গিয়াছে। সে কালে যাহারা কথকতা দ্বারা সংসার প্রতিপালন করিতেন, একালে তাহাদের বংশধররা অন্য বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন। গার্ল স্কুলের কল্যাণে একালের মেয়েরা লেখাপড়া শিখিয়া **সেকেলে রামায়ণ, মহাভারত** আর স্পর্শ করেন না; এখন তাহারা

সাহিত্যে আর্ট ও মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণসূচক, নব্য ঔপন্যাসিকগণের প্রণীত কামায়ণ পাঠে তৃপ্তিলাভ করিতেছেন, রামায়ণে **আর মন ওঠে না**।"[২৩] (নজরটান আমার)।

নবীনচন্দ্র সেন নিজে পাঠে সুনিপুণ ছিলেন। পাঠ উঠে যাওয়ার গাওনা গাইতে গিয়ে তিনিও হুবহু এক কথা বলেছেন।[২৪]

…"দেখিলাম আমার বাল্যকালে যাহারা পাঠক ছিল, তাহাদের মধ্যে এখন ২/৪ জন যাহারা জীবিত আছে, তাহারাই এখনকার খ্যাতনামা পাঠক। তাহাদের উত্তরাধিকারী আর কেহ গ্রামে জন্মে নাই। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে শুনিলাম—দেশে পুঁথি কে শুনে যে পাঠ করিতে কেহ শিক্ষা করিবে। কোন বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা আর এ পুঁথি শুনে না। বুঝিলাম স্ত্রীশিক্ষায় দেশ যথার্থই টলায়মান। এ সকল পুঁথির স্থান উপন্যাস গ্রহণ করিয়াছে।"[২৪]

'নবেল পড়া মেয়েদের' উপর দীনেন্দ্রকুমার ও নবীন সেনদের জাতক্রোধ কতটা উনিশ শতকের পুরুষতন্ত্রের স্বভাবজ ফল, সেই প্রসঙ্গ বর্তমানে আলোচ্য নয়। প্রাসঙ্গিক শুধু এই ইঙ্গিত যে কথকতার প্রধান শ্রোতা মেয়েরা, কিন্তু তাঁদের রুচিতে বদল হয়েছে; তাঁরা নিজেরা পড়তে সক্ষম হয়েছেন ও বাদ-বিচার করছেন, রসবোধ অন্যদিকে মোড় নিয়েছে, সাহিত্য বদলে গেছে, উপন্যাস পাঠ জনপ্রিয় হচ্ছে। পৃষ্ঠপোষকতার পরিবর্তনের পেছনে সামাজিক গোষ্ঠীর ওঠা নামার চাইতে অনেক বেশি সক্রিয় রসের আস্বাদের রূপান্তর, উপন্যাস নামে নতুন শিল্পের প্রতি ক্রমবর্ধমান আগ্রহ।

অন্যদিকে ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কথকদের সামাজিক ভূমিকা প্রসঙ্গে প্রত্যাশায় খামতি ঘটেছিল, আচার-অনুষ্ঠানের মূল্যায়নেও প্রশ্ন উঠেছিল। কথকতা ও পুরাণপাঠ ধর্ম-সাধনার সঙ্গে যুক্ত, পাঠে পুণ্য হয়, শুনলে পাপ কেটে যায়, এই জাতীয় বিশ্বাসে তার আবেদনের একটি দিক জড়িত আছে। কথক ঠাকুর বিশেষ গুণ বিশিষ্ট হবেন, এই ধারণা প্রত্যাশিত। রামগতি ন্যায়রত্ন কথকদের প্রতি গৃহস্থের বিরক্তির কথা উল্লেখ করেছেন।

"সম্প্রতি কিছু নিরক্ষর বা স্বল্পাক্ষর লোক ঐ ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন, এবং তাহাদের অনেকের পানাসক্তি, বিশেষতঃ পরদারানুরক্তি দর্শনে ঐ শ্রেণীর উপরেই লোকের অভক্তি জন্মিয়া গিয়াছে। **এখন আর কোন ভদ্রলোকে নিজ বাটীর মধ্যে কথা দিতে পার্যমানে সম্মত হন না**।"[২৫] (নজরটান আমার)

শ্রীহট্টে পুরাণপাঠ প্রচলিত ছিল, পুরোহিতরাও যেমন তেমন করে পাঠ সেরে দুপয়সা আয় করতেন। কিন্তু এই রীতি যে আচার সর্বস্বতায় পরিণত হচ্ছে, শিল্প কুশলতা যে হারিয়ে গেছে, সেই বিষয়েও গৃহস্থরা সজাগ হচ্ছিল। বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছেন,

"আমার মনে পড়ে দু' একবার আমার জেঠতুত ভাই, ইনি বাবার মুহুরী ছিলেন এবং বাবার সংসারের কাজকর্মের তত্ত্বাবধান করিতেন—বাঙলা নজির খড়োয়া দিয়া মুড়িয়া পুরাণ বলিয়া এই পাঠের সময় রাখিতেন। কখনও

কখনও আমাদের পরিবারে হয় নাই কিন্তু অন্যত্র এমনও শুনা গিয়াছে—দুষ্ট বালকেরা ছেঁড়া চটি এইরূপে মুড়িয়া পুরাণের আসনে স্থাপন করিত। লোকেদের ধর্মবিশ্বাস কতটা যে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, এই সকল ঘটনা ও কাহিনীতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।"[২৬]

ময়মনসিংহেও পুরাণ পাঠের দুরবস্থা, পাঠক ও কথকদের নিরক্ষরতা ইত্যাদি অভিজ্ঞতার কথা কৃষ্ণকুমার মিত্রও লিপিবদ্ধ করেছেন।[২৭] বিপিন পাল বা কৃষ্ণকুমার মিত্রের লেখায় ব্রাহ্ময়ানির ছোঁয়াচ থাকা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু রামগতি নিশ্চয় ব্যতিক্রম। পূর্বের কথকরা সবাই দক্ষ বা নিষ্কলুষ ছিলেন, এমন মনে করারও কারণ নেই। কিন্তু কথকরা আর আগের মতো নেই, পুরাণ পাঠের মাহাত্ম্য কমে যাচ্ছে, ভদ্র গৃহস্থের মনে এই ধারণার জন্ম, তজ্জনিত অশ্রদ্ধা ও তাচ্ছিল্যের ভাব, পেশাকে আঘাত হানার পক্ষে যথেষ্ট। মনে রাখা দরকার যে জমাটি দীর্ঘস্থায়ী আসর বসাবার উদ্যোগ জমিদার বা উঠতি ব্যবসায়ীরা নিত। কিন্তু আসরে গৃহস্থবাড়ির মেয়েদের, সাধারণ শ্রোতাদের উৎসাহ ও অংশগ্রহণের কথা সাক্ষ্যে বার বার বলা হয়েছে। সাধ্যমত প্যালা তারাই দিত, তাদের আগ্রহও কম ছিল না। তাই 'গেরস্তদের' ও বাড়ির মেয়েদের মনোভাবের পরিবর্তন এই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। আবার অশ্রদ্ধা বা তাচ্ছিল্য যে সবসময় সার্বিক ধর্মবিশ্বাসে শিথিলতার পরিচায়ক, তা নাও হতে পারে। বরং ঠিক এই সময়ে 'নব্য হিন্দু' পুনরুত্থানবাদীরা যেভাবে ধর্মকে বিন্যস্ত করতে লাগলেন, তার সঙ্গে পুরাতনী কথকতার রূপ ও ব্যাখ্যা হয়ত তাল রাখতে পারল না।

অন্যদিকে যাত্রা ইত্যাদির উদ্ভব হচ্ছে, বাংলা রঙ্গমঞ্চেও পৌরাণিক পালা জাঁকিয়ে বসেছে, বিনোদনের ক্ষেত্রে কথকতার নানা প্রতিযোগী বেড়েই চলেছে।

বাংলার সামাজিক ইতিহাসে রুচির ও অনুভূতির পট পরিবর্তন নিয়ে লেখা সবে শুরু হয়েছে। পোষ্টার সামাজিক অবস্থান বা তার পণ্য ক্রয়ের ক্ষমতা বা বাজারি চাহিদা, শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতাকে নির্ধারণ করার একমাত্র শর্ত হতে পারে না। নানা স্তরে সহৃদয়ের মনের রূপান্তর, রসের আস্বাদে রদবদল, নন্দন বোধে পরিবর্তনও সমভাবে বিবেচ্য। বর্তমান পর্যায়ে কোনগুলি 'কারণ', কোনটাই বা 'ব্যাপারবৎ কারণ' বা 'করণ' তা ঠিক করা মুশকিল। এই ক্ষেত্রে আপাতত জয়ন্ত ভট্টের অনুগামী হয়ে বলা যেতে পারে যে সামগ্রীর 'করণত্বই' প্রাসঙ্গিক। কোনো কারণই এককভাবে কার্যের 'করণ' নয়। যেহেতু সামগ্রী (কারণকূট বা নিখিল কারণের সমষ্টি) থাকলে কার্য অবশ্য উৎপন্ন হয়, সেটাই অসাধারণ কারণ বা 'করণ'। ইতিহাসবিচারে জয়ন্ত ভট্টের ধারণা অনেক এঁড়ে তর্কের অবসান ঘটাতে পারে।[২৮]

□ পর্ব / ৪ □

কথকতার কৃৎকৌশল

ক. আসর বিন্যাস

পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডের একটা পুরো অধ্যায় জুড়ে আছে পাঠের আসর কীরকম হবে তার বিবরণ। উনিশ শতকে ওয়ার্ডের বিবরণীতেও আসর সাজানোর কথা প্রাধান্য পেয়েছে। আসর জমাটি না হলে কথকতা মার খাবে। ঊনবিংশ শতকের সাতের কোঠায় একটি গ্রামের কথকতার আসরের বর্ণনা এইরকম :

> "একবার চাটুয্যে গিন্নী তীর্থ পর্যটন করিয়া আসিয়া বাড়ীতে তিনমাস 'কথা' দিয়াছিলেন ; এই উপলক্ষ্যে তাঁহাদের বাড়ীর বাহিরের আঙিনায় বাঁশের 'চ্যাটাই'-এর আচ্ছাদন দ্বারা একটি প্রকাণ্ড মণ্ডপ নির্মিত হইয়াছিল। তাঁহার নীচে দক্ষিণপ্রান্তে কথক ঠাকুরের উপবেশনের জন্য একখানি কাঠের তক্তপোষ সংস্থাপিত ছিল। সেই আসনে 'উত্তরমুখো' হইয়া বসিয়া কথক ঠাকুর কথকতা করিতেন, তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে অনুচ্চ টুলে শালগ্রামশিলা সংস্থাপিত হইতেন। কথক ঠাকুরের সম্মুখে মৃত্তিকার উপর প্রসারিত সতরঞ্চিতে বসিয়া শ্রোতারা কথা শুনিতেন। আঙিনায় উত্তর সীমায় একখানা খড়ো ঘর ছিল, তাহার সম্মুখে চিক টাঙ্গাইয়া পল্লী রমণীগণ সেই চিকের অন্তরালে বসিতেন। অপরাহ্নে চারিটার সময় কথারম্ভের সংবাদ প্রচারের জন্য চাটুয্যে বাড়ীতে কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিত। আমরা ছেলের দল সেই শব্দ শুনিয়া কথা শুনিতে ছুটিতাম। বিলম্ব হইলে স্থানাভাব হইতে পারে ভাবিয়া আমরা সর্বাগ্রে সেখানে উপস্থিত হইয়া 'ফরাস' অধিকার করিতাম। গ্রামস্থ অধিকাংশ লোক পাঁচটা বাজিবার পূর্বেই সেখানে উপস্থিত হইতেন। নিম্নশ্রেণীর লোকেরা মাটীতে বসিয়া নিস্পন্দভাবে কথা শুনিত।"[১]

চাঁদোয়া ব্যাসাসন, বেদি, শালগ্রাম শিলা—ইত্যাদি সব আসরেরই সাধারণ অঙ্গ ছিল। কথকের আসন উঁচু হবে, তা পবিত্র, এই কথা পদ্মপুরাণে বলা আছে। কথকী পরিভাষায় 'ব্যাসাসন' আজও চালু শব্দ। আসনকে কথক প্রণাম করে বসেন কারণ আসন তাঁর পূজার সামগ্রী। বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনের উপর গড়ে ওঠা ঢিবিতে বসে যেমন রাখাল বালক সেরা বিচারকে রূপান্তরিত হয়, ওই আসনের প্রসাদে কথক ঠাকুর হয়ে ওঠেন পরম্পরাগত ব্যাস। তাই ক্ষমতা থাকলে ব্যাসাসন তৈরিও করা হত তরিবৎ করে। এক কথকের জবানিতে এই তরিবতের কথা শোনা যাক :

> …"চাঁদোয়ার তলায় তক্তপোষের উপর গালিচা, গালিচাখানা কাশ্মীরী কিন্তু শতবর্ষেরও অধিক তার বয়স। স্থানে স্থানে একটু ছিন্ন হয়েছে। গেলবারে কুম্ভমেলায় গিয়েছিলেন বড় বউমা। তিনি কথক ঠাকুরের বসবার জন্য আগ্রা

থেকে সুন্দর ঝালর দেওয়া একখানা রেশমের আসন এনেছেন। সেই আসনখানা গালিচার উপর দেওয়া আছে। পাশেই একটা তাকিয়া। তুলো দেখা যায় নতুন ওয়াড় দেওয়া হয়েছে।"[২]

কথকতা সাধনার অঙ্গ, ঠাকুরের কাজ। চালতাবাগানে রাধারাণী বিগ্রহের কথা মনে রেখে দ্বিজরাজবাবু মাসাধিককাল কথকতা করেন। মেহের-হরের কথকঠাকুর কালীনাথ ভট্টাচার্য বা প্রবাদপ্রতিম ধরণীধরের মজলিশে শালগ্রাম শিলার সামনে বসতেন কথক। আর আসর বিন্যাসেও থাকবন্দী সমাজের রূপ থাকত, ব্রাহ্মণ ও শূদ্রদের বসার আসন আলাদাই হত। নৈহাটির কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়িতে কিশোর হরপ্রসাদের অভিজ্ঞতা দীনেন্দ্রকুমারের মতোই :

"রায় বাহাদুরের বাহিরবাড়ির পাঁচ ফুকরে দালানের সামনে যে উঠান আছে, সেই উঠানে কথা হইত। কথকের জন্য যেমন সবজায়গায় ইটের বেদি হয়, এ বাড়িতে তাহা হয় নাই। একখানা বড় চৌকি ও একখানা বড় তাকিয়া বেদির কাজ করিত। ঐ বেদির উপর একখানি ভালো গালিচা পাতা থাকিত। সামনে একটি বড় টিপায়ের উপর একখানি পিতলের সিংহাসনে শালগ্রাম থাকিতেন, তিনি কথার প্রধান শ্রোতা। উঠানময় গালিচা ও শতরঞ্চ পাতা থাকিত ; ব্রাহ্মণেরা গালিচায় বসিতেন, শূদ্রেরা শতরঞ্চে বসিত।"[৩]

গ্রামের আসর, সাধ্য কি যে ক্ষমতাবিন্যাসের থাককে অগ্রাহ্য করে ? এইরকম আসরের মধ্যমণি হলেন কথক ঠাকুর। দীনেন্দ্রকুমারের বর্ণনায়,

"কথক ঠাকুরের ললাট চন্দনচর্চিত, নাসিকায় দীর্ঘ তিলক, শিখার গ্রন্থিতে একটি ফুল। দেহ রেশমী নামাবলী দ্বারা আচ্ছাদিত, কণ্ঠে পুষ্পমাল্য। তিনি তুলটের কাগজে লিখিত ও পাতলা কাষ্ঠের আবরণাবৃত প্রায় এক হাত দীর্ঘ পুঁথিখানি সম্মুখে খুলিয়া রাখিয়া মধ্যে মধ্যে এক একটি শ্লোক দেখিয়া লইতেন, এবং তাহা আবৃত্তি করিয়া ব্যাখ্যা করিতেন ; কখন গান করিতেন, ব্যাখ্যা উপলক্ষে নানা গল্প বলিতেন; কখনও হাসাইতেন, কখনো কাঁদাইতেন। কথা কহিতে কহিতে শ্রান্তিবোধ হইলে ট্যাঁক হইতে নস্যপূর্ণ শামুক বাহির করিয়া দুই এক টিপ নস্য লইতেন, এবং সম্মুখস্থিত তো-করা গামছাখানি দ্বারা নাকমুখ মুছিয়া পুনর্ব্বার সঙ্গীতের সুরে কথা আরম্ভ করিতেন।"[৪]

আসর বসতে পারত নানা উপলক্ষে। উৎসবে তো বসতই। আবার তীর্থ পর্যটন সমাধা করে, ছেলের অন্নপ্রাশন, বা শোক দুঃখ উপশমের উদ্দেশ্যে কিছু দক্ষ কথক চাই, আর মুমুক্ষু পাঠক চাই। আদর্শ পাঠক শুকদেব আর শ্রেষ্ঠ শ্রোতা পরীক্ষিৎ।[৫] আসর জমাতে গেলে কিছু তৈরি শ্রোতাও চাই। দুঁদে কথক তাই লেখেন,

..."এর মধ্যেই দেখলুম, কোনো ভক্তের চক্ষে জল গড়াবার উপক্রম হয়েছে।

এদের বড় তাড়াতাড়ি ভাব হয়ে যায়। এসব লোক কথক ঠাকুরের খুব প্রিয়। তিনি গুটিকয়েক এরকম ভক্ত খুব কাছে নিয়ে বসেন।
তিনি বলেন, এরাই তাঁর যথার্থ সমজদার শ্রোতা। এদের মুখ না দেখে তিনি কথাই বলতে পারেন না।"৬

কিন্তু আসর যতই সাজানো হোক না কেন শ্রোতারা যতই উন্মুখ থাকুক না কেন শেষপর্যন্ত জমানোর দায়িত্ব গিয়ে পড়ে কথকের উপরই। একদিন ঠাকুরবাড়িতে জসীমউদ্দীন এই কথা মর্মে মর্মে বুঝেছিলেন।

"গল্পের আসরের উপলক্ষ করিয়া হলটিকে একটু সাজান হইয়াছে। কথক ঠাকুরের মত সুন্দর একটি আসনও রচিত হইয়াছে আমার জন্য।"

সেইদিন আসরে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া হাজির ছিলেন সবাই। অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, দীনেন্দ্রনাথ, রথীন্দ্রনাথ, এবং ঠাকুরবাড়ির সুসজ্জিতা বধূরা। আর গ্রামদেশের জসীম-উদ্দীন এই রকম আসরে যেন 'বলির পাঁঠা'।

"গল্প বলিতে বলিতে গল্পের খেই হারাইয়া ফেলি। পরের কথা আগে বলিয়া আবার সেই ছাড়িয়া-আসা কথার অবতারণা করি। দশ পনের মিনিট বাদে দিনুবাবু উঠিয়া গেলেন। সামনের শাড়িতে ঝকমকিতে দোলা দিয়া কৌতুকমতীরা একে অপরের কানে কানে কথা বলিতে লাগিতেন। কেউ কেউ উঠিয়া গেলেন।"৭

গ্রামের কবি জসীমুদ্দীনের বলার ধরন ঠাকুরবাড়ির শহুরে মনের হৃদয়-সংবাদী হয়নি। আসর জমল না যদিও বহিরঙ্গে ত্রুটি ছিল না। আবার এই আসরই মহিম কথক বা ক্ষেত্র কথকের কথায় কীভাবে জমে উঠত তার স্বীকৃতি আছে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিচারণায়।

"এ যে মহিম কথকের পুঁথি, একটি একটি পাতা পড়ে যেতেন কথক ঠাকুর আর একটি একটি ছবি যেন চোখের সামনে ভেসে উঠত। লাল বনাত একখানা গায়ে দিয়ে বসতেন পুঁথি হাতে, হাতে রুপোর আংটি, হাত নেড়ে নেড়ে কথকতা করতেন। রুপোর আংটির ঝকঝকানি আজও দেখতে পাই।...

"...ক্ষেত্রনাথ কথকের বলার ধরন চমৎকার, গলাটাও ছিল সুমিষ্ট। দক্ষিণের বারান্দার গায়ে নাচঘরটা তখন অস্তমিতমহিমা গন্ধর্বনগরের মধ্যে ম্লান শোভা ধারণ করেছে। তারই মধ্যে ক্ষেত্রনাথ কথক মায়ের মনের অবস্থানুযায়ী এক একটি কথা ভাগবত থেকে বলে চলেছেন, এইভাবে গেল প্রায় একবছর।"৮

শ্রোতার মন বোঝা, কথা তৈরি করা আর সুর ও স্বরে কথা বলাই তো কথকের কাজ, আসর সেইজন্য মুখিয়ে থাকে। কথা তৈরি করে লেখা হয় পুথিতে, আবার পুথি থেকে কথা বলা হয়। একাজে পুথি কথকের নিজের, অন্য অর্থে আসরের সমূহের। বিষয়টি পতঞ্জলিরও দৃষ্টি এড়ায়নি। পাণিনির 'হেতুমতী চ' সূত্রের ভাষ্যে প্রসঙ্গটি

উত্থাপিত হয়েছে।[৮ক] সুদূর অতীতে কংস মারা গেছেন অথচ পালায় বলা হয় "গচ্ছ হন্যতে কংসঃ।" বা 'ণিচ' প্রত্যয় যোগে প্রযুক্ত হয় 'কংসংঘাতয়তি' ইত্যাদি। বাচনে অতীতের এইরূপ বর্তমানত্ব (বর্তমানকালতা) নিষ্পত্তির বিচারে মহাভাষ্যে লোক-জীবনের নানা উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। শৌভিক (নটশিক্ষক) ও চিত্রকরের পাশাপাশি সমমর্যাদায় উল্লিখিত হয়েছেন গ্রন্থিক (কথক)। বই হাতে গ্রন্থিক ও সামনে জনমণ্ডলী (গড্ডঃ)। এই মাত্র আয়োজন। আর কিছু নেই অথচ কী করে কংস পালাকে প্রত্যক্ষ করানো হচ্ছে? কংস পালা তখন কথকের 'বুদ্ধি বিষয়ান্ প্রকাশয়ন্তি', স্ববুদ্ধি বিষয়ভূত; কথকের জ্ঞান ও বোধে কংসহত্যার অস্তিত্ব আছে। অতএব সেই প্রত্যক্ষে বর্তমানকালের নিষ্পত্তি সঙ্গত। টীকাকার নাগেশভট্টের মতে, বর্ণনার গুণে, গ্রন্থনার শক্তিতে কথক তাঁর বুদ্ধি শ্রোতাকে সমর্পণ করেছেন। গ্রন্থগত অতীত বিষয় 'শব্দোপহিত' হয়ে কথক ও শ্রোতৃমণ্ডলীর বুদ্ধিগোচর ও মানসপ্রত্যক্ষ হয়, পুথির পালা হয়ে ওঠে জীবন্ত। তাই এবার আসর থেকে আসা যাক পালার বিচারে।

খ. গল্প ফাঁদার মুনশিয়ানা :

চাঁইবুড়োর সাতরাজার ধন যে একমাণিক, সেটা যে পুথি এই কথা সবাই জানে, পুষ্পিকাতেও বার বার তাই লেখা আছে। তাই নানা ঝামেলা, নানা নিষেধ। যেমন,

"পুস্তক পড়িতে দিবে সুবুদ্ধির ঠাই।
সবাগুনা গ্রন্থ জেন গোবরায় নাই।"

মাতুলমহাশয়ের বাহির বাটির মণ্ডপে বসিয়া পুথির অনুলিপি করা হয়েছে, "ঘাড়ের মধ্যে সাল হইয়া বড় বেতা পাইয়া এহি পুস্তক সমাপ্ত করিলাম—এহি পুস্তক আর কেহর এলাকা নহি", ১২৪০ (১৮৩৩) সনে শ্রীকৃষ্ণকান্ত এই কথা লিখেছেন। তাই আরেকজনের ভাষায়, "দুঃখেন লিখিতং গ্রন্থং পুত্রবৎ পরিপালয়েৎ।" তাই এরকম কোনো পুথি অপহরণ করার পাপ প্রসঙ্গে অভিশাপ স্পষ্ট :

"এ পুস্তক জে চুরি করে সে শাশুড়ির শৃঙ্গার করে" বা "শাশুড়্যা হইবেক।" কিন্তু পুথি তো লেখা হয় পাঠের জন্য। ১১৮০ (১৭৭৩) সনে জগন্নাথ ঘোষ গদাপর্ব লিখতে গিয়ে বলছেন, "শ্রবণ কারণ ইহা লিখিলাম সব।" "সঙ্কর ঘোষ" তাঁকে দিয়ে প্রতিলিপি করাচ্ছেন : "জন্ত্র কড়ি লেখাইল কড়ি করে ব্যয়।।" ১২৩০ সনে শ্রীমদ্ভাগবত (১৮২৩) 'মহাপোরাণ'-এর পঞ্চম স্কন্ধের প্রতিলিপি করতে গিয়ে রামপ্রসাদ দাস বোস বলেন, "কিন্তু এক নিবেদন। বক্তা ঠাকুর মহাশয়দিগকে আমার শতং কোট নমস্কার। আমার দোশাদোশ ক্ষমা করিবা।"[৯]

পুথি লেখাতে পুণ্যও আছে, অর্থ প্রাপ্তিও আছে। লিপিকররা জানে পুথিতে যে "দোশাদোশ আছে", "বক্তা মহাশয়েরান" "তাহাকে সুদ্ধ করিবেন।" লেখা শুদ্ধ হবে পাঠে, পাঠ প্রধান, লেখা পড়া নয়, পড়ালেখা। তাই সুবুদ্ধিই পড়তে পারবেন, অন্যরা পড়তে গেলে হয়ে যাবেন গোবর-গণেশ। আগে জানতে হবে কী লেখা আছে,

হৃদয়ে ভক্তি থাকতে হবে, তবে তো পড়া-লেখা হবে। শুদ্ধ মনে পাঠ করতে হয়। তাই একসময়ে পুথিকে পুজো না করে কথকতার আরম্ভ বা শেষ অকল্পনীয় ছিল। এ হেন কথকতা করার অধিকারের একটা সূত্র পরম্পরা, পেশার ধারাবাহিকতা, এক কথক ঠাকুরের চোখে পুথির মাহাত্ম্য ধরা পড়েছে এইভাবে,

> "দেখলুম কথক ঠাকুর নবীন হলেও তাঁর পুঁথিখানা নতুন নয়। অনেক দিনের হাতে লেখা পুঁথি…ভাগবতের সবখানি এই পুঁথির মধ্যে ললিতাক্ষরে লেখা আছে। ধারে ধারে তিনপুরুষের হাতের লেখার নিদর্শন, ক্ষুদ্র টিপ্পনী। কোথাও শ্লোকের একপাদ, কোথাও পূর্ণশ্লোক আর কোথাও কোনো দৃষ্টান্তের সংকেত। যারা এই পুঁথি নিয়ে কথকতা করেছেন, তাদের রুচি ও শিক্ষা অনুসারে নানা শাস্ত্রের প্রমাণ পাশে পাশে সংগৃহীত।
>
> "গুরুদেব বলেছেন, পুরাণ যেমন ষট সংবাদ না হলে রুচিজনক হয় না, তেমন পুঁথিও তিন পুরুষের না হলে শোধন হয় না। এ সব পুঁথিও তিন চার হাত বদল হয়ে অনেক তথ্য পূর্ণ হয়, আর লিপিকর প্রমাদও সংশোধিত হয়ে যায়।"[১০]

পুথি কথকের নিজস্ব কিন্তু সেই পুথি ধারা-বহির্ভূত নয়, পরম্পরায় বিধৃত। পাঠে পুথির সার্থকতা, পুরুষানুক্রমে পাঠের মাধ্যমে পুথি পোক্ত হয়। অবিরত পাঠে পুথির গৌরব বৃদ্ধি পায়, পুথি শুদ্ধ হয়। সেই জন্যই আসরে পুথির স্বচ্ছন্দ লেনদেন আছে। পুথি বলাটাই তো কথকতার একরূপ। কথক কালীপ্রসাদ দেবশর্ম্মার চিঠির বয়ান হল, 'এখানে আমার পুথি আরম্ভ হইয়াছে, কিছুকাল বিলম্ব হইবেক।'[১১] আবার ১২৫৩ (১৮৪৬) সনের পৌষমাসে কথকতা করতে গিয়ে লক্ষ্মীনারায়ণ দেবশর্ম্মা ঠ্যাকায় পড়েছেন। শ্যামাচরণ ভট্টাচার্যকে অনুরোধ করে তিনি লিখেছেন, "কীন্তু লঙ্কাকাণ্ড পুস্তক এখানে অর্প্রাপ্ত হইআছে য়তেব ষুনিলাম জে আপকাদের গ্রামে এই পুস্তক আছে আপনি মম পিতি অনুগ্রহ পিকাস করিঞা ঐ পুস্তক এই লোক সমীভারে পাঠাইঞে দিব।"[১২]

যেহেতু পুথি পাঠ করা হয়, তার চাহিদা আছে, তাই সবসময় মালিকের কাছে পুথী ফেরত যোগ্য। তাড়া খেয়ে ১২১৫ (১৮০৮) সনে মাণিকচন্দ্র দেবশর্ম্মা "যুদ্ধ মঞ্জরী ঠাকুর জীউ" স্থানে একরারনামা লিখতে বাধ্য হচ্ছেন। "সন ১২০৫ পাচ সাল শ্রীযুত পিতা ঠাকুর আপনকার স্থানে হইতে শ্রীশ্রীভাগবৎ পুথী লইয়া আসীয়াছিলেন। সন ১২১৩ সালে সেহী পুথী নতুনবাজার মোকামে পাট করিয়া এখানে ছিল সে পুথী লইয়া সহরের সেবকবাটীতে রাখিয়াছি প্রকাষ করিয়া জাইবার কালে সহর হৈতে পুথী লইয়া আপনকার নিকট দিবো।"[১৩]

পুথি না হলে পাঠ হবে না। পুথি পরম্পরাগত কিন্তু পুথির মালিক আছে, তার উপরে কোনো না কোনো স্বত্ব আছে। পরম্পরার কাঠামোতে পুথির চরিত্র নির্ধারিত হচ্ছে, অথচ বিন্যাসে থাকছে বিন্যাসকারের দক্ষতা, নিজস্বতা। পাঠ সামূহিক, পুথিও

সামূহিক পাঠের জগতে প্রোথিত, তার সার্থকতা সেখানে। তাহলে কথকের নিজস্ব মুনশিয়ানা কোথায়, তার সরহদ্দই বা কতদূর সেটা বিচার্য হয়ে ওঠে।

যেভাবে পাঠকের রূপান্তর ব্যাখ্যাকার ও কথকের মধ্যে হয়েছে, ঠিক সেইভাবে কথকের পুঁথি রচনাও, মূল গ্রন্থের অনুসারে, একটি মাধ্যমিক স্তরের মধ্য দিয়ে দানা বেঁধেছে। এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত পুঁথি আলোচনা প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই জাতীয় রচনার কথা উল্লেখ করেছেন। রামায়ণ, মহাভারত বা ভাগবত আয়তনে বিশাল, নানা শ্লোকে ও জটিলতত্ত্বে পরিপূর্ণ। ফলে কোনটা রাখব আর কোনটা বাদ দেব, সেটা কথকরা ঠিক করতেন, মূল গ্রন্থ থেকে বেছে বেছে আখ্যান ও শ্লোক সাজিয়ে একটা নির্বাচিত সংকলন তৈরি করতেন। রমাপতি এইভাবে উত্তরাকাণ্ডের কথা সংগ্রহ করেছেন, কেশব পঞ্চানন ভট্টাচার্য এইভাবে ভাগবতের কথা চয়ন করেছেন, গালভরা নাম দিয়েছেন "হরি-ভক্তি তরঙ্গিনী"। উনিশ শতকের গোড়ায় গণেশ বিদ্যাবিনোদ একই পদ্ধতিতে ৫৯০টি শ্লোকে রামায়ণের আদিকাণ্ডের কাহিনীর চুম্বক দিয়েছেন। এই সংগ্রহ গ্রন্থগুলি আখ্যানের মূল কাঠামো, কোন কোন বিষয় আলোচিত হবে তার নির্দেশ। এই কাঠামোর উপরে প্রলেপ দেওয়া হয়, তৈরি হয় কথা এবং আখ্যান। এই সংগ্রহগুলি লেখা হত সংস্কৃতে। মূল শ্লোক থাকত, সঙ্গে সঙ্গে সহজ সংস্কৃত গদ্যে গল্পসারও দেওয়া হত। সম্ভবত ওইগুলির উপর ভিত্তি করেই দিবাকালের পাঠকে প্রথমদিকের কথকরা সন্ধেবেলায় লোকের সামনে অনুবাদ করতেন ; এই জাতীয় সংগ্রহ করার প্রথম উদ্দেশ্য হয়ত তাই ছিল।[১৪] কথকের ভূমিকা প্রসারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে এই সংগ্রহের কাঠামোও পরিবর্তিত হয়।

'আদিকাণ্ড' কথা পুঁথিতে নানা আখ্যানের চুম্বক দেওয়া আছে, 'কথকস্য কথা' যেমন গঙ্গাবতরণ, "রামাদয়ো মিথিলায়াং চলিতাঃ।" আবার তারই সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হচ্ছে জটায়ু-মারীচবধ অথবা "জনস্থানে রমতা রামেন শূর্পণখা বিরূপিতা।" এমনভাবে বাক্যবিন্যাস করা হচ্ছে যাতে করে বাংলায় রূপান্তরিত করতে কোনো অসুবিধা না হয়, "সরযূতীরে কোষলো নাম জনপদস্তু অযোধ্যানাম নগরী"। আখ্যানের কাঠামোর সূত্রটি সাজানো হয়ে রইল।[১৫]

আবার এইরকম সহজ সংস্কৃতে আখ্যানভিত্তিক আরেকটি পুঁথির মাঝে জনকের মুখে একটা সংস্কৃতগন্ধী বাংলা শ্লোক জুড়ে দেওয়া হয়, বোধহয় শ্রোতাদের কাছে লাগসই শোনাতে পারে। যেমন,

"জনক উঃ জগদম্বার শ্লোক

নম অন্নদা অন্নপ্রদান করা। ত্বয়ী দিনদয়াময়ী দুঃখহরা।
হে শুভঙ্করী সঙ্কট শান্তিকরা। জগদম্বে জগন্মাতা যোগধরা॥
হে কাশীশ্বরী শঙ্করি অন্নদাতা।
শমনস্য ভয়ে সদা রক্ষ মাতা॥
ত্বয়ি শিব সনাতনী শক্তি প্রদা।

এ অশক্তজনে বরদে বরদা ।।
অতি অকৃতি দুর্মতি দিন হীনে ।
ওগো দিনময়ি কর ত্রাণ দিনে ।।"[১৬]

আবার আরেকটি 'সংগ্রহের' পুঁথিতে "দেশে দেশে কলত্রাণি"র মতো রামায়ণের বিখ্যাত শ্লোকগুলির মধ্যে হঠাৎ কুম্ভকর্ণের একটি সংলাপ বিচ্ছিন্ন পাতায় দেওয়া হল : "কুম্ভ উঃ দিকপালান্ ভক্ষয়িষ্যামি ২ পাবকং। দেবান্ বিপ্রান্ বধিষ্যামি।··· পাতয়িষ্যামি নক্ষত্রঞ্চ মহীতলে। শতক্রতুং বিজেষ্যামি পশ্যামি বরুণালয়ং। পর্বতান চূর্ণয়িষ্যামি। দারয়িষ্যামি মেদিনীং। মহাদেবং বধিষ্যামি পশ্যাদ্য বিক্রমং মম।" বলাবাহুল্য, পাঠের মজলিশে সংস্কৃতে লেখা এই ধরনের সংলাপকে মুখে মুখে বাংলায় করে দেওয়া আদৌ দুঃসাধ্য নয়। এই বিশেষ সংগ্রহ পুঁথিটিতে স্থানে স্থানে বিচ্ছিন্ন পাতায় বাংলায় লেখা সাটও আছে, যেমন, "অশ্বমেধ যজ্ঞাবসানে অযোধ্যা মণ্ডল মধ্যবর্তী সৌধ নিকর মণ্ডিত প্রাঙ্গনে বিবিধ ক্ষৌমরাদি [?] বসনোনির্মিতাসনোপরি নৃপ নৃপতিগণ স্ত্রিয়গণ দিব্যসিংহাসনোপবিষ্ট···গাওরে কি রামায়ণ গান শিখেছো।"[১৭] সহজ সংস্কৃতে লেখা গদ্য সংলাপের পাশাপাশি বাংলা সাটও লেখা হচ্ছে, সংগ্রহের কাঠামোয় নানাভাবে যোজনা চলছে, যোজনা কাঠামোকে রূপান্তরিত করছে স্বতন্ত্র পুঁথিতে। এই রদবদলের প্রক্রিয়া ধরা পড়ে এক কথকের লেখায় :

> "আমি মনে করেছিলুম, ভাগবতের মূল শ্লোক আর কোন প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা বোধহয় পুঁথিখানায় আছে। ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করে জানলুম, তা নয়। মাঝে মাঝে কোথাও ভাগবতের মূল শ্লোক আছে, আর প্রায়শঃ নানা শাস্ত্রের প্রমাণ, উপাখ্যান আর তার সঙ্গে দৃষ্টান্তগুলির উল্লেখ করা হয়েছে। দেখলুম, কয়েকখানা পাতায় সমাসবহুল সুদীর্ঘ বাক্যাবলীর সমষ্টি আছে। সেগুলি মূল পুঁথির অংশ নয়, কিন্তু খোলা পাতা হিসাবে ঐ সঙ্গেই আছে। ঠাকুর বলেন, ঐগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই পাতাগুলির মধ্যে কোনটা বনের বর্ণনা, কোনটা পর্বতের বর্ণনা আর কোনটা রাজসভা বা নগরের বর্ণনা। এই বর্ণনাগুলো কথা জমানোর জন্য খুব প্রয়োগ হয়ে থাকে।"[১৮]

পুরাণকাব্য থেকে সংগ্রহ, আবার সংগ্রহ থেকে নানাভাবে প্রসারিত ও যোজিত হয়ে কথকের পুঁথি—এই স্তরে উপনীত হবার প্রক্রিয়ায় যোজনার কয়েকটি সাধারণ সূত্র ধরা যেতে পারে। প্রথমত, আখ্যান বিন্যাসে আমরা লোককথা ও পৌরাণিক কাহিনীর মিশ্রণ দেখি, দৃষ্টান্ত হিসাবে লোকগল্পকে বার বার হাজির করা হয়। এই কায়দাকে অগ্নি-পুরাণের ভাষায় বলতে পারি 'কথান্তরম', এক কথার মধ্যে অন্য কথা ঢুকিয়ে দেওয়া যাতে করে মূল কাহিনীটা জোরদার হয়। দ্বৈপায়ন ব্যাস বনে যাচ্ছেন। মায়ের কান্না শুনে থেমে গেলেন। মাতৃভক্ত। তাই মাকে গল্প শোনালেন। বলা হল কিন্তু "ইতিহাসং শৃণু"। ঠিক যেমন ঘটেছিল, ঠিক তাই। শুদ্ধমতি বামুন, তার বৃদ্ধা মা এবং হিংসুটে বউ। "ইতিহাসং শৃণুর" পরেই ভাষা বদলে গেলে, তার রওয়ানি হয়ে

গেল অন্যরকম। মায়ের বিরুদ্ধে বৌ-এর হিংসা ও স্বামীকে উত্তেজিত করার নমুনা :
"ওর স্ত্রী বলে মলো আমি কেয় নই। বানে ভেসে এসেচি। শাশুড়ি বুড়ি ঘরের বালাই। থাকতে সুখ হবে না। দূর করে দেবো। তবে বাঁচবো।"
আবার রাত্রে স্বামীর পা টেপার সময়,

"চকের জল শুদ্ধমতির পায়ে পড়লো। ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। কেন ? প্রিয়ে কাঁদ কেন। কি জন্যে স্ত্রী যদি কাঁদে পুরুষ টো ব্যস্ত হয়। কি চাই বল। আমি মলেই বাঁচি। আমার কপালে আর সুখ নাই। পাড়া প্রতিবেশিনীরে দুদে ভাত খায় একদিন দুগ্ধো অন্নে খেতে পেলাম না। আর শোনার কি রুপোর আঁচোড় গায়ে হলো না। বলে ডুকুরে ২ কাঁদচে। হ্যাঁব কাঁদিসনে, সব দেবো।"

লোককথায় ঝগড়ুটে বউ-এর রূপও এসেছে। স্বামী রোজগারে বেরুলে শাশুড়ির প্রতি স্ত্রীর মূর্তি,

"প্রাচীনা বলে ও বৌমা বড় ক্ষুধা পিপাসা দেয় না খাই। ও ঘরে' হতে বেরিয়ে ভিমরুলের চাকের মত মুক ফুলিয়ে বলে মাথা নেড়ে মরহ, আকন্দ ডাল [*sic*] মুড়ি দেরমেচো তোমার মরণ নাঞি মা ককুন্ডর' প্রেমাই পেয়েচো যম বা তোর পাঁজি পুঁতি ভুলে গেছে।"

শাশুড়ি ডাইন, বনে ছেড়ে দেওয়া উচিত, তাই স্বামীকে বলা হয় ও তুক করা হয়,

"ওমা কি হবে ? মরণ কেন হলো না। পাড়ায় কাকে খেয়ে এসেচেন। নজ্জায় মুক পাততে পারি না। আমার সোনার ঠাকরুণকে কে আড়ি করে চোষকা মন্ত্র দিয়ে গেছে হে।...তুমি বাঁচালে হয়। সাবধানে থেকো। ওয়ো হলে নাকি আপনার ঘরেই আসে। আমাদের কপালে জা থাক তুমি বেঁচে থাকো। হাতের কগাচি থাক।...এই বলে সাঁড়ের গোবর কেঁচোর মাটি পিন্দিমের শিশ। কপালে দিলে আর ফু ২ করে বুকে ফুৎকুড়ি"

স্বামীকে ভজিয়ে বনে শাশুড়িকে পাঠাবার পরে বউয়ের আনন্দ আর ধরে না।

"দূর করেচি ঘরের আপদ। এখন একলা একেশ্বরি। সৃষ্টিধরী হয়ে বসেচি। খাবো দাবো নাচবো গাবো।...বার বার পথ দেকচে। স্বামি ফিরে এলে হয়। আর আহ্লাদে মাজখানাটা ভেঞে ২ ফেটে ২ পড়ছে।... জেন ফুটি ফটা কাঁকুড় ফাটা ফুটকড়াই আটখানা হয়ে দুটি বুড়ো আঙুলে বোঁড়িয়ে বেড়াচ্ছে পৃথিবী সরা দেখচে।"[১৯]

দ্বৈপায়নের জন্ম ও জীবনবৃত্তান্তের মধ্যে এই কাহিনী নিয়ে আসা হল মাতৃভক্তির মাহাত্ম্য প্রচার করতে ; সত্যবতীর প্রতি ব্যাসদেবের চিরন্তন আনুগত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা উদ্দেশ্য। কিন্তু গল্পের ভাষা ও বস্তুর অভিমুখ ভাগবতী আখ্যানের বিপরীত, লোকগল্পের মেজাজ ও ছক স্পষ্ট। তাই মার্গ ও লোকের মিশ্রণ দেশজ রীতির জন্ম দেয়, সেই রীতিতে কথকতা করা হয়। আধুনিককালে দ্বিজরাজবাবুও এই রীতির ব্যতিক্রম

নন। রামের সভায় লবকুশ রামায়ণ গাইতে এসেছে। সকালে তারা অযোধ্যানগরী ঘুরে বেড়াচ্ছে। তখন ময়রার দোকান থেকে বিনা পয়সায় মিষ্টি খাওয়ার যে ফন্দি লবকুশ বার করেছিল, তা আমাদের ছেলেবেলার শোনা গল্প : 'বাবা, মাছি রসগোল্লা খাচ্ছে' বা 'পিঁপড়ে রসগোল্লা খাচ্ছে।'[২০] আসরে বাচ্চারা গল্পটা শুনে হেসে ফেলে, আমাদেরও ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে যায়, কাহিনীতে মৌতাত ধরে যায়। কিন্তু যতই কথান্তর হোক না কেন, সুতো যতই ছাড়া হোক না কেন, গোটাবার কায়দা জানতে হবে, মূলে ফিরতেই হবে।

আখ্যানের মধ্যে চরিত্রায়নের জন্য ছোট ছোট 'চুটকির' মতো রচনা থেকে যায়। এই-গুলিতে থাকে লৌকিকের স্পর্শ, কথকের উদ্ভাবনা। কয়েকটা নিদর্শন দেওয়া যেতে পারে। দেবকীর প্রথম সন্তানকে ভাগবতী কংস বধ করতে অনীহা প্রকাশ করে। পরে নারদের কাছে দৈবী চক্রান্তের কথা শুনে সব ক'টি সন্তানকেই হত্যা করল। কথক এই সূত্রকে নিজের মতো করে সাজিয়েছেন। কংসের কাছে বসুদেব প্রতিশ্রুত, তাই দেবকীর গর্ভের প্রথম সন্তানকে নিয়ে এসেছেন।

"কংস উঃ সদ্যজাত সন্তান, অচ্ছিন্ন নাড়ী। রুধিরাক্ত এ সন্তান লএে সভায় কেনো। তুমি কি খেপেচো নাকি।"

বসুদেব প্রতিশ্রুতির কথা মনে করিয়ে দিলেন। তখন,

> "ওহে বসুদেব ও কথাটা আমার মনে নাই। মিথ্যাতে তোমার এতো ভয়। আমরাত প্রতিদিন কতো মিথ্যা বলে থাকি। ওহে বসুদেব তোমার বাড়িতে কি সত্যের গাচ আছে। তোমাকে আমার পণ্ডিৎ বলে জ্ঞান ছিলো। এখন জাল্লেম জে তোমার তুল্য মূর্খ আর জগতে নাই।...আকাশবাণি হয়েছিলো। দেবকীর অষ্টম গর্ভের পুত্র হতে আমার বিনাশ হবে। প্রথম জাতো শন্তান কি অপরাধ করে। তোমার হৃদএে কি দয়া নাই। লএ জাও ২ গৃহে লএে যাও।"

ভাগবতী কংস ও কথকতার কংসে প্রভেদ প্রচুর। কংসের মুখে এইরকম বিচারবোধ তাকে অনেক স্বাভাবিক করেছে, সত্য ও মিথ্যা বিচারে দৈনন্দিনতার ছাপ লেগেছে। আবার 'টাইপ' চরিত্র হিসাবে নারদকে আনা হয়েছে, তার পরামর্শে কংস শিশুকে হত্যা কল্ল। পরামর্শটাও একটি লৌকিক হিসাবের ধাঁধা। কথকতো পুঁথিতে বেশ বিস্তৃত করে লিখেছেন :

> "নারদ উ। বটে তুমি অষ্টম কারে বলো। কংস উ।। সপ্তমের পর জে তারে অষ্টম বল্লি। নারদ উ।। সপ্তমের পর তারে অষ্টম বলো। ভালো আট্টা মণি আনওয়েন করি দেখি। কংস মহারাজ তৎখনাৎ মণি আনওয়েন কল্লেন। নারদ উ।। এখানে রক্ষ্যা করে গণনা করো দেখি। কংস গণনা করতে লাগলো। একো দ্বি তৃ চত্তুঃ পঞ্চ শষ্ঠ সপ্তম অষ্টম, এইটি অষ্টম হলো। নারদ বলেন বটে ওইটা বাদিকে রেখে গণনা করো। কংস পুনরায়

গণনা করে। পূর্ব্বৎ এক দ্বি ত্ত্ব চত্ত্ব পঞ্চ শষ্ঠ সপ্তম অষ্টম। আজ্ঞা সপ্তমটা অষ্টম হলো জে।...এইরূপ পণপূরাণ ন্যাএ দ্বারায় দেবর্শী নারদ শকলগুলোকে অষ্টম করে দেখালেন। পণপূরণ ন্যায় কেমন। জেমন একগণ্ডা দুই গণ্ডা করে কুড়ি গণ্ডা করে এক পণ হলো। আবার সেই সকল একত্র করে পুনরায় গণনা কত্তে গেলে আবার এক গণ্ডাতে কুড়ি গণ্ডা হয় সেইরূপ সকলগুলি অষ্টম হলো।"

শ্রোতার কৌতূহল উস্‌কে দিকে কথক নিজে লেখেন "বলো দেব ঋশি-নারদ কংসকে এমন উপদেশ কেন কর্লেন।" কারণ লোকবিশ্বাস ও দেবরোষ। "মৃতবৎশা" স্ত্রী নাকি শীঘ্র গর্ভধারণ করে তাই ছটি সন্তান বিনাশ হলেই "অবিলম্বে বৈকুণ্ঠনাথ হরি ভূতলে অবতীর্ণ হবে।।" আর "কংস বালক বিনাশ করে প্রচুর পাপ সঞ্চার করুক। তাহলে শীঘ্রই জমালয়ে গমন করবে।"[২১] যুক্তির ফাঁক নেই। পরিকল্পনাটিও নারদের লোকগ্রাহ্য কূঁদুলে স্বভাবের সঙ্গে মিলে যায়, তাঁর পাতা ফাঁদে বোকা কংস পা দেয়, দৈবী জগতের চক্রান্ত রূপান্তরিত হয় লৌকিক জগতের প্যাঁচ-পয়জারে। আর সেই বুনটটি কথক নিজেই বানিয়ে তোলেন, পৌরাণিক আখ্যানের টানেতে লোক-অভিজ্ঞতা সহজে খাপ খায়।

পৌরাণিক আখ্যানের ধারার মধ্যে এইরকম ছোট বুনটের কাজ, গায়কীর মতো কথকী 'গিটকিরি' পালায় গতি সৃষ্টি করে, বৈচিত্র্যও বাড়ায় দৈবী চরিত্রের মহিমায় মানবিক মাত্রা যোগ করে। এই বুনটের কাজগুলি ঘটনা ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াভিত্তিক, মূল কাহিনীর ইতি-উতিতে আবদ্ধ। লঙ্কায় রাম সীতাকে অগ্নি-পরীক্ষার আদেশ দিয়েছেন। কথকের বর্ণনায় হনুমান সেই মুহূর্তে অকুস্থলে নেই. কুবেরের উদ্যান থেকে ফুল আনতে গেছে। ফিরে এসে সাজানো চিতা দেখে হনুমান চটে আগুন।

"এই কথা শ্রবণ করে হনুমানের ভাবোন্মাদ হল। আমার মা অশতি। অশতি বলে রাম তারে ত্যাগ করেছেন আজ দেখিবো রাম কেমন বির।"

পুথিতে হনুমান বলে, "রামং যমগৃহং নয়ামি।" শালগাছ তুলে রামকে আক্রমণ করেন, লক্ষ্মণের সঙ্গে লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হন। অনুযোগ করেন,

"জদি মাকে প্রতিপালন কর্ত্তে পারবে না তবে আমায় কেনো বল্লে না। আমি ভিক্ষা করে মাকে খায়াতেম।" রামের সব কৃতিত্ব হনুমান নাকচ করে এইভাবে।

"জদি বলো রাম হরধনু ভঙ্গ করেছেন। শে ধনু বহুকালের পুরাতন জিন্ন হয়েছিলো।"[২২]

হনুমানের এই মূর্তি প্রচলিত তুলসীদাসী, বাল্মীকি বা কৃত্তিবাসী রামায়ণে নেই, সূত্রাকারেও উল্লিখিত হয়নি। কিন্তু ভক্ত হনুমানের এই প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক লোক-গ্রাহ্য, ওইরকম এক পরিস্থিতিতে রামের অপ্রত্যাশিত আচরণে যে নাটকীয়তার সম্ভাবনা ছিল কথক সেই সুযোগ ছেড়ে দেননি। ভক্ত হনুমানকে দিয়ে রামের আচরণের প্রতিবাদ কথক করিয়েছেন। ন্যায়পরায়ণ ও সীতাভক্ত বলে হনুমান লোকগ্রাহ্য চরিত্রে মিশেও গেছেন।

এইরকমই আরেকটি টুকরো ঘটনার কথাও কথক উল্লেখ করেছেন, একটি ভাবকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। স্বর্ণলঙ্কায় লক্ষ্মণ মোহগ্রস্ত, অযোধ্যায় ফিরতে ইচ্ছুক নন। তাই লঙ্কার বাইরে বেড়াতে গিয়ে দেখলেন যে মাথায় আগুনের পাত্র ও পায়ে লৌহবর্ম্ম পরে একদল কৃষক চাষ করছে। মাংসাশী পাখি ও বিষধর সাপের উপদ্রবের জন্য তাদের ওইরকম বেশ। তখন,

> "লক্ষ্মণ উ ॥ এইস্থানে জদি এতো ভয় এস্থান ত্যাগ করে অন্যত্র বাশ করো না। কৃশকেরা বলেন শে শত্য। কিন্তু জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। এই নিমিত্ত আমরা এস্থান পরিত্যাগ করে অন্যত্র গমন করতে পারি না, লক্ষ্মণের মনে? আমারো জননী জন্মভূমি আছে।"[২৩]

এইভাবে নানা জায়গা থেকে শোনা, তুলনামূলকভাবে অপ্রচলিত সূত্র থেকে নেওয়া বা নিজেরই তৈরি করা গল্প কথার বুনটে ধরা থাকে, অভিযোজনের মধ্য দিয়ে কথকের বৈশিষ্ট্য বোঝা যায়। আখ্যানগুলোর মার্গীয় কাঠামো, এইরকম সংযোজন ও কথান্তরের ফলে লোকভাবনার নানা স্তরে প্রসারিত হয়, নিজেরা। পরিবর্তিত হয়ে দেশজ রীতির অঙ্গ হয়ে ওঠে। হুতোমি ঠাট্টায়, কথকঠাকুর বস্তুত যা বলেন "সকলি কাশিরাম খুড়োর উচ্ছিষ্ট ও কোনটা বা স্বপাক"।

কথার অন্য লক্ষণ বিচারে দণ্ডী নির্দেশ দিয়েছেন যে প্রাকৃতেও কথা গ্রাহ্য। ভারতের শ্রেষ্ঠ কথা সংগ্রহই তো লেখা হয়েছে, "ভূতভাষায়"। যে কোনো কথকতার পুঁথিতে নানা ভাষার সমন্বয় চোখ এড়াবার নয়। একদিকে সমাসবদ্ধ দীর্ঘ বাক্য, বর্ণনা, সাট অন্যদিকে যথাস্থানে সুযোগ মতো পরিস্থিতি বুঝে একেবারে লোকজ সংলাপ। একটা নজির দেওয়া যাক :

> "ক্রমশঃ দেবকীর গর্ভ বর্দ্ধিত হতে লাগিল। একদা মথুরাবাশিনী স্ত্রি শকল কুম্ভকক্ষে জমুনার জল আনয়ন করিতে গমন করিতেছে পথিমধ্যে মনে ২ 'অ দিদি চল ন্না একবার দেখে যাই কারাগৃহে বসুদেব দেবকী কি কর্চে। অস্নি জাৎ লোকের ভাল্লয় হগ, আর মন্দই হগ, না দেখলে যাবেন না।' পথিমধ্যে কুম্ব রক্ষ্যা করে কারাগৃহদ্বারে গমন করে দ্বারের উভয় পার্শ্বে হস্তার্পণ করে দাড়িএে দেখেন দেবকীর বশুদেবের রূপেতে করে কারাগৃহ জেন আলোকিত হএেচে। দেখে বলেন মাগো বসুদেব রূপেতে জেনো ফেটে মরচে। মাগির কিরূপ হএেচে। মাগিদিগে চাও জায় না। মিনশে জেন রূপের কাঁদি হয়েচে। কোন স্ত্রি বলেন তা অমন হয়। জতো বেটা বেটি মরে বাপ মাএের রূপ হয়, গতর লাগে।"[২৫]

বর্ণনা সাধুভাষায়, তৎসম শব্দযুক্ত সংলাপে শব্দ প্রয়োগের ধরন একদম অন্যরকম 'মাগি', 'গতর', 'রূপের কাঁদি' ইত্যাদি প্রাকৃত শব্দ প্রয়োগে বাছ-বিচার নেই, যা কথায় স্বাভাবিক, পুঁথিতে হুবহু তাই বসানো হয়েছে। এই স্বচ্ছন্দ 'গুরুচণ্ডালি' কথকতার ভাষার জোর ; কেবল স্ত্রীদের সংলাপেই নয়, পরিস্থিতি বর্ণনাতেও এর লাগসই প্রয়োগ

দেখা যায়। বৃন্দাবন থেকে মথুরায় কৃষ্ণকে আনার জন্য দূত চাই; দূত খোঁজার আয়োজনের বিবৃতি লক্ষণীয়:

"বৈষ্ণব না হলে বিশ্বাস করে আসবে না। একজনা বৈষ্ণব দেখ। এই সুনে মালা ছিঁড়ে তিলক পুছে সব পলায়ন। একজন দেখে বলেন ঐ বৈষ্ণব কিহে তুমি বৈষ্ণব নও। কোন পুরুষেই নই। অপ্রলাপ কথা জাকে জা নয় তাই বল। উঁহুঃ মসয় পাওয়া যায় না। একজনা বলে অক্রূর মালা হাতে করে না। হাঁ হাঁ ডেকে আন। উনি শুনে বাড়ী গিয়ে লুক্কাইত। অক্রূরের স্ত্রী বলে বড় হাঁপিয়ে এলে জে। চুপ কর ২। তুমি হাতের কগাছি রাখবে না খুয়বে বলত। কংস দূত ধর্ত্তে আসছে। তুমি জেন প্রকাশ করো না। আ মলো পোড়া কপালের দশা। তেমন মেয়ে নই বলবার জন্য মর্চ্চি। এমন কালে কংস দূত আগমন কোথা গো অক্রূর বাড়িতে আছ।"[২৫]

সংলাপ ও ভাষার বিন্যাসে নাটকীয়তা সৃষ্টি করা হল। মথুরায় ত্রাস ও শোরগোল, সেই মেজাজের সঙ্গে তাল রেখে ভাষা ও সংলাপ সাজানো হচ্ছে যাতে করে বলার সঙ্গে সঙ্গে ওই ভাব কথার বাঁধুনিতে ধরা পড়ে। বিবৃতির বয়ানটা প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ নয়। 'যদুশ্রেষ্ঠ' কংস-পার্ষদ অক্রূর রূপান্তরিত হচ্ছেন ভক্ত কিন্তু ভীরু বৈষ্ণবে।

আবার আর্তি ও আসন্ন অপমানের ভয়ের মেজাজকে ধরা হয়েছে সরাসরি সংস্কৃত শ্লোক ও টেনে টেনে বাক্য রচনার মিশেলে। পাশাখেলায় পাণ্ডবরা পরাজিত হবার পর একটি পুথিতে দ্রৌপদীর অবস্থা ও মানসিকভাবের পরিচয় দেওয়া হয়েছে এইরকম ছত্রে:

"মহারাজ জন্মেজয় কি কর্বো। রাজসূয়াবভৃমে জনেন মহাক্রতৌমন্ত্রপূতেন শিক্তাঃ। সা পাণ্ডবানাং পরিভূয়বীর্যবলাৎ প্রমৃষ্যাধৃতারষ্ট্রিয়েন। উ॥ মৃত্যু উপস্থিত বুঝি॥ কি হলো রে॥ বাড়িতে ডেকে এনে এই করলে। ধন নিলে॥ এই অপমান॥ গোবিন্দাভিষিক্ত এ কেশ। কালশাপ দংশিলে সে বিষঘ্রাণ পাবি নে॥"[২৬]

কথকতায় ভাষা বদলের এই নজরকাড়া রীতি বঙ্কিমের সমজদারিতে ধরা পড়েছে। তাঁর মতে, কথকতার নানা অঙ্গ, ব্যাখ্যা, বর্ণনা, পদাবলী ও গান। প্রথম অঙ্গে ভাষা সংস্কৃতানুসারী, জমাট ভাবকে শিথিল করে। পারিস্থিতি বর্ণনায় আবার ভাষা প্রয়োজন-বোধে জমাটি, সংস্কৃত-অভিসারী। পদাবলীর উদ্দেশ্য ঝঙ্কার ও লালিত্য তৈরি করা; রসানুযায়ী গানের ভাষার রকমফের হয়। কিন্তু এই সবের মধ্যে কথকতার ভাষার নিজস্বতা দেখা যায় পরিস্থিতি বর্ণনায়, "রসোদ্দীপন" যার লক্ষ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব কথায়:

"ইহার বাক্য (Sentence)-গুলি ক্ষুদ্রাবয়বের হয়, অনেক ক্রিয়াপদ অনুক্ত থাকে, অনেক ক্রিয়া বিশেষণও অনুক্ত থাকে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্যের পর দীর্ঘচ্ছেদ থাকে, কখন কখন কোন বিশেষ কথায় শ্রোতার (বা পাঠকের) মনঃসংযোগ করার জন্য পুনরুক্তি থাকে, আর কথকদের স্থানে এই ভাষার সহায়কারী নানা

ভঙ্গী থাকে। **এই ভাষা হৃদয়চ্ছেদ করিয়া পাটে পাটে বসিতে থাকে।**... ইহাতে ছোট ছোট জমাট বাক্যের গাঁথনি থাকে। জমাট পদগুলিকে পৃথক করিয়া লইলে সংস্কৃত পদ বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু সমস্ত গাঁথনি ভাগবতের ন্যায় জটিল রীতি যুক্ত নয়।"২৬ক (নজরটান আমার) কথকতার রওয়ানি ভাষার এই গাঁথনির জন্য সম্ভব হয়েছে।

কথকের মুনশিয়ানার আরেকটি পরিচয় হল তত্ত্বকথা আলোচনা করা, নানাভাবে সামাজিক মূল্যবোধ ও আচারের সঙ্গে কাহিনীকে সংযুক্ত করা। সরাসরি কথক ব্যাখ্যার মাধ্যমে, প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে, এই জাতীয় ক্ষেত্র তৈরি করতে পারেন বা অনেকসময় চরিত্ররা সংলাপের মাধ্যমে নানা পরিস্থিতির উপর মন্তব্য করেন। যাকে চিরন্তন ও শাশ্বত বলে মনে করা হয়, তাকে দৈনন্দিনতার মধ্যে মেশাতে হবে, তা না হলে কথকতার সামাজিক গ্রাহ্যতা বিপন্ন হবে, যৌথের ধারণার সঙ্গে কথকতার বিযুক্তি ঘটবে।

শিবের বিবাহের পর শিব বাড়ি যান না, ঘর জামাই হয়ে থাকেন, মেনকার জ্বালার অন্ত নেই। কথক রামপদ ভট্টাচার্য নিজে একটি বাক্যে প্রেক্ষিত ঠিক করেন, পরে মেনকার উক্তি বসান :

"এখন শশুর বাড়িতে অধিককাল থাকলে সকলে বিরক্ত হয়। একদা মেনকা উ॥ আমি একলা মেয়েমানুষ কদিক করবো। প্রত্যহ আর জামাই আদর কর্ত্তে পারি না। উমাও ঘরের একখানি কাজ করবে না। কেবল দুজনে খাবেন আর ঘরের ভিতর রাতদিন বসে থাকবেন, দেখে দেখে গা জ্বলে যাচ্ছে। জামাইটি মানুষ হয় না। কেবল ভাঙ ধুৎরা খাবে আর চিরকাল শশুরবাড়ি বসে থাকবে। এদের উপায় হবে কি।"২৭

"ইতিহাসং শৃণু", এই বললেন একজন কথক। "এখন শশুর বাড়িতে অধিককাল থাকলে সকলে বিরক্ত হয়", এই কথা লিখলেন আরেকজন। অতীত ও বর্তমান দুটোই বলা হতে পারে, পৌরাণিক সময়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে। বর্তমানকে মাথায় রেখে মেনকা উচ্চারণ করেন লাখ কথার এক কথা "এদের উপায় হবে কি ?" উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে গ্রাম বাংলার বা মফস্বলী শ্রোতার কাছে প্রশ্নটা পরিচিত, তাৎক্ষণিক। পৌরাণিক আখ্যানের মধ্যে বাস্তব উঁকি মারে।

আবার কতকগুলি আখ্যানের ঝোঁক এইরকম, যে তত্ত্বকথা আনতে হয়, না হলে মূল্যবোধের সঙ্কট দেখা যাবে, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে লালিত নৈতিকতা মার খাবে। 'রাসলীলা' কথকতার অতি জনপ্রিয় আখ্যান, বৈষ্ণবীয় তত্ত্বের কেন্দ্রবিন্দু অথচ লৌকিক ক্ষেত্রে তার তাৎপর্য "উচ্ছৃঙ্খলতার" জন্ম দিতে পারে। নানাভাবে কথকতার পুথিতে এই সমস্যাকে মোকাবিলা করতে হয় কারণ শ্রোতাদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা তো আর কম নয়। তাই পুথিতে সরাসরি সমস্যা উত্থাপন করতে হয়, পূর্বপক্ষ ও সিদ্ধান্ত পক্ষের ধাঁচে তাকে নিরসনও করতে হয়। উদাহরণ দেওয়া যাক।

"এক উপপতি শেবা অতি ভয়াবহ কর্ম্ম। কোন গৃহস্থের গৃহে গমন করলে পর তাকে সমাদর করে না। নিকটে বশতে দেয় না। সকলের নিকট খাটো হয়ে থাকতে হয়। অধিক কি বাড়ির চাকর তাকে বলতে হয় চাকর বাবা ভাৎ খাও এসে। সে বলে জায় মা ঠাকরুণ তোমার স্বভাব ভালো নয় তোমার হাতের অন্ন ব্যঞ্জন ভোজনে ইচ্ছা হয় নাই। দেখোদেখি এমনি কর্ম্ম চাকরের নিকট খাটো হয়ে থাকতে হয়।"[২৮]

এইরকম সামাজিক অবস্থায় গোপীদের প্রেম কেন সমর্থনীয়? যুক্তি দেওয়া হচ্ছে:

"এক জে অমৃত তারে বিশ জ্ঞানে পান কল্লেও অমর করে। এক অমৃতজ্ঞানে পান কল্লেও তাতেও অমর করে। অমৃতের কার্জ যে অমরত্ব প্রদান ত্তাই করে থাকে। তেম্নি পরমাত্মা জে হরি তাকে গপি শকল উপপতি বুদ্ধিতেও চিন্তা করেও গুণময় দেহ ত্যাগ করে নিত্য দেহ পেয়ে কৃষ্ণ নিকটে সর্বাগ্রে গমন কল্লেন। ...জে কাম নরকপ্রদ সেই কাম জদি ঈশ্বরে অর্পণ করতে পারো তাহলে সে মুক্তি লাভ করে। জে জেভাবে চিন্তা করুগ। তা হল্লেও তো ঈশ্বর চিন্তা হয়।।"[২৯]

কিন্তু কৃষ্ণের তরফে যুক্তি কী? সমস্যা প্রশ্নাকারে রাখা হল, পূর্বপক্ষ স্থাপিত হল।

"পর স্ত্রি জে গোপীসকল তাহার সহিৎ রাশ ক্রিড়া কল্লেন। এতে ধর্ম্মের বিরুধবাচরণ হলো। জদি বলেন আপ্তকাম পুরুষের ইহা অধর্ম্ম নয়।... আমার এই জিজ্ঞাশ্যো। জদি জদুপতি শ্রীকৃষ্ণ আপ্তোকাম তবে কি অভিপ্রায়ে নিন্দিত কর্ম্ম করলেন। এ বিষয়ে আমার সংশয় উপস্থিত হয়েছে।"[৩০]

সংশয় নিরসন করা হল, পূর্বপক্ষের আপত্তি খণ্ডন করা গেল।

"ধর্ম্ম ব্যতিক্রমো দৃষ্ট।... জেমন শর্বভুক অগ্নি সকল ভোজন করেন বিষ্ঠাও ভোজন কচ্ছেন এবং গো-মহিশাদি ভোজন কচ্ছেন। তা বলে কি তিনি অপবিত্র [*sic*] হন। সেই অগ্নি আবার যজ্ঞিয় হবি ভোজন করে থাকেন। ...জদি বলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আপ্তকাম হয়েও।। তিনি এরূপ কার্জে কেনো প্রবত্ত হয়েন।। এ বিষয়ে আপনি শ্রবণ করুন। জদিও ভগবান আপ্তকাম তথাপি ভক্তজনের প্রতি অনুগ্রহ করার নিমিত্ত মনুষ্যদেহ আশ্রয় করে এইরূপ রাশক্রিড়া করেন।"[৩১]

আর শেষ কথা হল সব কাজ সবার সাজে না, ক্ষমতার তারতম্য আছে। দেবতা বলে কথা। ক্ষমতার ভাষাকে শেষপর্যন্ত রূপান্তরিত করা হয় যুক্তিতে,

..."জেমন রুদ্র মহাদেব ব্যতিরেকে অন্য ব্যক্তি বিশ পান কল্লে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয় তেমনি কোন মূঢ় ব্যক্তিরা জদি মনে করেন।। জে কৃষ্ণ রাসলীলা করেচেন এবং বস্ত্রহরণ করেচেন আমরা তাই করবো অই কথা মনে করে।। জদি সেই কার্যে প্রবৃত্ত হয় তৎক্ষণাৎ তার মৃত্যু হবে।"[৩২]

যুক্তিগুলি আদৌ নতুন নয়। ভাগবতে রাসলীলা প্রসঙ্গে অনুরূপ কথা বলা হয়েছে।

পরীক্ষিৎ প্রশ্ন করেছেন, শুকদেব বলেছেন ; আত্মকামত্ব, অগ্নির সর্বভুকত্ব, রুদ্রের বিষপান ইত্যাদি অনুষঙ্গগুলির উল্লেখ ভাগবতসম্মত। কিন্তু ভাষার প্রয়োগে বলার ঝোঁকে তারতম্য ধরা পড়ে। শাপমন্যি নতুন করে পাঠক্রমে ঢোকানো হলে। ভৃত্যরা যে গিন্নির হাতে খেতে চায় না, ঠাকরুনকে অমর্যাদা করে, এটা সংযোজিত। থাকবন্দী সমাজে কর্ত্রীর মর্যাদা, অধিকারভেদ যে ভক্তির পরতে পরতে জড়িয়ে থাকে, ভাগবতী আখ্যানের এই সূত্রকে বিশেষভাবে নজরে আনাটা কথকের কাজ। তত্ত্বকথা পরিবেশনের ক্ষেত্রে ভাষ্যকার ও টীকাকারের সঙ্গে কথক মিশে যাচ্ছেন।

সমাজে পাতিব্রত্য এবং গোপীদের পরকীয়া প্রেম, এর মধ্যেকার দ্বন্দ্ব মেটাতে কথায় নানা যুক্তি আনতে হয়, উপমাকে, দৃষ্টান্তকে ব্যবহার করা হয় যুক্তি হিসাবে, শেষে শাপের ভয়ও দেখাতে হয়। কথক ধর্মবক্তাও বটে, তাকে পরম্পরাগতভাবে গল্পও বলতে হবে আবার লক্ষ্যও রাখতে হবে যে সামাজিক স্থিতি না ভেঙে যায়, তাহলে শ্রোতার সমাজই বদলে যাবে, আসরের উদ্দেশ্য মার খাবে।

সময় সময় কথান্তরে যাবার খাতিরেও প্রশ্নোত্তর রাখা হত, যাতে করে বলাটা বেখাপ্পা না হয়ে যায়। যেমন কালিয়দমন পালার একজায়গায়,

> "রাজা উ ॥ গুরো গা এ কেমন হলো। এই আপনি পূর্বে বললেন ফানী-এর বিশ তেজেতে জমুনার উভয় তীরে বৃক্ষলতা ঔষধি তৃণ পর্জন্ত জলিত হয়েছিলো। কিন্তু সে স্থানে কদম্ববৃক্ষ কিরূপে জীবিত ছিল। শুদেব উ ॥ মহারাজ কি শ্রোতা ॥ আপনি ॥ আপনারে শ্রোতা পেএে আমি কৃতার্থ হলাম। মহারাজ শুন শুন। এই কদম্ববৃক্ষ কিরূপে জীবিত ছিল তাহার কারণ শুন..."[৩৩]

এই কথার পরে অন্য কথা শুরু হয়, গরুড়ের অমৃত আহরণ ও কদম্ববৃক্ষে রেখে ক্লান্তি অপনোদন। প্রাসঙ্গিক ভাগবতী শ্লোকে কদম্ববৃক্ষের উল্লেখ আছে, একটানে গল্পের ফাঁকে ঘটনাটি একটি শ্লোকে বলা হয়েছে। প্রশ্নোত্তরের রীতি ভাগবতে আছে, প্রথাসিদ্ধ। কথক ঠাকুর সেই রীতি ব্যবহার করে কথান্তরে গেলেন। ভাগবতে অনুষঙ্গ একটি শ্লোকে সারা হত, কথকতায় সেটা এক পাতা জুড়ে চলল, বেতালা মনে হল না। প্রশ্নের উত্তর হিসাবে যে আখ্যানটা বলা হয়েছে।

সংস্কৃত রসশাস্ত্রের বিচারে 'কথা' ও 'আখ্যায়িকার' বহিরঙ্গ নিয়ে ভামহ ও দণ্ডির কুটকচালি তর্ককে অপ্রাসঙ্গিক করে তুলেছিলেন বাণভট্ট। একটি নিবন্ধে এই তর্কের বিবর্তন নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন সুশীলকুমার দে। শেষপর্যন্ত 'রসেই' কথার পরিণতি। আলোচনা থেকে 'কথার' দুইটি নান্দনিক সূত্র পরিষ্কার।[৩৪] মহাভাষ্যের টীকাকারেরা আলোচনায় বার বার, 'গ্রন্থিক' শব্দটিকে কথকের প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহার করেছেন, ধারণা গ্রন্থনের, কথনের।

বাঁধুনি ও 'গাঁথনি'টা জরুরি। শ্রোতাদের মজলিশে 'কথা'কে গেঁথে তোলা কথকের কাজ। সেইখানে কাহিনীর উৎসবিচার ততটা প্রাসঙ্গিক নয়। কথা জমাটি হচ্ছে

কিনা, জমাটি কথা জমায়েতকে ধরে রাখতে পারছে কিনা, সেইটা বিচার্য। এই জমাট বাঁধার গুণ আবার নির্ভর করছে কথকের বুদ্ধিতে বিষয় কীভাবে অধিগত হল, তার উপর। কথকী রীতি কেবল গ্রন্থগত নয়, স্বকীয় বুদ্ধিগতও বটে।৩৫

তাঁর বিচারে ভামহ জানিয়েছেন যে কথা হল পুরোটা রচা কিন্তু কথায় প্রবাহ থাকতে হবে।৩৫ক প্রবন্ধের 'ভাবিকা' গুণ থাকে, তার প্রসাদে অতীত ও ভবিষ্যৎ মানসচক্ষে প্রত্যক্ষ হয়। (প্রত্যক্ষা ইব দৃশ্যন্তে যত্রার্থা ভূতভাবিতঃ)। এই 'ভাবিকত্ব' বা ভাবিকা সিদ্ধ হবার অন্যতম শর্ত 'কথায়াঃ স্বভিনীততা', কথাপ্রবাহ। উর্দুতে 'স্বভিনীততার' সুন্দর প্রতিশব্দ হল 'রওয়ানি'। 'বাঁধুনি' ও 'রওয়ানি', এই দুটি গুণ যখন পরস্পরের প্রতি স্পর্ধা নিয়েও 'সাম্যে' অবস্থান করে তখন কথা হয়ে ওঠে শিল্প রসে ভরপুর। "কথায়াং সরসং বস্তুং গদ্যৈরেব বিনির্মিতম্।"৩৬

ভামহী ধারণানুসারে সরসবস্তু গদ্যে লিখিত হলেও তাকে 'শ্রব্য' বা শ্রবণমনোহর হতে হবে। স্বর ও সুর সংযোগে শ্রবণীয় কথার চমৎকারিত্ব বা মনোহারিত্ব বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রেও সহযোগের, ঘটকালির, চিন্তা কার্যকর। 'সহিতের' তত্ত্বে স্বর ও সুর সংযোগে শব্দ গ্রন্থনা ও তার পাঠ হয়ে ওঠে কথকতা।

গ. স্বরের কথা, সুরের খেলা :

মন্দিরের পুরোহিত ও টোলের অধ্যাপকের পদ নিয়ে দুই ব্রাহ্মণ যুবকের মধ্যে জবর প্রতিদ্বন্দ্বিতা। লাজুক অম্বরনাথ এবং চতুর ও বাকপটু আদ্যনাথ। এই লড়াইয়ের ক্ষেত্র হল কথকতার আসর। জমিদার কন্যা বাণী সমজদার, ছেলেবেলা থেকে কথকতা শুনে তার কান তৈরি। স্নানযাত্রা থেকে ঝুলন পর্যন্ত মাসাবধিক কাল আসর বসে, গ্রামবাসীরাও শোনার অভিজ্ঞতায় কম যান না, তাঁদের গ্রামে ভাগবতী কথকতা প্রতি বৎসরে অনুষ্ঠিত হয়।

'মুখচোরা অম্বর', নিজের চিত্তরঞ্জনের জন্য 'শুধু নীরবেই পাঠকার্যে' অভ্যস্ত। ফলে কথকতার আসরে বসে তার করুণ অবস্থা হয়। পাঠকার্যে অনভ্যাসের দরুণ,

> "সে থামিতে লাগিল। কথা বলিতে বলিতে মধ্যে মধ্যে সে থমকিয়া থামিয়া পড়ে, কণ্ঠ যেখানে তারায় তুলিতে হইবে, সেখানে উদারায় নামিয়া আসে, যেখানে হর্ষে উচ্ছ্বসিত হইয়া কহিতে হইবে, সেখানে কণ্ঠ বাধিয়া নবোঢ়া বধূর মত লজ্জায় অস্ফুটতর হইয়া আসিয়া হয়ত শেষে থামিয়া যায়।...শ্রোতার দল প্রসন্ন হয় না, বক্তা লজ্জায় মাটি হইয়া যাইতে চাহে।"৩৭

আদ্যনাথ দক্ষ কথক, তাঁর কথকতা স্বরক্ষেপণে সিদ্ধ। তাঁর কথকতা শুরু থেকেই জমে ওঠে।

> "স্ফীতবক্ষে টগর ফুলের মালা পরিয়া কণ্ঠস্বর কখনো পঞ্চমে কখনো ভৈরবীতে কখনো বেহাগে কখনোও বা আবার ললিত রাগিণীতে উঠাইয়া

নামাইয়া হাসাইয়া কাঁদাইয়া নদীতরঙ্গের মত অবলীলায় যে বাহিত করিয়া দিয়াছে, সে আদ্যনাথ।"[৩৮]

ভূদেবের পরিবারের মেয়ে লেখিকা অনুরূপা দেবী, কথকতা তাঁর পরিচিত শিল্প। তিনি জানেন যে কথকী দক্ষতার অন্যতম উৎস হল স্বরের কুশলী নিয়ন্ত্রণ। ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রে 'কাকুস্বরব্যঞ্জক' অধ্যায়ে স্বর প্রয়োগের রীতিনীতি নিয়ে আলোচনা আছে। ভাব সৃষ্টির সঙ্গে স্বর প্রয়োগের যোগ নিবিড়। ভাব অনুযায়ী, পরিস্থিতি অনুযায়ী, কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন হয়। কোথায় তা হবে মন্দ্র (কণ্ঠস্থ বিলম্বিত ধ্বনি) আবার কোথায় হবে দীপ্ত। প্রযোক্তৃদের প্রতি অনুপুঙ্খ নির্দেশ আছে। "ভাবেষেতেষু নিত্যং হি নানারসসমাশ্রয়াৎ।" কণ্ঠস্বরের ওঠানামার সম গুরুত্বপূর্ণ বিরাম। বিরামের প্রযত্ন আবশ্যক, বিরাম অর্থসূচক। বিরামই 'অর্থসমাপ্তি নিমিত্তং' এইকথা অভিনবগুপ্ত তাঁর টীকায় মনে করিয়ে দিয়েছেন।[৩৯] বিরামে গোলযোগ হলে অন্য অর্থ হবে। নাট্যশাস্ত্র একটি সংগ্রহ গ্রন্থ। এর শিকড় নিহিত আছে ব্যবহারিক ও লৌকিক অভিজ্ঞতায়। টীকায় অভিনবগুপ্ত চেষ্টা করেছেন তাঁর নিজের দর্শন চাপাতে।[৪০] লোকবৃত্তি বা লোকস্বভাবের অনুসরণে বিরামের জন্য কথকরা বলার ভঙ্গি চালু করেছিলেন, যে ভঙ্গির কথা নাট্য শাস্ত্রেও উল্লিখিত হয়েছে।[৪১] এই ভঙ্গি প্রসঙ্গে তারাশঙ্করের সাক্ষ্য হল,

"নিশাপতি গম্ভীরভাবে বললে, দেবর্ষি নারদকে দেখে ব্যাস বললেন—অহো ভাগ্য! আসুন-আসুন-আসুন, দেবর্ষি নমস্কার।
নিশাপতি তখন ভাগবত কথকতার এ ষ্টান্টটুকু আয়ত্ত করেছে। সেকালে ভাগবতের আসরে এইভাবে অনেকজন আগন্তুক কথকের সাদর সম্বর্ধনায় আপ্যায়িত হয়ে বিনয় প্রকাশ করে অপ্রস্তুত হতেন।"[৪২]

স্বরক্ষেপণ ও স্বরভঙ্গি কথকরা অভ্যাস করতেন, আসরে সেইভাবে বলতেন। বিক্রমপুরের বাসাইলনিবাসী রাখালচন্দ্র গোস্বামী হলেন বংশগতগুরু। শিষ্যবাড়িতে তাঁকে পাঠ করতে হত, কথকতা করতে হত। গলার স্বরক্ষেপণে স্বাভাবিক নিপুণতা ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে একজন সাক্ষ্য দিয়েছেন যে ভাওয়ালে আসরে বসে বলার ঝোঁকে বলেছেন, "তোমার বাড়ী কোথায়?" সামনে বসে থাকা শ্রোতা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েছে, "হ্যাপার পরাণ গ্রাম"[৪২ক]

এই কৃৎ-কৌশলকে মাথায় রেখে কথকরা পুঁথি লিখতেন। পুঁথির বিন্যাসে ও ভাষায় তার ছাপ আছে। পুঁথিসংলগ্ন হরিনাম মাহাত্ম্যের একটি চূর্ণীতে টানা বাক্য সমষ্টি লেখা আছে। অর্থ অনুযায়ী বিরামপূর্বক পড়া বিধেয়। যেমন,

"ভাইরে বেদেয় হরি রামায়ণেয় হরি আদ্যে হরি অন্তে হরি হরি চলো কোন ভয় নাঞি কোন শ্রম নাঞি কোন ক্লেশ নাই মুখে হরি বললেই হয় রে অনাআশে, পরমপদ পাবে রে। ভেবে দেখো দেখি ছিলেই বা কথা এলেই বা কথা সেখানে কি কথা বলে এলে বিষয় পেয়ে ভুলে গেলে কিছু মনে নেই

ধনোপার্যেণ করো গৃহ ব্যাপার করো স্ত্রী পুত্রাদির লালনপালন করো তা যত বারণ করেন নাঞি তায় করো আর থেকে ২ মুখে একাকার হরি ২ বলে ডাক গো জন্ম সফল হবে কুল পবিত্র হবে।"[৪৩]

লেখায় কোনো যতিচিহ্ন নির্দেশ নেই। অথচ পড়লেই বোঝা যায় কোথায় থামতে হবে, কোথায় বা শুরু করতে হবে। এইবার কথোপকথনের একটা নমুনা পেশ করা যেতে পারে।

"এখানে দ্রৌ পাকগৃহে দ্বারে অঞ্চল পেড়ে সয়ন। নিদ্রা। এই সময় দুঃস্বা ছুটে গিয়ে চরণে পড়েছে। চোকবুজে উ॥ কেয় ঠাকুর পো? কেন? একি। চক্ষে জল কেন। উ॥ আমাদের সর্বনাশ হয়েছে। এলোকেশে সোনার প্রতিমা আঃ এই দণ্ড খানিক নিদ্রা হয়েছে কেন ঞেদের সঙ্গে বিবাদ হয়েছে। না। তবে কি মুখ ম্লান কিছু খাও নাই।...
দুঃস্বা চকে হাত দিয়ে রোদন। ঘরে থেকে সাধ করে বৌ এনেছিলাম। বৌরে বৌ। তাদের কেশ ধরে নিয়ে গেল। বৌরে বৌও ও। এনে দে তোর পায়ে পড়ি। বৌরে বৌ। উ॥ ভয় নাই।"[৪৪]

উপযুক্ত অনুচ্ছেদে দ্রৌপদী ও দুঃশাসনের মুখোচ্চারিত বাক্য এক স্বরে পড়লে চলবে না, তাল ও বিরামে পার্থক্য আছে, তাই দিয়ে পরিচিতি অনুযায়ী চারিত্রিক মেজাজ বোঝা যাবে। বাক্যবন্ধ ও যতির মধ্যে পড়ার রীতিনির্দেশ স্পষ্ট। পাঠ্যস্বর অনুযায়ী শ্রোতাদের কাছে বিশেষ আবেদন বিজ্ঞাপিত হবে, এই কথা মনে রাখা আবশ্যক।

বাঙালি কথকদের পাঠ রীতিতে একটি বিশেষত্ব নজর এড়াবার নয়। সংস্কৃতবহুল বাক্যাবলী বা 'সাট' বা 'চূর্ণীর' প্রয়োগ বাঙালি কথকতার রীতি ছিল। অনুপ্রাস ও সংস্কৃতবহুল শব্দ পাঠের ঝোঁকে ঝংকার তোলে, অর্থ ব্যতিরেকে শ্রোতাদের অভিভূত করে থাকে। এই কায়দায় কথকরা নিপুণ ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়,

"আমাদের দেশের কথকরা এই তত্ত্বটি জানিতেন, সেইজন্য কথকতার মধ্যে এমন অনেক কান-ভরাট-করা সংস্কৃত শব্দ থাকে এবং তাহার মধ্যে এমন তত্ত্বকথাও অনেক নিবিষ্ট হয়, যাহা শ্রোতারা কখনই সুস্পষ্ট বোঝে না কিন্তু আভাসে পায়—এই আভাসে পাওয়ার মূল্য অল্প নহে।"[৪৫]

সাটের সব শব্দের অর্থ বোধগম্য হয় না। সময় সময় অর্থও সামান্য, পুনরুক্তিতে ভরা। অথচ শব্দ ঝংকারে যে সৌন্দর্য আভাসে সৃষ্টি করে, তা শ্রবণ তৃপ্তিদায়ক। অর্থের বোধ সেক্ষেত্রে ততটা প্রয়োজনীয় নয়, হয়ত রস উপভোগের বাধক। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির বাল্য বয়সের অভিজ্ঞতাও রবীন্দ্রনাথের রসবিচারের অনুসারী। যোগেশচন্দ্রের জবানীতে,

"মনে পড়ে, নয় বৎসর বয়সে রামায়ণ নিয়ে কাড়াকাড়ি করেছি। বছর পাঁচ ছয় পরে রামায়ণ কথা প্রথম শুনি। সে কি আনন্দ! কথক ঠাকুরের বাক্যচ্ছটা বুঝতে পারতাম না, কিন্তু তা-তে কিছুই এসে যেত না, খেই হারাত না।"[৪৬]

উনিশ শতকে 'কথকতার সুর' বেশ চালু শব্দ। স্বরের সঙ্গে আছে সুর, গান বাঁধার কাজ। কিছু পালা তো সুরে, ছন্দে লেখা হত, তাদের শিল্পীরা হতেন গায়েন। কথকদের বানানো গান বেশিরভাগ সময়ে পৃথকভাবে লেখা হত, পুথিতেও আলাদা সংযোজিত হত। গান নানা সূত্র থেকে নেওয়া হত, টুকে রাখা হত, প্রয়োজনে কাজে লাগতে পারে। কথক মহানন্দের হাতে লেখা গানের খাতা সবচেয়ে বড় প্রমাণ। শ্রীমদ্ভাগবতের পালায় লেখা থাকত হরি মাহাত্ম্য নিয়ে গান,

"গৌড় শারং

হরে হর মম ভব যাতনাং নাশয়াসু বসুদেব বিশয় বাশনাং। অহম্মদ মত্ত তব জ্ঞান বিহীনে দীন হীন রামধনে সদাবিষয় নিপুণে বিতর করুণাং। ১।।

আলিয়া।। ইহ মে ভবে রাঘবে কিম্ভবে। অহমিহ সদামত্তো বিশয়াসবে। তব ভজন পূজন মনাদৃত্য মম মনঃ।। মুহ্যতি সতত মহং মামতি রবে।। নিবাস সংসার বনে ছিদ্রবহুল ভবনে।। নিত্যভয়ে কলিকাল চৌর সম্ভাবে।। সদা মহা মোহনিশী তেন দীনোদ্ধব গ্রাসি রাম তব তব শরনৈশি পদপল্লবে।। ১।।"

রামপদ ভট্টাচার্য গানটা লিখেছেন, 'রাম' কথাটি ভণিতায় আছে।[৪৭] কিন্তু গানটা লেখা আছে আলাদাভাবে, পালার কোনো অনুচ্ছেদের সঙ্গে যুক্ত নয়। ভাগবতী পালা। ফলে চূর্ণীর মতো সময় বা জায়গা বুঝে গানটা গাওয়া যাবে, বেমানান হবে না।

আবার সময় সময় পালার সংলাপের মধ্যে গান রাখা হত।

"কোন গপি রাধিকারে বলছেন শখিরে আর কালার প্রেমে কাজ নাই। তখন রাধিকা শখিরে অমন কথা বলিশ নে। শখী।।

গান।। শে কালো সামান্য কালো নয়। বেদাগমে কয়।। মহাজোগী মহাকালো কালোভবে জোগী হয়।। কিবা দিবা রাত্রো কালো না ভাএে কালাকালো সর্বদা জে ভাবি। কালো নাহি তারো কালো ভয়।।"[৪৮]

দ্বিজরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কথকদের আসরে বসলে মনে হয় সে আখ্যানে গানের ভূমিকা সবসময় গল্পের অঙ্গ নয়, বরং অলঙ্কার। কাহিনী বলার ফাঁকে ফাঁকে বিরতির জন্য, গান দেওয়া হয়, বৈচিত্র্য আনা হয়, তা না হলে বিবৃতি একঘেয়ে লাগতে পারে। কথা থেকে গান, গান থেকে আবার কথায় যাওয়া যেতে পারে। হনুমান ভরদ্বাজের আশ্রমে যাচ্ছেন, যেতে তো সময় লাগবে, ওই সময়ে আকাশপথের বর্ণনা না দিয়ে, হনুমানের মুখে দ্বিজবাবু গান বসিয়ে দিলেন,

"বিমল আনন্দে, সুললিত ছন্দে জগদানন্দে ডাকোনারে"[৪৯]

আবার লঙ্কায় হনুমান বৃদ্ধবেশে শিবভক্ত রূপে প্রবেশ করবেন, তখন মুখে শিবস্তোত্র স্বাভাবিক, হনুমান শিবস্তোত্র আবৃত্তি করতে লাগলেন, দ্বিজবাবুও স্তোত্র সুরে গেয়ে উঠলেন,

"শঙ্কর হর পরমেশ, পতিত পাবন দীনেশ।"[৫০]

কিন্তু কোনো কোনো সময় গানের মাধ্যমে তত্ত্বকথাও বলা হয়। কাহিনীর অন্তর্নিহিত ভাব সুরেলা কথায় যত সহজে গ্রাহ্য হবে, আর অন্যরূপে হওয়া সম্ভব নয়। বাসন্তী

দেবী এই রীতিতে সিদ্ধা, দ্বিজবাবুও প্রয়োজনে গানের এইরকম ব্যবহার করেন। হনুমান তাঁর বুক চিরে রাম-সীতার যুগল মূর্তি দেখাচ্ছেন, সেটা রূপক, তার তাৎপর্য গানে ব্যাখ্যা করা হল, "জয় মহাবীর জয়।।" কথকতায় গান এখানে যাত্রার প্রচলিত বিবেকের কণ্ঠে সঙ্গীতের ভূমিকা পালন করেছে।[৫১]

গান সংগ্রহ করা রীতি, একজনের লেখা গান অন্যে গাইতে পারতেন। গানও নানারকম, রামপ্রসাদী, কীর্তন, বাউলাঙ্গ, রাগপ্রধান, স্তোত্র ইত্যাদি। সব সুরই যে সহজ সরল, এই কথা মনে করার কোনো সঙ্গত কারণ নেই। অধুনা নবব্রত ব্রহ্মচারী তাঁর ভাগবত পাঠে স্বচ্ছন্দে রজনীকান্তের গান সুযোগ মতো ব্যবহার করেন।[৫২] মহানন্দও গান প্রয়োগে উদার মতাবলম্বী ছিলেন। দাশরথি রায়ের গান কথকরা গাইতেন কারণ ভাব ও সুরের ক্ষেত্রে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী, জনপ্রিয়ও বটে।[৫৩] পুথিতে দেখা যায় যে গান যেন শুনতে শুনতে লেখা হচ্ছে, আঁকাবাঁকা লেখা, আবার অপর পৃষ্ঠায় একই গানের পরিষ্কার অনুলিপি করা হচ্ছে। এক পাতায় এক পিঠে চূর্ণীর কয়েকটা ছত্র, "পরম-ধার্মিক দ্বৈদণ্ড প্রবল বল প্রতাপান্বিত, দুষ্টদমন শিষ্টপালন" ইত্যাদি বলে পরীক্ষিতের বর্ণনা, অপর পিঠে গানের কয়েকটা টুকরো ছত্র "সোনার চাঁদ গোঁড়াচাঁদকে পাগল করিলে" ইত্যাদি।[৫৪] এইগুলি নানা জায়গা থেকে চলতি অবস্থায় নেওয়া হচ্ছে, এইটা স্পষ্ট। ষষ্ঠীর দিনে স্থানীয় কথক এসেছেন, তম্বুরা নিয়ে প্রচলিত আগমনী গীত গাইলেন। ফরমায়েশ মতো একটি নতুন গান গাইলেন, গানটি ওই আসরের এক ১৪/১৫ বৎসরের কিশোরের লেখা, কিশোরটির নাম বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।[৫৫]

গান যাই হোক না কেন, যেই শিক্ষক হোক না কেন, কথকতার আসরে গানের আবেদন সামগ্রিক। পাঠক্রমে স্বরগুলির একক প্রয়োগ বিবেচ্য। কিন্তু যখন সঙ্গীতের মাধ্যমে রসসৃষ্টি হবে, তখন প্রযুক্ত স্বরগুলির সামগ্রিক আবেদনে ভাবটি ধরতে হবে। স্বরলিপি কাঠামো মাত্র। গায়কী, কণ্ঠ, পদ ও সুর মিলিয়ে ভাব রূপপরিগ্রহ করে, শ্রোতাকে মগ্ন করে। কথকের আসরে সঙ্গীতের সামগ্রিকতা অনুভবের বিষয়, লেখা বা বলার মধ্যে সব ধরা যায় কিনা সন্দেহ। তবুও রসভুক্তির একটি পরিস্থিতির বর্ণনা দেওয়া যেতে পারে। অনুরূপা দেবীই আমাদের ভরসা।

> "সেদিন কথা শেষে সঙ্গীত হইয়া সভা ভঙ্গ হইল। সেই তাল লয় যুক্ত স্বর ও সঙ্গীতের উদ্দীপনা সঙ্গীত শেষ হইলেও বাণীকে অনেকক্ষণ অবধি মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিল। ভ্রাতৃরূপে পরিকল্পিত শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে সদ্য-পুত্র-শোকাতুরা সুভদ্রার গীত, গীতটির মর্ম্ম এইরূপ···জান নাকি তোমার দেওয়া এ জীবনের সকল আলোক যদি নিবিয়া যায় তথাপি তোমার আলো এ জীবন হইতে নিমেষের তরেও নিবিবে না। তুমিই আমার অভিমন্যু, তুমিই আমার অর্জুন, তুমিই আমার বাসুদেব, তুমিই আমার সব, আমার সবই তুমি প্রভু।···সঙ্গীতের শেষ কম্পন বৃহৎ খিলানের মধ্যে বিলীন হইয়া গেল। ইহার পরও কিছুক্ষণ কেহ বাক্যোচ্চারণ করিল না।···কথক থামিয়া গিয়াছে,

সে (বাণী) এতক্ষণ কিছুই জানিতে পারে নাই। এতক্ষণ সে মন্ত্রমোহে আচ্ছন্নবৎ হইয়া সুভদ্রার কথাই ভাবিতেছিল।"[৫৬]

ঘ. কথকতায় তাৎক্ষণিকতা :

উনিশ শতকের প্রথমদিকে রাইপুর থেকে নীলকণ্ঠ দেবশর্মা নানুরে জানাচ্ছেন :

"নিবেদনমিদং, শ্রীযুক্ত দাদামহাশয় ৮ রোজ এ বাটিতে পৌচিআছেন এবং ৯ রোজ পুরাণ আরব্ধ বাবুদিগ্যের বাটিতে হইআছে জানিবেন লাভাদির কিছু হয় নাই কথকথা উত্তম হইতেছে সকলের মর্নাহৎ হইআছে আর উত্তর উত্তর ভাল হইতেছে"...[৫৭]

'উত্তর উত্তর ভাল হইতেছে', আসর জমে উঠেছে, কথকের সঙ্গে শ্রোতার ঘটকালি হয়েছে, কথক তাদের মনোমত হয়েছে। পুথিতে গ্রন্থনা থাকে, কাহিনী গ্রন্থনে আবদ্ধ। অথচ অনুষ্ঠান রোজ হয়, পুথিকে ঘিরে থাকে শ্রোতা ও পাঠক। সব শ্রোতাও সমান নয়, আসরের আবহাওয়াও সব জায়গায় এক নয়। কথকতার ভালো বা মন্দে তারতম্য ঘটে, কথককে সতর্ক থাকতে হয়, চিঠির বয়ানে তা ধরা পড়ে। তাই বাঁধা পুথির তারতম্য ঘটবে ; পুথি মূল খুঁটি। কিন্তু আসরে কথককে পুথির এদিকে-ওদিকে যেতে হয়, হুবহু পুথি ধরে চললে আর 'উত্তর উত্তর' ভালো হবার সম্ভাবনা কম। পুথি দেখতে হয়, ছুঁতে হয়, এবং তার পরে বলতে হয়। দীনেন্দ্রকুমারের বর্ণনায় ছবি স্পষ্ট,

"তিনি (কথক ঠাকুর) তুলটের কাগজে লিখিত ও পাতলা কাঠের আবরণাবৃত প্রায় একহাত দীর্ঘ পুথিখানি সম্মুখে খুলিয়া রাখিয়া মধ্যে মধ্যে এক একটি শ্লোক দেখিয়া লইতেন, এবং তাহা আবৃত্তি করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিতেন ; কখন গান করিতেন, ব্যাখ্যা উপলক্ষে নানা গল্প বলিতেন ; কখনও হাসাইতেন, কখনও কাঁদাইতেন।"[৫৮]

পুথিতে শ্লোক দেখা ও শ্রোতাদের হাসানো-কাঁদানোর মধ্যে ফাঁক অনেক। কথক গান গাইছেন, ব্যাখ্যা করছেন, গল্প বলছেন সবই মুখে, সঙ্গে সঙ্গে চলছে। শ্লোকগুলি সব পুথিতে লেখা। শ্লোক বা মূল কাহিনী কথায় পল্লবিত হচ্ছে, গানে অলঙ্কৃত হচ্ছে, গল্পে বিস্তৃত হচ্ছে। ফলে অনুষ্ঠানের তাগিদে সফল কথকরা আসরে বসে শ্রোতার মনোভাব বুঝে গান তৈরি করেন, গল্পের রদবদল ঘটে, স্বরের পরিবর্তনে ভাবের আবেদনেও রকমফের হয়। আসরের এই তাৎক্ষণিকতা অনুযায়ী মুখে মুখে রদবদল ঘটানো তাঁর দেখা সেরা বাঙালি কথকদের গুণবিশেষ, এই কথা দীনেশচন্দ্র সেন স্পষ্ট বলে গেছেন।[৫৯]

কথকদের নিজস্ব অভিজ্ঞতায় এই রীতি স্বীকৃত। দ্বিজরাজবাবু বলেন যে, "আসরে আসার আগে ভাবলাম এক আর আসরে বসে এমন কথা বললাম যা ভেবে আসিনি। জানি না কি করে বললাম।"[৫৯ক] আরেক কথক ঠাকুর লিখেছেন,

"অনেকদিন ধরে একই ধরনের বাঁধা নিয়মের গানগুলো মাঝে মাঝে একটু

অদলবদল করে ঠাকুর গান করেন। মাঝে মাঝে নতুন গানও তিনি তৈরী করে শুনিয়ে দেন। ঠাকুরের এখন এমন একটা শক্তি হয়েছে যে কথা বলতে বলতে সুর ধরলেন—আর সঙ্গে সঙ্গে পদযোজনা।...ঠাকুর কথা বলে গেলেই গান হয়ে যায়।"৬০

আসরে বসে সৃষ্টি করা, রদবদল করা তো শ্রোতার রুচিনির্ভর, শ্রোতার প্রতিক্রিয়া কথক ঠাকুরকে বক্তব্যের তারতম্য ঘটাতে প্রণোদিত করে। তাতে শ্রোতাদের রস আস্বাদনে খিঁচ লাগতে পারে, কারুর কারুর বিরূপ মন্তব্য আসতে পারে। কথক ঠাকুরের আত্মজৈবনিক রচনায় আসরে শ্রোতার প্রতিক্রিয়া ও কথকের বাচকতার মধ্যে টানাপোড়েন ধরা পড়ে,

> "এই যে মুখুটিমশায় আসুন, আজকের কথকতা কেমন শুনলেন ? দেখুন, সভায় আপনাদের মত জ্ঞানীগুণী লোক থাকলে কথার সুরই পালটে দিতে হয়। এই ধরুন ছন্দা, সে লেখাপড়া শিখেছে। একটা কথা বল্লে সে বোঝে। কাজেই ওদের মত শ্রোতা যদি কাছে বসে কেমন করে আর সাধারণ গল্প বলে কথা শেষ করি ? অবশ্য তাতে করে সাধারণ শ্রোতার পক্ষে একটু কিরকম মনে হয়, হলোই বা তা বলে কি রোজই একসুরে গান আর গল্প করে যেতে হবে, তবে শাস্ত্র ব্যাখ্যার যেটুকু রহস্য সেটুকু আর কোথায় বলব ? সাধুদের দল থেকে আজ আমায় একজন কে বলছিল—ঠাকুর কথাগুলি বড় শক্ত হয়ে যাচ্ছে। আজ যে একটাও গান হল না, কেবল কোথাকার কোন পণ্ডিত কি বলেছেন সে কথা, ওগুলি শুনে আমাদের কি হবে ?
>
> "...ঠাকুরমহাশয়, সে কথাতো ঠিকই—মুকুটি মশায় বলল ; তবে কিনা সাধারণ লোকে যাতে বেশ মেতে যায়, সেভাবেই আপনাকে কথা লাগাতে হবে।"৬১

শ্রোতার শোনার ইচ্ছা, শ্রোতার প্রস্তুতি, কথকের বলার ইচ্ছা, কথকের নিজস্ব প্রস্তুতি—এর মধ্যে ব্যবধান আছে, বিরোধ আছে, আবার যোগও আছে। দুটি মিলেই তৈরি হয় আসরের তারতম্য, তা আবার ঠিক করে দেয় বলার তারকে।

আসর সমাজস্থিত, তার বাইরে নয়। ফলে পরিস্থিতি অনুযায়ী কথকের বাচকতা অতিরিক্ত মাত্রা পেতে পারে। প্রতিমা দেবী তাঁর স্মৃতিতে এর সাক্ষ্য ধরে রেখেছেন :

> "স্বদেশী যুগের আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই 'সখি কেবা শুনাইল শ্যাম নাম' আর মৃদঙ্গের বোল, শ্রোতাদের আবেগের ধ্বনি এ'ল নীরব হয়ে। ক্ষেত্রচূড়ামণি কথক তখনো কুরুক্ষেত্রের বর্ণনা ও গীতার ব্যাখ্যা করে শ্রোতাদের চিত্তকে রুদ্ররসে উত্তেজিত করে রেখেছিলেন। সেটা স্বদেশী আন্দোলনের যুগের সঙ্গে তখনো বেখাপ্পা হয়নি।"৬২

বাইরের সামগ্রিক পরিস্থিতি বদলাচ্ছে, ক্ষেত্রচূড়ামণির কথকতা নূতন মাত্রা পাচ্ছে, গীতা বা কুরুক্ষেত্রের বর্ণনার রুদ্ররস তখন নূতন অর্থে মণ্ডিত হচ্ছে। স্থানীয় পরিস্থিতিতেও এইরকম প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা স্বীকার করা যায়। আত্মজৈবনিক রচনাতে প্রাণকিশোর

গোস্বামীর মতো 'পুরাণ-বক্তা' এইরকম অবস্থার বিবৃতি দিয়েছেন। 'বামন ভিক্ষা' পালায় কথক দানের প্রশংসা করছেন, বলছেন "দানের মত আর কি আছে?" গ্রামের বারুয্যে পরিবার, শীল পরিবার এদের দানের কথা বলা হল, দীঘি কাটানোর কাহিনী উল্লেখ করা হল। তাতে সভা থেকে রেগে সাধু সান্যাল উঠে গেলেন। কারণ,

> "এই গ্রামের সকলেই জানে সাধু সান্যালের মত কৃপণ আর কেউ নেই। সেই সান্যালের সামনে অত দানের কথা, তাই ঐ কথা তার ভালো লাগেনি। তিনি আরো ভয় করছিলেন, এর পর কথক যদি সভার দিকে লক্ষ্য করে দানের কথা কিছু বলে ফেলেন তাতে বেশী করে লাগবে এই সান্যালের।"৬৩

এইরকম কোনো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কথক প্রাণকিশোরের ছিল কিনা বলা মুশকিল। কিন্তু কথক ও শ্রোতার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিয়ে এতাবৎকাল বাংলা ভাষায় লেখা একমাত্র বইতে এই রকম পরিস্থিতিকে বাদ দেওয়া হয়নি, সেটা ভুললে চলবে না। সামাজিক মূল্যবোধের উপর গল্পের টানে কথক মতামত প্রকাশ করেন, গল্প ও কাহিনীতে মন্তব্য জুড়ে দেন। আসরের শ্রোতারা সমাজস্থ, তাতে তাদের প্রতিক্রিয়া হতে পারে, বাচকতা অভীষ্ট অর্থে না পৌঁছোতেও পারে।

আসরে নানা লোকের কাছে কথকতার গল্প নানা অর্থ নিয়ে আসে, শ্রোতারাও তাদের মতো করে কথকের বয়ানের মধ্যে নিজের মানে খুঁজে পায়। শ্রোতা ও কথকের যৌথ চেষ্টার মধ্যে কথকতার বয়ান গ্রাহ্য হতে পারে। যোজিতের সঙ্গে ব্যবধান অতিক্রম করাই তো যোজকের কাজ।

লেখা থেকে বলার প্রক্রিয়া, কথার ঝোঁকে বাক্য বদলে যাওয়া, শ্রোতার দাবিতে গল্প বানিয়ে তোলা, এইসব রওয়ানির মধ্যে পড়ে। কিন্তু কোথাও এইরকম হলে চলবে না যে মূল রস বদলে যাবে, রাম হবে কাপুরুষ ও রাবণ হবে পরম সুশীল, দেশরক্ষায় রত। তাহলে কথকতায় অনৌচিত্য দোষ ঘটবে, রসাভাস হবে। সীমা যেখানে টানা হয়, বাঁধুনি সেখানে রওয়ানির সঙ্গে মেলে। এই ক্ষেত্রেও লেখা ও বলার সাম্য দরকার, টানাপোড়েন সেই সাম্যকে জোরদার করার জন্য, ভেঙে দেবার জন্য নয়।

ঙ. কথকতার শৈলীতে আধুনিকতা ও ধারাবাহিকতা

কথকতা সম্পর্কিত একটি মূল্যবান প্রবন্ধে হরিপদ চক্রবর্তী মহাশয় বেশ জোরের সঙ্গে বলেছেন যে কথকতা "একটি অপরিবর্তিত শিল্পধারা।" যাত্রা, ঢপ গান বা পাঁচালিতে পরিবর্তনের তুলনায় প্রাচীন কথকতার সঙ্গে প্রচলিত আধুনিক কথকতার পার্থক্য খুব কম। কাঠামোর কোনোরকম তুলনামূলক আলোচনা তিনি করেননি। প্রবন্ধের উপসংহারে তিনি মতামত জানিয়েছেন মাত্র।৬৪

হরিপদ চক্রবর্তীর মন্তব্য হয়ত তুলনামূলক বিচারে সঠিক। যাত্রা, পাঁচালির অনুষ্ঠান দলগত। অভিনয় ও মঞ্চেও নানা কৌশলের প্রয়োগ আজকে সিদ্ধ। ফলে পরিবর্তনের গতিও দ্রুত। পক্ষান্তরে কথকতার ব্যবহারিক শিল্প চাতুর্য কথকের উপর নির্ভরশীল।

কণ্ঠস্বরের চড়াই-উৎরাই দিয়ে এবং সঙ্গীত ও শব্দযোজনা করে সব বোঝাতে হয়। কিন্তু কথকতাতেও বিবর্তনের ছাপ আছে। যতই ধীর গতিতে হোক, কথকতাও পরিবর্তন থেকে পুরোপুরি মুক্ত নয়। পরিবর্তনের উৎস দুটি। এক, শ্রোতার রুচি ও আধুনিক প্রচার-মাধ্যমের প্রভাব। দ্বিতীয়ত, শিল্পীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য।

নব্বইয়ের দশকে দেখছি যে দ্বিজবাবু, বাসন্তীদেবী অথবা অবনী অধিকারী হারমোনিয়ম ব্যবহার করেন। উনিশ শতকের কথকের আসরের নানা বিবৃতিতে স্বভাবত হারমোনিয়মের উল্লেখ নেই, কারণ তখনো সেটা চালু হয়নি। এটা অবশ্যই একটি পরিবর্তন। মাইক্রোফোনও কথকরা ব্যবহার করেন।

যে সব আধুনিক কথকতার আসর শুনেছি বা তাদের পুঁথি দেখেছি, তাতে বলা যায় যে 'চূর্ণীর' প্রয়োগ আজকাল অনুপস্থিত। ওই জাতীয় বর্ণনা বা বিবৃতির সঙ্গে আধুনিক শ্রোতা আদৌ অভ্যস্ত নয়, তাদের কানই তৈরি হয়নি। কবে থেকে চূর্ণীর প্রয়োগ কমতে শুরু করল, বলা মুশকিল। কিন্তু কুমুদবন্ধুর পুঁথিতে 'সাট' নেই। পঞ্চাশের দশকে ক্ষান্তিলতার খ্যাতি, ফলে তখন থেকে চূর্ণীর ব্যবহার কমে আসছে বলে অনুমিত হয়। হয়ত বাংলা ভাষা ও সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে সাধারণের সামগ্রিক পরিচয় ও তার সঙ্গে সঙ্গে ভাষা প্রয়োগ প্রসঙ্গে রুচির বদল 'চূর্ণীকে' ধীরে ধীরে অপ্রয়োজনীয় করে তুলেছে।

প্রচার-মাধ্যমের চাপও এক-আধটু বদল আনে। দ্বিজবাবু যুগলমন্ত্রে দীক্ষিত, 'সীতার পাতাল প্রবেশ' পালা আসরে কোনোদিন করেননি। শুধু একবার বেতারে করেছিলেন। ধারক বা শ্রাবকও আজকাল দেখা যায় না। সবাই যে সব আসরে পুঁথি বা খাতা সামনে রেখে পড়েন, তাও নয়। সকলেরই একটি পাঠ লেখা আছে, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু আসরে অনেকেই আজকাল স্মৃতি-নির্ভর। ধারাবাহিকতা থেকে যায় ভাববস্তুতে, রসবিন্যাসে।[৬৫] আধুনিক কথকদের রীতি লক্ষণীয়। দ্বিজবাবু প্রথাসিদ্ধ মঙ্গলাচরণ করেন। দ্বিজবাবুর মঙ্গলাচরণ এইরকম : সুরে পর পর পরিচিত সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি; রামের বন্দনা স্তোত্র, বাল্মীকি বন্দনা, শিবস্তোত্র, ভগবতী স্তোত্র (সর্ব্ব-মঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ-সাধিকে ইত্যাদি), কৃষ্ণস্তোত্র (হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপতে ইত্যাদি), মারুতি বন্দনা (নমামি অঞ্জনাসুতং বায়ুপুত্রং মহাবলং ইত্যাদি), ব্রহ্মা বন্দনা, পর পর বলা হচ্ছে। এঁদের কৃপায় মূক বাচাল হয়, পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে। তারপরে বাংলা গান, "রাম নাম বল, বল, এই নাম কর সার" (কীর্তনাঙ্গ সুর)। বাংলা গদ্যে তুলসীদাসী বচন আবৃত্তি, পরে বচনটির বিস্তৃত অনুবাদ : রামায়ণ পাঠ সর্বমঙ্গলকর ও পাপহর, বৈতরণী পারের তরণীস্বরূপ। কৈলাসে শিবের মুখে পার্বতী অপূর্ব রামকথা শ্রবণ করছেন, সেইটা যেন কৃপাপ্রাপ্ত দ্বিজবাবু বলছেন। গদ্যে আবেগ মিশিয়ে দ্বিজবাবু বলেন, রামকৃপাতেই তাঁর পাঠ করা সম্ভব হচ্ছে, "যন্ত্র আমি, যন্ত্রী তুমি, রথ আমি, রথী তুমি, যেমন পরিচালনা করবে তেমনিই পরিচালিত হব, যেমন বাজাবে তেমনিই বাজব।" আবার গান, "আমার হৃদয়-

মন্দির মাঝে এসো রাম ধনুধারী" ইত্যাদি। তার পরে আখ্যান শুরু।৬৬

পালার শেষও প্রথাগত। 'রাম বল মন' গানের কলি। তারপরে চিরপরিচিত,

"যে গায়, যেবা গাওয়ায় যেবা করায় শ্রবণ,
অনায়াসে হয় তাদের পাপের বিমোচন।"

চিরজীবী হনুমানকে সেইদিনের মতো বিদায় দেওয়া হয়, তিনি তো আসরে হাজির ছিলেন। ('নিজস্থানে গমন করুন পবন নন্দন।') কৃত্তিবাস পণ্ডিতের জন্ম শুভক্ষণ, তাঁকে প্রণাম জানানো কর্তব্য। এরপরে আগামী দিনের পালার বিষয় বলা হয়। সবার শেষে আসরে 'ভক্তজনের' সম্মিলিত কণ্ঠে 'রামধুন' দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি করা হয়। "ঈশ্বর আল্লা তেরি নাম" এই ছত্রটি গাওয়া হয় না।

একভাবে বিন্যস্ত মঙ্গলাচরণ ও সমাপ্তিকরণ-এর মাধ্যমে দ্বিজবাবু প্রত্যেকটি পালার 'ফ্রেমটি' বেঁধে দেন। এই সরহদ্দটি প্রথাগত। 'রামধুন' অবশ্য সংযোজিত, বাঙালি কথকতায় এর প্রয়োগ ঊনবিংশ শতকে ছিল কিনা সন্দেহ। কিন্তু দ্বিজবাবুর উদ্দেশ্য স্পষ্ট। পালাটি রামময়, রাম-পরিকররা সবাই আছেন, আছেন ভক্ত কবিরা, আদি কবি বাল্মীকি, গোস্বামী তুলসীদাস ও পণ্ডিত কৃত্তিবাস। এঁদের বার বার দ্বিজবাবু ছুঁয়ে যান, 'সনাতন কাব্যবীজ'-এর আধার তো এই মহাকবিরা।

দ্বিজবাবুর কথকতা গল্পপ্রধান। আখ্যানটা বড় কথা, তত্ত্বকথা মাঝে মাঝে থাকে, গান ফাঁকে ফাঁকে আসে। কথা ভক্তিরসপ্রধান। রাক্ষস বা হনুমান চরিত্র দিয়ে প্রয়োজনমাফিক দ্বিজবাবু হাস্যরস আনেন। রামের সেতুবন্ধনে কাঠবেড়ালিকে হনুমানের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা ও তাই নিয়ে কাঠবেড়ালির অভিযোগ, দ্বিজবাবু গম্ভীর স্বরে বলেন ও আসরে বাচ্চারা হেসে উঠছে, এইটা আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা।৬৭ দ্বিজবাবুর সূত্রও বিভিন্ন, তুলসীদাসী কৃত্তিবাসী থেকে যোগবাশিষ্ট রামায়ণ, রামরসায়ন ইত্যাদি। কিন্তু আখ্যানে লম্বা সংস্কৃত শ্লোক তিনি বলেন না, কথায় দীর্ঘ বাক্যও নেই। রামায়ণের মধ্যে প্রয়োজনে মহাভারতের গল্প এনেছেন, শবরীর উপাখ্যানে বিদুরের কৃষ্ণ সেবার কথা সাজিয়েছেন।৬৮

একটি দেশজ উপাখ্যানে কীভাবে অভিযোজন করা হয়েছে, দেখা যেতে পারে। তরণীসেন কৃত্তিবাসের নিজস্ব সৃষ্টি। রামের প্রশ্নের উত্তরে বিভীষণ ঠারে-ঠোরে তরণীর পরিচয় দিয়েছেন, "প্রকারেতে দিলেন প্রকৃত পরিচয়।" এর পরে যুদ্ধ। কৃত্তিবাসের আখ্যানের মাঝে দ্বিজবাবু নিজের কথা জুড়লেন, "এই হল ত্যাগ··· ঘর-দোর নেই, বিয়ে থা হল না, সংসার ত্যাগ করে বেরিয়ে গেলাম, আর মহাপ্রভুর মত সংসারত্যাগ, বুদ্ধদেবের মত রাজ্যধন ঐশ্বর্যপূর্ণ সংসার ত্যাগ, এ দুটো সংসারত্যাগে পার্থক্য নেই? আজ একমুঠো অন্নের সংস্থান করতে পারলাম না, বহু চেষ্টা করলাম, ভাঁড়ে ভবানী, বললাম আজকে আমি আহারে সংযম করেছি আর চতুর্বিধায় [?] সামনে পড়ে আছে তবু আহারে সংযম করেছি, এ দুটোর পার্থক্য নেই?"৬৯ দ্বিজবাবু তত্ত্বের প্রসঙ্গে বেশি বাক্য ব্যয় করেন না। কিন্তু গল্পের নাটকীয়তা ও নিগূঢ়ার্থ বাড়াবার জন্য কাহিনীতে

মোচড় দেন, কৃত্তিবাসের রওয়ানির রদবদল করেন। বিভীষণের পরামর্শে রাম ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করেন ও তরণী মারা যাবার পর বিভীষণ কাঁদেন, বলেন,

"প্রভু করি নিবেদন।
মরিল তরণীসেন আমার নন্দন।"

রাম সান্ত্বনা দিলেন। তখন বিভীষণ বলেন,

"বিভীষণ বলে, প্রভু, নিবেদি চরণে।
পুত্রশোকে কান্দি হেন না ভাবিহ মনে॥
ধন্য ধন্য পুণ্যবন্ত আমার সন্তান।
মরিয়া তোমার হস্তে পাইল নির্বাণ।
... ...
শত্রুভাব করি সবে পাইলা উদ্ধার।
শ্রীচরণ সেবা করি কি লাভ আমার॥
যদি পারিতাম দেহ করিতে পাতন।
বৈকুণ্ঠনগরে মম হইত গমন॥"[10]

পালায় দ্বিজবাবু বিভীষণের আক্ষেপকে অন্যভাবে রেখেছেন। পুত্রের মৃত্যুর পর সরাসরি বিভীষণ ধনুর্বাণ হস্তে রামকে যুদ্ধে আহ্বান করেছেন। "তরণীর যুদ্ধ শেষ— এবার আমার পালা। তরণী বালক, সে যুদ্ধ শেখেনি, ধরো ধনুর্বাণ, যুদ্ধ করো মোর সনে,...না তুমি আমার মিতা নয়, তুমি আমার পুত্রহন্তা।" পালায় রাম বিভীষণকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে তরণীকে তিনি বাঁচিয়ে দেবেন। বিভীষণ তখন জানালেন যে অন্তর্যামী হলেও রাম ভক্তহৃদয়ের মর্ম বুঝছেন না। রামের মিত্রতায় লাভ নেই, লাভ শত্রুতায় আছে, কারণ শত্রুতা করেই তো তরণী বৈকুণ্ঠে গেল। কৃত্তিবাসে বৈকুণ্ঠে না যাবার জন্য রাম বিভীষণকে সান্ত্বনা দেন এই বলে,

"শ্রীরাম বলেন দুঃখ ত্যজ বিভীষণ॥
যেই তুমি সেই আমি ইথে নাহি আন।
সাধুর জীবনমৃত্যু একই সমান॥
যতদিন রবে তুমি অবনীভিতরে।
আমার সমান দয়া তোমার উপরে॥"

দ্বিজবাবুর পালায় রাম বিভীষণকে বলেন—"বৈকুণ্ঠ যে তোমার মধ্যে এসে গেছে। বিগত কুণ্ঠা যেখানে, সেখানেই তো বৈকুণ্ঠ।" তরণীসেনকেও ছাপিয়ে যান বিভীষণ। দ্বিজবাবুর তরণীসেন বধ পালা প্রকৃতপক্ষে বিভীষণের ভক্তির পরীক্ষার ইতিবৃত্ত। কৃত্তিবাসের মূল রসকে ব্যাহত না করে বিভীষণের ব্যবহারকে একটু বদলে দিয়ে দ্বিজবাবু গল্পে প্রতিসরণ আনলেন।

দ্বিজবাবুর পাঠভঙ্গির সঙ্গে বেতারে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের **মহাভারতের গল্প** বলার ভঙ্গির

মিল আছে। **প্রভাবের কথা বলছি না,** সাযুজ্যের কথা আনছি। দ্বিজবাবু গান করেন, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ গল্পে আদৌ গান গাইতেন না কিন্তু উভয়ে ভাষাকে এক তারে বাঁধেন। শিষ্ট, সাধু অথচ সহজ ভাষা। চরিত্রানুযায়ী যে ভাষার রদবদল হত তা কিন্তু নয়। স্বরে অভিনয়াংশ কম, মেয়েদের সংলাপও এক স্বরে বলেন, কোনো 'মেয়েলি' ভাব আনেন না। দ্বিতীয়ত ঘটনানুযায়ী ছোট ছোট ভাগে আখ্যানকে বিভক্ত করে বলা হয়। নিজের মন্তব্য, প্রশ্ন বা গান (দ্বিজবাবুর ক্ষেত্রে) এই ছোট ছোট ভাগগুলির সংযোজক। ফলে গল্পের রওয়ানি তৈরি হয়, পরের ঘটনাটি শোনার জন্য কৌতূহল উসকে দেওয়া হয়। বিভূতিবাবু কথকতার ও গল্প বলার এই শৈলীকে ধরতে পেরেছিলেন। বাবা হরিহরের পাঠ শোনে অপু,

> "এদিকে আবার যখন সিন্ধু সৌবীরের রাজা রহূগন তাঁহার স্বরূপ না জানিয়া রাজর্ষি ভরতকে শিবিকাবাহক নিযুক্ত করেন—তখন হইতে কৌতূহলে ও উৎকণ্ঠায় তাহার (অপুর) বুক দুরু দুরু করে, মনে হয় এইবার একটা কিছু ঘটিবে, ঠিক ঘটিবে।"[৭১]

ছোট ছোট ঘটনাগুলির নিজস্ব ভাব আছে । কোনোটা হাসির উদ্রেক করে, কোনোটা বা দুঃখের। এই সব টুকরো টুকরো ভাব মিলে গোটা পালাটার মধ্যে যখন এক সামগ্রিক রস ফুটে ওঠে, তখনই কথকতা শিল্পোত্তীর্ণ হয়, গল্প বলাটা হয়ে ওঠে আর্ট।

অবনীবাবুর কথকতাটা প্রথানুগ তবু শৈলীতে দ্বিজবাবুর 'রামায়ণীর' সঙ্গে তাঁর পার্থক্য আছে। অবনীবাবুর পাঠ অনেকটা পাঁচালির ঢঙে, আখ্যানে গানের চাইতে পয়ারে লেখা পদ্যাংশ বেশি।[৭২] অবনীবাবুর মূল উৎস জগৎরামী-রামপ্রসাদী রামায়ণ, অষ্টাদশ শতকে রাঢ় অঞ্চলের বিখ্যাত সহজিয়া সাধকের লেখা। "অদ্ভুত-অধ্যাত্ম মত, একত্র করিয়া যুত, রচনা বিবিধ রসধাম।"[৭৩] মঙ্গলাচরণের বিন্যাস এক, খালি সংস্কৃত পদগুলির বেশিরভাগ বাংলা পয়ারে গীত। আখ্যান ছন্দে বিধৃত, সংলাপও প্রায়শ তাই। পালার আগে একটি দীর্ঘ বন্দনাগান আছে। তাতে পরিচিত সমস্ত মার্গীয় দেবতা আছেন, তদাতিরিক্তও কেউ কেউ আছেন। দীর্ঘ বন্দনাগানের শেষ অংশ তুলছি,

> "পিতামাতা চরণকমলে প্রণাম জানাই।
> পিতামাতার সম গুরুভাই এই জগতে আর কেহ নাই।।
> আর শিক্ষাগুরু দীক্ষাগুরু বন্দিনু চরণ।
> এই আসরে আসুন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।।
> এই আসরে এসো মাগো বীণা [?] বাদিনী।
> সঙ্গে করি লয়ে এসো ছয় রাগ আর ছত্রিশ রাগিণী।।
> মাগো মা, তোমার কৃপাতে মাগো রামের গুণ গাই।
> তুমি মুখ ফিরালে বাক্য নাহি পাই।।
> ... ...

কলিযুগের দেবতা বন্দি দেবী বিষহরি।
পদ্মফুলের উপর জন্ম হয় যার শিবের কুমারী ।।''

কোনো পরিশীলিত আসরে, হরিসভায়, রামায়ণী বন্দনাগানে মনসার প্রবেশ অপ্রত্যাশিত। কিন্তু অবনী অধিকারীর বন্দনা দেখায় যে রামায়ণী পালাতে, বন্দনার বিন্যাসে আঞ্চলিক সংস্কৃতির নানা সূত্রে, সবকিছু ঢুকে পড়তে পারে। গ্রামে যাদের ক্ষমতা স্বীকৃত, লৌকিক আসরের বন্দনাগানে তাদের বাদ দেওয়া বিপদজনক।

ইন্দ্র ব্রাহ্মণ নন, তাই গৌতম মুনি তাঁকে সামগান শেখাননি। তখন ছদ্মবেশী ইন্দ্র অহল্যার কাছে সামগান শেখেন। অবনীবাবুর পালায় শৃঙ্গার বা জৈবিক আকর্ষণ গৌণ।

অবনীবাবুর পালার বিন্যাসও একটু আলাদা। ছোট কথা, মূল সংলাপ গানে, আবার ছোট কথা। নমুনা দেওয়া যাক,

> ''এমন সময় দেবরাজ ইন্দ্র গৌতম মুনির বেশ ধারণ করিয়া অহল্যার কুটিরে এসে উপস্থিত হইল। আর এখানে,
> 'অহল্যা গৌতম জ্ঞানে তারে করে সম্ভাষণ।
> বলে, আজি কেন প্রাতঃকালে গৃহে আগমন ।।'
> দেবরাজ ইন্দ্র বলে
> 'ওগো তব রূপ হইল স্মরণ।'
> তোমার গানের রূপ আমার মনে পড়ল।
> তাই, 'কেমনে করি বল তপস্যা আচরণ ।।'
> আমি শুনেছিলাম ভগবান তিনি গানে বড় সন্তুষ্ট হন। ...অভিধানে পন্ডিতগণ অর্থ করেছেন সামবেদ মানে হল গান, গানের সুরে ভগবানকে ডাকা, এর নাম সামবেদ। দেবী তুমি আমাকে একখানি গান শোনাও।
> 'একদিন এ কারণে দিলেন অহল্যাদেবী তারপরে গাহিলেন গান।
> গানের সুর শিখন করি দেবরাজ ইন্দ্রপুরে যান ।।'''

অবনীবাবুর কথকতায় পাঁচালি গানের প্রভাব আছে। গান গদ্য সংলাপের অনুসারী নয়। বরং গানের মধ্যে ঘটকালির কাজ গদ্য করেছে।

ক্ষান্তিলতা দেবীর কথা গদ্যে। তাঁর কথার চলন আখ্যায়িকার ঢঙে নয়। দ্বিজবাবুর কথকতায় গল্পের আধারে ব্যাখ্যা থাকে। কিন্তু তত্ত্ব ব্যাখ্যার প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত হিসাবে ক্ষান্তিলতা দেবী গল্পের উপস্থাপনা করতেন বা কুমুদবন্ধু পালা লিখতেন। দুইজনের ভঙ্গি ও মেজাজে পার্থক্য এইখানে।

'কুন্তীস্তব' পালায় ক্ষান্তিলতা দেবীর সব গুণ, কুমুদবন্ধুর লেখার সব বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। প্রসঙ্গ নির্দেশ, দীর্ঘ ব্যাখ্যা ও সংলাপ, শ্লোক ও নানা ভাষ্যের অংশ এবং নানা গান। পালার আরম্ভে তিনি বলেন যে কুন্তীদেবীর স্তবাবলীর মধ্য দিয়ে কুন্তীদেবীর বর প্রার্থনা প্রসঙ্গে 'ভগবানের লীলাগুণ কথা' বিষয়ে **'কিছু আলোচনা'** করবেন।

এই **'আলোচনাই'** হল তাঁর কথকতার বিন্যাস। অর্জুনের হাতে অশ্বত্থামার পরাজয় ও পরীক্ষিতের জীবনরক্ষা হল প্রেক্ষাপট। দ্বৈপায়ন হ্রদে দুর্যোধনের উরুভঙ্গ থেকে অশ্বত্থামার পাণ্ডব শিবিরে নিশি অভিযান ও পরাজয়, উত্তরার ভ্রূণরক্ষা ইত্যাদি একটানা গদ্যে বলা হয়েছে, প্রসঙ্গ নির্দেশ করা হয়েছে। যখন প্রভাতে কৃষ্ণ পাণ্ডব শিবির ত্যাগ করতে উদ্যত তখন তাঁর সঙ্গে কুন্তী কথোপকথনে লিপ্ত হলেন। বিবৃতিতে বোঝানো হয়েছে যে কেন কৃষ্ণ পাণ্ডববন্ধু, কেন কৃষ্ণ পরীক্ষিৎকে রক্ষা করলেন। কুন্তীর মুখে ধুয়ার মত ফিরে এসেছে, কেবল একটি বিষয় : কৃষ্ণকে দেবার মত পাণ্ডবদের দুইটি বস্তু আছে, 'ব্যথা মাখা অশ্রুজল' ও 'অবনত মস্তকে প্রণাম', এই দুইটিকে নানাভাবে নানাগানের সংযোগে ক্ষান্তিদেবী তাঁর কথায় ব্যাখ্যা করেছেন। ব্যাখ্যাতে প্রায়শই সংলাপ দীর্ঘ। কৃষ্ণের প্রতি সম্বোধনের উদাহরণ দেওয়া যাক, "হে আমার করুণানিধান, হে আমার বিপদভঞ্জন, হে আমার দীন দয়াল, হে আমার পাণ্ডবসখা, হে আমার কাঙ্গালের ঠাকুর" ইত্যাদি।[৭৪]

একই বিষয়ের নানা বিচার কথকতাকে ব্যাখ্যামূলক করে তোলে। গল্পের রওয়ানির চেয়ে ভাবের তাৎপর্য প্রতিষ্ঠা হয়ে ওঠে লক্ষ্য। ক্ষান্তিদেবীর কথকতার শৈলী তাই। একটি কেন্দ্রীয় ভাবকে নানা ভঙ্গিতে আলাপ করার মধ্যে নিহিত আছে তাঁর পাঠের আঙ্গিক। নানা টুকরো টুকরো ভাবকে নিয়ে অন্য এক সামগ্রিক ভাবের আবেদন ফোটানো তাঁর অভীষ্ট নয়।

বাসন্তীদেবীর বৈশিষ্ট্য মঙ্গলাচরণে।[৭৫] তিনি এখানে নতুন ভঙ্গি উদ্ভাবন করেছেন। প্রথমে তিনি কোনো একটি দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে পালা আরম্ভ করেন। মালদহের এক সভায় গিয়ে আরম্ভ করেন যে তাঁর দামি জিনিস হারিয়েছে, চোরের নামও জানেন, কেউ খুঁজে দিতে পারবে কিনা। সভায় সাড়া পড়ে যায়। তখন তিনি বলেন যে তাঁর হৃদয় হারিয়েছে, চোর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং। আমার শোনা আসরে তিনি আরম্ভ করেন যে একজন পরিচিতের (রামবাবু) সঙ্গে তাঁর অনেকদিন দেখা সাক্ষাৎ হয়নি, কারণ তাঁর মেয়ের বিয়ে ছিল। সেই বিয়েতে অলঙ্কার দেওয়া হয়েছে, 'কৃষ্ণ নাম শ্রবণ কুণ্ডল', যাতে মেয়ে সবসময় কানে দিতে পারে। সেই বিয়ের অনুষঙ্গে বলেন যে শ্রোতারাও প্রত্যেকে কন্যাদায়গ্রস্ত, তাঁদের ঘরে দুইটি বয়স্থা কন্যা আছে। রতি ও মতি তাদের নাম, তাদেরও সুপাত্রস্থ করতে হবে। এইভাবে দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাকে রূপক হিসাবে ব্যবহার করে তিনি পালার উপস্থাপনা করেন।

প্রণাম জানানো হয় গুরুকে, গ্রন্থকে, গ্রন্থ প্রতিপাদ্য শ্যামসুন্দর ও রাধারাণীকে, রচয়িতা ব্যাসদেবকে, বক্তা শুকদেব ও শ্রোতা পরীক্ষিৎকে। এবং অবশেষে অতীত ও বর্তমানের উপস্থিত ও অনুপস্থিত বৈষ্ণব ভক্ত শ্রোতাকে প্রণাম করে তিনি ভাগবতী কথা শুরু করেন। তাঁর এই রীতি প্রথানুগ।

বাসন্তীদেবীর কথকতাও ব্যাখ্যামূলক। গোবিন্দ অধিকারীর গান, মহাভারতের কাহিনী, লৌকিক দৃষ্টান্ত সবই আনা হয় তত্ত্ব প্রতিবেদনের উদ্দেশ্যে। বাসন্তীদেবীর

পাঠে কিন্তু নাটকীয় সংলাপ কম। তার বর্ণনা গীতি-নাটিকার আকারে বিন্যস্ত নয়। বরং গীতি-কথিকার ঢঙে তিনি তাঁর বক্তব্য সাজান।
শৈলীতে আধুনিক কথকদের মধ্যে পারস্পরিক পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। ধরণীধর বা ক্ষেত্রমোহনের শৈলী কী ছিল, বলা যায় না। যাঁরা বর্তমানে কথকতা করছেন, তাঁরা কেউ উনিশ শতকের কথক পরম্পরার লোক নন। অতএব ধারাবাহিকতার কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। বহিরঙ্গে পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু কথকতা পৌরাণিক আখ্যানমূলক, তার মূল রস ভক্তি। এই অন্তরঙ্গে বোধ হয় পরিবর্তন আসেনি। কিন্তু শ্রোতা বদলেছে, ভাষায় রুচি একরকম নেই, দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় নানা পরিবর্তন এসেছে। অনুষঙ্গ বোঝাতে গিয়ে, 'ঘটকালি' করার সময়, গান, পালার সংলাপ ও বিন্যাস, উদাহরণ চয়ন যুগোপযোগী না হলে আসর জমানো অসম্ভব। আজকের কথকরা এই কথা জানেন।

□ পর্ব / ৫ □

শ্রোতার জগৎ

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পিতৃকুলের আর্থিক অবস্থা যে রকমই হোক না কেন, মামার বাড়ি বেশ সচ্ছল ছিল। মাতামহ ছিলেন হাওড়ার শিবপুরের ছোটোখাটো জমিদার, ইংরেজ সওদাগরের হউসে বড়োবাবু। এমন অবস্থায় যা হয়। উনিশ শতকীয় যৌথ পরিবারে জুটে গিয়েছিল এক গরিব পোষ্য জ্ঞাতি। সুনীতিবাবুর মানিকাকা। এই অর্ধপোষ্য গরীব আত্মীয় সবার উপহাসের পাত্র। ফাই-ফরমায়েশ খাটা তাঁর অবশ্য-কর্তব্য। যে কোনো বৃহৎ কাজ-কর্মে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ করার দায় বর্তাত মানিকাকার উপরই। সাদামাটা গেঁয়ো মানুষ, বিদ্যার দৌড়ও সামান্য। দুপুর বেলা একপাল বাচ্চাকে তিনি তাঁর গাঁয়ের গল্প বলতেন। জমাটি নিমন্ত্রণ রক্ষার মজাদার কাহিনী আর মাঝে মাঝে যাত্রায় দেখা, 'কথকতায় শোনা পালা, অজামিলের কথা, রুক্মাঙ্গদ রাজার একাদশী, ধ্রুবের তপস্যা' ইত্যাদি। সেই মুহূর্তে ভাইপো-ভাইঝি বা ভাগনে-ভাগনিদের কাছে মানিকাকাই কথক হতেন— 'এ সব গল্প বেশ শ্রুতিরোচক আর মনোমোহন করে শোনাতেন'। কথক ঠাকুরের দৌড় কেবল আসরে সীমাবদ্ধ থাকে না, মানিকাকার মতো মানুষের মাধ্যমে একনিষ্ঠ শিশু শ্রোতাদের জমাটি আসর বসে।
মানিকাকা কথকতার আসরে হাজিরা দিতেন। কারণ ভাল 'আক্ষেপের কথা' শোনা তাঁর বাই ছিল। "চৌধুরি পাড়ায় কথকতার আসরে কথক ঠাকুর যখন কোন গম্ভীর বিষয় নিয়ে বাগাড়ম্বর ক'রে ব'লে যেতেন, মানিকাকা নিবিষ্ট চিত্তে শুনতেন, আর অনেক সময়ে চোখ দিয়ে তাঁর ঝর ঝর করে জল প'ড়ত। তিনি তখন একাগ্র মনে, তাঁর

বর্ণনা অনুসারে, দুটো 'আক্ষেপের কথা' শুনছেন। তাঁর এই 'আক্ষেপের কথা' শোনার আগ্রহ আমাদের আছে একটা রসিকতার বিষয় হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল।"[১]
অবজ্ঞেয় মানিককাকা খুঁজে বেড়াতেন কোথায় 'আক্ষেপের কথা' শুনতে পাওয়া যাবে। বড়লোক আত্মীয়রা তাই নিয়ে ঠাট্টা করতেন। পরিবারের ক্ষমতা বিন্যাসের নিম্নতম বিন্দুতে অবস্থিত দুর্ভাগা বোকাসোকা মানিককাকা কিন্তু বার বার ওই রকম আসরে ছুটে যেতেন, এমনকি বাড়ির গুরুদেবকেও রেহাই দিতেন না, তাঁর কাছ থেকেও "গোটাকতক 'আক্ষেপের কথা' " শোনবার দাবি জানাতেন। ওই রকম আসরে তিনি তাঁর মনের আশ মেটাতে পারতেন, কাঁদতেন, তাঁর 'একাগ্রতা' তাঁর বিদ্রূপকারীদেরও চোখ এড়াত না। বড়লোক আত্মীয়রা হাসতেই পারেন, কিন্তু ভট্টনায়ক, আনন্দবর্ধন, অভিনবগুপ্তদের কাছে এই জাতীয় অভিজ্ঞতার মূল্যের শেষ ছিল না। রস সৃষ্টির আলোচনায় ভুক্তিবাদী, ধ্বনিবাদী বা রসধ্বনিবাদীরা সহৃদয়, সামাজিক বা রসজ্ঞকে আলোচনার কেন্দ্রে বসিয়েছেন। রসের প্রতীতি রসচর্বণা বা রস আস্বাদনে, সহৃদয় বা সামাজিক সেই রস আস্বাদনে সক্ষম। সহৃদয়ের রসচর্বণা ভিন্ন রসের অনুভব প্রকাশবেদ্য নয়। "ধন্যালোকের" লোচন টীকায় ভরতের অনুসারী হয়ে অভিনবগুপ্ত রায় দিয়েছেন : "যোঽর্থঃ হৃদয়সংবাদী তস্য ভাবো রসোদ্ভবঃ।"[২] রসবিচারে সহৃদয়ের এইরূপ প্রাধান্যকে রসধ্বনিবাদীদের বৈলক্ষণ বলে সুশীলকুমার দে মহাশয় মনে করেছেন। ভারতীয় নন্দনতত্ত্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী প্রস্থানের বক্তব্যে শিল্পী বা কবির সৃজনী প্রতিভার যথাযথ বিশ্লেষণ হয়নি, পশ্চিমী পাঠকের কাছে, এটা ছিল তাঁর 'আক্ষেপের' বিষয়।[৩] কবি-প্রতিভার বিশ্লেষণে ধ্বনিবাদীদের অবহেলা প্রসঙ্গে দে মহাশয়ের অনুযোগে অতিশয়োক্তি আছে। কিন্তু এতে কোনো সন্দেহ নেই যে সহৃদয় বা সামাজিকই রস আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে, কারণ তার রসাস্বাদন বা রসচর্বণার মধ্য দিয়ে রসের প্রকাশ, "রস্যমানতাই ইহার প্রাণস্বরূপ"। তাই কাব্যরসের আধার কবিও নন, কাব্যও নয়, সহৃদয় পাঠকের মন, সঙ্গীত ও অভিনয় প্রসঙ্গেও একই কথা প্রযোজ্য।
জবরদস্ত কথক নন, আলোচনার আসরে রসবোধের বিষয়ী হিসাবে অভাজন মানিককাকাই জাঁকিয়ে বসবেন। কিন্তু কীভাবে? আমাদের কথকরা কি এতটা জানতেন? রসের ধারণা কি তাঁদের আয়ত্তে ছিল? বেশির ভাগ কথকই বৈষ্ণব। ভাগবতী কথকতার বহু পুঁথিতে শ্রীধর স্বামী ও বিশ্বনাথ কবিরাজের টীকার উল্লেখ পাওয়া যায়। বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্ব রসতত্ত্বের নামান্তর, ভক্ত ও ভগবানের সম্পর্ককে নানা রসের মাধ্যমে বর্ণিত করা হয়েছে। সুতরাং কথক ঠাকুর রসতত্ত্বের ঐতিহ্য সম্পর্কে অনবহিত থাকতেন, একথা মনে করা সঙ্গত নয়। সরাসরি প্রমাণও আছে। কথকদের রচিত 'সংগ্রহ গ্রন্থে' আখ্যানাংশ নির্বাচন ও ভাগ রস অনুযায়ী করা হত। যেমন :

> 'রামায়ণ কথা সংগ্রহঃ'তে আরম্ভেই বিন্যাস এরকম: "নবরসঃ কিং। শৃঙ্গারো-যথা সীতাহরণ শূর্পনখাঃ গমনাদিঃ ॥ ১ ॥ বীরো যথা রাবণ কুম্ভকর্ণবধাদয়ঃ ॥ ২ ॥ করুণো যথা রামস্য বনগমনাদিঃ ॥ ৩ ॥ অদ্ভুতো যথা সাগরবন্ধনাদিঃ

।। ৪ ।। হাস্যোযথা দশরথগৃহে রাম জন্মঃ ।। ৫ ।। ভয়ানকোযথা রাবণমারীচ সম্বাদঃ" ইত্যাদি ।।[৪]

আবার বর্ষীয়ান কথক কুমুদবন্ধু বলেন যে, 'কথকতা খুব শক্ত বাবা, কথায় নবরসের বিন্যাস করতে হবে তো ।'[৫]

সরাসরি ঐতিহাসিক প্রমাণসূত্র ছাড়াও বলা যেতে পারে যে কথকতা একটা বিশেষ রকমের পাঠ। এই পাঠের মাধ্যমে কীভাবে সহৃদয় বা সামাজিক ভরতের হরিণ শিশুর হারানোর বেদনায় আকুল হন, লঙ্কায় হনুমানের কীর্তিকলাপে হেসে খুন হন? ভরত বা হনুমান কেউ তাঁর পরিচিত নন, তাঁদের অভিজ্ঞতার তিনি সরাসরি শরিকও নন। শ্রোতার নিজের বোধ স্বগত, ভরত বা হনুমানের ভাব পরগত। লৌকিক ভাবের পরিমিতত্ব ছাপিয়ে যাওয়া যায় কীভাবে, কীভাবে কথকের উচ্চারিত শব্দের জোরে, পাঠের ঝোঁকে অন্য বিষয় 'সহৃদয় হৃদয়-সংবাদী' হয়, বিষয়ের 'চমৎকৃতিতে' সামাজিক-এর 'তন্ময়ীভবনতা' দেখা যায়, অতি সাধারণ শব্দ রসধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়? এই প্রশ্ন তাত্ত্বিক। নবম থেকে একাদশ শতকে, নানা প্রস্থানের নানা বিতর্কের মধ্য দিয়ে হারিয়ে যাওয়া পুস্তক "হৃদয় দর্পণের" লেখক ভট্টনায়ক অথবা "ধ্বন্যালোকের" অজ্ঞাতনামা কারিকাকার, বৃত্তিকার আনন্দবর্ধন এবং লোচন টীকাকার অভিনবগুপ্তরা সদলবলে এই প্রশ্নের মোকাবিলা করেছেন। এই প্রসঙ্গে কথকরা এই তত্ত্বের সব অনুপুঙ্খ সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন ছিলেন কিনা, তা অবান্তর। রসসৃষ্টির ক্ষেত্রে শ্রোতার ভূমিকার সাধারণ বিচারেই রয়ে গেছে তত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা।

তাঁদের রচনানুসারে, শব্দের সংকেতিত করার ক্ষমতা মান্য, বলা হয়েছে "ধ্বননং শব্দস্যৈব ব্যাপার ।।" "শব্দজাঃ শব্দা" ধ্বনি বলে অভিহিত। কিন্তু শব্দের মধ্য দিয়ে অভিধা ও লক্ষণার বা তাৎপর্যের শক্তি ছাপিয়ে যে ব্যঞ্জনাজন্য বোধ বা ব্যঙ্গ অর্থ সৃষ্টি হয়, ধ্বনিবাদীদের কাছে সেটাই ধ্বনির বিশেষ পারিভাষিক অর্থ। শব্দের নিজস্ব শক্তিতে এই ব্যঞ্জনার ক্ষমতা নিহিত আছে, ব্যঞ্জনার স্বতন্ত্র বোধে রস জাগ্রত হবার সম্ভাবনা থাকে। "শব্দনং শব্দঃ শব্দব্যাপারঃ, ন চাসাবভিধাদিরূপঃ, অপি ত্বাত্মভূতঃ, সোঽপি ধ্বননং ধ্বনিঃ।" বক্তার উচ্চারিত শব্দ ব্যঞ্জনা নামক বিশিষ্ট শক্তির দ্বারা শ্রোতার বা সহৃদয় বা সামাজিকের মনে অভিজ্ঞতাজনিত বাসনাদি সংস্কারের উদ্রেক করে, বর্ণিত বিষয়ের সঙ্গে তন্ময়ীভবনতার প্রাপ্তিযোগ হয়।[৬]

কিন্তু এই স্তরেই ভট্টনায়ক বা অভিনবগুপ্ত ব্যঞ্জনার দ্বারা রসসৃষ্টির দুইটি ধারণার নির্দেশ করেছেন। এই তন্ময়ীভবনতা বা চিত্তবৃত্তির সঙ্গে একাত্মতা অলৌকিক, এই অনুভবনের আস্বাদনের সঙ্গে লৌকিক সুখ-দুঃখবোধের অনুভবের পার্থক্য আছে। রসচর্বণা লৌকিক ভাবের পরিমিতত্বকে অতিক্রম করে, শব্দ ব্যঞ্জনার এতই ক্ষমতা। বাল্মীকির আদি শ্লোক নিয়ে আলোচনাকালে বলা হল যে "ইহা লৌকিক শোক হইতে পৃথক (লৌকিকশোক ব্যতিরিক্তাং) এবং নিজের চিত্তবৃত্তির যে বিগলিত অবস্থায় ইহা আস্বাদিত হইতেছে, তাহাই ইহার একমাত্র সারবস্তু। পরিপূর্ণ কুম্ভ থেকে যেমন জল

উছলাইয়া পড়ে (রসপরিপূর্ণকুম্ভোচ্ছলন) তেমনই চিত্তবৃত্তির স্বাভাবিক নিঃষ্যন্দিতার জন্য বিলাপবাক্য ক্ষরিত হয়।"[৭] রসের এই উচ্ছলন প্রবণতার জন্য শোক আর ক্রৌঞ্চের একান্ত শোক নয়, বাল্মীকির নিজস্ব দুঃখ নয়, শোক সহৃদয়ের চর্বণাযোগ্য। কিন্তু এই চর্বণা সম্ভব, লৌকিক অনুভবের পরগতত্ব বা আত্মগতত্ব অতিক্রম করা যায়, "রসাদি বিষয়ে ভাবকত্বের দ্বারা"। রস ভাবিত হলেই ভোগ (অনুভব) করা সম্ভব। ভট্টনায়কের মতে, "রসের সম্পর্কে যাহা বিভাবাদির সাধারণত্ব সম্পাদন করে তাহাই ভাবকত্ব।"[৮] এই ভাবকত্বের ধারণাকে অভিনবগুপ্ত বাতিল করতে পারেননি। প্রচলিত পাঠ্যপুস্তক "সাহিত্য দর্পণে" বিশ্বনাথ কবিরাজ এই 'ভাবকত্বের' অপর পারিভাষিক নাম দিয়েছেন "সাধারণীকৃতিঃ"। উচ্ছলন প্রবণতা ও রসধ্বনির মাধ্যমে রসের অনুভবকে আদর্শায়িত করা ও ব্যাপ্তি দেওয়া হয়। ফলে রস সামাজিক হৃদয়সংবেদ্য হতে পারে, বহুজনীন হতে পারে। রসবোধের আলোচনায় শব্দের ব্যঞ্জনার শক্তির মাধ্যমে লৌকিক সীমা, নিছক ব্যক্তি-অভিজ্ঞতার সীমাকে অতিক্রম করার বাসনা এই তত্ত্বে বার বার স্বীকৃত হয়েছে।[৯]

কথক বাগাড়ম্বরের মাধ্যমে, শব্দ শক্তির মাহাত্ম্যের জন্য, ধ্বনি বা রস সৃষ্টি করেন। মানিকাকার আত্মগত শোকানুভবে হৃদয় সিক্ত ছিল, মানসপ্রক্রিয়ায় তিনি রসধ্বনিজাত বিষয়ে তন্ময়ত্ব পান, রসচর্বণা শুরু হয়। এই অনুভবন লৌকিক নয়, "মানসপ্রক্রিয়া"; এই রস কাহিনী বা কথকে আবদ্ধ নেই, রস ব্যাপ্ত, 'সহৃদয় হৃদয়সংবেদ্য।' মানিকাকার মতো আসরে অনেকেই এর অংশগ্রাহী। আসর রসবোধের ক্ষেত্র হিসাবে রূপান্তরিত হয়েছে রামের অযোধ্যায়, কৃষ্ণের বৃন্দাবনে বা ভরতের তপোবনে।

কথকতার আসরে রসভোগের বা সীমা অতিক্রমের আরো নানারকম উদাহরণ হাজির করা যেতে পারে। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সদ্য বিবাহিত বড় ছেলের অকালমৃত্যুতে সমস্ত পরিবার শোকে মোহ্যমান। মুশকিল আসানের পথ বাতলালেন দীনেশচন্দ্র সেন।[১০]

> "আমি একদিন বলিলাম, 'আপনারা যদি সান্ত্বনা চান, তবে আমি একজন ভাল কথককে নিযুক্ত করতে পারি, তাহার কথায় আপনারা শান্তি পাইবেন।' সমুদ্রে পতিত ব্যক্তি যেরূপ তৃণটিকেও আশ্রয় করিতে হাত বাড়ায়, গগনবাবু এই প্রস্তাবটির সফলতা সম্বন্ধে আস্থাহীন হইয়াও ইহাতে রাজী হইলেন বাড়ীর মেয়েরা সাগ্রহে এই প্রস্তাবে সায় দিলেন।"

কোন পরিস্থিতিতে কথকদের ডাকা হয়, তার আভাস পাওয়া গেল। মেয়েরা এই বিষয়ে যথারীতি উৎসাহী, দীনেশবাবু তাও জানাতে ভোলেননি। কথক ক্ষেত্রনাথ চূড়ামণিকে দেখতে আদৌ নয়নাভিরাম নয়।

> "কিন্তু কথা বলিবার ইহার আশ্চর্য শক্তি! প্রথম দিনই আসর জমিয়া গেল। গগনবাবুর বাড়িতে ছেলে বুড়া সকলেই মৌতাত ধরিলেন, সন্ধ্যায় বড় হলঘরটায় ক্ষেত্রচূড়ামণির কালোকণ্ঠে ঔজ্জ্বল্য প্রদান করিয়া ফুলের মালা দুলিতে থাকিত, এবং তিনি ধ্রুব, প্রহ্লাদ, জড়ভরত, দক্ষযজ্ঞ, রুক্মিনী হরণ,

বকাসুর বধ প্রভৃতি কত পালা যে বলিয়া যাইতেন, তাহার অবধি ছিল না। তিনি কথায় কথায় ছবি আঁকিয়া যাইতেন ; বর্ণনার ছটায় মেঘ, বৃষ্টি, বসন্ত সমীরণ এবং পদ্মবন যেন চোখের সম্মুখে উপস্থিত করিতেন, কখনও শ্রোতৃবর্গ অশ্রুসিক্ত হইয়াছে, কখনও হাসির স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। এরূপ অপরূপ বক্তাকে পাইয়া ধর্মের কথায় পৌরাণিক প্রসঙ্গে মন হইতে শোক ধীরে ধীরে মুছিয়া যাইতে লাগিল।

"...প্রায় একমাসের মধ্যে গগনবাবুর মন এরূপ লঘু হইয়া গেল যে যখন ক্ষেত্র কথক কথা বলিতেন, তখন গগনবাবু লুকাইয়া তাঁহার চেহারা ও ভঙ্গীগুলি আঁকিতেন।"

ক্ষেত্রচূড়ামণির কথকতা হৃদয়সংবেদ্য হয়েছিল। বলার কারুকৃতিতে, পৌরাণিক গল্পের ব্যঞ্জনায় গগনবাবুর শোকসন্তপ্ত পরিবার সবাই রসের আস্বাদনে সমর্থ হয়েছিলেন, যাঁদের ব্যক্তিগত শোকভার 'লঘু' হয়ে গিয়েছিল এমনকি ক্ষেত্র কথক নিজে গগনবাবুর শিল্পের বিষয় হয়ে গেলেন। এই ক্ষেত্রে রসচর্বণার দ্বারা ব্যক্তি-শোকানুভবের সীমা অতিক্রম করা সম্ভব হয়েছিল। এই অতিক্রম্যতা কেবল গগনবাবুর মধ্যেই সীমিত ছিল না, তা জনগ্রাহ্য হয়েছিল, "ছেলেবুড়া সকলের মৌতাত ধরেছিল।" ক্ষেত্র কথক বলেছেন আর রস আস্বাদনের ভাগীদার হয়েছেন বাড়ির আমজনতা।

এই আমজনতার সঙ্গে কথকের ঘটকালি কীরকম পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে ; তার ছবি অনুরূপা দেবীর লেখাতেও ধরা পড়ে। নায়িকা বাণী রসজ্ঞ, তার দৃষ্টিতে কথকের অনুষ্ঠান দেখানো হচ্ছে। শ্রোতার প্রতিক্রিয়া, কথকের নৈপুণ্য সব কিছু বর্ণনায় ধরা পড়েছে।

"...সেদিন কথকতার বিষয় ছিল 'অভিমন্যুবধ'। ক্ষমতাশালী বক্তা... ভাষা প্রাণস্পর্শী, স্বর অনন্যসাধারণ। বীর বালকের অতুল সাহস, অমিত পরাক্রম, শ্রোতৃদলকে উত্তেজিত করিয়া যেন রণক্ষেত্রে টানিতেছিল। তারপর সে কি উৎকণ্ঠা, কি বিপুল উদ্বেগ। শ্বাস বুঝি কণ্ঠের মধ্যে চাপিয়া আসে। সপ্তরথী আসিয়া একা অসহায় বালককে একসঙ্গে ঘিরিল। পিশাচ, পিশাচ! দন্তে দন্ত নিষ্পেষিত ও হস্ত দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ হইয়া গেল। প্রতিকার নাই! ইহার কি প্রতিকার নাই! ধিক! যদি না অন্যায়কারী শত্রুপক্ষকে দলিত করিয়া সপ্তরথীর লৌহ-নিগড়-মধ্য হইতে সোনার হরিণটিকে উদ্ধার করিয়া আনিতে পারা যায়, তবে শতধিক এই জীবনে। কিন্তু হায়! কোন উপায় রইল না, অন্যায় সমরে ভারতের ভবিষ্যরবি অকালে অস্তমিত হইল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মাতুল, পিতা সব্যসাচী, পিতৃব্য মহাবল ভীম যাহার সহায়, সে আজ অসহায় অনাথভাবে সপ্তরথীর সপ্তশরে শোণিতরঞ্জিত বিক্ষতাঙ্গে বসুধা আলিঙ্গন করিল।...

"দর্শকগণ নীরবে অশ্রুমোচন করিতেছিল। কোন কোন পুত্রশোকাতুরা

জননী হৃদয়ের আবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিলেন। বাণী নীরবে চক্ষু মুছিয়া কথকের মুখে চাহিল। সে মুখে কোন পরিবর্তন লক্ষ্য হইল না। চিত্রকরের তুলি যেমন চিত্রের ভাবপ্রদান করে, বর্ণ সমাবেশে ইন্দ্রালয় নন্দনকানন রচনা করে, নিজে সে ভাবসম্পদের ধারও ধারে না, যে এতগুলি লোকের বক্ষতলে শোকস্মৃতি জাগ্রত করিতেছিল, সে নিজে যেন তাহার মধ্যে ধরা ছোয়াও দেয় নাই।"[১০ক]

এই উদ্ধৃতিতে ফুটে উঠেছে বৈপরীত্য, পালার ধাপেধাপে, কী করে শ্রোতা তন্ময়তা পায় ও কীভাবে কথক নিরাসক্ত থাকে, ফলে কীভাবে আসর রসোত্তীর্ণ হয়।

উনিশ শতকের শেষের দিকে কথকতার বড় পৃষ্ঠপোষক ছিল কলকাতায় গড়ে ওঠা হরিসভা। আসর বসত সেখানে। বেহালার প্রাচীন হরিভক্তি প্রদায়িনী সভার পুরাতন কার্যবিবরণীর পাতা থেকে টুকরো খবর তোলা যাক।[১১]

"সভার উদযোগে বিগত মাঘমাস হইতে বৈশাখের শেষ পর্যন্ত শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য কথক মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবতীয় কথা কহিয়াছিলেন। ইহাতে প্রত্যহ শ্রোতৃসংখ্যায় সভাগৃহ পরিপূর্ণ হইত। দূরপল্লী হইতে অসংখ্য স্ত্রীলোক এই কথা শ্রবণ করিতে প্রত্যহ উপস্থিত হইতেন।"

পরের বছরের প্রতিবেদনও একই রকমের :

"গত মাঘ মাসের ও ফাল্গুনের কিয়দ্দিন পর্যন্ত খিদিরপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কথক মহাশয় মাসাধিককাল শ্রীমদ্ভাগবতীয় কথা কহিয়াছিলেন। ইহাতে প্রত্যহ শ্রোতৃসংখ্যায় সভাগৃহ পূর্ণ হইত। **বলা বাহুল্য শ্রোতৃগণের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক হইত।**"

(নজরটান আমার)

গত বছরে (১৯৯২) চালতাবাগান গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর আসরেও একই দৃশ্য দেখা যায়।[১২] রাধারাণীর কাছে কথক দ্বিজরাজবাবুর মানসিক করা আছে। পৌষ বা মাঘ মাসে একমাস ধরে রামায়ণী কথকতা করেন তিনি।

শ্রোতাদের শতকরা ৯৫ ভাগ পাড়ার বৃদ্ধা বা বয়স্কা মহিলা, তিন-চার ভাগ বৃদ্ধ। তাঁরা নিয়মিত আসতেন, দু-চার পয়সা প্যালাও দিতেন। আসরে জোকার দেওয়া, কান্না, ভাবে অভিভূত হওয়া, সবই তাঁদের মধ্যে দেখা যেত। ষাটবছর আগেকার বেহালার হরিসভা বা এখনকার চালতাবাগানের হরিসভার আসরে শ্রোতার চরিত্রে বা পরিবেশে পার্থক্য খুব আছে বলে মনে হয় না।

আসরে বেমানান একমাত্র আমি। ফলে অনেকের প্রশ্নের জবাব দিতে হত, আলাপও জমে গিয়েছিল। বছরের পর বছর দ্বিজবাবুর কথকতা শুনছেন, শুনতে শুনতে গান মুখস্থ হয়ে গেছে, এমন একজন বললেন, 'নাতনি কোন স্কুলে পড়ে খোঁজ রাখি না। ওর পড়াও বুঝতে পারি না। রামকথা বুঝি, তাই আসি। আরেকজন আগে আসতে পারতেন না। সংসারে কাজ ছিল। এখন সবাই বড় হয়েছে, কাজ কম, ফাঁক পেলে

চলে আসেন। এখনো কাজ থাকলে আটকে থাকতে হয়। তখন মন খারাপ করে। মন ভার হলে কথকতা শোনেন, মন হাল্কা হয়ে যায়।
আবার একজন বাল্যবিধবা। কষ্টেসৃষ্টে ছেলে মানুষ করেছেন, বিয়ে দিয়েছেন। তা অনেক হয়েছে। রান্নাঘরে আর ঢুকবেন না। শেষ কয়েকটা দিন, ধর্মকর্ম নিয়ে থাকবেন।
আবার কেউ বললেন যে, বাড়ির ছেলের কথা বলার সময় হয় না, সবাই সবসময় ব্যস্ত। এখানে আসেন। অনেক লোকের সঙ্গে কথাবার্তা হয়। সময় কাটে। আবার কথকতায় মনও শান্ত হয়, ভালো ভালো কথা শোনেন।
সবাই বৃদ্ধা, সবাই মহিলা, বৃহৎ পরিবারের সকলের দায়িত্ব ছিল। আজ সেই ভার নেই, নাতনি ও ছেলেদের সঙ্গে আড়ো-আড়ো ভাব, আগের বাঁধন শিথিল হয়েছে। সময়ও আসন্ন, শেষ পারাণির কড়ি চাই, জীবনের দায়বোধের কৈফিয়ৎ হয়ত দিতে হবে। কথকতায় বর্ণিত মূল্যবোধের জগতে তার উত্তর পাওয়া যেতে পারে। আবার কথকতার রস আস্বাদন অনেকে মিলে করেন, আলাপ আলোচনায়, আদানপ্রদানে সেখানে সমাজ গড়ে ওঠে, এককত্ব কেটে যায়। রস আস্বাদনের প্রক্রিয়ায় যোগ দিতে এসে এখানে শ্রোতা হয়ে ওঠেন সামাজিক, সমূহে বা গোষ্ঠীতে তিনি স্থিত হন।
আবার কোনো না কোনো ভাবে এঁরা নিজেদের বঞ্চিত ভাবেন। এঁদের এই বঞ্চনা রসের 'সাধারণীকৃতির' জন্য, শব্দের ব্যঞ্জন শক্তির প্রভাবে, কোনোদিন মিলে যায় শবরীর সার্বিক দুঃখে, তার প্রাপ্ত সামাজিক তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যে। আবার পরম ভক্তিতে শবরীর যখন চরম প্রাপ্তি হয়, এঁরা মাটিতে কেঁদে লুটিয়ে পড়েন, বার বার হরিধ্বনি করেন। দ্বিজরাজ বাবুর বলা আখ্যানের শবরী তখন আদর্শায়িত হয়ে সর্বজনগ্রাহ্য হয়েছে।
লক্ষণীয় যে ভট্টনায়ক বা অভিনবগুপ্তদের রচনায় সহৃদয় ও সামাজিক সমার্থক, একটির পরিবর্তে অপরটি ব্যবহৃত হয়। সহৃদয়-এর সঙ্গে সামাজিকের এই যোগ তাৎপর্যপূর্ণ, একজন জরন্মীমাংসক যোগী সহৃদয় হতে পারেন না, বাসনার সংস্কার তাঁর নেই, শৃঙ্গার রসের আস্বাদন তার পক্ষে কী করে সম্ভব? রসাস্বাদন অলৌকিক কিন্তু যে বাসনাখ্য সংস্কার চিত্তবৃত্তিতে বিভাবাদিরূপে থাকে, যা রসবোধে অভিব্যক্ত হয় তা সামাজিক অভিজ্ঞতাপ্রসূত। অভিজ্ঞতা একক নয়, তা সমাজস্থ। সহৃদয়কে বার বার 'সামাজিক' নামাখ্যায় ভূষিত করে, তার নিজস্ব অভিজ্ঞতাকে যেন বাস্তবের মধ্যে বেঁধে রেখে দেওয়া হয়।[১৩]
এই বাস্তবতা ক্ষমতা বিন্যাসের দ্বারা আবদ্ধ। মানিকাকা সামাজিক বা সহৃদয় কিন্তু বাস্তবে তিনি পরান্নভোজী, বড়লোক আত্মীয়ের গলগ্রহ। হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা বা চালতাবাগানের হরিসভার অধিকাংশ শ্রোতাই পুরুষ শাসিত সমাজে মেয়ে; নানা দৈনন্দিন বঞ্চনার অবশ্যম্ভাবী শিকার। চালতাবাগানের বৃদ্ধারা আবার নানা অর্থে সংসারের প্রান্তবাসী। সম্পন্ন গগন ঠাকুররাও শোকে বিপর্যস্ত। নানাভাবে লৌকিক অভিজ্ঞতা এঁদের আহত করেছে, নানাভাবে এঁরা পর্যুদস্ত।

নিষ্পেষণের, হতাশার তাড়নায় এরা কথক ঠাকুরের কাছে যায়, দাবি জানায়,

> "আমরা চাই একটু প্রাণ জুড়ানো হরিকথা যাতে চোখে জল আসে, **প্রাণে ভরসা জাগে**। এইসব তত্ত্বকথায় যে শুধু প্রাণ শুকিয়ে যায়, কোন ভরসা পাই না। মনে হয় আমরা ভগবানের কাছ থেকে অনেক দূরে পড়ে আছি।"[১৩ক]
>
> (নজরটান আমার)

রসের উচ্ছলন ক্ষমতা ও সাধারণীকৃতি এই লৌকিক ক্ষেত্রকে মানসক্রিয়ায় অতিক্রম করায়, শ্রোতারা রসভুক্তির মাধ্যমে একক বোধকে সাধারণ বোধে রূপান্তরিত করেন। সাধারণীকৃতির ধারণার মধ্যে আছে একদিকে আদর্শায়িত করার ঝোঁক অন্যদিকে আছে ব্যাপ্ত করার বৃত্তি। উচ্ছলনের মধ্য দিয়ে, ব্যাপ্ত হবার মধ্য দিয়ে সীমা অতিক্রম করা যায়। ক্ষমতা বিন্যাসের নানা সীমা একক শ্রোতাকে লোকজীবনে নানা নিষেধের মধ্যে আবদ্ধ করে, তার সত্তা বা বোধকে খণ্ডিত করে। রসধ্বনির মাধ্যমে, শব্দশক্তির মাধ্যমে রাম বা শবরীর কাহিনীতে শ্রোতা একাত্ম হয়, লৌকিক বোধের উত্তরণে, অলৌকিক জগতে তার সাযুজ্য ঘটে। অলৌকিক জগতে এই সাযুজ্যতার মাধ্যমে, আস্বাদনের মাধ্যমে, তার 'চিৎ সম্বিত' হয়। সাংখ্য মতাবলম্বী ভট্টনায়ক বর্ণিত সম্বিতের অর্থ 'চৈতন্য'। নিম্নকোটির প্রতিনিধি মানিকাকার চৈতন্য দৈনন্দিন জীবনে নিয়মিত খণ্ডিত হয়, ক্ষমতার চাপে তাঁকে অস্বীকার করা হয়, ঠাট্টা করা হয়। রসধ্বনির ভোগে সেই চৈতন্য ফিরে পাওয়া যায়, তা স্ফুটিত হয়। চৈতন্যের প্রাপ্তি, অভিব্যক্তি, রসভোগের সাধারণীকরণের মাধ্যমেই সম্ভব। সংসারের অন্য সব ক্ষেত্র মানিকাকার কাছে, বুড়িদের কাছে সংকুচিত, প্রবেশাধিকার সেখানে সীমিত, কিন্তু রসভোগের এই ক্ষেত্র খোলা রয়েছে। আসরে তারা স্বরাট, কারণ তারা সামাজিক, রসের অনুভব সেখানে 'সহৃদয় হৃদয় দর্পণমধ্যাস্তে।' শব্দময় ধ্বনিময় কথকতার আসরে তাই দেখা যায় তাদের ভিড়।

আশির কোঠায় নৃতত্ত্ববিদ ভিক্টর টার্নারের (Victor Turner) 'সীমা অতিক্রমের' (Liminality) তত্ত্ব অনেক সমাজবিজ্ঞানীকে নাড়া দিয়েছিল। দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপের মধ্যে এমন আচার অনুষ্ঠান আসে, নানা শিল্পকর্মের মধ্য দিয়ে এমন ক্ষেত্র খুঁজে পাওয়া সম্ভব যেখানে গ্রাহ্য কাঠামো মুহূর্তের মধ্যে নাকচ হয়ে যায়, সমূহের অবস্থিতি বড় হয়ে ওঠে, মুক্তির অনন্ত সম্ভাবনা দেখা যায়। মুহূর্তগুলি হয়ত ক্ষণস্থায়ী কিন্তু সেইগুলির পুনরাবৃত্তি হয়, নানা আচারে, আন্দোলনে, উৎসবে, তীর্থযাত্রায় কাঠামো থেকে বাইরে যাবার পথ খুঁজে পাওয়া যায়, এমনকি কাঠামো নাকচ হতেও পারে। মানসিক ও ব্যবহারিক, উভয়ক্ষেত্রে, এই প্রক্রিয়া কার্যকর হয়।[১৪]

ভারতীয় রসতত্ত্বের ব্যাখ্যায় এই প্রক্রিয়ার অন্যতর মাত্রা দেখা যায়। রসের আলোচনায় আছে 'চমৎকারিত্ব', ও এই চমৎকারিত্ব নিহিত আছে বিস্তৃতির ধারণায়। ভরত নাট্যশাস্ত্রে স্পষ্ট বলা হচ্ছে,

> "যোঽর্থো হৃদয় সংবাদী তস্য ভাবো রসোদ্ভবঃ।
> শরীরং ব্যাপ্যতে তেন শুষ্কংকাষ্ঠমিবাগ্নিনা ॥"

আগেই দেখেছি, অভিনবগুপ্ত এই রসব্যাপ্তির তত্ত্বে কীভাবে সায় দিয়েছেন। বিশ্বনাথ কবিরাজ লিখেছেন, "চমৎকারশ্চিত্তবিস্তাররূপো বিস্ময়াপর পর্যায়ঃ।" (চমৎকার শব্দের অপর নাম হচ্ছে চিত্ত বিস্তাররূপ বিস্ময়।"[১৫]
রসপ্রস্থানের ব্যতিক্রমী চরিত্র কুন্তকও রসের এই সামান্য গুণকে স্বীকার করেছেন। তাঁর ভাষায় "চমৎকারো বিতন্যতে, চমৎকৃতির্বিস্তার্যতে।" ফলে মুহূর্তে মুহূর্তে রসাস্বাদন হয়, সেই আস্বাদন ক্ষণকালের নয়।[১৬] কবি-হৃদয় থেকে রস ক্ষরিত হয়, উচ্ছলিত হয়। আবার রসাস্বাদনে সহৃদয় চিত্তের বিস্তার হয়। এই তত্ত্বে কাঠামোর মধ্যে থেকেও মানসপ্রক্রিয়ায় কাঠামোকে অতিক্রম করার কথা থাকে; সামাজিক সংস্কারে আবদ্ধ হয়ে। লৌকিকভাবে তটস্থ থেকেও রসাস্বাদনে অলৌকিকভাবে রূপান্তরিত হওয়া যায়। ভ্যান জেনেপ (VAN GENNEP) বা টার্নার বার বার কাঠামোর বাইরে যাওয়ার ক্ষেত্রে নানা পর্ব বা ভাগের কথা বলেছেন, সীমা অতিক্রমের মুহূর্ত-গুলিকে সেই পর্বান্তরের মধ্যে প্রোথিত করার চেষ্টা করেছেন।
রসানুভূতির ভারতীয় ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এইরকম পর্বভাগের বা মুহূর্তের অনুসন্ধানের প্রয়োজন উপলব্ধ হয় না। রসব্যাপ্তির বা উচ্ছলনের মধ্যে সহৃদয় ডুবে যান, চমৎকৃত হন, তটস্থের সীমা অতিক্রান্ত হয়, মুহূর্ত ও ক্ষণকে আলাদা করে চেনার সুযোগ থাকে না, কাঠামোর বাইরে তার বিরোধী রূপ দাঁড়িয়ে থাকে না, কাঠামোর মধ্যে হাজির ও গায়েব অনুযোগী-প্রতিযোগী রূপে আবদ্ধ, একটার সঙ্গে অন্যটা সমবায় সম্বন্ধে থাকে, মুহূর্তের মধ্য দিয়ে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা যায় না। সহৃদয়ের রসাস্বাদনের সামগ্রিকতার রূপ তাই এই তত্ত্বে ধরা পড়ে।

□ পর্ব/৬ □

কথকতা, যাত্রাপালা ও ঢপ কীর্তন : সমানতন্ত্রের সাধনা

ক. কথকতা ও যাত্রাপালা

১৭৭২ নাগাদ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেছিলেন, কথকতার সমাদর কমে এসেছে, বিনোদন ও লোকশিক্ষার আসরে যাত্রার রমরমা শুরু হয়েছে।[১]
ফলে পেশাতেও বদল ঘটছে। কথক বা পাঠকদের কেউ কেউ যাত্রার পালা রচনায় ঝুঁকে পড়ছেন। পূর্ববাংলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী যাত্রাপালা লেখক কৃষ্ণকমল গোস্বামী (১৮১০-১৮৮৮) পেশায় কথক ছিলেন এবং অন্যপক্ষে আধুনিক এক গবেষক দাবি করেছেন যে উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে মতিলাল রায় (১৮৪৩-১৯০৮) যাত্রাপালা

রচনায় যে নূতন ধারা সঞ্চার করলেন তার পিছনে ছিল কথকতার জোর।[২] অষ্টাদশ শতক থেকে কৃষ্ণের মানভঞ্জন ইত্যাদি পালা চালু ছিল।

পৌত্তলিকতা ও সুরুচির খাতিরে ওয়ার্ড ও রামমোহন উভয়েই এই জাতীয় যাত্রার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করেছিলেন।[৩] কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, এই প্রথম দিককার যাত্রাপালার কাঠামো। যাত্রাতে সংলাপের বাহার ছিল না। পাত্র-পাত্রী কথা বলত গানে ; পরিস্থিতি ও ভাবও ব্যাখ্যা করা হত গানে। কৃষ্ণকমলের যাত্রা পালার বিন্যাসে এর ছাপ সুস্পষ্ট। প্রথমদিকে কৃষ্ণকমল পালা (স্বপ্নবিলাস, ১৮৪২) বাঁধতেন এইভাবে :

"যশোদা : যত কাঁদে বাছা বলে 'সর সর'
আমি অভাগিনী বলি 'সর সর'
(বল্লাম) নাহি অবসর, কেবা দিবে সর
অমনি সর সর বলে ঠেলিলাম ফেলে।"

বা দুটো গানের মাঝে এক ছত্র,

"সেত যা হবার তা হয়েছে, এখন, অথবা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে,
বিশাখা (সুরে), ওগো শ্রীরাধিকে, তুই যে আমাদের প্রাণাধিকে, ধনি। বংধুর সর্বার্থ সাধিকে ; তাই বলি রাই বিনয় করে চরণ ধরে, কিছুদিন দেখ ধৈর্য ধরে,—সেই বংধুর তরে।"

বা, "রাধিকা সখি, কি সম্পদ ?
ললিতা—শ্যামপদ। (সুরে) ওগো রাধে, ওগো চন্দ্রবদনে…"

শেষ জীবনে তিনি যে পালা লেখেন তার নাম হল ভরৎ মিলন. গান বেশ কিছু আছে কিন্তু বড় বড় গদ্য সংলাপ এবং দৃশ্য নির্দেশ আছে। যেমন, ২য় দৃশ্য, চিত্রকূটগিরি—নিম্নদেশ :

"বশিষ্ঠ (স্বগতঃ) আহা! কি সুন্দর! কেমন রমণীয় শান্তিময় স্থান চিত্রকূট! বোধহয় যেন যোগিগণের ধ্যান সমাহিত চিত্তের লয় স্থান অচল সুনির্মল চিদাকাশধাম এই চিত্রকূটাচলের উপমাস্থল, এবং যেন বোধ হইতেছে সেই বিমল সত্বাশ্রিত চিত্তে ভাসমান প্রপঞ্চাতীত, শুদ্ধ বোধগম্য কূটস্থ চৈতন্যচ্ছবি প্রপঞ্চলোচনের গোচর করস্থ হে বিশ্বাত্মন রাম, তুমি এই চিত্রকূটস্থ রামরূপ সন্দর্শন কর" ইত্যাদি।[৪]

'ভরত মিলনে' এইরকম গদ্যাংশের ছড়াছড়ি। দৃশ্যের প্রারম্ভে ঋষি বা মুনি এইরকম বাক্যাবলী বলেন। এই বাক্যাবলীর উদ্দেশ্য ঘটনাপ্রবাহ বজায় রাখা নয়, কথার পিঠে শুধু কথা জুগিয়ে যাওয়াও নয় বরং তত্ত্ব ব্যাখ্যা করা। নাটকীয় সংলাপের কাজ সাধিত হচ্ছে গানে কিন্তু তত্ত্বের ব্যাখ্যা গম্ভীরভাবে শ্রোতাদের দিয়ে যাচ্ছেন বশিষ্ঠ বা সুমন্ত্র। বিচিত্র বিলাস (১৮৫৬) পালার ভূমিকায় কৃষ্ণকমলের কয়েকটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য :

"যদিও প্রচলিত অভিনয় (যাত্রা) অনায়াস দৃশ্য কিন্তু তাহা সহৃদয় ব্যক্তিরগণের নিদারুণ বিরক্তিকর। কারণ অনভিজ্ঞ অভিনেতৃগণ সামান্য লোকের প্রীতিপদ রহস্য সাধনের উদ্দেশ্যে **প্রবন্ধগত প্রকৃতভাব** পরিত্যাগ পূর্বক অসাময়িক অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ, নানা প্রকার কদর্য রঙ্গভঙ্গী ও নিতান্ত অবিধেয় বেশ বিন্যাস করিয়া থাকে। প্রায় চতুর্দশ বৎসর গত হইল আমি সাধারণের নির্দোষ প্রীতিশীল মানসে **প্রকৃত প্রবন্ধের অনুগত হইয়া** প্রথমতঃ স্বপ্নবিলাস তৎপর দিব্যোন্মাদ নামে ব্রজলীলাত্মক দুইখানি সঙ্গীতবহুল নাটক রচনা করি"।[৫] (নজরটান আমার)

'প্রকৃত প্রবন্ধের' ভাব অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে, রসাভাস ঘটতে দেওয়া চলবে না, বৈষ্ণবপ্রবর কথক কৃষ্ণকমল একথা ভোলেননি। গেয় সংলাপে তিনি সেই রস বজায় রেখেছেন, তাঁর কাছে সেই রচনা 'সঙ্গীত প্রধান'। আবার অন্য পালায় বিশেষ চরিত্রের মুখে লম্বা বক্তৃতার মাধ্যমে তত্ত্ব ব্যাখ্যা করাতেও তিনি বিরত হননি। তখন বোধহয় রুচি ও লেখার কায়দাও কিছুটা বদলেছে।

কিন্তু তবুও চাহিদা ছিল গানেরই। গোবিন্দ অধিকারীর (১৭৯৮/৯৯-১৮৭০/৭১ ?) যে পালা প্রথমে মুদ্রিত হচ্ছে তাতে একেবারে গদ্য সংলাপ নেই, সবটা গান।

গোবিন্দ অধিকারীর ভাগিনেয় প্রসন্নকুমার দাস বৈরাগী মহাশয়ের কাছ থেকে বাণেশ্বর ঘোষ গোবিন্দের 'স্বহস্ত লিখিত খাতা' সংগ্রহ করেন এবং "শ্রীযুক্ত রাখাল দাস কবিরত্ন ও কবিবর শ্রীযুক্ত তিনকড়ি বিশ্বাস দ্বারা সংশোধনপূর্বক" জনসমাজে প্রচার করেন। পদাবলীগুলো সাজানো হয়েছে নানা পালার মধ্যে, মানভঞ্জন, সুবলসংবাদ, মাথুর ইত্যাদি। গানগুলোর উপরে আছে এই ধরনের শিরোনাম, 'বৃন্দে উক্তিপদ', 'শ্রীকৃষ্ণ উক্তিপদ' ইত্যাদি। কিন্তু কোনো গদ্য সংলাপ নেই, নেই কোনো বক্তৃতা। পালায় গানই সব, প্রয়োজনে গদ্য সংলাপ থাকতেও পারে কিন্তু গান বাঁধাই পালা লেখকের বৈশিষ্ট্য। বাণেশ্বরবাবু ব্যবসা করছেন, খাতার স্বত্ব তাঁর। বটতলার রীতি অনুযায়ী পণ্ডিতদের সাহায্যও তিনি নিয়েছেন। কিন্তু লক্ষণীয়, তিনি কোনো সংলাপ ঢোকাননি বা খাতাতেও পাননি। উক্তি সমস্তই সুরে, খাতায় সেই কথা ও সুর লিপিবদ্ধ থাকে।[৬]

পাঁচালির অবস্থাও তথৈবচ। অভিনয়ের দিক থেকে পাঁচালি ও যাত্রায় অনেক প্রভেদ। কিন্তু পাঁচালিতে আখ্যান ব্যাখ্যা করা হয় ছড়ায়। কথার স্থানে ছড়া কেটে আখ্যায়িকার প্রবাহ রক্ষা করার মধ্যে পাঁচালিকারের কৃতিত্ব নিহিত থাকে। পাঁচালিও গানে বাঁধা হত। দাশরথি রায় (১৮০৬-১৮৫৭) নানা ঝাঁঝালো ছড়া ও সরস বাকযুদ্ধের মাধ্যমে পাঁচালিতে সমসাময়িক ঘটনার উপর টিপ্পনী কাটতে লাগলেন, পাঁচালিকে এক ধরনের সঙ্গীতময় নকশায় রূপান্তরিত করলেন। কিন্তু সেখানে অনুঘটকের কাজ করত টুকরো টুকরো ছড়া ; পারম্পর্য বদলাতে, সংযোজন করতে বা বিষয়ান্তরে যেতে ছড়াকে মোক্ষম উপায় হিসাবে ব্যবহার করতে দাশরথি রায়ের জুড়ি মেলা ভার।[৭]

যাত্রাপালা রচনায় সুরের এই একচেটে আধিপত্য শেষ হয় উনিশ শতকের শেষভাগে। যখন গদ্য সংলাপের প্রাধান্য এল, কথকতার বিন্যাস তখন পালা লেখকদের কাছে সহজলভ্য ছিল। আখ্যান বলতে হবে, আখ্যান ব্যাখ্যা করতে হবে, কাহিনী-প্রবাহ অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে নানা যাত্রার দল জাঁকিয়ে বসেছে, প্রতিযোগিতা বেশ তীব্র। দল ভাঙাভাঙির 'নোংরামি' শুরু হয়েছে, শুরু হয়েছে পালা চুরি করার প্রবণতা। বটতলার প্রেস নানা ধরনের পালা ছাপাচ্ছে, কবিবর অঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ রচিত পালার বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে, "সরমা বা বীরমাতা (তরণীর যুদ্ধ), ইহাতে সেই রাম-লক্ষ্মণ, তরণী, মেঘনাদ, মকরাক্ষ, কুম্ভ, নিকুম্ভ, রসমানিক, সীতা, সরমা, সুর্পণখা আর সেই কুম্ভীলক, সুরজার পাষাণভেদী শোকোচ্ছ্বাস, সবই আছে।"৮ পালাকার মতি রায়ের দলের খাই অনেক। তাই গোবিন্দপুর অঞ্চলে কৈবর্ত বৈকুণ্ঠ অধিকারী শীতলা ষষ্ঠীর দিন নতুন পালা নামাবে। মতি রায়ের দল থেকে একজন মদ্যপ 'জুড়ি' পালিয়ে এসে তার দলে ভিড়েছে। এ প্রসঙ্গে দীনেন্দ্রকুমার রায়ের বর্ণনা শোনা যাক :

> "জুড়ি প্রবর অপমান বোধ করিয়া মতিরায়ের দল পরিত্যাগ করে ; সঙ্গে সঙ্গে সে অন্নদাতা মতিরায়ের 'ভীষ্মের শর শয্যা গীতাভিনয়' নামক গ্রন্থখানির নকল চুরি করিয়া লইয়া যায়।··· বৈকুণ্ঠ দেখিল, একটি ভাল দলের একজন খ্যাতনামা জুড়ি ও **একখানি ভাল পুস্তক** একত্র হস্তগত হইতেছে, ইহাতে ব্যবসায়ের বেশ সুবিধা হইতে পারিবে। সুতরাং সে মাসিক পনর টাকা বেতন ও খোরাক পোষাক অঙ্গীকার করিয়া লোকটিকে নিজের দলে ভর্তি করিয়া লইল।
>
> "বৈকুণ্ঠ 'ভীষ্মের শরশয্যা'র নাম পরিবর্তন পুর্ব্বক এই নবার্জিত গ্রন্থখানির নাম রাখিল 'ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যু—গীতাভিনয়।' সে খুব ধুমধামে এই গ্রন্থের তালিম দিতে লাগিল এবং নিজের বাহাদুরী প্রকাশের জন্য দুই একটা দৃশ্যের সামান্য পরিবর্তন করিল ; গান, সুর, ভাষা, সমস্তই অবিকল রইল"৯ (নজরটান আমার)।

ভালো পালার চাহিদা যে কী হতে পারে, বিশেষ করে মতি রায়ের পালার, তার অজস্র সাক্ষ্য আছে।১০ এবং পালার চাহিদার অন্যতম কারণ হল মতি রায়ের বক্তৃতার এক ধরনের মাদকতা। ধরনটা কিন্তু জেনে বুঝে 'কথকতা' থেকে নেওয়া। পালা অভিনয়-কালে মতি রায় অনেক সময় নিজে কথক চরিত্র হিসাবে নামতেন।১১ কিন্তু তাঁর অভিনবত্ব হল পালা বিন্যাসে কথকতার ঢঙ অনুসরণ করা। মতিলাল রায় বিরচিত 'দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ' গীতাভিনয়ের কতগুলি সংলাপের টুকরো অংশ লক্ষ করা যাক,

> "প্রাতিকামী। মা দ্রুপদ রাজকুমারী ! সে ব্রজসম বাক্য কি আপনার কমলতুল্য কোমল প্রাণে সহ্য হবে ? বলতে যে আমার বক্ষস্থল বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে।
>
> ···"ওমা ধর্মরাজ পত্নী ! আমি কোন দোষে দোষী নই মা, দুষ্টের দাসত্ব

শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে এই কার্য করতে প্রবৃত্ত হয়েছি, তারা যা আমাকে বলেছে আপনার শ্রীচরণে নিবেদন করলাম, আপনি যেমন অনুমতি করবেন, তাই করব।”

আবার দ্রৌপদীর বিলাপ,

“(দ্রুত পদে গমন ও গান্ধারীর পদধারণ করিয়া) ওমা গান্ধারী! মা আমাকে রক্ষা কর, ওমা আমাকে রক্ষা কর! মা তুমি ভিন্ন আর আমার কেউ নাই।

গীত

আমি ধরি পদে এ বিপদে রাখ মা গান্ধারী।
আমায় ধরিতে আসে দুঃশাসন পাপরূপ ধারী।
আর কার কাছে দুঃখনিবারী
(আমার তোমা বিনা আর কেউ নাই মা)
আমি ভয়ে কেঁপে মলাম মা
রাখ জননী জগতে যশ দাসীরে উদ্ধারি ॥
আমি ধৈর্য যে ধরিতে নারি,
(দাসীর প্রতি কি তোর দয়া হবে)
(আজ আমি বড় দুঃখিনী গো)
ওমা নিবাও আমার মনের আগুন দিয়ে কৃপাবারি ॥

গান্ধারী। ওমা অসিতরূপে, তুমি যেরূপে আমার কাছে এসেছ, এতে বোধ হচ্ছে প্রলয়কালীন মেঘ যেমন মুষলধারে বারিবর্ষণ করে ধরাকে জলমগ্ন করে, তুমি তোমার ঐ দেহরূপ মেঘের আবির্ভাব করে নয়নবারি বর্ষণদ্বারা আজ কুরুকুলকে ডোবালে।”[১২]

এই ছন্দ ও মেজাজ কথকতার পুঁথিতে লভ্য। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত সভাবিষয়ের উপর লিখিত একটি পুঁথির ভাষার বিন্যাস লক্ষ করা যেতে পারে। কথক রামগোপাল শর্মা এইভাবে বিন্যাস করেছেন :

“প্রাতিকামী কি বলবো রে। আমি জে কুলবধূ। কেমন করে সভায় জাবো। প্রাতি উ॥ কি কবো। মন্যে ধ্রুবো কৌরবানাং বিনাশ। মা জানলেম কৌরবকুলের বিনাশ এতদিনে হল।

আবার দ্রৌপদীর বিলাপের বিন্যাস এই,

“দুঃখে শোকে রোসে ভয়ে কাতরা কম্পিতা। নিশ্বসন্তি। কি হবে কে রক্ষা করে। এলোচুল কোমলাঙ্গি। ছুটে গিয়ে গান্ধারির চরণে ধরে বলেন মা আমায় রাখ গো। একবস্ত্রা গুরুজনসভায় কেমন করে জাব। ব্যাধিমন্দিরে জেমন মৃগ কাঁপে। ললাটে বক্ষস্থলে করাঘাত। হায় কি হবে প্রাণ জায়। স্ত্রীলোকের লজ্জাত জান গো। হেরেচেন। তা এইখানে থাকবো। তোমার

সেবা করিবো। আজ অবধি দাসি হলেম। উ। অমা কেন ২। দুঃশবাসন বাউ বেগে পশ্চাৎ আগমন করে। দাসি হয়েচে একবার সভায় আসবে। গান্ধারী উ রবে। দ্রৌপদী উ। ঠাকুরপো অদ্য রজস্বলাস্মি।... নীলকুঞ্চিত কেশে ধরে জখন সভা মধ্যে আকর্ষণ করেন যে জায়। একে ক্ষীণ বালা অবলা বালা। উ। অরে মন্দবুদ্ধি লয়ে যাসনেরে দন্তে তৃণ ধরে বলি। অদ্য রজস্বলাস্মি। দ্রৌপদী কেঁদে বলেন কোথা জাবরে। কোথা রৈল ঘোড়া দাসীগণ। কোথা চামর, কোথা সুখ ঐশ্বর্য, কি হবে রে।"[১৩]...

কথকতার ভাষা বিন্যাসে টুকরো টুকরো সংস্কৃত শ্লোকাংশ ছাড়া সবই সংলাপধর্মী। সংলাপের মাধ্যমে দ্রৌপদীর হেনস্তা বর্ণনা করা হয়েছে, কথোপকথনের ঢঙে নাট্যগুণ অব্যাহত রাখা হয়েছে। মতি রায়ের পালায় গীতাংশের মাঝে মাঝে আবার সংলাপ আছে, সংলাপ আবার সুরে ফিরেছে। কথকতার ভাষা পড়লেও পরিষ্কার হয় যে কিছু বাক্য টেনে সুরে পড়তে হবে। জায়গায় জায়গায় সংস্কৃত বাক্যাংশ ছেদ এনেছে। সংস্কৃত-বহুল শব্দ রসের গাম্ভীর্য রাখার প্রয়োজনে মতিলাল রায়ও ব্যবহার করেছেন। প্রাতিকামীর কুণ্ঠা বা গান্ধারীর কাছে দ্রৌপদীর ছুটে যাওয়া, আর্তির বিন্যাস একগোত্রীয়।

চরিত্রানুযায়ী বিন্যাসে দুলকি বা হালকা অথবা খেলো মেজাজের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শব্দ বিন্যাস মতি রায়ও করেছেন, কথক ঠাকুরও করেন। যেমন, উপযুক্ত যাত্রাপালায় আছে, "দুঃশাসন, (স্বগত) তা পাঁচটি বর আছে, আরও যত দেবেন তা না বলবে না, 'ক্ষেপী ভাত খাবি না পাত পাড়বো কথা।'" বা "দুঃশাসন (বগল বাজাইতে বাজাইতে) যায়।"[১৪]

আবার কথকতার পুথিতেও গন্ধর্বের হাতে কৌরবদের দুর্গতিতে ভীম একভাবে 'বগল বাজায়ে' ওঠেন, গ্রাম্য ভাষা প্রয়োগ করেন "একি যুগে [যুধিষ্ঠিরকে] পেয়েছ, ঘণ্টার গড়ুর হয়ে বসে থাকবে।"[১৫]

উপযুক্ত উদাহরণ ও পারম্পর্য থেকে যে অনুমিতিতে আসা যায় তা হল যাত্রার পালা রচনার বিবর্তনে গান প্রথমে একাধিপত্য বজায় রেখেছিল। গান বাঁধার জোরে ছিল পালাকারের খ্যাতি। গদ্য সংলাপ গৌণ, উক্তি-প্রত্যুক্তি সব গানে। শুক-শারী বা চূড়া বাঁশির ঝগড়া সব সুরে, ছড়ায়। কৃষ্ণকমলের পালায় দ্বিধামনস্কতা আছে, কিছু পালায় প্রায় সবই গান আবার কিছু পালায় দীর্ঘ সংলাপ, তাকে একটানা বক্তৃতা বলাই ভাল। কথকতার টুকরো টুকরো ভাঙা কথা, মাঝে মাঝে তাক বুঝে 'চূর্ণী' লাগানোর কায়দা সেখানে নেই। ঠিক যে সময়ে যাত্রা কথকতাকে জনপ্রিয়তায় মেরে বেরিয়ে যাচ্ছে, সেই সময় মতিলাল রায় বা নীলকণ্ঠের উত্থান। এবং মতিলাল রায় পালাতে কথকতাকে আত্মসাৎ করেছেন, সংলাপ বিন্যাস করেছেন কথকতার ঢঙে। কথক যেরকম রামায়ণ ও মহাভারত থেকে ঘটনা নিয়ে পর্ব বিন্যাস করেন, আখ্যান

রচনা করেন, মতিলাল রায়ের পালা রচনার অন্যতম উদ্দেশ্য তাই। তিনি নিজে লিখেছেন :

> "মহাভারতের ন্যায় গ্রন্থ পৃথিবীর আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। ইহা রত্নের ভাণ্ডার বিশেষ। আমি সেই ভারত ভাণ্ডারে প্রবেশ করিয়া রত্ন চয়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছি। ইচ্ছা আছে ক্রমে ক্রমে মহার্ঘ রত্নগুলি সংগৃহীত হইলে একগাছি রত্নহার প্রস্তুত করিয়া বঙ্গমাতাকে উপহার প্রদান করিব।"[১৬]

আমরা আগেই দেখেছি যে ঠিক একই ভাবে ভাগবতের বা রামায়ণের ভিন্ন পর্ব থেকে সংগ্রহ করে পর্বানুযায়ী কথকতার পুঁথি সাজানো হয়। বিন্যাসের ধারায়, গদ্য সংলাপের গ্রন্থনে ও ভূমিকায় যাত্রা এবং কথকতার অন্তর্লীন সম্পর্ক গড়ে উঠল। পালাকাররা অবশ্য কথকতার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, কেউ কেউ স্বয়ং কথকও বটে। আবার যাত্রাপালার সংলাপ সংশোধনে এই জাতীয় পণ্ডিতদের সাহায্য অবলীলায় নেওয়া হত। মতিলাল রায় স্পষ্ট লিখেছেন :

> "কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের সাহিত্য শাস্ত্রাধ্যাপক নবদ্বীপ নিবাসী পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ বাচস্পতি ও জেলা ফরিদপুরের অন্তঃপাতী হাসামদীয়া গ্রামনিবাসী, সম্প্রতি বাগবাজারবাসী জ্যোতিঃশাস্ত্র বিশারদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সিদ্ধান্তরত্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় এই গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পরিদর্শন করতঃ সংশোধন করিয়া দিয়া আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।"[১৭]

কবিবর অঘোররত্ন কাব্যতীর্থ নিজে যাত্রাপালা লিখতেন। ফলে কথকতার ঢঙে সংলাপ লেখায় পালাকারদের পক্ষে বিশেষ অসুবিধা ছিল না।

তখনকার দর্শকদের কাছে এই জাতীয় নানা স্তরের সংলাপ, গদ্য ও পদ্যের চলাচল আকর্ষক হচ্ছিল। একঘেয়ে পুনরুক্ত সংলাপ যে যাত্রার দুর্বল দিক, এই কথা বলে সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ শেষ করেছেন। ঠিক সেই সময়েই মতিলাল রায়ের সমসাময়িক অনুজ পালাকাররা উনিশ শতকের শেষ পাদে কথকতার ভঙ্গিতে সংলাপ লেখাকে রীতি বলে মানলেন। রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৪৯-১৯০৪), ব্রজমোহন রায় (১২-?-১২৮৩) প্রভৃতি পালাকাররা সংলাপের পাশে নির্দেশনা দিতে শুরু করলেন এই বলে 'কথকতার সুরে'। চাহিদা বুঝে নীলকান্ত মুখোপাধ্যায়ও কৃষ্ণযাত্রার পালায় ব্যাখ্যা সম্বলিত লম্বা লম্বা সংলাপ জুড়ে দিলেন।[১৮] বাজারের তাগিদে, রুচির পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে, শিল্প আঙ্গিক গড়ে তোলার দাবিতে ভিন্ন ভিন্ন রীতির অন্তর্লীন সম্পর্ক কী করে গড়ে ওঠে, তার নিদর্শন এই দুই রীতির লেনদেন। যাত্রার কাছে কথকতা পিছু হটেও যাত্রা পালার কাঠামোতে তার নিজের ছাপ রেখে গেল।

খ. কথকতার পালা ও ঢপকীর্তন

আরেক ধরনের হারিয়ে যাওয়া ইতিবৃত্তে বার বার আমরা কথকতার অনুবৃত্তি পাই। তা হল ঢপ কীর্তন। ঢপ কীর্তন যে কীভাবে গায়, তা একজন বর্ষীয়ান সঙ্গীত

বিশারদ অনেক অনুসন্ধান করেও শুনতে পারেননি।[১৯] কীর্তনের সামাজিক ইতিহাসে ঢপ কীর্তন ব্রাত্য, বিবৃতি মাত্র।[২০] অথচ ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এর জনপ্রিয়তা ছিল অসাধারণ, বিশেষত মহিলা গায়কীরা এই রীতিতে আসর একেবারে মাত করে দিতেন। শাস্ত্রীয় কীর্তনের মধ্যে বিন্যস্ত করা, ব্যাখ্যা করার সুযোগ আছে। পালাকীর্তন নানা বিখ্যাত পদকর্তার পদাবলী নিয়ে সাজাতে হয়, কোনো একটি রসকে ঘিরে গ্রন্থন করতে হয়। এই গ্রন্থন করার মধ্যে গায়কের রসবোধ, শিল্প ধারণা ও বৈষ্ণব সাহিত্যে তাঁর পাণ্ডিত্য প্রকাশিত হয়। এবং অনুক্রম বজায় রাখার জন্য নানা গানের মধ্যে যে সংযোগ করা হয় তাকে বলা হয় ঘটকালি বা ভিয়ান, এবং এই সংযোগটি হয় কথার। আখরের মত ঘটকালিও গায়কের স্বকীয়। কীর্তন আসরে গায়কী রীতির মতো ঘটকালি বৃত্তির নাম আছে। বাড়ুজ্জ্যে মশায়ের ঘটকালি অর্থ অবধূত বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ঘটকালি, মুখুজ্জে মহাশয়ের ঘটকালি অর্থ যামিনী মুখোপাধ্যায়ের ঘটকালি বা রসিক পালের ঘটকালি।[২১] উনিশ শতকে বা বিংশ শতকের দ্বিতীয় পাদেও গায়কী শৈলীর সঙ্গে সঙ্গে এই ঘটকালির রীতিও আসর জমাবার ক্ষেত্রে কম প্রয়োজনীয় ছিল না। কীর্তনের সমজদার শ্রোতা খগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে লিখেছেন, পাবনার অধিবাসী রামকমল ভট্টাচার্যের আসরে নাকি "কখনো দশ হাজার লোক মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাঁহার কীর্তন শুনিয়াছে। কীর্তনগানে এরূপ লোক সমাগম বোধহয় আর কখনো দেখা যায় নাই। তাহার বিশেষ একটি কারণ বোধহয় তিনি নাচিয়া গাহিয়া **কথকতার সুর** দিয়া কীর্তন প্রচার করিয়াছেন যাহাতে সর্ব সাধারণে কীর্তনগানের মর্ম সহজে বুঝিতে পারে।"[২২] (নজরটান আমার)

'কথকতার সুর' বা 'ভিয়ান' দেওয়া সুন্দর শব্দ; পালা কীর্তনে কথার ভূমিকা বলার জন্য লিখে আর কিছু বলা যায় না, কানে শোনবার দরকার পড়ে।

এবং ঢপের ক্ষেত্রে সেরকম হবার আর কোনো উপায় নেই অথচ কথার স্থান প্রচলিত কীর্তন অপেক্ষা এই রীতিতে অনেক বেশি। বিক্ষিপ্ত লিখিত সাক্ষ্যের সীমিত সাধ্যের মধ্যে থেকে দুয়েকটা ইঙ্গিত মাত্র দেওয়া যেতে পারে। বৈশিষ্ট্য বোঝাতে গেলে বিস্তৃত উদ্ধৃতি দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। ঢপ কীর্তনের জন্মদাতা মুর্শিদাবাদের রূপচাঁদ চট্টোপাধ্যায় (১১২৯ বঙ্গাব্দে জন্ম) নিজে ছিলেন কথক।[২৩] ঢপের একটি বৈশিষ্ট্য হল যে কীর্তনে দল থাকে কিন্তু ঢপ সাধারণতঃ একজন গায়। পাঁচকড়ি দে লিখেছেন, "ঢপকীর্তনে গায়ককে একাই সর্বচরিত্রের অভিনয় করিতে হয়।...সে জন্য গায়ক কে কি বলিতেছে উক্তির পূর্বে তাহা উল্লেখ করিবেন। যে স্থলে ছোট উক্তি বা প্রশ্নোত্তর, তাহা স্বরের ভিন্নতা এবং হস্তমুখের তদনুযায়ী ভঙ্গি দ্বারা বক্তৃতা করিলে শ্রোতাদের বুঝিবার কোনো অসুবিধা হবে না।"[২৪]

কথকতায় একক অভিনয় ও গান এবং ঢপেও একক অভিনয় ও গান; **সাযুজ্যতার** শেষ কিন্তু এখানে নয়। ঢপে বাক্যাংশ দ্বারা গ্রন্থনা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। ঢপের কীর্তনে কৃষ্ণলীলাঘটিত প্রস্তাবটি গদ্যে ব্যাখ্যা করতে হয়। আবার প্রতি

বক্তৃতার শেষে একটি ক্ষুদ্র গদ্যবন্ধ 'তাল-লয়-সুর সংযোগে' গেয়ে শেষ করা রীতি। বক্তৃতার বাক্যবন্ধ ও সুরযুক্ত গদ্যবন্ধের মধ্যে মিল রাখতে হবে, তা না হলে রসাভাস ঘটবে। এই জাতীয় 'গীতি কথিকা' বাঁধতে মোহনদাস বৈরাগী, অঘোরদাস, দ্বারিকাদাস প্রমুখ নামজাদা ওস্তাদ ছিলেন। কিন্তু যাঁর পালা অপেক্ষাকৃত সহজলভ্য, তিনি ছিলেন প্রায় নিরক্ষর, যশোহরের মধুকান বা মধুসূদন কিন্নর (বঙ্গাব্দ ১২২৫-১২৭৫)।

ঢপের বাক্যাংশের বিন্যাসে আবার টুকরো টুকরো সংস্কৃত শ্লোকও থাকত। জগন্মোহিনী নিজে জল অচল কান জাতীয় রমণী। কিন্তু তিনি ঢপের মধ্যে চৈতন্যের নমস্কার সূত্র পাঠ করার রীতি চালু করেন। মধ্যে মধ্যে সেই সুযোগে সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করে তিনি গ্রন্থনাকে কারুকার্য মণ্ডিত করে তুলতেন। সংস্কৃত শ্লোকের লাগসই উদ্ধৃতি প্রয়োগও গ্রন্থনার অন্যতম লক্ষণ। এখানে কথকতার গ্রন্থনার সঙ্গে যোগসাজস স্পষ্ট।

বামা, শ্যামা, গুরুদাসী, ঠাকুরদাসী প্রভৃতি অনেকে ঢপ গানে সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ঢপের জনপ্রিয়তায় তখন অনেকে বীতশ্রদ্ধ কারণ তা নাকি "এখনকার বেশ্যাদিগের অর্থাগমের অবান্তর উপায় হইয়া উঠিয়াছে।"[২৫] শাস্ত্র যখন ভেঙেচুরে সমাজের অন্তেবাসীদের হাতে রূপান্তরিত হয়, তখন শিল্পবোদ্ধারা আঁতকে ওঠেন। কীর্তন ও কথকতার মিশ্রণের ক্ষেত্রে প্রায়োগিক দিক থেকে এগিয়ে এসেছিলেন অন্ত্যজ, নিরক্ষর কান, মহিলা গায়িকা ও গণিকারা। এই বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে বইয়ের বিজ্ঞাপনেও লেখা হয়েছিল, "৺ মধুসূদন কিন্নরের গীত ও বক্তৃতা অনুযায়ী শ্রী তিনকড়ি বিশ্বাস প্রণীত, যাহা অনেকানেক **বার ললনাগণে** কীর্তন করিয়া সকলের মনোরঞ্জন করিয়াছে।" (নজরটান আমার)

'প্রভাস তীর্থ' সঙ্গীত পালায় বা "উদ্ধব সংবাদে" প্রেক্ষাপট এক, মুমুক্ষু পরীক্ষিৎ শুকদেবের কাছ থেকে কথা শুনছেন। আরম্ভের ঢঙ ও বিন্যাস এইরকম :

> "অনন্তর রাজাধিরাজ মহারাজ পাণ্ডুবংশাবতংস শৌর্য ধৈর্য গুণাগুণ রাশীকৃত দিগবিদিগ অবস্থিত অনবরত ভূপতিমণ্ডল বেষ্টিত সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় বীরাগ্রগণ্য যে রাজা তেঁহ ব্রাহ্মণকণ্ঠে মৃত সর্পার্পণ করে দারুণ অভিশাপ ভয়ে ভীতাঙ্গ হয়ে মাহেন্দ্রসম ঐশ্বর্য সকল বন্ধুবান্ধব কলত্রাদি পরিত্যাগ করে সুরধুনি তরঙ্গিনী হরিপদরজ বিহারিণী ত্রিলোক তারিণী গঙ্গে তৎতীরে তুলসী কাননে উপবেশনপূর্বক অঙ্গে হরিনামাঙ্কিত হরিপদাঙ্কিত কটিতটে ডোরকপিন আচ্ছাদিত পরমভাগবত তিলকোজ্জ্বল ললাটে সংশোভিতমান প্রেমকরি পরিপূরিত লোচনে গদগদ বিধানে শ্রী শুকদেব স্থানে জিজ্ঞাসা করিলেন। বলে গুরুগো আমার গতি কি হবে।
>
> চেয়ে দেখ গুরু, আমি পোড়ে আছি ভবকূপে এবার তরাও কোনরূপে অতি তুচ্ছ জলপিপাসু পরি-পীড়িতান্তঃ করণে করণে মহানুভব শমীকমুনির করেছি

অপমান, না জানি সেই অপরাধে কোন ঘোর নরকে জেতে হবে, তাই বলি গুরো অন্য কথা বলো না, আর সময় নাই, এখন বিষ্ণু গাথা হরিকথা কও।"

একই অনুচ্ছেদে উপমাবহুল বর্ণনা, সুরে কথা ও কথোপকথন টানা সন্নিবেশ করার ঢঙ একেবারে কথকতার রীতিতে গোছানো হয়েছে। নারদের রূপ বর্ণনায় 'অনুস্বার' যোগ করে সংস্কৃতগন্ধী করা হল। এক ধরনের পড়ার তাল গড়ে উঠল :

"কিবা প্রতিবিম্বিত রবিমণ্ডল কুণ্ডাক্রান্ত শোভা পদার্থ পদ্ম অধর এবং সংশোভিত মলয় শুক্লবরণ তনু পিঙ্গল জটিলং উরে পিঙ্গ যুত মলকা কুটিলং সুললিত রাজিত চন্দন তিলকং তেজময় রবিমণ্ডল সদৃসং ভুরু যুগল রতিপতিকাম মুকতং প্রেমজেনোবলি মুদিত নেত্রং করকমলে সদাবাজিত জয়ং রসনায় ব্রজপতি ভাগবততয়ং জাসনদতভব সত্যাবতসা কলিতে কুচকুচ বোদতি সহসা হরিনামাঙ্কিত সর্ব্বশরীরং সিঞ্চিতলোচনে পুস্করনীরং প্রবস্তুতা নারদমুনি বীণামন্ত্র হস্তে ন্যস্ত করি শ্রীবৃন্দাবনধাম গমন করিতেছেন, সে বীণায় কি গান করেন,

"রাগিনী ভৈরব, তাল কাওয়ালি।

বৃথা দিন গেলরে বীণে মজ কৃষ্ণ গুণাগুনে,"

বলার জন্য লেখা হয়েছে, বর্ণনা, তাল ও সুর সেভাবে সাজানো। আবার 'চূর্ণী' বা 'সাটে'র ঢঙে যজ্ঞস্থলের বিবরণ লেখা হয়, যেমন :

"কিবা সে পুরীর আশ্চর্য শোভা,—কত শত স্থানে অয়স্কান্ত মণি, পিতরাস মণিকারণে চাকচক্য শোভা করিতেছে, আর কিবা স্থানে ২ রক্তপতাকা নীলপতাকা শ্বেতপতাকা পতো পতো শব্দে গগনপথ প্রতীয়মান হইতেছে আর কিবা স্থানে স্থানে নানাবিধ বাদ্যোদ দম করিতেছে, কিবা রণকেকা, জয় কেকা কাড়া টিং টিং টীকারা দগড় দামামা ধ্বনি করিতেছে কিবা ভেরী, তুরি ধুধুরি রামসিঙ্গা রণসিঙ্গা কাংস্য করতাল মধুর মৃদঙ্গ খমক খামাক ইত্যাদি রূপ নানাবিধ বাদ্য উদ্গম হইতেছে, কিবা স্থানে স্থানে ধুপাবলী দীপমালা স্থানে ২ কদলীবৃক্ষ রোপণ তদতলে পূর্ণ কুম্ভ তদোপরি আম্র-শাখা তদোপরি নারিকেল ফল এবোমপ্রকারে পুরী সুশোভিতমানা।"...[২৬]

বাদ্যযন্ত্র ও সাজসজ্জার বর্ণনায় শোভাবস্তুর ব্যবহার, শব্দানুপ্রাসের প্রয়োগ যে কোনো চলিত সাটের মত। পার্থক্য ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে ছেদ আনা হয়েছে, বর্ণনাময় শব্দ ও সংস্কৃত বিশেষণ পর পর একভাবে বসানো হয়নি। ঢপের বর্ণনাতেও আধুনিক বাংলা গদ্যের ছাপ পড়েছে। রসসৃষ্টি, চরিত্র ও পরিস্থিতি রচনায় কথকতা ও ঢপের পালায় কোনো মৌলিক পার্থক্য আছে বলে মনে হয় না। 'উদ্ধব সংবাদ' পালা বিচার করা যেতে পারে।[২৭] ঢপ পালার শুরুতে কংস চিন্তায় মগ্ন। সর্বত্র কৃষ্ণরূপ দেখছেন অথচ সব বীরেরা কৃষ্ণহাতে নিহত। এমন সময় নারদের আগমন, ছলে কৃষ্ণকে মথুরায় আনতে হবে, কংস বধের কাল আসন্ন। চিন্তাকুল কংসকে নারদের পরামর্শ :

শ্লোক

"যশোদায়াভবৎ কন্যা দেবক্যা বসুদেবজঃ ॥
রোহিণ্যা বলরামশ্চ ভাদ্রেহ সিতাষ্টমীনিশি ॥"

কথা

শুন মহারাজ যশোদার কেবল একটি কন্যা হয় আর দেবকীর অষ্টম গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়, রোহিণীর গর্ভে বলরাম জন্মে।

তান

"যেই দিন ভূমিষ্ট হলেন নারায়ণ।
কি কহিব সেদিনের দুঃখের কথন ॥
ভাদ্রেতে অসিতাষ্টমী মহা অন্ধকার।
মেঘের গর্জন তাহে পড়ে চারিধার ॥
আপনি আপন অঙ্গ পায়, না দেখিতে।
বসুদেব লয়ে কৃষ্ণ গেল গোকুলেতে ॥"

সুর

মহারাজ তব ডরে
কৃষ্ণ রেখে এল নন্দের ঘরে।

কথা

তখন রাজা কংস কহেন, এত বড় কর্ম বসুদেব করেছে ? আমার অরিকে রেখে এসেছে বৃন্দাবনে ? এখনি তার শিরশ্ছেদন করব।

দেবর্ষি এই বাক্য শ্রবণ করে মনে ভাবিলেন ও কথা বলা ভাল হয় নাই। [প্রকাশ্যে] মহারাজ আপনার জ্ঞান নাই। যদি এখন বসুদেব ও দেবকীকে বধ করেন তাহলে শত্রু বধ হয় না। বধের কথা শুনে কৃষ্ণ বলরাম অন্যদেশে পলায়ন করিবে।

কংস এখন উপায় কি ?

নারদ। তান-পয়ার

এক ধনুর্ময় যজ্ঞ কর আরম্ভন।
রামকৃষ্ণ দুই জনে কর নিমন্ত্রণ ॥
রথে যবে আসিবেক ভাই দুই জনে।
স্বহস্তে ধরিয়ে দোঁহে বধিও পরাণে ॥"

"গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি ও পুনরুক্তির" আশঙ্কায় ভাষাকে "নাটকীয়ভাবে" সাজানো হয়েছে, একথা সংকলক আগেভাগে জানিয়েছেন। চরিত্র ভাগ, নাম নির্দেশ, শিরোনাম ইত্যাদি "আবশ্যকতানুসারে ভাষার সঙ্গতি ও সৌন্দর্যরক্ষাকল্পে", সম্পাদক সংযোজিত

করেছেন। কিন্তু পরিস্থিতি তৈরি ও চরিত্র এক থেকে গেছে। এবার সমতুল্য কথকতার পুঁথির উদাহরণ বিচার করা যাক।[২৮]

> "নারদ উবাচ। শুনু মহারাজ তবে তোমায় বিশেষ করে বলি। উ॥ যশোদায়াঃ সুতাং কন্যাং দেবক্যাঃ কৃষ্ণমেবং ।। রামঞ্চ রোহিণীপুত্রং বসুদেবেন বিভ্ভতা। ন্যস্তো স্বমিত্রে নন্দে বৈয়াত্যাং তে পুরুষাহতাঃ ।। দেবকীপুত্র কৃষ্ণ রোহিণীপুত্র রাম বসুদেব এ [?] য় যুক্ত হয়ে স্বকীয় মৈত্র জে রাম [*sic*] তার গৃহে রক্ষা করে এসেচেন। আর যশোদার কন্যাটিকে আনয়ন করে তোমাকে ভুলিয়েছেন। এই তোমাকে বিশেষ বললেম। এই কথা শ্রবণ করে ক্রোধে পরিপূর্ণ কংস বলে বসুদেব ভণ্ড তপস্বী এত বড় সাধ্য। নিপাতমসি মাদও বসুদেব জিঘাংসয়া। শাণিত খড়্গ নিয়ে বিনাশোদ্যত। বসুদেব দেবকীকে এই ক্ষণেই বিনাশ করিব। নারদ মনে করেন এক কর্ত্তে আবার আর হলো। অগ্নি হাস্য। কঃ উ। কেন হাসলেন জে। নারদ উ। মহারাজ তোমার বুদ্ধি-হ্রাস হয়েচে। বুদ্ধিমান মন্ত্রিয় নাই। শেষে বিবেচনা কর দেখি। আজ জেমন তুমি বসুদেবকে বিনাস করলে। এই শুনে কৃষ্ণ বলরাম পালাবে। পরে বলবান হয়ে সৈন্য সঞ্চয় করে এসে দাঁড়াবে। তখন পারা জাবে কি করে। বরং বসুদেবকে কারাগারে বদ্ধ কর। পরামর্য [*sic*] বলি শুনু। ধনুর্যজ্ঞ আরম্ভ কর। আর নিমন্ত্রণ করে রামকৃষ্ণকে বাড়ী আন। স্থান ভ্রষ্ট হলে সে তেজটা যাবে। এখানে অনেক অসুর আছে না হয় তুমি আছ আমি আছি ধরাধরি করে জা হয় এরকম করা জাবে। না হলে আর নিস্তার নাই।"[২৯]

সাধর্ম্য খুব স্পষ্ট, চোখে লাগার মতো। ঢপের পালাতেও তত্ত্ব আলোচনা প্রশ্নোত্তরের ঢঙে, পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসু আর শুকদেব নিরসনকর্তা।[৩০] মূল কাহিনী দুয়েকটি শ্লোকে বলা আছে, উৎস একই শ্রীমদ্ভাগবত। কিন্তু নারদীয় ছলচাতুরি, বাকপটুতা সব পালাকারের অভিযোজন। কৃষ্ণকাহিনীর নানা কাব্য, পালা কীর্তন মিলে মিশে কতকগুলি ছকের জন্ম দিয়েছে, দেশজ চৈতন্যে সেইগুলো গেড়ে বসেছে। চরিত্রের সেইরূপ রসময় আচরণ প্রত্যাশিত। এই উৎসে রদবদল হয় কিন্তু রসগত ধারণার আবৃত্তি অক্ষুণ্ন থাকে। সংযোজন, বাক্যাংশ রসচৈতন্যকে পরিপুষ্ট করে, শ্রোতার প্রত্যাশাকে তাকে স্বীকার করতে হয়, রসসৃষ্টির ক্ষেত্রে তাকে পরিপূর্ণ অস্বীকার করে যাওয়া যায় না। ফলে কথকতা, ঢপ, যাত্রাপালা একই কাহিনী কাঠামোয় আবদ্ধ, একটা থেকে অন্যটায় যাতায়াত সহজসাধ্য। এবং রস সৃষ্টির আবহ সৃষ্টিতেও এদের মিল লক্ষণীয়। ঢপ কীর্তনের গায়কী প্রভাব মজলিসে কীভাবে কাজ করত, তার এক বর্ণনা দীনেন্দ্রকুমার রায় দিয়েছেন। কার্তিক জন্মের আখ্যান নিয়ে পালা, এক বয়স্কা ঢপ গায়িকা পালা গাইছেন।

"বৃদ্ধা গায়িকা কখন কথায়, কখন দ্রুত ছড়ায়, কখন তানলয়-বদ্ধ অনুপ্রাস ঝঙ্কারিত দীর্ঘ সুরে অলৌকিক গাথা গাহিতে লাগিল,—বলদৃপ্ত দুর্দান্ত অসুরগণের নিদারুণ অত্যাচারে ত্রিদিব ধাম বিনষ্ট।··· মন্দাকিনীর আর সে শোভা নাই ; পারিজাতে আর তেমন গন্ধ নাই।··· দেবগণ দুঃখে ম্রিয়মাণ, অপমানে নতশির।··· বৃদ্ধার কোমলকণ্ঠ নিঃসৃত দেবগণের দুঃখদৈন্য প্লাবিত সকরুণ সংগীতধারা শ্রোতৃবর্গের শ্রবণবিবরে প্রবেশ করিয়া সমবেদনায় তাহাদের হৃদয় আপ্লুত করিয়া তুলিল ; সকলে স্থান কাল ভুলিয়া বহু প্রাচীন যুগের একটি সঙ্কটময় পৌরাণিক দৃশ্যের মধ্যে আত্মহারা হইয়া পড়িল ; সেই বিষাদসংগীত শুনিতে শুনিতে ও দৃশ্যের পর দৃশ্য অতিক্রম করিতে করিতে, দর্শকের নয়নসমক্ষে শুভ্র তুষার কিরীটি কৈলাসের পদ প্রান্তবাহিনী সুর-তরঙ্গিণী মন্দাকিনীর ফেনোর্মিমালা বিজন শরবন, হরমনোমোহিনী নগেন্দ্র নন্দিনী পার্ব্বতীর মাতৃরূপ ও রজতগিরিনিভ দেবাদিদেব মহাদেবের দিব্যমূর্ত্তি মায়াচিত্রের ন্যায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল ; অবশেষে সকল চিত্র নিষ্প্রভ করিয়া একটি অনিন্দ্যসুন্দর, পঙ্কজলোচন, গৌরকান্তি, অমরবৃন্দবন্দনীয় শিশু দেবতার মূর্তি তাহাদের চিত্রপটে প্রতিফলিত হইল। তখনও সেজের উজ্জ্বল আলোক চণ্ডীমণ্ডপ মধ্যবর্তী ময়ূরাসন কার্তিকের সুন্দর মুখের উপর বিম্বিত হইতেছিল, সকলে ভক্তি পরিপ্লুত হৃদয়ে সেই দেবমূর্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিল।"৩০

চিত্রময়তা, কালের প্রসারণ, পৌরাণিক সময়ে প্রবেশ, এ সমস্ত কথকতার কাজ, আবার ঢপেরও কাজ। এই পালায় সাহিত্য ও শিল্প মিলে মিশে তৈরি করেছিল অষ্টাদশ ও উনিশ শতকে দেশজ সংস্কৃতি, এক রস আস্বাদনের জগৎ। 'আধুনিকতার' সমান্তরালে এই গোত্রের রসবোধ ক্রিয়াশীল ছিল। তার স্বীকৃতি বঙ্কিমের উপন্যাসে, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে রয়ে গিয়েছে।

এই রকম জগতে শিল্প মাধ্যমগুলো প্রতিযোগিতায় রত থেকেও একটা অপরটাকে অনুবিদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিল, একজন আরেকজনের কাছ থেকে নিতে কুণ্ঠিত হয়নি। দেশজ সংস্কৃতি তৈরি হতে যাতায়াত শুধু খাড়াখাড়ি হয় না, আড়াআড়িও হয়, এই কথা মনে রাখা দরকার। এই আড়াআড়িত্বকে দিয়েছিল বটতলার ছাপাখানার অর্থনীতি, পৌরাণিক আখ্যানের আবৃত্তি ও অনুবৃত্তিতে দর্শকদের রুচি। বৈষ্ণবীয়, শাক্ত বা মহাকাব্যীয় প্রসঙ্গ ও বোধের যে বিপুল সম্ভার প্রাক-ইংরেজ যুগ থেকে তৈরি হয়েছিল, তাতে এক ধরনের নৈতিকতা, শিক্ষা ও রস প্রত্যাশায় অবশ্য টানা পোড়েন ছিল। যেমন শাক্ত বনাম বৈষ্ণব ; আবার দ্বন্দ্বকে মেলানোও হত কৃষ্ণকালী যাত্রার মধ্যে। কিন্তু এই রস প্রত্যাশার জগতে দ্বন্দ্ব ও মেলানোর সম্ভাবনা থাকার ফলে, কথকতা, পালাকীর্তন ও ঢপের আবেদন নানা বয়সের লোকের কাছে ছিল। রস সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় লোকেরাও উৎসাহে অংশগ্রহণ করত। উনিশ শতকীয় একটি আসরের বিবরণ এই সজীবতাকে ছুঁয়ে যায়,

"বৃদ্ধেরা মস্তকে চাদর জড়াইয়া আসরে বসিল। যুবকেরা একটু দূরে বসিয়া সেকালের ও একালের ঢপের সমালোচনা করিতে লাগিল। ক্রমে ঢপ, কবি, কীর্তন, পাঁচালী—সকল রকম গানের আলোচনা আসিয়া পড়িল। তর্ককোলাহল ক্রমে সমুচ্চ হইয়া উঠিল। মেয়েরা চিকের আড়ালে বসিয়া কেহ ঢুলিতে লাগিল, কাহারও বা হাই উঠিতে লাগিল, কেহ বা অধীর হইয়া ঢপওয়ালীর প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করিতে লাগিল। ছোট ছোট ছেলেদের এ সকলদিকে কিছুমাত্র খেয়াল নেই। তাহারা সতরিঞ্চর প্রান্ত-ভাগে বসিয়া বিষম জটলা বাঁধাইয়া দিয়াছে!...

"এমন সময় গান আরম্ভ, সূচনা স্বরূপ বাদ্যযন্ত্রে দুই একটি মৃদু আঘাত হইল, ক্ষণকালের মধ্যে সভাস্থলের কোলাহল মন্দীভূত হইল...

বৃদ্ধেরা তামাক টানিতে টানিতে ভক্তি গদগদ চিত্তে সেই গান শুনিতে লাগিল। যুবকগণের তর্কস্রোতে অকস্মাৎ ভাঁটা পড়িল; বালক দিগের দ্বন্দ্বযুদ্ধ থামিয়া গেল।"৩১

এইভাবে ঢপের মজলিশে, কথকতার আসরে তন্ময়ীভবনতার মাধ্যমে আবালবৃদ্ধ বনিতা রূপান্তরিত হয় সহৃদয়ে, এবং ফলে শিল্প হয়ে ওঠে রস-সংবেদ্য।

□ পর্ব / ৭ □

কথকতার সামাজিকতা

ক. লোকশিক্ষার চরিত্র বিচার :

বঙ্কিমচন্দ্র বা সঞ্জীবচন্দ্র, দীনেশচন্দ্র সেন বা হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সবাই ঐতিহ্যানুসারী সমাজে কথকদের শ্রেষ্ঠ লোকশিক্ষক বলেছেন। কথকের সম্বল কথা। মজলিশে সেই কথার মাধ্যমে শ্রোতারা নানা নীতি উপাখ্যান শুনতেন, আখ্যানের বয়ানে, গানের কথার পরতে পরতে থাকত জীবনচর্চার নানা মূল্যবোধের ইঙ্গিত, কী করলে ভালো হয়, কী করলেই বা মন্দ হয়, এইসবের নির্দেশ। এই ভালোমন্দ ত্রিকালব্যাপ্ত। কথকের বয়ানে ভূত, ভবিষ্যত, বর্তমান সমভাবে বিরাজ করে। অথচ শ্রোতারা তো সাম্প্রতিক। দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা ও জীবনচর্চার মধ্যেই তাদের নীতিবোধ স্থিত। তাই ঘটকালি করার সময় কথকও দৈনন্দিনকে ভুলতে পারেন না, পৌরাণিক চরিত্রে বাস্তবের মিশেল দিতে হয়; কথা যত 'অসম্ভব' হোক না কেন, তাকে 'সহজের' সমে, সমাজের পথে, ফিরতে হবে। বার বার শ্রোতারা কাল্পনিক আখ্যানে খুঁজে বের করেন নিত্য প্রাসঙ্গিকতা, প্রাত্যহিক জগতের তুলনা বা প্রতিতুলনায় পৌরাণিক চরিত্রগুলো ফিরে আসে, ঢুকে পড়ে প্রবাদ ও প্রবচনে, ধারণা হয়ে ওঠে লোকগ্রাহ্য, 'বিদুরের ক্ষুদ' বা

'রাবণের চিতা', 'কংস মামা' বা "দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ" ; পৌরাণিক কথা জন্ম দেয় ধারণার, ধারণা রূপ পায় লৌকিক ছড়ায়, সামাজিক মন্তব্যে,

"ভীম, দ্রোণ, কর্ণ গেল, শল্য হল রথী,
চন্দ্র সূর্য অস্ত গেল জোনাকি ধরে বাতি।"

উনিশ শতকের দ্বিতীয় পাদে, লোকবৃত্তের বাইরে দাঁড়িয়ে, ইংরাজের পিঠ চাপড়ানোর কাঙাল, ইংরাজি নবীশ, 'নদের ফটিকচাঁদ'দের বিরুদ্ধে বঙ্কিম প্রায়ই গালমন্দ করতেন। সমাজে 'শিক্ষিত' ও 'রামাদের' মধ্যকার দূরত্ব ক্রমশ যোজন-প্রমাণ হচ্ছে। বঙ্কিম চিন্তিত। এই ব্যবধান কমাবার জন্য যে 'সুশিক্ষিতের' উদ্যোগ কাম্য। লোকশিক্ষার প্রকল্পে তাঁর অগাধ আস্থা। স্বভাবত তাঁর আলোচনার অনুষঙ্গে হাজির হন আশৈশব পরিচিত কথক ঠাকুর,

"গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, বেদী পিঁড়ির উপর বসিয়া, ছেঁড়া তুলট, **না দেখিবার মানসে সম্মুখে পাতিয়া**, সুগন্ধি মল্লিকামালা শিরোপরে বেষ্টিত করিয়া নাদুস্নুদুস্ কালো কথক সীতার সতীত্ব, অর্জ্জুনের বীরধর্ম্ম, লক্ষ্মণের সত্যব্রত, ভীষ্মের ইন্দ্রিয়জয়, রাক্ষসীর প্রেমপ্রবাহ, দধীচির আত্ম-সমর্পণবিষয়ক সুসংস্কৃতের সব্যাখ্যা সুকণ্ঠে সদলঙ্কার সংযুক্ত করিয়া আপামর সাধারণ সমক্ষে বিবৃত করিতেন। যে লাঙ্গল চষে, যে তুলা পেঁজে, যে কাটনা কাটে, যে ভাত পায় না পায়—সেও শিখিত **যে ধর্ম্ম নিত্য**, যে ধর্ম দৈব, যে আত্মান্বেষণ অশ্রদ্ধেয়, যে পরের জন্য জীবন, যে ঈশ্বর আছেন, যে বিশ্ব সৃজন করিতেছেন, বিশ্ব পালন করিতেছেন, বিশ্ব ধ্বংস করিতেছেন, **যে পাপ পুণ্য আছে, পাপের দণ্ড, পুণ্যের পুরস্কার আছে**, যে জন্ম আপনার জন্য নহে, পরের জন্য, যে অহিংসা পরমধর্ম, যে লোকহিত পরম কার্য,—সে শিক্ষা কোথায় ? সে কথক কোথায় ?"[১] (নজরটান আমার)

ইংরাজ শিক্ষিত নব্য যুবকের লোকশিক্ষার প্রতি অনীহার বিপরীতে কথকের সামাজিক ভূমিকাকে বঙ্কিম ব্যাখ্যা করেছেন। সংস্কৃতির যোজক হলেন কথক ; তাঁর যোজনার ফলে সমাজে মূল্যবোধের সৃষ্টি হয়, চিত্তবৃত্তির প্রসার ঘটে।

মূল্যবোধের আবৃত্তি নিঃসন্দেহে কথকের কাজ। কিন্তু সেটা এক বিশেষ প্রকারের মূল্যবোধ। তাঁর আলোচনায় দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন যে লোকগাথার প্রেমকাহিনীকে ব্রাহ্মণরা বাতিল করলেন এবং কথকদের মাধ্যমে দেবলীলার কথা চালু করলেন।[২] এক হাতে নিলেন, আরেক হাতে দিলেন। মনোরঞ্জনের ক্ষেত্রটি 'নিম্নশ্রেণীর' হাত থেকে চলে গেল পৈতা ঝোলানো কথক ঠাকুরের খপ্পরে। ভালো মন্দের তর্ক-বিচার দীনেশচন্দ্র সেন স্পষ্টত এড়িয়ে গেলেও এই পরিবর্তনের কথা বলেছেন।

ঐতিহাসিক কালক্রম, নৃতাত্ত্বিক তত্ত্ব, এই সবের ফাঁকিরে দীনেশচন্দ্র সেনের বক্তব্যে ফাঁক পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু কথকদের বর্ণিত পালার খুঁটি ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে প্রোথিত ছিল। কথকরা সমাজরক্ষণে ব্রতী ছিলেন, সমাজ পরিবর্তনে নয়।

অধুনা প্রয়াত দার্শনিক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় চার্বাক দর্শনের অবলুক্তির পিছনে কথকদের ভূমিকাকে বেশ বড় করে দেখিয়েছেন।[৩] মহাভারতের শান্তিপর্বের একটি আখ্যানে ইন্দ্ররূপী শেয়াল নাস্তিক্যধর্মে বিশ্বাসের ভয়াবহ পরিণতি হাতেনাতে দেখিয়েছে, তর্কবিদ্যার প্রতি তার অনুরক্তির কর্মফল নিজমুখে বলেছে। কর্মফল কী? আগের জন্মে বামুন কিন্তু পরের জন্মে শেয়াল। আর এই গল্পটি নিপুণভাবে কথকঠাকুর 'নিরক্ষর' চাষাভূষোদের কাছে বলে কী মারাত্মক 'প্রোপাগান্ডা'ই না করেছেন। কথকরা এইরকম প্রচারক, সাবেক কালের শাসকশ্রেণীর হাতের প্রচারমাধ্যম; অক্ষর-জ্ঞানহীন 'চাষাভূষোদের' চেতনায় 'নাস্তিক্যবুদ্ধির বিভীষিকাটা' 'কথকঠাকুর মারফৎ' শাসকরা গেঁথে দিতেন। গল্পকারদের ও কথকদের প্রসঙ্গে দেবীপ্রসাদের শেষ প্রাসঙ্গিক মন্তব্য হল "আজকের দিনে এরকম কুশলী প্রোপাগান্ডিস্ট-এর খবর পেলে শাসক সম্প্রদায় পুরস্কারের ঝুড়ি উপুড় করে দেবেন।

শ্রদ্ধেয় দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের যে কোনো মন্তব্য অনুধাবনযোগ্য। উনিশ শতকে বঙ্কিমী মূল্যায়নের সঙ্গে তাঁর বিবৃতির অনেক ফারাক, এমনকি দীনেশ সেনের লেখার মেজাজের সঙ্গেও তাঁর চিন্তা স্বভাবত খাপ খায় না। বঙ্কিমের কাছে যা লোকশিক্ষা, দেবীবাবুর কাছে সেটা শাসকশ্রেণীর প্রোপাগান্ডা। বঙ্কিমের ধারণা যে নদের ফটিকচাঁদদের দাপটে কথকদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। হালকাভাবে হলেও দেবীবাবুর মনে হয়েছে যে জানা নেই, তাই। নতুবা কথকদের ভবিষ্যত উজ্জ্বল, খবর পাওয়া মাত্র শাসকদের দয়া তাদের উপর ঝরে পড়বে।

শ্রদ্ধেয় দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের বিচারের সঙ্গে বৈমত্যের সুযোগ আছে। ঐতিহাসিক-গত ভাবে কথকরা লোকায়তিকদের বিরুদ্ধে কতটা লড়েছিলেন বা ব্যবহৃত হয়েছিলেন, সেটা আলোচ্য নয়। মহাভারত বা রামায়ণের সব আখ্যান কথকরা ব্যবহার করতেন না, সংগ্রহের মাধ্যম দিয়ে কিছু আখ্যানমাত্র নির্বাচিত করতেন, সেই ভিত্তিতে পুঁথি নিজেদের মতো করে লিখতেন। কোনো কথকতার পুঁথিতে শান্তিপর্বে লেখা ইন্দ্ররূপী শেয়ালের আখ্যান উল্লিখিত করার কোনো ঐতিহাসিক নিদর্শন আছে কিনা, সেই তথ্য বিচারও গৌণ। আপত্তি আছে অন্যখানে, সমস্যাটাকে যেভাবে সাজানো হয়েছে—সেইখানে।

যে কোনো যুগে শাসক শ্রেণীর চিন্তাধারা সামগ্রিকভাবে সমাজে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে, মার্কসের এই উক্তি মান্য। আমাদের আজকের সমাজেও ডাক্তার, আইন-জীবি, বিজ্ঞানী ও কবিরা বুর্জোয়াদের বেতনভুক, এই দামি কথাটাও মার্কস বলে গেছেন। বেশিরভাগ ব্রাহ্মণ ব্রহ্মোত্তর, দেবোত্তর জমি ভোগ করেন। জমিদার বাড়ির ডাকা আসরে তাঁরা কথক। পালার অন্যতম উৎস ব্রাহ্মণদের লেখা পৌরাণিক আখ্যান। বৌদ্ধিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের নিগড় কোথায় বাঁধা, সেইটা বুঝতে কোনো অসুবিধা নেই।

অথচ সীমা অতিক্রান্ত হয়, অন্তত হবার সম্ভাবনা থাকে। কথা বলার আর্ট হল

কথকতা। আসর সামাজিত অনুষ্ঠান, বক্তা ও নানা রকমের শ্রোতা উভয়ে উপস্থিত থাকে। শ্রোতারা মান্য বামুন, 'নিরক্ষর চাষাভুষা' 'গোলা মেয়েমানুষ' সবরকম হতে পারে। কিন্তু আসরে রসভোগের প্রক্রিয়ায় তাদের সাধ্যানুযায়ী শ্রোতারাও সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়। নানা শ্রোতার সংবেদনশীলতাকে কথক তার পাঠক্রমে মোকাবিলা করেন, তা না হলে আসর মাটি হবে। এই মোকাবিলার নানা সাক্ষ্য প্রভুপাদ প্রাণকিশোর গোস্বামীর আত্মজৈবনিক রচনায় লব্ধ।

ফলে ইচ্ছানুসারে বক্তব্যকে চেতনায় গেঁথে দেওয়া যায় না; তেমন তেমন শ্রোতার মান পাঠরত কথকের দাড়ি মরা পোষা ছাগলের দাড়ির কথা মনে করিয়ে দেয়, তার শোক উছলে ওঠে, এই কথাও গল্পে শোনা যায়।[৩ক] সব মতের কথক থাকতে পারে। নাস্তিক বৌদ্ধ ও জৈনদেরও 'কথা' ছিল, তাই কথকও ছিল। কিন্তু 'রক্ষণশীল আস্তিক' কথকরাও মজলিশের চাহিদার তাগিদে, শিল্পের নীতিতে, এমনকি পেশার খাতিরে সবসময় বাঁধাধরা পথে চলবেন, তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। অভিযোজন চলছে, তাৎক্ষণিকতা বয়ানের অভিমুখ বদলাচ্ছে, এই সবের কিছু কিছু উদাহরণ প্রসঙ্গান্তরে আলোচিত হয়েছে। পুরুষ শাসিত সমাজের ভ্রূকুটি অবহেলা করে কুমুদবন্ধু তাঁর পালা 'রিঙ্গনলীলার' মধ্যে মহিলা শিক্ষার পক্ষে জোর সওয়াল শুরু করেন, এইরকম নজিরও আছে।

স্বার্থ যাই থাকুক না কেন, অভীষ্ট যে ভাবে ছকা হোক না কেন, কথকদের সত্তা আছে, শ্রোতাদের বোধ আছে, আছে সামাজিক অভিজ্ঞতা। যোজক ও যোজিতের পারস্পরিক সংঘাতে (দ্বিবিধ অর্থে) রসভোগের ক্ষেত্র তৈরি হয়, সেই ক্ষেত্রে টানাপোড়েন আছে, প্রতিসরণ হয় আখ্যানবিন্যাসে ও ভাববোধে। শাসকশ্রেণীর হাতে কথকদের ক্রীড়নক—তাদের আদর্শ প্রচারের 'মাধ্যম' মাত্র মনে করা, অন্যদিকে 'নিরক্ষর' (দেবীবাবু বার বার কেন জানিনা এই বিশেষণটা গ্রামবাসী ও চাষীদের আগে ব্যবহার করেছেন: যেন অক্ষর জ্ঞানটা বুদ্ধি-বিবেচনা ও যুক্তিবোধের সমার্থক) চাষীদের চৈতন্যকে আঁক টানার স্লেট হিসাবে দেখানোর মধ্যে আদর্শ ও মূল্যবোধ গড়ে ওঠার পথে বৈপরীত্যের নানা মুহূর্তকে অবহেলা করা হয়, যোজনার আদান-প্রদানের প্রক্রিয়াকে বাদ দেওয়া হয়। আসরে পাঠের ও শোনার নানা স্তরে যে ভিন্ন বয়ান তৈরি হতে পারে, মূল্যবোধের রঙে তারতম্য ঘটতে পারে—এইরকম কোন সম্ভাবনা এই জাতীয় আলোচনায় আমল পায় না।

খ. কথক ঠাকুর ও সামূহিক চৈতন্য

এই মূল্যবোধ নির্মাণ-প্রক্রিয়া সমূহের স্থান কোথায়? কী করে বা যোজিতের অবস্থান পরিবর্তন যোজকের ঘটকালি রীতিতে পরিবর্তন আনে, উভয়ের টানাপোড়েন আখ্যানের বিন্যাস, রসভোগকে করে তোলে ভিন্নতর? তুলনা, প্রতি তুলনার মাধ্যমে সমস্যা বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যেতে পারে? সমূহের উপস্থিতি কথকতার আসরের পরিমণ্ডল

কীভাবে নির্ধারিত করে, সেই বিষয়ে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল। তাঁর সাক্ষ্য থেকে বিস্তৃত উদ্ধৃতি দেওয়া আবশ্যক :

"আশী বৎসর পূর্বে মাতাঠাকুরাণী রামায়ণ পাঠ করাইয়াছিলেন। তখন ইস্কুলে পড়ি। **সমুদয় ঘটনা এখনও প্রত্যক্ষ প্রতীয়মান হইতেছে।** তিনি গৃহদেবতা রঘুনাথজীউর সম্মুখে সঙ্কল্প করিলেন, তিনি সমস্ত বৈশাখমাস রামায়ণ পাঠ করাইবেন। আটচালায় বেদী নির্মিত হইল, গ্রামস্থ সকলকে রামায়ণ পাঠ শ্রবণ করিতে আহ্বান করা হইল। মা পাঠক ঠাকুরকে ধুতি, উড়ানী আর কি কি দিয়া বরণ করিলেন। অপরাহ্নে পাঠক বেদীতে বসিয়া রামায়ণের পুথি খুলিলেন। গ্রাম ছোটো, ইতোমধ্যে পঞ্চাশ ষাটজন পুরুষ এবং ত্রিশ চল্লিশ জন নারী যথাস্থানে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। পাঠক রামায়ণ হইতে দুইটি, তিনটি, চারটি শ্লোক পাঠ করিলেন, তারপরে ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। কত প্রকারে তাৎপর্য বুঝাইতে লাগিলেন, কখন তিনি অভিনয় করেন, কখন পুরুষোচিত ভাষা ব্যবহার করেন, কখন নারীসুলভ কণ্ঠে খেদ করেন ইত্যাদি প্রায় দেড় ঘণ্টা এইরূপ চলিতে থাকে। শ্রোতৃবর্গ নিবিষ্ট চিত্তে শুনিতে থাকে। প্রতিদিন যে একই লোক আসিত তাহাও নয়। রাঢ়ের গ্রামে বর্ষীয়সী **বিশেষতঃ গ্রামের ঝিউড়ি,** এ পাড়ায় সে পাড়ায় স্বচ্ছন্দে আসে। শ্রোতাদিগের মধ্যে অনেকেই অত্যল্প লেখাপড়া জানিতেন, তাহাও পাঠশালায় সমাপ্ত। কিন্তু পাঠকের ভাষা সংস্কৃত শব্দ বহুল হইলেও **ভাবার্থ গ্রহণ করিতে পারিতেন।** এইরূপে বৈশাখ মাস অতিবাহিত হইল। সমাপ্তি দিবসে **ব্রত উদযাপিত হইল,** পাঠক দক্ষিণান্ত হইলেন।...পরদিন **ব্রাহ্মণ ভোজন।** মায়ের সঙ্কল্প সিদ্ধ হইল। শ্রোতারা দুই কারণে আসিত —রামায়ণ পাঠ শ্রবণ করিলে **পুণ্য হয়,** তাহারা পুণ্য অর্জন করিতে আসিত। আর দ্বিতীয় কারণ, তাহারা না আসিলে মায়ের সঙ্কল্প ভঙ্গ হইত। তাঁহার **পাপ হইত।** তাঁহারা তাঁকে **পাপের ভাগী করিতে পারিত না।** এই কারণেও তাঁহারা না আসিয়া পারিত না। **তাহাদের আসাতে মা কৃতার্থ বোধ করিতেন।** রামায়ণ শ্রবণ করিলে পুণ্য হয়, **ইহা কি অন্ধ বিশ্বাস?** যিনি একথা বলেন তিনি রামায়ণ পড়েন নাই, **শ্রদ্ধা সহকারে পড়েন নাই।** রামাদির চরিত ধ্যান করেন নাই। আর, তিনি পুণ্য শব্দের অর্থও জানেন না।"[৪]

(নজরটান আমার)

কথকতা ইতিহাসে, সমাজে বিবর্তিত। আসরের উদ্যোক্তা ও শ্রোতারা পাপ ও পুণ্যে বিশ্বাসী। পাপ-পুণ্য একার নয়, তার ছোঁয়াচ সবার লাগে, সবার তাতে অংশ আছে। সঙ্কল্প করেন একজন, ডাকেন একজন কিন্তু আসতে হয় সবাইকে, আসরে হাজির থাকা হল সামাজিক দায়। যোগেশচন্দ্র রায়ের ধমকানিটা তাৎপর্যপূর্ণ। রস উপভোগ-এর শর্ত আছে, শ্রদ্ধা থাকতে হবে, পুণ্যে আস্থা রাখতে হবে। শ্রদ্ধার

আভিধানিক অর্থ তো বিশ্বাস, প্রত্যয়, স্পৃহা, আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি। পুণ্য অর্থ শুভকর্ম, পবিত্র ধর্ম। এই সব গুণের শর্তাধীনে যোজক-যোজিতের মোকাবিলা হয়, তা না হলে রসভোগের সম্ভাবনাই নাকচ হয়ে যায়। "কাশীরাম দাস ভনে, শুনে পুণ্যবান।" শ্রোতারা পুণ্যবান, তাই তো তাঁরা কথা শুনছেন।

যখন সমূহ বদলে যায়, শর্ত পালটে যায়, তখন কথকও বাতিল হয়ে যান। যোগেশ-চন্দ্রের সমসাময়িক কলকাতার এক বাসিন্দা লিখছেন,

> "বৃদ্ধ ও বৃদ্ধারা তাহাদের কথকতা ও পালাগান শুনিতে যাইতেন। অন্যান্য ভদ্রলোকেরা কখনো যাইতেন না। কথাবার্তার প্রচলিত মাত্রাই ছিল—এ যেন 'কথকের কথা', অর্থাৎ বিশ্বাসযোগ্য নয়।"[৫]

প্রতিতুলনা আনা যেতে পারে। 'কথার' একটি রূপ কথকতা। আরো অনেক প্রজাতি আছে—রূপকথা, গীতকথা, কিস্যা, ইত্যাদি, সেইগুলিও বাচ্য। এই বাচনীয় প্রজাতি ছাপার অক্ষরে এল, বঙ্গ শিশুসাহিত্যে শোরগোল পড়ে গেল।

বিংশ শতকের গোড়ায় ডিকটাফোন নিয়ে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার একশ বছরের বৃদ্ধার কাছ থেকে গীতকথা সংগ্রহ করেছেন, যেমন শুনেছেন তেমন লিখেছেন, সেইমতো ছাপিয়েছেন। পরে সমালোচকদের চাপে, "গল্পভুক সামান্য শিক্ষিত পাঠকবর্গের" চাহিদা মেটাতে ঠাকুরদাদার ঝুলির প্রথম সংস্করণ (১৯০৮) পুনর্লিখিত হল, সেই মার্জিত সংস্করণেরই বাজারে কাটতি হল। পুনর্লিখনে মূল গল্প বদলায়নি।[৬] কিন্তু অপ্রচলিত শব্দ পাল্টানো বা ভাষার মার্জিতকরণে দক্ষিণারঞ্জনের কলম সীমাবদ্ধ থাকেনি। কথ্য গল্পের সংহত লেখ্য রূপ দেওয়া হয়েছে, রকমফের ঘটে গেছে গল্প আস্বাদনের তারে।

মনে রাখতে হবে ঠাকুরদাদার ঝুলির গল্প গীতিকথার সংকলন। বিশেষ আয়োজন ও সমাবেশে সমূহের সামনে কথাগুলি বলা হত। আঁতুড়ঘর গল্প বলার অন্যতম জায়গা। আসন্নপ্রসবা জননী যেদিন থেকে আঁতুড়ে যান সেই দিন থেকে গীতকথা-অভিজ্ঞরা প্রতি রাত্রে মজলিশ বসাতেন।

রাত্রি দ্বিপ্রহরে আসর শেষ হত। কথকদের মধ্যে কেউ সম্ভ্রান্ত বিধবা, অনেকে কৃষক। 'রোজের রাত যোগান' তারা কড়ায়-গণ্ডায় বুঝে নিত। ষষ্ঠীর দিন ঘটা বেশি হত, সারারাত ধরে পালা বলা চলত। অন্য গায়ক-গায়িকা "মূল কথকের" সঙ্গে যোগ দিত, কথার সঙ্গে সঙ্গে গান চলত। ছেলে, মেয়ে, বুড়ো, আসরে সবাইয়ের অবাধ প্রবেশাধিকার।[৭]

বৈলক্ষণগুলিও স্পষ্ট। কথকতা মার্গ থেকে জন-অভিমুখী, ব্রাহ্মণের পুঁথি থেকে প্রাকৃতজনের আসরে তার যাত্রা। লোককথার কথ্য রূপকে দক্ষিণারঞ্জন মার্জনা করেছেন, আঁতুড়ঘর থেকে গল্পকে তুলে আনছেন ব্যক্তি পাঠকদের শহুরে বৈঠকখানায় ; কথকতার আখ্যানের যোজনার অভিমুখের বিপরীতে ঠাকুরদাদার ঝুলির গল্পের যাত্রা, কথার রওয়ানি হয়ে ওঠে অন্যরকম।

বর্তমান প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ যথেষ্ট। দীনেশচন্দ্র সেনের সাক্ষ্যানুযায়ী, প্রথম সংস্করণে 'মালঞ্চমালা' গল্পটি শুনে হুবহু লেখা হয়েছিল, তাই ওই গল্পটি থেকে একটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করা হল :

প্রথম পাঠ : ১৯০৮

"কোটালিনী ছিল ঘরে, কোটালিনী আসিয়া কয়,—কি বারোদিনের আয়ু তারি কাছে দিব কন্যা আমার,—যুগ জন্ম হবিষ্য।— মা গেলেও না, ছা গেলেও না! কপাল আমার,—বারোবছরের তিনবছর গেল রোগে, চারবছর গেল শোকে,—আরও যে বচ্ছর আছে তা যদি না যায় ভোগে, তো মেয়ের জন্ম কি? হাঁড়ীর মাছ হাঁড়ীতে জিয়াই, শাখা সিঁদুরের বড়ি খোয়াইতে একবেলা খাই একবেলা না খাই,—এক কোলের কন্যা—তাই দিব শিশুপুত্রের কাছে।—সেও পুত্র বাঁচে কি না বাঁচে?—'কুঁড়ে বাঁধি, কুঁড়েয় থাকি তার তলেও রাজার হাঁচি!' রাজাকে গিয়া কও, কন্যা যে আমি দিব না 'আহা, কিবা আমার পাড়লেন গিয়া ফল, তারি জন্য দেখি আমি কন্যার চক্ষের জল!' কোটালিনী পোঁটলা পুঁটলী বাঁধিয়া কন্যাকে ডাকে,— 'মালঞ্চ লো মালঞ্চ! আয় মা, আমরা এ জনমের মত রাজ্য ছেড়ে যাই।'"[৮]

মার্জিত পাঠ : ১৯০৯

"কোটালিনী বলে,—কুঁড়ে বাঁধি কুঁড়েয় আছি, তার তলেও রাজার হাঁছি।' বারো দিনের আয়ু শিশুর কাছে কন্যা দিব? রাজাকে গিয়া বল কন্যা আমি দিব না।"[৯]

দুইটিতেই কোটালিনীর আপত্তির কথা অক্ষুণ্ণ আছে, বদলে গেছে শুধু ঢঙ; ব্যঞ্জনের তার হয়ে গেছে পানসে। [একান্ত আমার পাঠ, সামূহিক নয়] প্রথম বয়ানে আছে আশা ও আশঙ্কা, বঞ্চনা ও সাধ, রাজার প্রতি ছুঁড়ে দেওয়া ব্যঙ্গ, সংসারে দৈনন্দিন লড়াই, অত্যাচার থেকে মেয়েকে বাঁচাবার জন্য পথে বেরিয়ে পড়বার তাগিদ। রাজার অন্যায় আবদারের বিরুদ্ধে, জোর জবরদস্তির বিরুদ্ধে এইসব অনুভূতির মিশ্রণে গড়ে উঠেছে কোটালিনীর আপত্তি। মার্জিত পাঠে শব্দ বদলায়, গান বাদ দেওয়া হয়, বলার রওয়ানিকে সংক্ষিপ্ত করা হয় সরাসরি নেতিবাচক বাক্যে; লৌকিক স্বাদের আভাস দেবার জন্য বজায় রাখা হয় একটা প্রবাদ। ফলে কোটালিনীর আপত্তি একমাত্রিক ঘোষণার মতো শোনায়। বাগর্থ যে সম্পৃক্ত, আলাদা করা মুশকিল।

নতুন গড়ে ওঠা 'শিশু সাহিত্যের' অন্যতম রূপকার দক্ষিণারঞ্জন। জোর তর্ক চলছে, কোনটা পাঠ্য কোনটা অপাঠ্য, কোনটা বোধগম্য, কোনটা বা দুর্বোধ্য। এই গোষ্ঠীতে দক্ষিণারঞ্জনও আছেন, লিখছেন দেশগঠনের বই, চারু ও হারু, লাষ্টবয়, ফার্স্টবয়।

তার চেয়ে বড় কথা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ উদ্যোগ নিয়েছে, খাঁটি দেশজ বস্তুর উদ্ধার করতে হবে, স্বদেশী ব্রতে নিজস্ব সম্পদের অনুসন্ধানে লিপ্ত হতে হবে, 'ভারতীয়

প্রাণধারা', 'বাঙালীর জাতীয় চিত্তরসের' সঙ্গে শিক্ষিতের পরিচয় করানো কর্তব্য। এই প্রকল্পের তিনি পুরোপুরি শরিক, এই কথা দক্ষিণারঞ্জন ভূমিকায় বার বার স্বীকার করেছেন। 'আমার দেশ', 'বাঙ্গালীর আপন প্রাণ', **'বাঙ্গলা ভাষার প্রকৃত আকৃতি'** (নজরটান মিত্র মহাশয়ের) সব কিছু ঠাকুরদাদার ঝুলিতে পাওয়া যাবে, এই বিশ্বাসে তিনি কাহিনী সংগ্রহ করে প্রকাশ করেছেন।

এর অর্থ এই নয় যে দাবিগুলি যথার্থ নয়, মিত্র মহাশয়ের বানানো। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে 'কথার' বৈশিষ্ট চিহ্নিত করা হচ্ছে নতুনভাবে। বোধের এই রূপান্তর স্মর্তব্য। সমালোচনা দরকার। 'পাশ্চাত্য শিক্ষা', 'পাশ্চাত্য আদর্শ' ও 'উপন্যাস' জাঁকিয়ে বসেছে, তার তুলনীয় কিছু 'আমার দেশ' দিয়েছিল, যেমন 'শিশুসাহিত্য (রূপকথা)' মেয়েলি সাহিত্য (ব্রতকথা) ইত্যাদি। জিনিস খাঁটি হওয়া চাই, মেকি হলে চলবে না। জড়িত আছে 'জাতির বেদনা উল্লাসের মর্ম্মর্যাদা', 'দেশে ও বিশ্বে' প্রতিষ্ঠা কামনা, প্রমাণ করার উদগ্র ইচ্ছা "ভারতেরই মধুচক্রের মোম, অপর দেশ হইতে ক্যান্ডেলরূপে আসিয়া, আলো জ্বালাইতেছিল।" ফলে জিনিস আমাদের, কিন্তু প্রতি পদক্ষেপে তুলনা দিতে হবে বিদেশের, তা না হলে স্বদেশ প্রতিষ্ঠিত হবে কী করে ?[১০]

এই আদিকল্প যে রাজনৈতিক ও সামাজিক বাতাবরণে গড়ে উঠেছে, তা সুপরিচিত। ফলে যোজনার ক্ষেত্রে প্রতিসরণ ঘটেছে। সমসাময়িক অনেকের মতো দক্ষিণাবাবুও মনে করছেন খাঁটি আছে পল্লীতে, বঙ্গজননী হচ্ছেন পল্লী নিবাসী। পল্লী ও শহরের ব্যবধান-এর ধারণা প্রধান হয়ে উঠছে। পল্লী 'খাঁটি স্বদেশী' শহর মেকি বিদেশী। পল্লীর আঁতুড়ঘর গল্পের উৎস, ভূমিকার ৩নং পাদটীকায় আঁতুড়ঘরকে জায়গাও দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু উদ্দিষ্ট হচ্ছেন শহরের আধুনিক পাঠকরা। দক্ষিণাবাবুও 'ঘটকালি' করছেন, শহুরে পাঠকদের পড়াচ্ছেন 'পল্লীর শ্রুতিসাহিত্য।' রবীন্দ্রনাথ প্রস্তাব দিচ্ছেন যে "আধুনিক দিদিমাদের জন্য অবিলম্বে স্কুল খোলা হউক"। সেইখানে দক্ষিণাবাবুর বই হবে পাঠ্য।[১১]

কথকের উদ্দেশ্য একেবারে আলাদা। শহর বা পল্লীর দ্বৈধতা তাঁর পালার কেন্দ্রীয় ভাব নয়, মথুরা ও বৃন্দাবন, রাখাল রাজা ও দ্বারকার রাজা এক লীলাময়ের প্রকার মাত্র। আসরে শ্রোতার পরিচয় বাঙালি নয়, ভক্ত ; বিপরীতাচারীরা হল পাষণ্ড। আজও পাঠের শেষে দ্বিজবাবু ভক্তমণ্ডলীর নামে জোকার দেন, পাঠের প্রারম্ভে বাসন্তী দেবী উপস্থিত ও অনুপস্থিত, গত ও বর্তমান ভক্তবৃন্দের চরণে কোটি কোটি প্রণাম জানান। গোস্বামী কবিরাজের অনুসরণে সপ্তদশ শতকে যদুনন্দন তো বলে দিয়েছেন পাঠের সার্থকতা, পাঠকের কামনার কথা :

> "মোর মুখ মরুস্থল, বাণীখিন্নরূপচর গোকুলা উন্মুখা বাক্যগণ।
> বৈষ্ণবের কর্ণ নদী, প্রবেশ করয়ে যদি, পুষ্ট স্নিগ্ধ হইবে তখন।।"[১২]

বাচ্য থেকে পঠনীয়, কথ্য থেকে লেখ্য, শ্রুতি থেকে মুদ্রণ। তাই **যোজিতের পড়ার** সুবিধের জন্য সংস্করণকে মার্জিত করা হল। পল্লী **"গীতকথা"** হয়ে যাচ্ছে, তাকে

হতে হচ্ছে **'বঙেগাপন্যাস'**। আধুনিক শিশু সাহিত্যের তালিকায় সেইটা অবশ্য পাঠ্য, ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত হল 'বঙেগাপন্যাস'-এর ষোড়শ সংস্করণ। আর কথকতার আখ্যান খুঁজে পাওয়া যাবে শুধু পুঁথিতে। ওই গুলির অমার্জিত পাঠ তো এককের নয়, পাপ পুণ্যে বিশ্বাসী ভক্তসমূহের, যে সমূহ আজ 'জাতিতে' পর্যবসিত, যার সত্তা আজ 'এককে' বিভক্ত, স্বগত পাঠে যে অভ্যস্ত। ☐

...

আসরে ঝাঁপ পড়ে গেছে, ধীরে ধীরে পুঁথি পাতড়া গুটিয়ে ফেলছেন, লাল বনাত গায়ে চাঁই বুড়ো, উঠে যাবার সময় হল তাঁর, কোনোদিন আর ডাক আসবে কিনা, কে জানে। সেই কবে খবর পেয়েছি কাশীতে মারা গেছেন হরু ঠাকুর, নিশ্চিন্দিপুরের হরিহর রায়। আর কে পালা বাঁধবে তাঁর মতো? মনটা কি একটু আনচান করে? জানি 'দুর্ভাবনাময় জটিল সাম্প্রতিকের'[১৩] মুখোমুখি আমরা, লোকে ধমক দেবে। এইসব ক্ষেত্রে বিষণ্ণতাকে প্রশ্রয় দেওয়া কাজের কথা নয়, সেইটা রোমান্টিকতা, অলস 'নস্টালজিয়া'। ইতিহাসের আধুনিকতার, অনিবার্যতার বিরোধিতা। যা অবস্থা আজ-কাল, এই অতীতবিলাস বিপদজনকও হতে পারে, ব্রাহ্মণ্যবাদকে প্রশ্রয় দেবে, হয়তো বা দুর্বল করে তুলবে ধর্মনিরপেক্ষতার লড়াইকে। কিন্তু এও তো মনে হয় যে সমূহের রসভুক্তির ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাকে যথাযথ সামাজিক ও নান্দনিক মর্যাদা না দেওয়াটা কৃতঘ্নতা। আরো শুনেছি যে অপু আজও স্বপ্ন দেখে, এই দরিদ্র, নিষ্পেষিত দেশে, নিষ্ক্রিয় সময়ে প্রতিদিন তার কানে ভেসে আসে তার বাবার, কথক হরিহরের, আশীর্ব্বচনের রেশ ;

> "কালে বর্ষতু পর্জ্জন্যং পৃথিবী শস্যশালিনী...'
> লোকাঃ সন্তু নিরাময়া ঃ..."

কৃতজ্ঞতা স্বীকার—জীবিত কথক ও কথকীদের কাছে আমার ঋণ অপরিসীম। তাঁদের সাহায্য ও আসর ছাড়া এই রচনা কোনোদিন সম্ভব হত না। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য তাঁদের কাছে মার্জনা ভিক্ষা করছি।

বরাহনগর শ্রীপাঠবাড়ির গ্রন্থাগারিকের অকুণ্ঠ সাহায্যকে শ্রদ্ধার সঙেগ স্মরণ করি।

দেবাশিস বসু ও মৃদুলকান্তি বসু নিঃস্বার্থভাবে নানা সূত্রের হদিস দিয়েছেন। বাবু ইন্দ্রনাথ মজুমদার এবং বন্ধু অরুণ নাগ ও বন্ধুপত্নী মধুশ্রী নাগের সহযোগিতা ও উৎসাহ অনেক সময় গবেষণাকে সুগম করেছে। নানাভাবে সাহায্য করেছেন অদিতিনাথ সরকার, অমর সু, নীলমণি মুখোপাধ্যায়, অরুণ দাশগুপ্ত, শুভেন্দু দাশগুপ্ত, সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রদ্ধেয় বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য, ছাত্র প্রদীপ্ত রায় এবং অগ্রজপ্রতিম সম্পাদক অনিল আচার্য।

জাতীয় গ্রন্থাগার, সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগারের কর্মচারীদের ও বেহালা হরিসভার কর্তৃপক্ষের সহযোগিতার কথাতো বলাই বাহুল্য।

সবার শেষে ধন্যবাদার্হ বন্ধুবর রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায় ও যোগসূত্রের তরুণ উদ্যোক্তারা।

টীকা ও সূত্র নির্দেশ

সংকেত সূচী :—বিশ্ব— পুঁথিশালা, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।
ক. বি.— পুঁথি সংগ্রহ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
পাঠবাড়ি— শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দির, পাঠবাড়ি, বরাহনগর।
এশিয়া— পুঁথি সংগ্রহ, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল কলিকাতা।

তালিকার ক্রমিক সংখ্যা ও ফোলিও সংখ্যা দ্বারা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

□ পর্ব / ১ □

১। রামগতি ন্যায়রত্ন, বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, হুগলী বুধোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত, ১৮৭২-১৮৭৩, ১৩৪ ও ৮১।

২। গঙ্গাচরণ সরকার, বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা, ঢাকা কলেজ ভবনে পঠিত, ১২৮৬ আষাঢ় মাস, চুঁচুড়া সাধারণী যন্ত্র, ১৮৮০, ২৬।

৩। MAHAMAHOPADHYAY Hara Prasad Sastri Ed. & Revised by Jogendra Nath Gupta, *A Descriptive Catalogue of the Vernacular Manuscripts in the Collections of the Royal Asiatic Society of Bengal*, Vol IX Bengali Manuscripts, Calcutta, 1949, 48।

৪। ঐ, 60,268,182।

৫। গঙ্গাচরণ সরকার, প্রাগুক্ত।

৬। রাধাগোবিন্দ নাথ সম্পাদিত, শ্রীচৈতন্য ভাগবত, মধ্য, ১ম, কলিকাতা, ১৯৮১, ১ম অধ্যায়, ৫২-৫৪।

৭। ঐ, মধ্য, ২য়, ২১শ অধ্যায়, ১৮১-১৮৪।

৮। ঐ, অন্ত্য, ৫ম অধ্যায়, ১৯৮।

৯। হরিদাস দাস সম্পাদিত, গুণলেশসূচকম, শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য গ্রন্থমালা, হরিবোল-কুটির, নবদ্বীপ, প্রকাশন তারিখ অনুল্লেখিত, ৬৭ নং শ্লোক। Rama Kanta Chakraborty, *Vaisnavism in Bengal*, Cal, 1984, 214.

১০। গুণলেশসূচকম, ঐ, ৮৭-৮৮ নং শ্লোক। শ্রীল নরহরি চক্রবর্তী ঠাকুর বিরচিত, শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর, গৌড়ীয় মিশন সংস্করণ, বাগবাজার, ১৯৮৭, সপ্তম তরঙ্গ, ৩৪৪-৩৪৫।

১১। শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর, ঐ, নবম তরঙ্গ, ৩৯৮-৪০০।

১২। William Ward, *View of the History, Literature, Religion of*

the Hindus including a minute description of their manners & customs and Translations from their principal works, 2nd ed. Vol 1, Section IV, 70, Serampore, 1815.

১৩। ঐ, Vol II, 220.

১৪। কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীসদগুরু সঙ্গ, ২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৭৮, ১৫৪।

১৫। শান্তিকুমার দাশগুপ্ত সম্পাদিত, আমার জীবন, প্রথম খণ্ড, নবীনচন্দ্র রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৮১, ১৭৮।

১৬। ঐ, ১৭৭।

১৭। "সমাজচিত্র (পূর্ব ও বর্তমান) অথবা কেঁড়েলের জীবন", সুনীল দাস সম্পাদিত মনোমোহন বসুর অপ্রকাশিত ডায়েরী, কলিকাতা, ১৯৮১, ১০৩। উদ্ধৃতিতে নজরটান বাদ পড়েছে। শেষ বাক্যটি লক্ষ করুন।

১৮। বিনয়চন্দ্র মিত্র, রাজারামপুর শ্রীকৃষ্ণপুর মিত্রবংশ, বর্ধমান, বর্ধমান সাহিত্য সভা, ১৯৪২, ১১৬-১১৭, ১৬৩।

১৯। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, আমার কালের কথা, কলিকাতা, ১৩৫৮, ৯৩-৯৪, ৯৯, ১০৫, ১০৭।

২০। অতুলকৃষ্ণ দত্ত চৌধুরী, আমার গ্রামের কথা, কলিকাতা, ১৯৪৪, ৩৮।

২১। *Reports on Publications issued and Registered in the several Provinces of British India during the year 1878*, Cal, 1879, *Selections from the Records of the Govt. of India, Home* Revenue and Agricultural Dept.

২২। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, ৩৭।

২৩। রাসসুন্দরী দেবী, 'আমার জীবন', আত্মকথা, নরেশচন্দ্র জানা প্রমুখ সম্পাদিত, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৮১, ৩৭।

২৪। কুন্তক, বক্রোক্তিজীবিত, প্রথমোন্মেষ, ১৭ নং কারিকা। রবিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ও অনূদিত, কলিকাতা, ১৩৯৩, ৭০-৭৩, ১৭।
S. K. De. ed. The Vakrokti-Jivitam, Calcutta, 1961, 17.

২৫। ভর্তৃহরি, বাক্যপদীয় : ব্রহ্মকান্ড, ১ম খণ্ড, বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯৮৫, ৮১নং কারিকা। ১৯৩-১৯৬।

২৬। প্রাসঙ্গিক আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, S. K. De, *History of Sanskrit Poetics*, Calcutta, 1976, 142-144

২৭। ধ্বন্যালোক ও লোচন, সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও কালীপদ ভট্টাচার্য অনূদিত ও সম্পাদিত, প্রথম উদ্দোত, কলিকাতা, ১৯৮৬, ৪৪-৪৫।

২৮। তৃতীয় উদ্দোত, ৩ ও ৪ নং কারিকা ও লোচন টীকা, ১২৭-১২৮।

২৯। ঐ। ছাপায় ভুল আছে। হবে : শ্রোত্রৈক গ্রাহ্যোঽপি

৩০। কুন্তক, প্রাগুক্ত।

৩১। পশ্চিমযাত্রীর ডায়েরী, রবীন্দ্র রচনাবলী, বিশ্বভারতী সংস্করণ, উনবিংশ খণ্ড, ৪১৪-৪১৫।

৩২। রাসসুন্দরী দেবী, আমার জীবন, প্রাগুক্ত, ২৯-৩১, ৩৬-৩৭।

৩৩। 'জীবনস্মৃতি', রবীন্দ্ররচনাবলী, সপ্তদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী সংস্করণ, ৩০৮। শিলাইদহে ১৮৯০ সালে প্রমথ চৌধুরিকে লেখা চিঠি, চিঠিপত্র, পঞ্চম সংকলন, ১৩৯, বিশ্বভারতী, ১৩৫২। শান্তিনিকেতনে কথক হিসাবে রবীন্দ্রনাথ নিজে ১৬ দিন ধরে মহাভারতের আখ্যান বলেন। খুব জমাটি আসর হয়েছিল। Manoranjan Bandyopadhyay Santiniketan Reminiscence, চিঠিপত্র, ত্রয়োদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৯৯২, ১৯৭।

৩৪। মনোমোহন বসুর অপ্রকাশিত ডায়েরী, প্রাগুক্ত, ১০১-১০২

৩৫। বুদ্ধদেব বসু, মহাভারতের কথা, কলিকাতা, ১৩৯২, ১১৪।
বৃহদ্ধর্মপুরাণ পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, নবভারত সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩৯৬, পূর্বখণ্ড, অধ্যায় ২৭-২৯, ১০৯-১১৬। ১ অধ্যায়, ১-২, ১৩ অধ্যায়, ৫৬, পুরাণটি পশ্চিমবঙ্গে ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে লেখা হয়। বিস্তৃত আলোচনা, R. C. Hazra, *Studies in the Upapuranas*, Vol. II Cal, 1963, 396-466. প্রত্যেক পুরাণেই বক্তার পরম্পরা নির্দিষ্ট উক্ত আছে, তার দ্বারা পুরাণের মাহাত্ম্য ও প্রামাণিকতা নির্ধারিত হয়। পুরাণের কাঠামো প্রসঙ্গে সাধারণ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, Mahamahopadhyay Hara Prasad Sastri. *A Descriptive Catalogue of Sanskrit manuscripts in the Collections of the Asiatic of Society Bengal*, Vol V, Purana Manuscripts, Preface, LXXIII—CCXXV. গিরীন্দ্র শেখর বসু, পুরাণ প্রবেশ, কলিকাতা, ১৩৪১। G. Bonazzoli, 'Puranic Parampara', Purana, Vol 22, 1980, No 1

৩৬। তথ্যাদি সংগৃহীত হয়েছে, G. Bonazzoli, 'Composition, Transmission and Recitation of the Purans' (A few remarks), *Purana*. Vol. XXV, No 2, July, 1983

৩৭। বৃহদ্ধর্ম পুরাণ, প্রাগুক্ত, পূর্বখণ্ড ২৯শ অধ্যায়, ১১৬।

৩৮। 'পারায়ণ' বিশ্বকোষ, নগেন্দ্র নাথ বসু সম্পাদিত ১১শ খণ্ড ১৮৮৬-১৯১১, পুনর্মুদ্রণ, নিউ দিল্লী, ১৯৮৮।
বাঁকুড়া থেকে প্রাপ্ত একটি রামায়ণী পুঁথিতে পাঠক ও কথকের পার্থক্য স্পষ্ট বলা হয়েছে।
"পাঠক পোঁথা পড়ে কথক বাখানে।" দ্রষ্টব্য অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত, বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ, [পরিষৎ পুঁথিশালায় সংগৃহীত], তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, কলিকাতা, ১৩৩৩, ৩৭।

৩৯। রামগতি ন্যায়রত্ন, প্রাগুক্ত, ৮২-৮৩।
৪০। পদ্মপুরাণ পাতাল খণ্ড, পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত বঙ্গবাসী, কলিকাতা, ১৩১৮, ৬৯ অধ্যায়—৭০ অধ্যায়। ৬২৪-৬২৫, ৬৩৪-৬৩৫, ৬৩৮-৬৩৯ Bonazzoli (1983), প্রাগুক্ত, 274-276।
৪১। রামকমল বিদ্যালঙ্কার, সচিত্র প্রকৃতিবাদ অভিধান, কলিকাতা, ১৯১১, ৯৮২।
৪২। ভূমিকা, পদ্মপুরাণম স্বর্গখণ্ডম, পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, নবভারত সংস্করণ, বৈশাখ, ১৩৯৬।
৪৩। কুন্তক, প্রাগুক্ত, কারিকা ৫, ৩০-৩৩।
৪৪। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মারুতির পুঁথি, কলিকাতা, ১৩৮৮, ৪৮।

□ পর্ব / ২ □

১। দীনবন্ধু মিত্র, রচনা সংগ্রহ, সাক্ষরতা প্রকাশন, কলিকাতা ১৯৭৩, ৪৮৪, ৪৯০
২। 'ব্রজবিলাস', দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন, বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ, সাক্ষরতা প্রকাশন, দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৭২, ৪৫৪-৪৫৫।
৩। রাধাগোবিন্দ বসাক সম্পাদিত ও অনূদিত, কৌটিল্যীয় অর্থশাস্ত্র, ২/২৭, কলিকাতা ১৯৬৪, ১ম খণ্ড, ১৯০-১৯১। প্রাচীনকালে কথকদের প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য, সুকুমার সেনের নিবন্ধ, 'কথকতা', ভারতকোষ, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৫০-১৫১।
৪। 'কথকতা', বিশ্বকোষ, তৃতীয় ভাগ, নগেন্দ্রনাথ বসু, ১৮৮৬, ১৯১ পুনর্মুদ্রণ, দিল্লী, ১৯৮৮।
৫। W. Ward প্রাগুক্ত, 2nd Ed. Vol. II, ২৪৪-২৯০।
৬। হরিপদ চক্রবর্তী, 'কথকতার পুঁথি', সুবর্ণলেখা, আশুতোষ ভট্টাচার্য ও অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৪, ৫৮০-৫৯২।
৭। ভোলানাথ চক্রবর্তী, সেই একদিন আর এই একদিন, অর্থাৎ বঙ্গের পূর্ব্বও বর্ত্তমান অবস্থা, সুরাপান নিবারণীসভায় বক্তৃতা, ৯ই শ্রাবণ, আদি ব্রাহ্ম-সমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত, ১৮৭৫ সন, ১৩-১৪। রাজ নারায়ণ বসু দ্বারা অভিব্যক্ত, বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা, সারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত, শোভাবাজার গ্রে ষ্ট্রীট, ১৮০০ শকাব্দ (১৮৭৮) ৬২-৬৪। কথক ঠাকুরের নাম পুস্তিকাটিতে ভ্রমবশত লেখা হয়েছে গঙ্গাধর শিরোমণি।
৮। দুর্গাদাস লাহিড়ী, বাঙ্গালীর গান, কলিকাতা, ১৩১২, ২৭৭-২৭৯।
৯। বিপিনবিহারি চক্রবর্তী প্রণীত, খাঁটুরা ইতিহাস ও কুশদীপের কাহিনী, কলিকাতা, ১৩০৮, দুর্গাচরণ রক্ষিতের যত্নে সংগৃহীত, অনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশিত, ১৬৪-২০৭।

১০। 'বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটালপাড়ায়', হরপ্রসাদ রচনা সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, সত্যজিৎ চৌধুরী ও অন্যান্য সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯৮১, ১৫।

১১। হরিহর শেঠ, 'চন্দননগরের কথক, কবিওয়ালা ও যাত্রা', প্রবাসী, মাঘ, ১৩৩১, ২৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা, ৫০৬-৫০৭।

১২। শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার, জীবনীকোষ, ভারতীয়, ঐতিহাসিক, ২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৪৫, ৫১, ১৫১-১৫২। কিশোরীভজন সম্প্রদায়ের জন্য দ্রষ্টব্য, অক্ষয়কুমার দত্ত, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, বিনয় ঘোষ সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৩৭৬, ৩২৪-৩২৬।

১২ক। 'আমাদের গৃহে অন্তঃপুর শিক্ষা ও সংস্কার', প্রদীপ, ভাদ্র, ১৩০৫, উদ্ধৃত সাহিত্য সাধক চরিতমালা, ২য় খণ্ড, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬।

১২খ। বিপিনচন্দ্র পাল, সত্তর বৎসর। আত্মজীবনী, কলিকাতা ১৩৬২, ৩২-৩৩। গোপালচন্দ্র রায়, জীবনস্মৃতি, ১৯৯২, ৬। রামধনের কন্যা বিদুষী ছিলেন, পুঁথিও লিখতেন। কিন্তু কথকতা করতেন তার কোনো প্রমাণ নেই।

১৩। Dinesh Chandra Sen, *History of Bengali Language & Literature*, Calcutta, 1911, 590

১৪। ঈশানচন্দ্র বসু সম্পাদিত, গোবিন্দমঙ্গল, দুঃখী শ্যামদাস বিরচিত দ্বিতীয় সংস্করণ, বঙ্গবাসী, কলিকাতা, ১৩১৭। কালিদাস রায়, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য, ১ম খণ্ড, নিউ প্রেস, তারিখ অনুল্লেখিত, ৩১৩-৩১৪, ৩৩১। অধিকারী বংশ মেদিনীপুরে আজও কথকতা করেন। তমলুকের অনাথবন্ধু দাস অধিকারী নামজাদা কথক। শ্রীমতী বিদ্যুৎলতা সামন্তের নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। আমরা এই কথক-কথকীদের সঙ্গে এখনো যোগাযোগ করতে পারিনি।

১৫। অবনী অধিকারীর সহিত সাক্ষাৎকার, রতনপল্লী, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৩।

১৬। বসন্তকুমার পাল, স্মৃতির অর্ঘ্য, শিবপুর, ১৩৪৬, ২৩৫-২৩৬।

১৬ক। সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা, সম্পাদনা অরুণ নাগ, কলিকাতা ১৩৯৮, ৮১।

১৭। উনিশ শতকের শেষ প্রান্তে ও বিংশ শতকের গোড়ায় বৈষ্ণবসমাজে প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর দোর্দণ্ডপ্রতাপ ও ভূমিকার কথা আজও অনালোচিত। অতুলকৃষ্ণের জবানির উপরে ভিত্তি করে প্রাণকিশোর রচিত অতুলকৃষ্ণের জীবনী একটি প্রাসঙ্গিক উৎস। হরিসভা আন্দোলনের ইতিহাসও অনালোচিত রয়েছে। উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমের জন্য দ্রষ্টব্য, প্রভুপাদ শ্রীপ্রাণকিশোর গোস্বামী, 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী' (১৩৩৭ সন, পৌষ, ঢাকায় প্রদত্ত ভাষণ) আদর জানাই, সম্পাদনা, ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা, প্রকাশন তারিখ অনুল্লেখিত, ১২৫-১৩৪। বিমানবিহারী মজুমদারের ভূমিকার জন্য দ্রষ্টব্য, 'শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান', কলিকাতা ১৯৫৯, ৫৩৮।

১৮। দীনেশ চন্দ্র সেন, 'বাঙালার বিলুপ্ত সম্পদ কথকতা', প্রবর্তক, ২২ বর্ষ, ১ম খণ্ড ৪র্থ সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৪৪।

১৯। প্রভুপাদ প্রাণকিশোরের জীবনী ও কার্যাবলীর জন্য দ্রষ্টব্য, আদর জানাই, প্রাগুক্ত ; গুরুরাজকিশোর গোস্বামী সম্পাদিত আচার্য প্রভু প্রাণকিশোর, কলিকাতা, ১৩৮৮।

২০। প্রাণকিশোর গোস্বামী, প্রভু অতুলকৃষ্ণ, কলিকাতা, ১৩৫৮, ৪৬-৪৭। পাঠক ও ব্যাখ্যাকার অতুলকৃষ্ণ সম্পর্কিত তথ্যাদি এই পুস্তক থেকে সংগৃহীত।

২১। ঐ, ১০৮-১০৯

২২। প্রাণকিশোর গোস্বামী, কথকতার কথা, কলিকাতা, ১৩৭৫, ১৩৪।

২৩। অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা গদ্যে শ্রীযুক্ত প্রাণকিশোর গোস্বামী, আদর জানাই, প্রাগুক্ত, ২৪৯-২৫২।

২৪। দ্বাদশ ভাষণ, সঙ্কলয়িতা, ড. বাসন্তী চৌধুরী ও কথাসেবিকা, কোন্নগর, ১৩৯০, ১০০।

২৫। বিপিনবিহারি চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, ১৭০-১৭২।

□ পর্ব / ৩ □

১। সুধীররঞ্জন দাস, যা দেখেছি, যা পেয়েছি, কলিকাতা, ১৯৬৯, ১২৩। নির্মল কুমার রায়, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ তীর্থপরিক্রমা, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৮৫, ১৭০। কথক ঠাকুরদার উল্লেখ আছে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, চতুর্থ ভাগ, কথামৃত ভবন, ১৩৭৭, দ্বাদশ খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে, ৮২।

২। দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, স্মৃতিরেখা, ১৩৪০, ৩০-৩২, ৫১।

২ক। দীনেশচন্দ্র সেন, বৃহৎ বঙ্গ, ১ম খণ্ড, ১৯৩৫, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৯৩, ৩৮৬।

৩। রাজ্যেশ্বর মিত্র, 'নিধুবাবুর গানের উৎস', প্রসঙ্গ বাংলা গান, কলিকাতা, ১৯৮৯, ২৩।

৪। 'বঙ্গের শ্রেষ্ঠ পুরাণবক্তা (কথক) মদীয় ৺পিতৃদেব কৃষ্ণমোহন শিরোমণির কথা', (১) বামাবোধিনী পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭, জুন ১৯১০, ৪৫। প্রবন্ধটি অসমাপ্ত। বৈবাহিক সূত্রে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের আত্মীয় ছিলেন কৃষ্ণমোহন শিরোমণি। এঁর কথাই ঠাট্টা করে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর লিখেছেন। তারাকুমার কবিরত্ন হয়ত প্রবন্ধটির লেখক। প্রবন্ধটির হদিস দিয়েছেন মৃদুলকান্তি বসু।

৫। পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত, চিঠিপত্রে সমাজচিত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৫৩, নং ১৪৩, ৯৯।

৬। বিপিনবিহারি চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, ১৬৬

৭। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, আমার কালের কথা, কলিকাতা, ১৩৫৮, ১০।

৮। দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের ভূমিকাসহ, নিত্যগোপাল গোস্বামী সঙ্কলিত, কৃষ্ণকমল গীতিকাব্য, কলিকাতা, ১৩১৭। তথ্যগুলি পুত্র রচিত কৃষ্ণকমলের জীবনী থেকে আহৃত হয়েছে।
৯। ডা. গৌরমোহন দাস দে, পিছনে তাকাই, কলিকাতা, ১৯৯১, ৪২।
১০। গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, অপুর পাঁচালী, ১৩৮১, ৪৭।
১১। বিভিন্ন সময়ের কার্যবিবরণী ও সাম্বৎসরিক প্রতিবেদন, হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা, বেহালা। এই সূত্র ব্যবহারের জন্য শ্রী সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও হরিসভার কর্তৃপক্ষের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।
১২। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 'শ্রীধর কথক', উজ্জীবন, আশ্বিন, ১৩৭৯, ১৯শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ৩০২। এই প্রবন্ধটির হদিস দেবার জন্য দেবাশিস বসুর কাছে আমি ঋণী।
১৩। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, 'গল্প', কি লিখি ?-তে সঙ্কলিত, কলিকাতা, ১৩৬৩, ১২৯।
১৪। চিঠিপত্রে সমাজচিত্র, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, ১২৯ নং, ৮৯।
১৪ক। James Long, *Returns Relating to Publication in the Bengali Language* in 1859, Selections from the Records of Bengal. Govt., No XXXII, Calcutta, para 17.
১৫। 'অপ্রকাশিত আত্মচরিত,' দিনযাত্রা, আনন্দবাজার, 6 March, 1983।
১৬। পাঁচুগোপাল ভট্টাচার্য, শ্রীমদ্ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ স্মরণে, কলিকাতা, ১৩৮৩, ৩৬-৩৭।
১৭। শ্রীপ্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, আমার দেখা কলকাতা, কলিকাতা, ১৩৮৭, ১৩৫-১৩৬।
১৮। দীনেন্দ্রকুমার রায়, সেকালের স্মৃতি, আনন্দ সংস্করণ, ১৩৯৫, ৪০।
১৯। প্রাণকিশোর গোস্বামী, কথকতার কথা, প্রাগুক্ত, ৩৩-৩৪।
২০। রাজকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, সোনামুখী, ১৩ই জুন, ১৯৯৩।
২১। Y. B. Damle, 'Harikatha—A study in Communication', *Bulletin of Deccan College Research Institute*, S. K. De Felicitation Volume. Ed. by N. G. Kalelkar, 1960, 63-107. Philip Lutgendorf, 'Rama's Story in Shiva's City : Public arenas and Private Patronage', in Sandra Freitag ed. *Benaras : Power, Community and Culture*. O. U. P., 1991, বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য 34-60, 39-41, 56-61.
২২। Lutgendorf, ঐ, 40-41.
২৩। সেকালের স্মৃতি, প্রাগুক্ত, ৪৩।

২৪। 'আমার জীবন' নবীনচন্দ্র রচনাবলী, শান্তিকুমার দাস সম্পাদিত প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৮১, ১৬৪।

২৫। শ্রীরামগতি ন্যায়রত্ন, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, হুগলী বুধোদয় যন্ত্রে কাশীনাথ ভট্টাচার্য দ্বারা মুদ্রিত, ১৮৭২-১৮৭৩, ১৩৫।

২৬। সত্তর বৎসর, প্রাগুক্ত, ১১৬।

২৭। কৃষ্ণকুমার মিত্র, আত্মচরিত, কলিকাতা, ১৩৮০, ৪১-৪২।

২৮। ন্যায় দর্শনে 'কারণতত্ত্ব'তে কার্যকারণের ভিন্ন ভিন্ন সম্পর্কানুযায়ী কারণের প্রকার ভেদ আছে, তাদের পারিভাষিক শব্দ ও প্রয়োগ নির্দিষ্ট। "তর্ক সংগ্রহ" নামক প্রচলিত পাঠ্য বইতে অন্নং ভট্ট অসাধারণ কারণকে 'করণ' বলেছেন। অসাধারণ=ফলাযোগব্যবচ্ছিন্ন। অর্থাৎ ফলের সঙ্গে যার অযোগ ব্যবচ্ছেদ= যেটা থাকলে ফল অবশ্য উৎপন্ন হয় সেটাই 'করণ'। নব্য ন্যায় দর্শনে ব্যাপারবদ্ কারণই করণ।

'তজ্জন্যত্বে সতি তজ্জন্যজনকঃ' যা তজ্জন্য, (তা থেকে উৎপন্ন) অথচ তজ্জনিত অর্থাৎ কার্যের জনক। করণ যার মাধ্যমে কার্যের জনক হয় তাকে ব্যাপার বলে। যেমন—ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ ইন্দ্রিয়জন্য এবং ইন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষের জনক হওয়ায় ইন্দ্রিয়রূপ করণের ব্যাপার। ভারতীয় দর্শনকোষ, প্রথম খণ্ড, শ্রীমোহন ভট্টাচার্য ও দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯৭৮, ১৫০।

কারণতত্ত্বের প্রাখর্যবৃদ্ধিতে জয়ন্তভট্টের দান অভিনব। উদাহরণ ও যুক্তির সাহায্যে কোনো কারণকে তিনি নাকচ করেননি, সব কারণের সমষ্টি অর্থাৎ সামগ্রীকে 'করণ' বলেছেন। কীভাবে 'কারণ সামগ্রী' সংসাধিত হয় ও 'করণ'ত্বের বিধান হয়, এই ধারণা পাশ্চাত্য দর্শনসিদ্ধ কার্যকারণ সম্বন্ধের আলোচনাকে অন্যদিকে মোড় দিতে পারে। দ্রষ্টব্য: জয়ন্ত ভট্ট কৃত ন্যায়মঞ্জরী প্রথম আদেশঃ, প্রথম খণ্ড, পঞ্চানন তর্কবাগীশ অনূদিত ও সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯৩৯, ১০৪-১০৬, ১২২-১২৩।

☐ পর্ব / ৪ ☐

১। দীনেন্দ্রকুমার রায়, সেকালের স্মৃতি, প্রাগুক্ত, ৪২।

২। কথকতার কথা, প্রাগুক্ত, ৯-১০, ১২।

৩। 'বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটাল পাড়ায়' হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, ১৪।

৪। দীনেন্দ্রকুমার রায়, প্রাগুক্ত।

৫। কথক ও শ্রোতার শাস্ত্রীয় লক্ষণ ও গুণের বিবৃতির জন্য দ্রষ্টব্য শ্রীশ্রী জিতেন্দ্রনাথ গোস্বামী সম্পাদিত, রাসলীলা, নবদ্বীপ, ১৩৬২ সন, পুস্তিকায় হরিদাস দাসের ভূমিকা।

৬। কথকতার কথা, প্রাগুক্ত, ১৮।
৭। জসীমউদ্দীন, ঠাকুরবাড়ীর আঙিনায়, কলিকাতা, ১৩৭৬, ৪৮-৪৯।
৮। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রানী চন্দ, জোড়াসাঁকোর ধারে, কলিকাতা, ১৩৫১, ৪৩, ৪৮।
৮ক। পাতঞ্জলং মহাভাষ্যম, ড. বালশাস্ত্রী সম্পাদিত, বারাণসী, ১৯৮৭। কৈয়টের মহাভাষ্য প্রদীপ ও নাগেশ ভট্টর প্রদীপোদ্দ্যোত নামক টীকা সহিত। ৩/১/২৬, ৯৪-৯৬। পালা 'বুদ্ধি বিষয়সত্ব' হয় বলে ঘটনা বিবৃতিতে তিনটি কালের প্রয়োগ সঙ্গত, যেমন "গচ্ছ হন্যতে কংসঃ", "গচ্ছ ঘানিষ্যতে কংসঃ", "কিং গতেন, হতঃ কংসঃ।" বুদ্ধির অর্থ কেবল ধী বা মেধা নয়। জ্ঞান, উপলব্ধি, চৈতন্য ইত্যাদি বুদ্ধির পর্যায়শব্দ।
৯। চিঠিপত্রে সমাজচিত্র, প্রথম খণ্ড অপরার্ধ, প্রাগুক্ত, ৩৯১-৪০৪। এই পুষ্পিকা সঙ্কলন থেকে উদ্ধৃতিগুলি নির্বাচিত করা হয়েছে। লিপিকর প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত, বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ, পরিষৎ পুঁথিশালায় সংগৃহীত, তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, কলিকাতা, ১৩৩৩, ৯।
১০। কথকতার কথা, প্রাগুক্ত, ২০।
১১। চিঠিপত্রে সমাজচিত্র, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, ৯৮।
১২। ঐ, ৯৩।
১৩। ঐ, ১০০-১০১।
১৪। H. P. Sastri, *A Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Collections of the Asiatic Society of Bengal*, Vol. V, Purana Manuscripts, Calcutta, 1928, XXVII, CXXXI, 36-39, 363-364.
১৫। গণেশ বিদ্যাবিনোদ, আদিকাণ্ড কথা, এশিয়াটিক ৩৩১০, ৪০ক, ৮-১১ক।
১৬। রামায়ণ কথা, ঐ, ৬৬০১, ২৩ক-২৪ক।
১৭। রামায়ণ কথা সংগ্রহঃ, ঐ, ৩৭৮৭। ১৭৩৮ শকাব্দে (১৮১৬ খৃষ্টাব্দে) পুঁথিটি রচিত হয়।
১৮। কথকতার কথা, প্রাগুক্ত, ২০-২১।
১৯। কথকতার পালা, শ্রীমদ্ভাগবত (নানা আখ্যানাংশ), রামপদ ভট্টাচার্যের পুঁথি, ব্যাসদেবের জন্ম ১২৯০ (১৮৮৩) সালে লিখিত, পাঠবাড়ী ২৭৮৩/১৩, ২১খ-২৩খ।
২০। দ্বিজরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথকতা, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী, চালতাবাগান, ১৯/১২/৯২।
২১। কথকতার পালা (শ্রীকৃষ্ণের জন্ম), তারিখবিহীন, পাঠবাড়ী, ২৭৮৪/১৪, ২৬ক-৩০ক।

২২। কথকতার পালা (রামরাজা), খণ্ডিত, তারিখবিহীন, পাঠবাড়ী, ২৭৮৯/১৭, ১৯ক-২০ক
২৩। ঐ, ২৭ক-২৭খ।
২৪। কথকতার পালা (শ্রীকৃষ্ণের জন্ম), প্রাগুক্ত, ৩৬ক-৩৭ক। মূল লেখায় ভুলবশত টীকা নং ২৫ ছাপা হয়েছে।
২৫। কথকতার পুঁথি (ভাগবত), খণ্ডিত, তারিখবিহীন, ক. বি. ৫০০৭, ২ক।
২৬। কথকতার পুঁথি (সভাপর্ব), খণ্ডিত, রামগোপাল শর্মা লিখিত, বিশ্ব, ৬২৩১, ১০ ক, পুঁথিতে সংস্কৃত শ্লোক যেমন আছে, তেমন উদ্ধৃত হল।
২৬ক। 'বাঙ্গালা ভাষা', (রামগতি ন্যায়রত্ন লিখিত বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব নামক পুস্তকের সমালোচনা), বঙ্গদর্শন, কার্ত্তিক ১২৭৯, ৪৫৩-৪৫৪। কথকতা, পালাগান ইত্যাদিতে বঙ্কিমের সংস্কার ও শিক্ষা পরিবারগত, পিতৃদত্ত। বাল্যকালে যিনি কথকতার গান বাঁধতেন, প্রাপ্ত বয়সে তিনি দেশজ গান, পালার বিশাল সংগ্রহ গড়ে তুলেছেন। নানা সাক্ষ্যের মধ্যে একটি স্মৃতিচারণের উল্লেখ করা যেতে পারে। অক্ষয়চন্দ্র সরকারের, 'বঙ্কিমচন্দ্র', অক্ষয় সাহিত্য সম্ভার, কালিদাস নাগ সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৮৮৭ শকাব্দ (১৯৬৫, ১৪৮-১৪৯।)
২৭। কথকতার পালা (মহাভারত—নানা আখ্যান), ১২৯০-১৩০৬ (১৮৮৩-১৮৯৯)-এর মধ্যে লিখিত। মথুরাবাটির রামপদ ভট্টাচার্য ছাত্র রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সাহায্যে পালাগুলো লিখেছেন। শিবের বিবাহবর্ণন, ২৬ক-২৬-খ। খণ্ডিত, ২৭৮৭ / ১৫ক, পাঠবাড়ি।
২৮। কথকতার পালা (রাস) তারিখবিহীন, ২৭৮৫/১৫, পাঠবাড়ি, ৩২খ।
২৯। ঐ, ২০ক-২৩খ
৩০। ঐ, ৯১খ।
৩১। ঐ, ৯২ক, ৯৫খ।
৩২। ঐ, ৯৩ক।
৩৩। কথকতা : বিভিন্ন পালার অংশ বিশেষ ; কালিয়দমন পালা, ৭ক, ২৭৮৬/১৫ক, পাঠবাড়ি, আদিনিবাস কৃষ্ণনগর, হাল নিবাস ফরাসডাঙ্গার হাটখোলা, শ্রীরামপদ ভট্টাচার্য লিখিত। ১২৯২ (১৮৮৫) সাল নাগাদ পালাটির লেখার কাল বলে অনুমিত হয়।
৩৪। The Akhyayika and The Katha in Classical Sanskrit, in S. K. De, *Some Problems of Sanskrit Poetics,* Calcutta, 1981, 65-79.
৩৫। তুলনীয়, S. N. Dasgupta and S. K. De, *A History of Sanskrit Literature,* Classical Period, Vol. 1, Calcutta, 1977, 636-639.
৩৫ক। 'ভাবিকা' বা 'ভাবিকত্ব' সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের মূল্যবান ধারণা। ভামহ পরবর্তী আলঙ্কারিকরা নানাভাবে এই ধারণাকে আলোচনা করেন। প্রাসঙ্গিক

শ্লোক, কাব্যালঙ্কার, ৩নং পরিচ্ছেদ, ৫২-৫৩। ৩/৫২-৫৩, উদ্ধৃত অংশ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য V. Raghavan, *Studies on Some Concepts of the Alamkara Sastra*, Madras, 1973, 132-146. এই প্রসঙ্গে রাঘবনের ব্যাখ্যার উপর আমি নির্ভরশীল।

৩৬। বিশ্বনাথ কবিরাজ, সাহিত্য-দর্পণঃ, ৬/৩৩৩, বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৩৮৬, ৪৭৯। 'বিনির্মিতম' হবে।

৩৭। অনুরূপা দেবী, মন্ত্রশক্তি, কলিকাতা, ১৩২২, ৬৪। রমাকান্ত চক্রবর্তী উপন্যাসটির কথা আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছেন।

৩৮। ঐ, ৭৫।

৩৯। ভরত নাট্যশাস্ত্র, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ছন্দা চক্রবর্তী সম্পাদিত ও অনূদিত, ৩/১৯।৪৩-৬২, কলিকাতা, ১৯৮২, ৮-১৫। অভিনবগুপ্তের প্রাসঙ্গিক টীকা, নাট্যশাস্ত্রম্, Ed. M. R. Kavi, Baroda, 1934, Vol. II, সপ্তদশোনুধ্যায়ঃ, ৩৯৯।

৪০। তুলনীয়, রাজ্যেশ্বর মিত্র, 'তাণ্ডব' ভরত নাট্যশাস্ত্র, প্রাগুক্ত, প্রথম খণ্ড ৩১২-৩১৩। নাট্যশাস্ত্রে স্বর ও সুর নিয়ে বিশদ ব্যাখ্যামূলক আলোচনা, রাজ্যেশ্বর মিত্র, 'নাট্যশাস্ত্রে সঙ্গীতচিন্তা', প্রাগুক্ত, তৃতীয় খণ্ড, ২৯৮-৩৫২।

৪১। আচার্যপ্রদত্ত উদাহরণ এইরূপ: "কিং! গচ্ছ! মা বিশ! সুদুর্জন। বারিতোঽসি কার্যং ত্বয়া ন মম। সর্বজনোপভুক্ত।"
ছন্দ অনুসারে বিরাম নয়, অর্থানুসারে থামতে হচ্ছে। ফলে পাঠকালে এক, দুই, তিন বা চার অক্ষরের পরও বিরামের প্রয়োজন হতে পারে। ভরত নাট্যশাস্ত্র, তৃতীয় খণ্ড, ১৪-১৫। ৬১ নং শ্লোক।

৪২। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, আমার কালের কথা, প্রাগুক্ত, ১৯৭।

৪২ক। রাখালচন্দ্র গোস্বামীর পুত্রবধূ শান্তিরাণী গোস্বামীর সাক্ষ্য, শ্রী নিত্যগোপাল গোস্বামীর সৌজন্যে প্রাপ্ত, ২৯।৯।৯৩।

৪৩। কথকতার পালা (শ্রীমদ্ভাগবত), পাঠবাড়ী, ২৭৮৩/১৩, রামপদ ভট্টাচার্যের পুথি (১৮৮৩ সালে লিখিত)।

৪৪। কথকতার পুথি (বনপর্ব্ব), খণ্ডিত, তারিখ অজ্ঞাত, বিশ্ব, ১৫২৫, ৮৬ক-৮৬খ।

৪৫। 'জীবনস্মৃতি' রবীন্দ্র রচনাবলী, বিশ্বভারতী সংস্করণ, সপ্তদশ খণ্ড, প্রাগুক্ত, ৩০৮-৩০৯।

৪৬। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, 'গল্প', কি লিখি? প্রাগুক্ত, ১২৮। শাস্ত্রী মহাশয় কথকের চূর্ণীগুলোকে বাংলা ভাষার সম্পদ বলে মনে করতেন। কৈশোরে কথকের আসরে তাল ও লয়ের সঙ্গে চূর্ণী পাঠ হাজার হাজার শ্রোতার মতো তাঁকেও মুগ্ধ করেছিল। তাই কাঞ্চনমালা উপন্যাসের সহজ সরল গদ্যের মধ্যে তিনি হঠাৎ 'চূর্ণী' বসিয়ে দেন। এইজন্য অক্ষয় সরকারও তাঁকে সমালোচনা

করেন। 'অক্ষয়চন্দ্র সরকার', হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনাসংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, ১৩১-১৩২।

৪৭। কথকতার পালা (শ্রীমদ্ভাগবত) প্রাগুক্ত, পাঠবাড়ি, ২৭৮৩/১৩। আলাদা পাতায় গানটি লিখিত।

৪৮। কথকতার পালা (প্রভাসতীর্থ যাত্রা), ২৭৮৬/১৬, পাঠবাড়ি, ৮ক,

৪৯। রামের অযোধ্যা প্রত্যাবর্তন, সীতারামকুটির, টালিগঞ্জ ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৩।

৫০। ঐ, ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৩। এইরকম গান আরো আছে। যেমন, 'রামায়ণ দেহতত্ত্ব', রামায়ণাচার্য ফেলারাম বন্দ্যোপাধ্যায়, বিরচিত, শ্রীরামনামাবলী, বাঁকুড়া, ১৩৮৩, ২২ নং গান।

৫১। এই পত্রিকায় 'কথকতার গানে' সম্পূর্ণ গানটি আছে। রচয়িতা ফেলারাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের গীতগুলি উপযুক্ত পুস্তিকা থেকে গৃহীত হয়েছে। যথাযথ-স্থানে সূত্র নির্দেশে পুস্তিকাটির অনুল্লেখের জন্য দুঃখিত।

৫২। সাধক নবব্রত ব্রহ্মচারীর ভাগবতপাঠ, (কথা ও সংগীতে) ৩৭-এর পল্লী হরিনাম সংকীর্তন সম্প্রদায়ের উদ্যোগে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ জীউ-এর মন্দিরপ্রাঙ্গন, বৈঠকখানা, কলিকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৩।

৫৩। কথকতার কথা, প্রাগুক্ত, ৮৫-৮৬।

৫৪। কথকতার পাতড়া, ৫০৬৫ ও ৫০৬৭, বিশ্ব।

৫৫। পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সেকালের দুর্গোৎসবের প্রারম্ভে পল্লীচিত্র, আশ্বিন, ১৩২২, মর্মবাণী, ১ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ২৫৫।

৫৬। মন্ত্রশক্তি, প্রাগুক্ত ৭৬-৭৭।

৫৭। চিঠিপত্রে সমাজচিত্র, ২য় খণ্ড প্রাগুক্ত, ১২৩।

৫৮। সেকালের স্মৃতি, প্রাগুক্ত, ৪২।

৫৯। Dinesh Chandra Sen, *History of Bengali Language and Literature*, প্রাগুক্ত, 589-590।

৫৯ক। দ্বিজরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রদত্ত সাক্ষাৎকার, ২০শে নভেম্বর, ১৯৯২। চালতাবাগান, কলিকাতা।

৬০। কথকতার কথা, প্রাগুক্ত, ৪৭।

৬১। ঐ, ৭৩-৭৪।

৬২। প্রতিমাদেবী, স্মৃতিচিত্র, কলিকাতা, ১৩৫৯, ৮৫-৮৬।

৬৩। কথকতার কথা, প্রাগুক্ত, ৩২-৩৩।

৬৪। হরিপদ চক্রবর্তী, 'কথকতার পুঁথি', সংস্কৃতি বৃত্ত, সুবর্ণলেখা, প্রাগুক্ত, ৫৯২।

৬৫। আমার আলোচনা শ্রুতিনির্ভর। আসরের তারিখ ও স্থান নির্দেশ করা হল। কিছু আসরের পাঠ ক্যাসেটে ধরা আছে। প্রধানত সেইগুলি থেকে সরাসরি উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। দুই-একটির ক্ষেত্রে মাত্র অনুলিখন নিয়েছি।

ক্যাসেটগুলি আমার সংগ্রহে আছে। সব আসরগুলিই অন্য উদ্দেশ্যে আয়োজিত, আমি সাধারণ শ্রোতা হিসাবে আসরে যোগ দিয়েছি। একমাত্র অবনীবাবুর আসরই আমার শোনার জন্য বসানো হয়েছিল।

৬৬। তরণীসেনবধ পালা, দ্বিজরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী, চালতা বাগান, কলিকাতা, ৫।১২।৯২। অন্যান্য পালাতেও মঙ্গলাচরণের ছক এক থাকে। ক্যাসেটে সংরক্ষিত।

৬৭। সেতুবন্ধ পালা, ঐ, ৩।১২।৯২। অনুলিখন।

৬৮। শবরীর প্রতীক্ষা পালা, ২৭।১১।৯২, ঐ, অনুলিখন।

৬৯। তরণীসেন বধ পালা, প্রাগুক্ত।

৭০। তরণীসেনের যুদ্ধ ও পতন, কৃত্তিবাস বিরচিত রামায়ণ, সাক্ষরতা প্রকাশন, ২৯৫-২৯৬।

৭১। বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পথের পাঁচালী, কলিকাতা, ১৩৭২, ২৯৩।

৭২। অবনী অধিকারীর কথকতা, অহল্যার শাপমোচন, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৩, অরুণ নাগ ও মধুশ্রী নাগের গৃহ, শান্তিনিকেতন। ক্যাসেটে রক্ষিত।

৭৩। অনেক চেষ্টা করেও এখনো জগৎরামী রামায়ণের কোনো সংস্করণ পড়তে সক্ষম হইনি। তথ্যাদির জন্য দ্রষ্টব্য, D. C. Sen, *The Bengali Ramayanas*, Calcutta, 1920, সুকুমার সেন, বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, আনন্দ সংস্করণ, ১৩৯৮, ৩৬৩-৩৬৪।

৭৪। ক্ষান্তিলতা দেবী, কুন্তীস্তব (ভাগবতী), বছর দশেক আগে শ্যামাপূজার দিনে আয়োজিত পাঠ, ক্যাসেটে রক্ষিত, শ্রীযুক্ত করুণকান্তির সৌজন্যে প্রাপ্ত।

৭৫। বাসন্তী চৌধুরী, রাসলীলা, সপ্তম পর্ব, নিঃস্বলানন্দ কলেজ, ভদ্রেশ্বর, ৫ই জুলাই, ১৯৯৩। ক্যাসেটে রক্ষিত।

□ পর্ব / ৫ □

১। 'মানি কাকা', জীবনকথা, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিত, কলিকাতা, ১৯৭৯, ১৪২-১৫০।

২। আলোচনায় ব্যবহৃত হয়েছে, আনন্দবর্দ্ধনাচার্য প্রণীত ধ্বন্যালোক ও আচার্য অভিনবগুপ্ত বিরচিত লোচন, মূল ও সটীক অনুবাদ, অনুবাদক, শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও কালীপদ ভট্টাচার্য, কলিকাতা, ১৯৮৬। আলোচ্য শ্লোকটি অবশ্য ভরত নাট্যশাস্ত্র থেকে উদ্ধৃত, ১১। প্রবন্ধে 'আনন্দবর্ধন' বানান ব্যবহৃত হয়েছে।

৩। S. K De, *Sanskrit Poetics as a Study of Aesthetics*, O. U. P. 1963, 14-17. Edwin Gerow's টীকা, 6·6, 85।

৪। রামায়ণ কথা সংগ্রহঃ, নং ৩৭৮৭, এশিয়া ১ক-১ খ।

৫। চন্দননগরের ফটকগোড়ায় কথক কুমুদবন্ধুর প্রথম সাক্ষাৎকার ১৫ই জুলাই, ১৯৯৩। উল্লেখ্য এই যে এই জাতীয় ধারণা শ্রুতির মাধ্যমে শিল্পীরা তাঁদের চেতনায় গেঁথে রাখেন। ১৯২৫ সালে কলকাতায় কালকা বিন্দাজি ঘরাণার চৌধুরান বাইজী নৃত্যের নানা অঙ্গভঙ্গিকে নাট্যশাস্ত্র মতে ব্যাখ্যা করে অমিয়নাথ সান্যালকে হকচকিয়ে দিয়েছেন। অমিয়বাবু তখনো নাট্যশাস্ত্র। গ্রন্থটি চোখেই দেখেননি আর বাইজি জানেনই না, ভরত লোকটি কে। দ্র. 'নৃত্যের বস্তুতত্ত্ব', সমকালীন, আষাঢ়, ১৩৬৮, পুনর্মুদ্রিত, ভরত নাট্যশাস্ত্র সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, ২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৮২, ২৮০-২৮১।

৬। ধ্বন্যালোক, প্রাগুক্ত, ১৫, ৪৪, ৪৬। প্রথমোদ্দ্যোতঃ।

৭। ঐ, ২৫-২৬, ৪০-৪১। পঞ্চম কারিকার বৃত্তি ও ভাষ্য প্রথমোদ্দ্যোতঃ।

৮। ভট্টনায়কের 'ভুক্তিবাদ' ও অভিনবগুপ্তের অভিব্যক্তিবাদ সম্পর্কিত তুলনামূলক আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, সাহিত্য মীমাংসা, বিশ্বভারতী, ১৯৭৫, ৭৬-১০৬।

৯। বিশ্বনাথ কবিরাজ, সাহিত্যদর্পণঃ, সম্পাদনা ও বঙ্গানুবাদ, বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, ৩।৯, ৯৫-৯৬।

১০। দীনেশচন্দ্র সেন, ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য, কলিকাতা, ১৯৬৯, ১৮১-১৮২।

১০ক। মন্ত্রশক্তি, প্রাগুক্ত, ৭৫-৭৬।

১১। বেহালা হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা, (স্থাপিত ১২৫৯ সাল/সন ১৮৫২)। দ্রষ্টব্য ৬৫ তম সাম্বৎসরিক পত্রিকা (১৩২৪) ও ৬৬তম সাম্বৎসরিক পত্রিকা, ১৩২৫, ১৭ ও ১৫।

১২। অনুচ্ছেদটি ৪।১১।৯২ সালে চালতাবাগানে দ্বিজরাজবাবুর কথকতার আসরে সমাগত শ্রোতাদের সঙ্গে কথোপকথন-ভিত্তিক।

১৩। বিশ্বনাথ কবিরাজ, পূর্বোল্লিখিত, ৩।৮, ৯৪-৯৫। নাট্যশাস্ত্রের পরিভাষায় শ্রোতার সমাবেশরূপে সমাজ কথাটি প্রাচীনকাল থেকে ব্যবহৃত, অশোকের শিলালিপিতে শব্দের এই জাতীয় প্রয়োগ দেখা যায়। দ্রষ্টব্য, দেবদত্ত ভাণ্ডারকর ও ননীগোপাল মজুমদারের আলোচনা, Indian Antiquary, 1913, 255--258 ও Indian Antiquary, 1918, 221-223.

১৩ক। কথকতার কথা, প্রাগুক্ত, ৭৩।

১৪। Victor Turner, *Dramas, Fields and Metaphors*, Cornell, 1974. Partha Chatterjee, More on Modes of Powers and the Peasantry, *Subaltern Studies*, Vol, II, edited by Ranajit Guha, Delhi, 1983, 338-339.

১৫। ভরত নাট্যশাস্ত্র, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, সপ্তম অধ্যায়, ৭নং শ্লোক, ১৫৪। সাহিত্য দর্পণঃ, তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ, প্রাগুক্ত, ৮৬। একজন আধুনিক গবেষকের মতে

'চমৎকার' ধারণাটি উৎপন্ন হয়েছে ভালো খাবার পর জিভ দিয়ে টাক্‌রায় যে তৃপ্তিবিধায়ক আওয়াজ করা হয়, তার থেকে। 'রামায়ণ চম্পুর' টীকাতেও আছে। "চমদিত্যনুকরণ শব্দঃ।" পরে শব্দের অর্থ বিস্তার হয়েছে, রসাস্বাদনে চিত্তবৃত্তির বিস্তার অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। Raghavan, প্রাগুক্ত, ২৯৪।

১৬। রাজানক কুন্তকাচার্যের বক্রোক্তিজীবিত, রবিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, ১/৫ প্রাগুক্ত, ৩০। Sushil Kumar De, *Vakroktijivita of Kuntaka,* প্রথমোন্মেষঃ, শ্লোক নং ৫, প্রাগুক্ত, ৫।

□ পর্ব / ৬ □

১। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'যাত্রা', বঙ্গদর্শন, পৌষ, ১২৭৯ পুনর্মুদ্রিত, সঞ্জীব রচনাবলী, সম্পাদনা অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১৯৭৩। ৪০৫-৪২৩। যাত্রাপালা নিয়ে মনোগ্রাহী আলোচনা, নাট্যকার মন্মথ রায়, লোকনাট্য যাত্রাগান, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৬।

২। হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, যাত্রাগানে মতিলাল রায় ও সম্প্রদায়, কলিকাতা, ১৩৭৪। সুকুমার সেনের অধিবচন ; লেখকের মন্তব্য, ২০১।

৩। William Ward, প্রাগুক্ত, Vol. 1. Sec. VIII, 189-191. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, রামমোহন গ্রন্থাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ, ১৩৬২, ১২।

৪। বিভিন্ন উদ্ধৃতাংশের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের ভূমিকা সহ কবিপুত্র নিত্যগোপাল গোস্বামী সঙ্কলিত কৃষ্ণকমল গ্রন্থাবলী, কলিকাতা, ১৩১৭। ২, ১৪, ৩৩০। আলোচনা, Nisikanta Chattopadhyay, *The yatras or the popular Dramas of Bengal.* London, 1882, Calcutta, reprint, 1976. পুনর্মুদ্রিত গ্রন্থে রমাকান্ত চক্রবর্তীর তথ্যসমৃদ্ধ মুখবন্ধ উল্লেখযোগ্য।

৫। কামিনীকুমার গোস্বামী সম্পাদিত, কৃষ্ণকমল গীতিকাব্য, কলিকাতা, ১৩২৮, ১৮০-১৮১।

৬। গোবিন্দচন্দ্র দাস বৈরাগ্য প্রণীত, মানভঞ্জন যাত্রা, পালা সম্বলিত পদাবলী, তদীয় ভাগিনেয় প্রসন্নকুমার দাস বৈরাগ্যের আদেশানুসারে গরাণহাটা ৪০৮ পুস্তকালয় থেকে শ্রী বাণেশ্বর ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত, কলিকাতা, ১২৯৩, প্রথম সংস্করণ। পাঁচকড়ি দে ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে এই পালাগুলো পরে ছাপান। গোবিন্দ অধিকারীর জীবনীর জন্য দ্রষ্টব্য, গোপেশচন্দ্র দত্ত, কৃষ্ণযাত্রা ও নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১৯৭৬, ৪২-৫৩। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অক্ষয়কুমার সরকার জানিয়েছেন যে পালায় 'পদাবলী আবৃত্তি করিতেন, ব্যাখ্যা করিতেন, গান করিতেন। মধ্যে মধ্যে ঘটকালি ও কথোপকথন থাকিত মাত্র।' সংলাপ

তাৎক্ষণিক, গানই রসের পরিবাহী, সরকারের রচনায় এই ইঙ্গিত স্পষ্ট। দ্র. 'জয়দেব', অক্ষয় সাহিত্য সম্ভার, কালিদাস নাগ সম্পাদিত প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, ২৫৫।

৭। হরিপদ চক্রবর্তী, দাশরথি ও তাঁহার পাঁচালি, কলিকাতা, ১৩৬৭, ৭৩-৭৪। উক্ত লেখক সম্পাদিত ও সঙ্কলিত, দাশরথি রায়ের পাঁচালী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬২।

৮। পাঁচকড়ি দে সঙ্কলিত, মধুসূদন কিন্নরের ঢপকীর্তন কলিকাতা, ১৩৪৩। পুস্তকের শেষে এই জাতীয় বিজ্ঞাপন আছে।

৯। দীনেন্দ্রকুমার রায় 'শীতলা ষষ্ঠী', পল্লীবৈচিত্র ১৩১২, আনন্দ সংস্করণ ১৩৮৯, ৯১।

১০। দ্র. ভূমিকা, ভরতাগমন গীতাভিনয়, মতিলাল রায় কর্তৃক প্রণীত, ১২৯৫।

১১। হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, ২০৭-২০৮।

১২। 'দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ', গীতাভিনয়, শ্রীমতিলাল রায় কর্তৃক প্রণীত, কলিকাতা, সন ১২৮৮। ৯৭, ১০৯-১১০।

১৩। কথকতার পুথি, সভাপর্ব্ব, ৬২৩১, বিশ্ব ১৹ ক-খ। (খণ্ডিত, তারিখ অজ্ঞাত)।

১৪। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, প্রাগুক্ত, ৮৯, ১৫৯)।

১৫। কথকতার পুথি, ১৫২৫ক, বনপর্ব্ব, বিশ্ব, খণ্ডিত, তারিখ অজ্ঞাত, ৮৪ খ।

১৬। দ্রষ্টব্য, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের বিজ্ঞাপন, প্রাগুক্ত।

১৭। দ্রষ্টব্য, ভরতাগমন গীতাভিনয়ের বিজ্ঞাপন। প্রাগুক্ত। বটতলায় পণ্ডিতদের নিয়ে সংশোধন, সংযোজন ও পরিমার্জন প্রচলিত রীতি ছিল। সঠিক সম্পাদনা, প্রক্ষিপ্ত বিচার করা ইত্যাদি আরেক রকমের পাঠ তৈরি করার ধারণা থেকে জাত। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখরা এইসব পণ্ডিতদের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত ছিলেন।

১৮। হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, ২১৬-২২২। গোপেশচন্দ্র দত্ত, প্রাগুক্ত, ২৪৭-২৪৯।

১৯। রাজ্যেশ্বর মিত্র, আমার দেখা বাংলা গানের জগৎ, কলিকাতা, ১৯৮৯, ৭৭।

২০। হিতেশরঞ্জন সান্যাল, বাঙলা কীর্তনের ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৮৯।

২১। কৃষ্ণা বক্সী, কীর্তন গানের ইতিহাস, কলিকাতা, ১৩৯৫, ৮০-৮১। কথকী হিসাবে শ্রীমতী কৃষ্ণা বক্সীর সাক্ষ্য মূল্যবান। আখর ও কথার ভূমিকা কীর্তনে কীভাবে অমোঘ হতে পারে, তার জন্য দ্রষ্টব্য, আখুরিয়া হরিদাসের কীর্তনবৃত্তান্ত, সরলাবালা সরকার, হারানো অতীত, কলিকাতা, ১৩৬০, ১৪০-১৪৭।

২২। খগেন্দ্রনাথ মিত্র 'কীর্তন,' বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, কলিকাতা, ১৩৫২ পুনর্মুদ্রণ, ১৯৫২, ৩৪-৩৫।
২৩। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বাঙ্গলার কীর্তন ও কীর্তনীয়া, রাজ্য পুস্তক পর্ষদ সংস্করণ ১৯৯০, ১০৫-১০৬।
২৪। পাঁচকড়ি দে সঙ্কলিত, মধুসূদন কিন্নরের ঢপকীর্তন, প্রাগুক্ত।
২৫। উপর্যুক্ত অনুচ্ছেদের তথ্যাভিত্তি, 'কৃষ্ণকীর্তন,' বিশ্বকোষ, নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত, চতুর্থ ভাগ, ১৮৬৬-১৯১১, পুনমুদ্রণ, নিউ দিল্লী, ১৯৮৮, ৪০৪-৪৩৫।
২৬। উদ্ধৃতিগুলির উৎস, ঢপকীর্তন প্রভাস যজ্ঞ পালা, শ্রীনৃসিংহ কুমার ঘোষ দ্বারা প্রকাশিত। কলিকাতা, চিৎপুর রোড, ১৪০ নং কমলাকান্ত যন্ত্রে শ্রীতিনকড়ি বিশ্বাস দ্বারা মুদ্রিত। ১২৯২। ১-৪, ৮৩-৮৪।
২৭। পাঁচকড়ি দে সঙ্কলিত, প্রাগুক্ত, ৬৪-৬৬।
২৮। কথকতার পুঁথি, ক.বি., খণ্ডিত, ৫০০৭, ১ ক-১ খ, লিপিকাল অজ্ঞাত।
২৯। পাঁচকড়ি দে, প্রাগুক্ত, ৮০-৮১।
৩০। দীনেন্দ্রকুমার রায় 'কার্তিকের লড়াই', প্রাগুক্ত, ২৯-৩০।
৩১। ঐ।

☐ পর্ব / ৭ ☐

১। 'লোকশিক্ষা', বঙ্কিমরচনাবলী, ২য় খণ্ড, যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত, সংসদ সংস্করণ, ১৩৭১, ৩৭৬-৩৭৭।
২। দীনেশচন্দ্র সেন, বৃহৎ বঙ্গ, প্রথম খণ্ড, দে'জ সংস্করণ ১৯৯৩, ৩৮৬।
৩। দেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে, অনুষ্টুপ, কলিকাতা, ১৯৮৭ ১৯২-১৯৫।
৩ক। রমাকান্ত চক্রবর্তী, 'কথকতা পাঠকতা' দ্রষ্টব্য। বর্তমান সংখ্যা, যোগসূত্র।
৪। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, পৌরাণিক উপাখ্যান, কলিকাতা, ১৩৯০, ৮৮-৮৯।
৫। মহেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান, সম্পাদনা, ধীরেন্দ্রনাথ বসু, কলিকাতা, ১৩৫০, ১২।
৬। দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (অষ্টম সংস্করণের পুনমুদ্রণ, রাজ্য পুস্তক পর্ষদ প্রকাশন) অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৯১, ৭৯-৮০।
৭। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, ভূমিকা, (১৩১৫), ঠাকুরদাদার ঝুলি, কলিকাতা, ষোড়শ সংস্করণ, ১৩৯৩, ১৪।
৮। ঠাকুরদাদার ঝুলি, প্রথম সংস্করণ, ১৩১৫, ১৩৮-১৩৯।

৯। ঐ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩১৬, ৯৬।

১০। অনুচ্ছেদের অধিকাংশ শব্দাবলী ঠাকুরদাদার ঝুলির ভূমিকা (১৩১৫) থেকে উদ্ধৃত ; প্রচ্ছদের পেছনের কাগজে ছাপা সমসাময়িক সমালোচকদের নানা মন্তব্য ও দক্ষিণারঞ্জন লিখিত অন্যান্য বইয়ের বিজ্ঞাপনও কৌতূহলোদ্দীপক। বইয়ের আখ্যাপত্রে পুরোনাম—উপরে ছোট অক্ষরে "মাতৃগ্রন্থাবলী চতুর্থ সংখ্যা" দক্ষিণে কোণায় "বাংলার কথা সাহিত্য" মাঝে বড় অক্ষরে "বাংলার উপন্যাস ঠাকুরদাদার ঝুলি"। মলাটে কিন্তু 'বঙ্গোপন্যাস' লেখা আছে। প্রাগুক্ত সংস্করণ।

১১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভূমিকা (১৩১৪), ঠাকুরমার ঝুলি, দ্বাত্রিংশতি সংস্করণ, ১৩৯১, ১২।

১২। যদুনন্দন দাস, গোবিন্দলীলামৃত, কৃষ্ণদাস কবিরাজ কর্তৃক সংস্কৃতে প্রণীত, কলিকাতা, ১২৭৪, ২।

১৩। শঙ্খ ঘোষ, কল্পনার হিস্টিরিয়া, কলিকাতা, ১৯৮৪, ৫০।

(দীনেশচন্দ্র সেনের নামের আগে ভুলবশত 'ডক্টর' বসানো হয়েছে। এটা অপ্রয়োজনীয়।)

□ □ □

ভ্রম সংশোধন

"রিঙ্গনলীলার" বিন্যাস হবে এইরকম "নূপুর তুমি গুঞ্জনরবে সিঞ্চন করতঃ"—এর পরে "দিবানিশি জিতং শব্দ করছ" পড়তে হবে, ও "বিধি মার্গে জায় না জানা" পর্যন্ত টানা ক্রম বজায় থাকবে। এর পরে যারা "মাতৃ জাতিকে ঘৃণা করেন" থেকে "ভাষা শেখেন" অনুচ্ছেদটি আসবে। (দ্রষ্টব্য ৩৪-৩৭ পৃষ্ঠা)।

১৬৫ পৃষ্ঠায় "পটুয়াদের গানও শ্রোতারা শোনে না নির্বিকার উদাসীনতায়"—এই শুদ্ধ পাঠ হবে।

তারাশিস ভট্টাচার্য নয়, তারাশিস মুখোপাধ্যায় হবে।

□ □ □

CITIBANK CARDS
The Best Way To Pay

□

Space donated by :

A Well Wisher

□

With best compliments from :

M/s. L. M. M. International

Manufacturer of Lifting & Materials Handling Equipments, i.e. "LMM" Brand "ISI" Marked Super Gear Chain Pulley Blocks, "ISI" Marked Pulling & Lifting Machines, Hand & Electrically Operated Winches, Electric Hoists, Wire Rope Pulley Blocks, Hooks, etc.

Office Address :
6, RAJA WOODMUNT STREET, CALUTTA-700 001
A/C Office Address :
36, STRAND ROAD,
CALCUTTA-700 001
Works Address :
HOWRAH AMTA ROAD, BANKRA, HOWRAH
Our Sister Concern :
M/s. EASTERN SUPPLY CO. (P) LTD.
Phone Nos. :
Office : 243-1384, 243-8267
A/C Office : 243-3126
Works : 665-1261

□

With best compliments from :

Star Tea Company Pvt. Ltd.

[SINCE 1940]
Retailer, Wholesaler & Exporter
8/1, LAL BAZAR STREET
CALCUTTA-700 001
Office : 220 0559, 220 5710
Shop : 248 2630

BRANCH :
23, R. G. KAR ROAD
CALCUTTA-700 004
Phone : 55 6599
Cable : HINDCHA
Telex : 212352 STAR IN

With best compliments from :

Searle (India) Limited

Product :

TRAPP 50% E.C.
FENVAL 20% E.C.
LACER E.C.
TRAPP 5% GR
FENVAL 0·4% DP
RADAR E.C.

With best compliments from :

S. Sen & Co.

Engineer, Fabricator, Fire Fighting
Equipments & General Order Suppliers

76A, RASTRAGURU AVENUE,
CALCUTTA-700 028

OWNERSHIP FLAT
AT
Ramgarh, Dakshineswar
Near UBI Ariadaha Branch
34, S-17, BUS STAND (Dolperi) CALCUTTA-700076

CONTACT :

Home Land Construction

Promoter and Land Developer
40, RAMGARH ROAD, CALCUTTA-76
Low Price Rate (400/-) Sft. for 20 Nos. Flats
(Two size flats—650 sft available)
Booking open from 29-1-93

□

সব ঋতুতেই সেবার প্রয়াসী

প্রতিটি পদক্ষেপেই পুরসভা আপনার সঙ্গী।
প্রাথমিক শিক্ষা, সাক্ষরতা, স্বাস্থ্য, জল সরবরাহ,
বস্তি উন্নয়ন, আবর্জনা অপসারণ ও আরও অনেক কিছু।

আমরা কলকাতার জন্য

তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ

কলকাতা পুরসভা

□

With best compliments from :

K. Ghosh & Co.

Authorised Nonlevy Cement Dealer

22A, DR. L. M. BHATTACHARJEE ROAD
CALCUTTA-700 014, PHONE : 245-1080

□

□

কৃষি ও কৃষকের সেবায়

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বীজ নিগম লিমিটেড

উন্নত মানের সারটিফায়েড পাট, ধান, গম, ডাল শস্য ও সব্জী ও
তৈলবীজের উৎপাদন ও সরবরাহের একমাত্র
নির্ভরযোগ্য সরকারী প্রতিষ্ঠান।

রাজ্য বীজ নিগমের বীজই
বাজারের সেরা বীজ

ব্যবহার করুন □ ফসল বাড়ান □ লাভ বাড়ান

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বীজ নিগমের জেলা দপ্তরে যোগাযোগ করুন

পশ্চিম দিনাজপুর : উকিলপাড়া, রায়গঞ্জ।
মালদা : অভিরামপুর, পোঃ মকদমপুর।
মুর্শিদাবাদ : পঞ্চাননতলা, বহরমপুর।
নদীয়া : ১২, ডি. এন. রায় রোড, কৃষ্ণনগর।
বর্ধমান : বর্ধমান, কানাইনাট সাল।
বীরভূম : বড়বাগান, সিউরি।
বাঁকুড়া : চাঁদমারীডাঙ্গা।
মেদিনীপুর : সিপাই বাজার চক্।
উত্তর ২৪ পরগণা : ২১ নং কে. এন. সি. রোড, বারাসাত।
হুগলী : পিপুলপাতি হুগলী।
কোচবিহার : রাজমাতা ষ্ট্রীট।
পুরুলিয়া : অনিলা ভবন, কে. পি. লেন,
পোঃ ডুলমি, নদিহা।

সদর দপ্তর

৪, গঙ্গাধর বাবু লেন, ষষ্ঠতল
কলিকাতা-৭০০ ০১২

□

With best compliments from :

S. N. Polyfilms

GOPALPUR
P.O. R-GOPALPUR
DIST. 24 PGS (N)

Manufacturer of HD, LDPE, LLDPE, HM-HDPE Films & Bags, Specialist in Shrink Wrapping Film.

With best compliments from :

Adkins India

PRAFULLA KANAN (WEST)
CALCUTTA-59

Pharmaceuticals Distributors :
PFIZER LTD. FDE LTD.
&
UNISEARCH LTD.

With best compliments from :

Jal H. Indorewalla & Sons

41 C-D, GARCHA ROAD
CALCUTTA-700 019

□
With best compliments from :

Amar Taxi Service
NEW DELHI-110 003
Phone : 4611205

□
With best compliments from :

M/s. Moongipa Roadways
119, COTTON STREET
CALCUTTA-7

□

With best compliments from :

M/s. Das Printers

123/1, ACHARYA P. C. ROAD
CALCUTTA-700 006
Phone : 350-4312, 350-8843

Leading House of Quality Letter Press
& Off-Set Printing

□

With best compliments from :

Continental Hardware Mart

Dealers of :

Dewrance, Leader, GG. Spirax Drayton, Kilburn &

Propel Brand Valves

Office :

26, STRAND ROAD

CALCUTTA-700 001

Phone : 20-6696, 20-2995

Gram : PIPEWAY

□

Space donated by :

Classic Brickfields

THANA : RAJARHAT

□

With best compliments from :

N. G. T. Engg. (P) Ltd.

□
Space donated by :

A Well Wisher

□
With best compliments from :

M/s. Joshi Sales & Suppliers
Pvt. Ltd.

□

With best compliments from :

Central Concrete & Allied Products Ltd.
and
Central Engineering Syndicate
(An Undertaking of New Central Group Engineering Pvt. Ltd.)
8, CAMAC STREET
3rd Floor, Space-1
CALCUTTA-700 017
Phone No. 242-0090/4272/1521/1553
Telex : CA-021-2331 CENT IN
Fax No. 91-33-2424330
Gram : CENTPILES

Declaration No. : 96/93 □ Oct-Dec 1993 □ Rs. 22

With best compliments from :

SUNNY ELE RICALS
3, SECTOR-1
SALT LAKE CITY
CUTTA 700 064

সঞ্জয় চক্রবর্তী কর্তৃক ইমপ্রিণ্টা, ২৪৩/২বি, আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রো তা-১০০ ০০৬ থেকে মুদ্রিত এবং টি জি ২/২৯, তেঘরিয়া, হাতিয়ারা, কলকাতা-১০০ ০৫৯ থে শিত।